

৭

রচনা বালী

সৈয়দ মুজতবা আলী



ସିନ୍ଧୁ ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ଚଳିତ ରଚନାବଳୀ

ମୁଦ୍ରଣ ୩୭



ସିନ୍ଧୁ ଓ ଘୋଷ ପାବ୍ଲିଶାନ୍ସ
ପ୍ରା ଇ ଡେ ଟି ଲି ମି ଡେ ଡ
୧୦ ଶ୍ୟାମାଚରଣ ଦେ ଷ୍ଟ୍ରୀଟ, କଲିକତା ୧୨

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৫৫

সম্পাদক
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
সদ্বৎসনাথ ঘোষ
সবিতেন্দ্রনাথ রায়
মণীশ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ-পরিরক্ষণা
শ্রীচুনী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ-মুদ্রণ
সিঙ্গক স্ট্রীট ও
চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ বে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে
এস এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ শশী প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৬ হইতে অশোককুমার ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

ভূমিকা	শ্রীঅন্নপূর্ণা বসু	ক—ছ
জলে-ডাঙায়		১
ভবঘুরে ও অন্যান্য		১০৫
মদসারফির		২৬৭
গ্রন্থ-পরিচয়		৪১১

ভূমিকা

সৈয়দ মজতবা আলী সাহেবকে বেশ কয়েকবার চোখে দেখেছি, তাঁর মজলিশ বৈঠক কিংবা মশলাদার বক্তৃতাও শুনেছি। যদিচ সে সব স্মৃতি মনের অটোগ্রাফ-খাতায় দস্তখত রাখার মত ব্যাপার। কালেভদ্রে খুলে দেখা আর অটোগ্রাফ-শিকারিদের কাছে ছাতি-ফোলানো ছাড়া তা দিয়ে আর কিছুই করা যায় না। ভূমিকা লেখা তো দূরে থাক। তবে হক কথা, আলী সাহেব আমার বন্ধু, আমার মতো আরো অসংখ্য পাঠকের অন্তরঙ্গ বন্ধু, আমাদের তিনি কস্মিনকালে না চিনলেও। বয়েসের যে ব্যবধানই থাকুক, তাঁর সেই দেশে বিদেশে থেকে শ্রদ্ধা করে পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়, মায় এই রচনাবলী প্রকাশ পৰ্যন্ত, এত কাছের মানুষ তামাম দুনিয়ায় আর কেউ হতে পারে বলে জানি না। আমি বিদেশ দু'ড়ি নি (দেশটাই ভাল করে চষা হল না), জর্ডানের জল খাই নি, ডুসেলডফের কাদায় পা হড়কে যায়নি, জিবুটি বন্দরের শস্তা কাক্সের বসে নিবুপানির গেলাসের ওপর থেকে চামর দিয়ে ভনভনে মাছি তাড়াইনি, জালালাবাদের ১২০ ডিগ্রি গরম থেকে খান্ন-ই জম্বারের ৬০ ডিগ্রিতে পৌঁছিয়ে আরামের সুখনিম্বাস ছাড়িনি, কাইরোর মুক্তাঙ্গন হোটেলে বসে পোলাও-পারা শসা চিবোইনি, গডেসবার্গের নিজর্ন রাস্তার গেরস্তবাড়ি ঢুকে কেক-প্যাস্ট্রিও সাঁটাইনি। কিন্তু এর সবই আমার নথিপত্রের। হয়ত বা আপনাদের অনেকেরও। কারণ আলী সাহেবের সঙ্গে এসব জায়গায় আমাদের জ্বর ঘোরা হয়ে গেছে। মেনে চেপে সাহেববাবুর মত নয়; সিম্ফ'পায়ে হেঁটে, লজ্জাড়া ট্যান্ডিতে উঠে, কখনো বা জাহাজের জনতা-ডেকে, কভুবা ট্রেনে, যখন যেমন সুবিধে। কখন পেরিয়ে এসেছি লন্ডন, প্যারিস, রোম, সেখান থেকে মিউনিক—খেয়ালও নেই। আলী সাহেব আমাকে হাত ধরে ট্রাফালগার স্কোয়ারে নিয়ে যাননি, বাকিংহাম প্যালাস দেখাননি, বাঙাল হয়েও হাইকোর্ট দেখাননি। ইফেল টাওয়ারের ধারে-কাছেও তিনি নেই। গল্টরের ডাক যেখানে লাগু খান সেখানেও উনি আপনাকে ঢোকাবেন না। বেশি পীড়াপীড়ি করলে বড়জোর উনি কেন্সিংটন গার্ডেনে কোন খানদানি ইংরেজের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন, কিন্তু নিজের বন্ধু শহরের শহরতলির প্রান্তে টেনিসের-এর বাড়ি গিয়ে তার খাডারনি গিমির কাছে বসে গরম সুপ খাবেন। অবশ্য এরই মধ্যে আপনার আমার আয়ো কিছু অভিজ্ঞতা

হয়ে গেছে। যেমন ধরুন, এক বদম ত্রিটিশ মিউজিয়াম ঘোরা হয়ে গেছে, বালিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজহার বিশ্ববিদ্যালয় খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছি— এখন পাত্তাড়ি বগলে ঢুকে পড়তে যা বাকি, শব্দ শব্দ শব্দ শব্দ জোটেনি। কাইরোর রাস্তাঘাট মোটামুটি চেনা হয়ে গেছে, পোর্ট সঈদ গিয়ে জাহাজ ধরতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। চাই কি, জুর্নিখ এয়ারপোর্টে নেমে ট্রানজিট প্যাসেঞ্জারের খোঁয়াড় থেকে কী কৌশলে বিনা ‘ভিজা’য় বাইরে বেরুনো যায়, তাও শেখা হয়ে গেছে। তবে আপশোষের কথা কোন শ্রীমতী ফ্রিড বাওয়ান বা চি জেল সেখানে আপনার-আমার জন্যে হার্পিতোশে অপেক্ষা করবে না।

সৈয়দ মুজতবা আলীর সাহিত্যিক জীবন দীর্ঘকালের নয়, গ্রন্থসংখ্যা খুব একটা কম না হলেও বেশি নয়, আর সেগুলো না গল্প না উপন্যাস। রচনা কথটা আমার তেমন পছন্দ নয়। বেল লেংরই বলি আর প্যারিসোনা এসে-ই বলি, আলী সাহেবকে তেমন ধারা অ্যাকাডেমিক শিরোনামের মধ্যে বাঁধতে মন চায় না। ভ্রমণসাহিত্য হিসেবে তাঁর কিছু কিছু গ্রন্থের পরিচিতি হয়ত যেমানান নয়, যদিও তার জ্ঞাত আলাদা, সঞ্জীবচন্দ্র যেমন পিঁয়াজ আর পলাতুর জাতিভেদ করেছিলেন। অথচ এ সবই আলী সাহেবের জীবনকথা, তাঁর নিজেরই অভিজ্ঞতার ঝুলঝুড়ী সম্পদ। আত্মজীবনের বাইরে গিয়ে তিনি কোন গল্প ফাঁদেননি। দূর-চারণে কেতাব ছাড়া, আলীসাহিত্য সবটাই তাঁর নিজের জীবনের বর্ণালী, বানিয়ে বলার চতুরালি নয়। অস্ত্রচলের ধারে এসেই তিনি পূর্বাচলের পানে তাকিয়েছেন, মার্সিয়ানের ঠাকুরমার মত বলেছেন, এস্ ইস্ট্ সো লাণ্ডে হের—সে সব কত পুরনো কথা, সব কি মনে আছে? তা নেই-নেই করেও কম নেই। তাই ঝাড়া চল্লিশ বছরের ইতিহাস ঠায়েঠায়ে রয়ে-বসে বলতে হয়েছে। তাঁর মনুসারির পর্দার এক জায়গায় তিনি কবুল করেছেন, “সে সব অভিজ্ঞতা সুসংলগ্ন ভাবে ক্রমানুক্রমে লিখে উঠতে পারি নি। কিন্তু আমি ভরসা রাখি যে, সচতুর পাঠক আমার প্রকাশিত পুস্তক থেকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত টুক-টুকি ছিটেফোটা জুড়ে দিয়ে জিগ্‌শো পাজল সমাধান করতে পারবেন—অর্থাৎ একটি মোজাইক নিৰ্মাণ করতে পারবেন; তদ্ব্যতীত মোটামুটি একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি পেয়ে যাবেন। যদিও তার আউটলাইনগুলো সুস্পষ্ট শাপ হব না, বহু ডীটেল বাদ পড়ে যাবে, কিন্তু তাতে করে কিছু আসে যায় না।” সত্যি কিছু আসে-যায় না, কিন্তু তাও কি তিনি সহজে লিখেছেন? তাঁর মত ‘মুন্ডি’ লেখক বাঙালী

সাহিত্যে সম্ভবত বেশি নেই, ছিলেন না। ঐ মদুসাফির বইতেই এক জায়গায় তিনি বায়নাক্ষা ধরে বলেছেন, ‘আমার জীবনস্মৃতি লিপিবদ্ধ করার মত দৃগুটি আমার কখনো হবে না সে আমি জানি।’ গ্রন্থ গট্ ভগবানের আশীর্বাদ, এত কাশ্বেডর পরও গোটা কড়ি বই !

আলী সাহেবের ভবঘুরে বইতে কিছু বিষয়াগ্রিত রচনা আছে, তাছাড়া জলে-ডাঙায় ভবঘুরে মদুসাফির সবই সমগকথা। কিন্তু একেমন সমগ ? স্বীকার করি তিনি অনেক মূল্যক চেষ্টা বেড়িয়েছেন, অনেক শহর-বন্দরের ধুলো অনেক নদীর পানি খেয়েছেন। কিন্তু সমগের জন্য কদাচ নয়—মদুসাফির কৈফিয়তেই সে কথা কবুল করা হয়েছে। আর তাঁর সমগকাহিনীও তাঁর ‘অনিচ্ছার’ সৃষ্টি এবং তাও সমগের অনেককাল পরে, যখন সমগের স্মৃতির ওপর ধুলোর পলস্তায় পড়ে গেছে। সমগের তো আনিভারসারি হয় না—পূরনো সমগের জাবর কাটা সবাই পছন্দ করেন না। পূরনো ঘিয়ে বাতের ব্যথা কমে কিন্তু ভাত খাওয়া যায় না। আমাদের এক প্রাচীনকালের হাফগিস লেখক সঞ্জীবচন্দ্র বড়ো ব্যেয়েসে পালামৌ সমগের বৃত্তান্ত লিখতে গিয়ে বড়ই ব্যেয়েসের চোখ আর মনের মধ্যে গুবলেট করে ফেলেছেন। আলী সাহেবও সেই উমরে কলম ধরেছেন, যখন চোখে-দেখা কানে-শোনা জিভে-চাখা অভিজ্ঞতা অনেকটাই পিছনে হটে গেছে, এখন সম্বল শব্দ স্মৃতির গুমর। একে সমগকথা পাঠক বলতে চান বলবেন, না হয় নাই বলবেন। এখানে কোন দিনলিপি নেই, সময়ের গরমিল যথেষ্ট, কখনো স্নেহা থেকে স্বাপরে হাজির, এটা বলতে সেটা এসে ঢুকেছে, আশকথা পাশকথার ছড়াছড়ি। লেখক নিজেও তা জানেন। তাই প্রায় লেখাতেই এই বেপাক্ষা বর্ণনার জন্য হাত কচলাতে থাকেন। বলেন, “কোথা থেকে কোথা এসে পড়লুম। ঘটাপকে নিয়ে এই তো বিপদ : সে স্বেরকম রাস্তায় নাক বরাবর চলতে জানে না, তার কাহিনীও ঠিক তেমনি পারলেই সদর রাস্তা ছেড়ে এর খিড়িকর দরজার দিকে তাকায়, কোপের আড়াল থেকে ওর পিছনের পুরুরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ভবঘুরে।” কিন্তু আলী সাহেবের অনুরক্ত পাঠকদের এইটেই লাভের, কারণ এই ধরনের রসকরা মশকরা শব্দতেই তাঁরা ভালবাসেন বেশি। এ কালের পাঠক নিশ্চয় আলী সাহেবের কাছ থেকে ‘ইয়োরোপে সাড়ে তিন মাস’, ‘হাবুলের কাবুল-সমগ’ শব্দতে চায় না। লেখক নিজেও জানেন, “এখন এত শত লোক নিত্য নিত্য বস্ত্র ইন কস্টোতে উইক এন্ড

কাটাতে যায়, জব্বল্ অল্ অল্‌বীয়াতে হানিমুনের প্রথমার্ধ চুবে আসে যে 'ফ্রান্স ভ্রমণ' কিংবা 'মস্তে কার্লো বর্শ'ন' শিরোনামা এখন সে অবজ্ঞার চোখে দেখে। এইজন্যই বলিছিলুম, আলী সাহেবের ভ্রমণকাহিনী গতানুগতিক ট্রাভেল লিটারেচার নয়। কোনো দেশের মননসাধনা চিংপ্রকবের পরিচয় তো লাইব্রেরিতে বসেই পাওয়া যায়। কিন্তু সে দেশের আসল রূপ সেখানকার সাধারণ মানুষের কাছে। মজতবা আলী লিখেছেন, "সে দেশের টাঙ্গাওলা-বিড়িওলা-জ্বাইভার কারখানার মজদুর কী ভাবে কী চিন্তা করে সেটা জানতে হলে সে দেশে না গিয়ে উপায় নেই। কারণ তারা বই লেখে না, খবরের কাগজে সম্পাদককে চিঠি লিখে নালিশ ফরিমাদ জানায় না। তাদের কামাকাটি গালমশ্শ যা কিছু করার সব কিছুই তারা করে এদেশের চায়ের বোকানে, ওদেশে 'পাবে', অর্থাৎ শরাবখানায়।" আলী সাহেবের সঙ্গী হয়ে তাই ভিনদেশের পাবে-শরাবখানায়-কাফে-রেষ্টোরাঁয় ঢুকে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয় তা পুরো একটা দেশ আবিষ্কারেরই সমতুল। কেনিসিংটন গিজার পাশে ছোট্ট শরাবখানায় সেই বড়ির সঙ্গে আলাপের কথা কি ভুলে যাচ্ছেন? সেই সঙ্গে কত খুঁটিনাটি, রাসাঘরের মেন্দ, পানভোজনের ফিরিস্তি, গাছপালা-গাড়িঘোড়ার ছবি, কত প্রবাদপ্রবচন, আবহাওয়ার তত্ত্ব, সাহিত্যের খবর, রাজনীতি-সমাজনীতি, মামলা ও হামলার বিবরণ, পথঘাটের নকশা, কত বয়েৎ ও কটুবাক্য ফুলফুরির মত ঝরে তাঁর কলমে। মজতবা আলীর সাহিত্যকে তাই বলতে ইচ্ছে করে এনসাইক্লোপিডিয়া আলীয়ানা। তামাম দুনিয়ার খালাসীদের খবর রাখেন মানুষটি, তা সে নোম্মাখাল্যা সিলেট্যাই হোক, আর হামবুর্গ ভেনেসেরই হোক। ইহুদি থেকে বেদে, উষাস্তু থেকে যাবাবর, অনেক অনিকেত জীবনের কাহিনী আমরা পড়েছি। কিন্তু জলঅন্তপ্রাণ সমুদ্র-সমাপিত, জাহাজের মাঝিমাল্লা খালাসী কাপ্তেনদের উদ্ভূমি জীবনের কাহিনী এমন লবণাক্ত ভিজ়ে ভাসায় আর কে বলতে পারেন? কিন্তু এও সব নয়। আলীর থলিতে হরেক পশরা। তাতে বিবিসির আবহাওয়ার পূর্বাভাস (ঝড়ের পরে ঘোষিত), এলিয়টের ক্যাথলিক রক্ষণশীলতা, আকাশবাণীর রেডিওয়ে একটিভিটি-নিরোধক শটুডিও, হিটলার বরিশালের লোক, আরব সাগরের আবহাওয়া, ফরাসি খাবার উৎপত্তির ইতিহাস, আহার সম্পর্কে ফরাসি গুণগী রশফুকোনের বাণী, 'ক্রমবর্ধী'র বৌদ্ধিক শব্দতত্ত্ব, ইন্ডোলাজির ইতিবৃত্ত, এশিয়াটিক সোসাইটির জন্মকথা, বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত চর্চার ইতিহাস, জার্মান এনসাইক্লোপিডিয়ায় 'ঠাকুর' শব্দের ব্যাখ্যান, হিটলারের বিবাহকালীন আবেদনপত্র,

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভিলহেল্ম ফন হুমবলট্-এর মনীষা, সোমোকোরা ধীপের ভূতত্ত্ব, সোমালিল্যান্ডের উপর ইয়োরোপের রাজনীতির জুড়ো, 'বোম্বেটে' শব্দের হৃদয়—কী নেই সেখানে? অথচ লেখক বলছেন, তিনি নতুন কিছ্ লেখেননি, নতুন কিছ্ দেখেননি—প্রা় সা শাজ প্রা় সে লা সেম শোজ, দি মোর ইট চেজেস দি মোর ইট ইজ দি সেম থিং।

তব্ এর মধ্যে রসনার্ঘ্যের দিকেই মৃজতবা সাহেবের নেকনজর বেশি, তাতে সন্দ নেই। তাঁর দেহাবসানের পর দেশ পত্রিকার একটি প্রবন্ধ 'সৈয়দ মৃজতবা আলী') হীরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন, তিনি যেমন করে বলতেন ঠিক তেমন করেই লিখতেন, বলার আর্ট আর লেখার আর্ট তাঁর কাছে অভিন্ন ছিল। আলী সাহেবের এক অন্তরঙ্গজন আমীনুর রশীদ চৌধুরী আর একটি প্রবন্ধ ('মৃজতবাকথা') সজনীকান্ত দাসের স্মৃতি উদ্ধার করে জানিয়েছিলেন যে একবার আলী সাহেব নাকি রাস্তায় দাঁড়িয়ে, এবং পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরে গেলে পাশের কাফের বসে, দুনীয়ার মদ্যপানীদের জাতগুণ্ঠির ফিরিস্তি দিয়েছিলেন। কথা শেষ হলে দেখা গেল, সাঁঝবাতি জ্বলে গেছে অথচ প্রোতাদের দূপদ্বরের খাওয়া হয়নি। 'ভবঘুরে ও অন্যান্য' নামক গ্রন্থের 'হুঁসিয়ার' লেখাটি পাঠ করলেই পাঠকের মালুম হবে এ সব কথা কত সত্যি ছিল আলী সাহেবের জীবনে। এই এক চিলতে প্রবন্ধেই তিনি হৃদয়মুড় করে হর-দুনীয়ার মদ্যপানীদের ন্যাড়িনক্ষত্রের বিবরণ দিয়েছেন। ফ্রান্সের বোর্দো অঞ্চলের ক্লারেট মদ, বাগের্শুঁর ওয়াইন, শ্যাম্পেন কেন বৃজবৃজ করে বাগের্শুঁড করে না, হাঙ্গেরির টকাই ও বাঙলার পচাই, সাঁওতালি হাড়িয়া আর ইতালির কিয়াস্তি, আপেল ফার্মেঁট করে কেমন করে সাইডার ও মধু ফার্মেঁট করে মীড হয়, চোলাই কাকে বলে—এসব খবরে রচনাটি জ্বজ্ব করছে। তিপ্পান সালের নীয়েনস্টাইনারের কী গুণ, লন্ডনের বারের ভুঁড়িওয়ালা ওয়াইন মাস্টারের চেয়ে আলী সাহেব কম জানেন, এ কথা হালফ করে কেউ বলতে সাহস পাবেন না। আর দুনীয়ার পানশালের খবর তাঁর পকেটে—একটু একটু করে খুশবু ছাড়েন, চারদিক ম-ম করে। একবার চটেমটে তিনি লিখেছিলেন, "ভোজনাদি সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করলেই কোনো কোনো উষাসিক পাঠক নাকি বিরক্ত হন" (মুসাফির দ্রষ্টব্য)। তওবা তওবা। সে পাঠকের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ নেই। সেই মুরুন্দরামের আমল থেকেই বাঙালির মন পাকশালে। আর সেই পাকশালের বেদব্যাস মৃজতবাজীর মহাভারত খাদ্য-পর্ব শোনাই হল গিয়ে পুণ্যবানের কাজ। ঘাণে যদি অর্ধ, শ্রবণে তাহলে

কোয়ার্টার ভোজন । আমরা আলী সাহেবের দৌলতে স্প্যানিশ রেস্টোরাঁয় মদ্র পৃথিতে তৈরি বিরিয়ানি চেখেছি, ফরাসি মেনদ্র পিয়েস দ্য রোজিসতাসে চোখ বুলিয়েছি, মারিয়ানার ঠাকুরমার তৈরি 'রে রাগদ' অর্থাৎ কিনা কোফতাকাটা হরিণের মাংস আর ফ্রান্সের মাটির নিচে ফলানো সবজি 'ট্রাফেল' টেস্ট করেছি । বাঁধাকপি'র টক আচার 'ক্রাউট' আর পি'য়াজ পুদিনার ওমলেট 'ওজে'ব' দুটোই পছন্দ । কিন্তু এখানেই তো সৈয়দ মজতবা আলীর কেরামতি নয় । সালাদ রুদ্র, সালাদ আলা, মায়োনেজ-এর স্বাদ শেষ হবার আগেই তাঁর পকেট থেকে বেরোয় হাইনের কবিতা । রাইনের ধারে গে'য়ো 'পাবে' কুমারী কোটে লেখককে হাইনের যে কবিতা শোনায়, সঙ্গে সঙ্গে ফস করে তিনি যতীন বাগচী কৃত তার অনুবাদ আমাদের শুনিয়ে দেন ; মারিয়ানার মদ্রে হাইনের কবিতা শুনে সত্যেন দত্তের ঠিক-ঠিক অনুবাদটি তাঁর মনে পড়ে ; ওমর খৈয়ামের জুতসই বয়েৎ ঝেড়ে তৎক্ষণাৎ কাস্টিচম্ব ঘোষের অনুবাদ পেশ করেন তিনি, এমন কি ফিটজেরালডের পাশে দ্রুম করে তার ফরাসি অনুবাদটিও দিয়ে দেন । আলী সাহেব তাই অভুলনীয়—কিন্তু তুলনামূলক তত্ত্বালোচনায় তাঁর বড়ই আগ্রহ । নিজে তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব আর তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ছাত্র । কিন্তু তুলনামূলক পানভোজনতত্ত্ব, ভূগোলতত্ত্ব, নারীমনতত্ত্ব, পুলিসি কতব্যতত্ত্ব কিছতেই তাঁর কৌতুহলের কমতি নেই । হাইনের গঙ্গাস্তব আর কলকাতার জাপানি আক্রমণের সময়কার ছড়া, পাশাপাশি গ্যাট হয়ে বসে তাঁর লেখায় । মিশরের মরুভূমিতে আব্দুল আফসিয়ার ভাড়া-করা ট্যাক্সির শব্দের সঙ্গে সাদৃশ্যসূত্রে তুলসীদাসী রামায়ণের ভাষা ফিনকি দিয়ে ওঠে তাঁর কানে (কটকটীহ মরুট বিকট ভট কোটি ফোটিনহ ধাবাহি—বানরদের কোলাহলের বর্ণনা) । কাইরোর রাস্তায় Fools Restaurant (ফুল আরবি শব্দ, =সিমবীচি) দেখে তাঁর মনে পড়ে যায় কলকাতার রাস্তায় 'কপির সিঙাড়া' বিজ্ঞাপনের দিকে) ।

এই তুলনামূলক মেজাজেই দুনিয়ার খোশগল্প গুরুগুরিয়ে ওঠে আলী সাহেবের পেটে, মোকা মাফিক বেরুবার জন্য । পৃথিবীর সব দেশের সমাজেই মৌখিক গল্পসাহিত্যের একটি বিচিত্র বিপুল সম্পদ অলিখিত হাওয়ায় ভেসে বেড়ায় । আলী সাহেব সেই গল্পের একজন পাকা ভান্ডারী । কিন্তু তিনি ঘাচেন, সাগা, ইভেনিতির, হালিড্র, নভেলা, হিরোটেল-এর কারবারি নন । অ্যানেকডোট, খোশ গল্প, ক্ষুদ্র উপাখ্যান, ড্রল, টিটিবিটস্, জেস্ট, কৌতুক নকশা ঝিলঝিলিয়ে ওঠে তাঁর মদ্রে, আর তখন, কিছু কিছু তুলনাসূত্রে, ঠিক ঠিক

মোকায় এসে পড়ে তার দেশবিদেশের জাতভাইগুলো। তাঁর সাহিত্যের একটা বড় আকর্ষণ এই গল্প। অনেকক্ষণ অশ্রুকারে ট্রেন ছুটলে ছোট্ট ছেলে ভাবে ইন্সটিশান আসছে না কেন? তেমনি অনেকক্ষণ ভারি ভারি কথা চললে পাঠক ভাবে গল্প আসছে না কেন? তা আলী সাহেবের ট্রেন লোকাল গাড়ি, ইন্সটিশান ঘন ঘন। গুরু কথার মাঝখানে হৈ হৈ করে ওঠে অ্যানেকডোট। এই প্রত্যাশায় তাঁর লেখার পাতায় এ'টেল পোকায় মত চোখ আটকে থাকে পাঠকের। চুটকুলা স্টেটের রায়বাহাদুর তিনি, দিল্লীগীপস'দ কিস'সার দিল্লী'বরো। আর এখানেও সেই তুলনার আগ্রহ ঘনিষে ওঠে তাঁর চিন্তে, একই গল্পের দেশান্তরী রূপ বা সাইক্ল' অনগ'ল তিনি শুনিয়ে যান। খোশ গল্প যে একটা আর্ট'এ সত্য একালে আলী সাহেবই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এই বইয়ের ভূমিকা একমাত্র আলী সাহেবই লিখে দিতে পারতেন, তাঁরই লেখা উচিত ছিল, তিনিই একমাত্র তাঁর বইয়ের ভূমিকা লেখার হকদার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই লেখা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু হায়, আমরা যখন জলে-ডাঙায়, মদুসারিফর, ভবঘুরের ওপর হুঁমুড়ি খেয়ে পড়েছি, তখন আলী সাহেব গ্রহসূর্য' তারায় তারায় স্নানমান। 'সে বড় মজার ভ্রমণ, তাতে টিকিট লাগে না, 'ভিজার'ও দরকার হয় না।' জলে-ডাঙায়-এর উৎসর্গপত্রে ফৌস করে নিশ্বাস ছেড়ে তিনি লিখে গেছেন, 'কিন্তু হায় সেখান থেকে ভ্রমণকাহিনী পাঠাবার কোনো ব্যবস্থা এখনো হয় নি। ফেরবারও উপায় নেই।'।

তাই ভবঘুরে আলী সাহেবের গ্রহসূর্য'-তারালোক ভ্রমণের কাহিনী আর এই লোকে আমাদের পড়ার সন্ধান হবে না।

অরুণ বসু

ଜଳେ-ଡାଢ଼ାୟ

উৎসর্গ

বাবা ফিরোজ,

ভ্রমণ-কাহিনী তুমি যেদিন প্রথম পড়তে শুরুর করবে সেদিন খুব সম্ভব আমি গ্রহ-সূর্যে তারায়-তারায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। সে বড় মজার ভ্রমণ—তাতে টিকিট লাগে না, ‘ভিজা’রও দরকার নেই। কিন্তু, হায়, সেখান থেকে ভ্রমণ-কাহিনী পাঠাবার কোনো ব্যবস্থা এখনো হয়নি। ফেরবারও উপায় নেই।

তাই এই বেলাই এটা লিখে রাখছি।

তোমার

আবু

বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ার কর্মটি সব সময়ই এক হৃদ্বাহুল ব্যাপার, তুমুল কাণ্ড ! তাতে দুটো জিনিস সকলেরই চোখে পড়ে ; সে দুটো—ছোটোছোটো আর চেঁচামেচি ।

তোমাদের কারো কারো হয়তো ধারণা যে সায়েব-সুবোরা যাবতীয় কাজকর্ম সারা করে যতদূর সম্ভব চুপিসাড়ে আর আমরা চিংকারে চিংকারে পাড়ার লোকের প্রাণ অতিষ্ঠ না করে কিছুই করে উঠতে পারি নে । ধারণাটা যে খুব ভুল সে কথা আমি বলবো না । সিনেমায় নিশ্চয়ই দেখেছ, ইংরেজরা ব্যাঙ্কুইট্ (ভোজ) খায় কি রকম কোনো প্রকারের শব্দ না করে । বাটলাররা নিঃশব্দে আসছে যাচ্ছে, ছুরিকাটার সামান্য একটু ঠুং-ঠাং ; কথাবার্তা হচ্ছে মৃদু গুঞ্জরণে, সব-কিছু অতিশয় পরিপাটি, ছিমছাম ।

আর আমাদের দাওয়াতে, পাল-পরবের ভোজে, যিগ্যর নেমস্তমে ?

তার বর্ণনা দেবার ক্ষমতা কি আমার আছে ? বিশেষ করে এ-সব বিষয়ে আমার গুরু সুকুমার রায় যখন তাঁর অজর অমর বর্ণনা প্র্যাটিনামাক্সের রেখে দিয়ে গিয়েছেন । শোনো :

‘এই দিকে এসে তবে লয়ে ভোজভান্ড
সমুখে চাহিয়া দেখ কি ভীষণ কাণ্ড !
কেহ কহে ‘দে আন’ কেহ হাঁকে ‘লুচি’
কেহ কাঁদে শূন্য মুখে পাতখানি মূর্ছি ।
হোথা দোঁখি দুই প্রভু পাত্র লয়ে হাতে
হাতাহাতি গদ্বাগদ্বিত দ্বন্দ্বরণে মাতে ।
কেবা শোনে কার কথা সকলেই কর্তা
অনাহারে কত ধারে হল প্রাণহতা ।’

বলে কি ! ভোজের নেমস্তমে অনাহারে প্রাণহতা ! আলবাত ! না হলে বাঙালীর নেমস্তম হতে যাবে কেন ? পছন্দ না হলে যাও না ফান্সপাতে । খাও না আলোনা, আধাসেখ শূয়ারের মৃদু কিংবা কিসের যেন ন্যাজ !

কিন্তু জাহাজ ছাড়ার সময় সব শেয়ালের এক রা ।

আমি ভেনিসে দাঁড়িয়ে ইটালির জাহাজ ছাড়তে দেখেছি—জাহাজে বন্দরে, ডাঙায় জলে উভয় পক্ষের খালাসীরা মাস্কারিনি-থেকো খাটি ইটালিয়ান ; আমি মার্সেলসের বন্দরেও ঐ কর্ম দেখেছি—উভয় পক্ষের খালাসীরাই ব্যাঙ-থেকো সরেস ফরাসিস্ ; আমি ডোভারে দাঁড়িয়ে ঐ প্রক্রিয়াই সাতিশয় মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করেছি—দু পক্ষের বাঁদরগুলোই বীফস্টেক-থেকো খাটাশ-মুখে ইংরেজ । আর গঙ্গায়, গোয়ালন্দে, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জে যে কতগত বার এই লড়াই দেখেছি তার তো লেখাজোখা নেই । উভয় পক্ষে আমরাই দেশভাই জাতভাই দাড়ি-দোলানো, লুঙি-ঝোলানো সিলট্যা, নোয়াখাল্যা ।

বন্দরে বন্দরে তখন যে চিংকার, অটরব ও হুংকারধ্বনি ওঠে সে সর্বত্র

একই প্রকারের। একই গন্ধ, একই স্বাদ। চোখ বন্ধ করে বলতে পারবে না, নারায়ণগঞ্জে দাঁড়িয়ে চাঁটগাইয়া শুনছ, না হামবদুর্গে জর্মন শুনছ।

ডেকে রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে প্রথমটায় তোমার মনে এই ধারণা হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয় যে, জাহাজ এবং ডাঙার, উভয়ের পক্ষের খালাসীরা একমত হয়ে জাহাজটাকে ডাঙার দড়াদড়ির বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি দিতে চায়। কিন্তু ঐ তো মারাত্মক ভুল করলে, দাদা? আসলে দু পক্ষের মতলব একটা ঋণাত্মক লাগানো। জাহাজ ছাড়ানো-বাঁধানো নিছক একটা উপলক্ষ্য মাত্র। যে খালাসী জাহাজের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি তুকী ঘোড়ার তেজে ছুটছে, সে যে মাঝে মাঝে ডাঙার খালাসীর দিকে মৃৎ খিঁচিয়ে কি বলছে তার শব্দ সেই ধ্বন্দ্বুমারের ভিতর শোনা যাচ্ছে না সত্যি কিন্তু একটু কল্পনাসক্তি এবং ঈশ্বর খালাসী-মনস্তত্ত্ব তোমার রপ্ত থাকলে স্পষ্ট বুদ্ধিতে পারবে, তার অতিশয় প্রাজ্ঞ বক্তব্য, ‘ওরে ও গাডুগু’ম ইস্টুপিড, দড়িটা যে বাঁ দিকে গি’ট খেয়ে গিয়েছে, সেটা কি তোর চোখে মাস্তুল গর্জে দেখিয়ে দিতে হবে। ওরে ও’—(পূনরায় কটুবাক্য)।—

এই মধুরসবাণীর জুতসই সদ্বস্তর যে ডাঙার কন-পক্ষ চড়াক্সে দিতে পারে না, সে কথা আদ্যপেই ভেব না। অবশ্য তারও গলা শুনতে পাবে না, শব্দ দেখতে পাবে অতি রমণীয় মৃৎভাঙ্গি কিংবা মৃৎ-বিস্কৃতি, এবং বুদ্ধিতে হবে অনুমানে।

জাহাজের দিকে মৃৎ তুলে ফাঁচ করে খানিকটে থুথু ফেলে বলবে, ‘ওরে মক’টস্য মক’ট, তোর দিকটা ভাল করে জড়িয়ে নে না। জাহাজের টানে এ-দিকটা তো আপনার থেকে খুলে যাবে। একটা দড়ির মনের কথা জানিস নে আর এসেছিস জাহাজের কামে। তার চেয়ে দেশে গিয়ে ঠাকুরমার উকুন বাছতে পারিস নে? ওরে ও হামান-দিস্তের থ্যা’তলামুখো’—(পূনরায় কটুবাক্য)।—

একটুখানি কল্পনার সাবান হাতে থাকলে ঐ অবস্থায় বিস্তর বাস্তবের বুদ্ধদ ওড়াতে পারবে।

ওদিকে এসব কলরব—মাইকেলের ভাষায় ‘রথচক্র-ঘঘ’র-কোদুড-ট’কার’ ছাপিয়ে উঠছে ঘন ঘন জাহাজের ভে’পূর শব্দ—ভে’টা, ভে’টা—ভে’টা, ভে’টা—

তার অর্থ, যদি সে ছোট জাহাজের প্রতি হয়, ‘ওরে ও ছোকরা, সর না। আমি যে একদুনি ওদিকে আসছি দেখতে পারিছিস নে? থাক লাগলে যে সাড়ে বারিশভাজা হয়ে যাবি, তখন কি টুকরোগুলো জোড়া লাগাবি গাঁদাপাতার রস দিয়ে?’ আর যদি তোমার জাহাজের চেয়ে বড় জাহাজ হয়, তবে তার অর্থ, ‘এই যে দাদা, নমস্কারম্। একটু বাঁ দিকে সরতে আজ্ঞা হয়, আমি তা হলে ডান দিকে স্ফুর্ৎ করে কেটে পড়তে পারি।’ এবং এই ভে’পূ বাজানোর একটা তৃতীয় অর্থও আছে। প্রত্যেক জাহাজের মাঝিমাল্লারা আপন ভে’পূর শব্দ চেনে। কেউ যদি তখনো বন্দরের কোনো কোণে আনন্দরসে মত্ত হয়ে থাকে, তবে ভে’পূর শব্দ শুনে তৎক্ষণাৎ তার চৈতন্যোদয় হয় এবং জাহাজ ধরার জন্য

উর্ধ্ব্বাসে ছুট লাগায় ।

আমি একবার একজন খালাসীকে সাতরে এসে জাহাজে উঠতে দেখেছি । তখন তার আর সব খালাসী ভাইয়ারা যা গালিগালাজ দিয়েছিল তা শুনে আমি কানে আঙুল দিয়ে বাপ বাপ করে সরে পড়েছিলাম । ইংরাজিতে বলে, ‘হি ক্যান্ স্‌দ্যার লাইক্ এ সেলার’ অর্থাৎ খালাসীরা কটুবাক্য বলাতে এ দুনিয়ার সব চাইতে গুস্তাদ । ওরা যে-ভাষা ব্যবহার করে সেটা বর্জন করতে পারলে দেশ-বিদেশে তুমি মিষ্টভাষীরূপে খ্যাতি অর্জন করতে পারবে ।

তোমার যদি ফাসী-পড়নে-ওলা ক্লাস-ফ্রেন্ড থাকে তবে তাকে জিজ্ঞেস করো, ‘ইস্‌কন্দর্-ই-রুমীরা পুরসীদ’—অর্থাৎ ‘আলেকজান্ডার দি গ্রেটকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল’—দিয়ে যে গল্প আরম্ভ, তার গোটাটা কি ? গল্পটা হচ্ছে, সিকন্দরশাহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ‘ভদ্রতা আপনি কার কাছ থেকে শিখেছেন ?’ উত্তরে তিনি বললেন, ‘বে-আদবদের কাছ থেকে ?’ ‘সে কি প্রকারে সম্ভব ?’ ‘তারা যা করে আমি তাই বর্জন করেছি ।’

খুব যে একটা দারুণ চালাক গল্প হল তা বলছি নে । তবে জাহাজের খালাসীদের—বিশেষ করে ইংরেজ খালাসীদের—ভাষাটা বর্জন করলেই লাভ-বান হওয়ার সম্ভাবনা বেশী ।

জাহাজের লিফ্টিং ওঠার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেখবে দু-একটা লোক এক লাফে তিন ধাপ ডিঙোতে ডিঙোতে জাহাজে উঠছে । এরা কি একটু সময় করে আগে-ভাগে আসতে পারে না ? আসলে তা নয় । কোনো বেচারীকে কাস্টম-হাউস (যারা আমদানী-রপ্তানী মালের উপর কড়া নজর রেখে মাশুল তোলে) আটকে রেখেছিল, শেষ মুহূর্তে খালাস পেয়েছে, কেউ বা আধ ঘণ্টা আগে খবর পেয়েছে কোন যাত্রী এ জাহাজে যাবে না বলে খালি বাথটা সে পেয়ে গিয়েছে কিংবা কেউ শহর দেখতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিল, কোনো গতিকে এইমাত্র বন্দর আর জাহাজ খুঁজে পেয়েছে ।

‘বদর বদর’ বলে জাহাজ বন্দরের বন্দন থেকে মুক্তি পেল ।

অজানা সমুদ্রের বৃকে ভেসে যাওয়ার গুৎস্য এক দিকে আছে, আবার ডাঙা থেকে ছুটি নেবার সময় মানুষের মন সব সময়ই একটা অব্যক্ত বেদনায় ভরে ওঠে । অপার সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, সীমার শেষের দিগ্বলয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মুক্ত মনের যত অগাধ আনন্দই পাও না কেন, ঝগঝগাত্যার সঙ্গে দুর্বীর সংগ্রাম করে করে ক্ষণে-বাঁচা ক্ষণে-মরার অতুলনীয় যত অভিজ্ঞতাই সঞ্চার কর না কেন, মাটির কোলে ফিরে আসার মত মধুময় অভিজ্ঞতা অন্য কিছুতেই পাবে না । তাই ভ্রমণকারীদের গুরু, গুরুদেব বহু নদ-নদী সাগর-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার পর বলেছেন,—

‘ফিরে চল, ফিরে চল মাটির টানে

যে মাটি অঁচল পেতে চেয়ে আছে মূখের পানে ।’

জাহাজ ছাড়তে ছাড়তে সমুদ্রের অন্ধকার ঘনিষে এল ।

আমি জাহাজের পিছন দিকে রেলিঙের উপর ভর করে তাকিয়ে রইলাম

আলোকমালায় সুসজ্জিত মহানগরীর—পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ বন্দরের দিকে । সেখানে রাস্তায় রাস্তায়, সমুদ্রের জাহাজে জাহাজে আর জেলেদের ডিঙিতে ডিঙিতে কোথাও বা সারে সারে প্রদীপশ্রেণী আর ফোথাও বা এখানে একটা, ওখানে দুটো, সেখানে একঝাঁক—যেন মাটির সাত-ভাই-চুপা ।

আমরা দেয়ালি জর্দালি বছরের দাগ এক শুবুর্ভাদিনে । ওখানে সম্বৎসর দেয়ালির উৎসব । এদের প্রতিদিনের প্রতি গোধূলিতে শুবু লগ্ন । আর এদের এ উৎসব আমাদের চেয়ে কত সর্বজনীন ! এতে সাড়া দেয় সর্ব ধর্ম সর্ব সম্প্রদায়ের নর-নারী—হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পারসিক-মুসলমান-খ্রীষ্টানী !

আমি জানি, বৈজ্ঞানিকরা বলেন, কোনো কোনো ছোট্ট পাখির রঙ যে সবুজ তার কারণ সে যেন গাছের পাতার সঙ্গে নিজের রঙ মিলিয়ে দিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে, যাতে করে শিকারে পাখি তাকে দেখতে পেয়ে ছোঁ মেরে না নিয়ে যেতে পারে ! তাই নাকি আমের রঙও কাঁচা বয়সে থাকে সবুজ—যাতে পাখি না দেখতে পায়, এবং পেকে গেলে হয়ে যায় লাল, যাতে করে পাখির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে—যাতে সে যেন ঠুকরে ঠুকরে তাকে গাছ থেকে আলাদা করে দেয়, নিচে পড়ে তার আঁটি যেন নতুন গাছ গজাতে পারে ।

বৈজ্ঞানিকদের ব্যাখ্যা ভুল, আমি বলি কি করে । বিজ্ঞানের আমি জানি কতটুকু, বুঝি কতখানি ? কিন্তু আমার সরল সৌন্দর্য-তিয়াসী মন এসব জেনেশুনেও বলে, ‘না, পাখি যে সবুজ, সে শুধু তার নিজের সৌন্দর্য আর আমার চোখের আনন্দ বাড়াবার জন্যে । এর ভিতর ছোট হোক, বড় হোক, কোনো স্বার্থ লুকনো নেই । সৌন্দর্য শুধু সৃষ্টির হওয়ার জন্যই ।’

ঠিক তেমনি আমি জানি, পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে প্রতি গোধূলিতে যে আলোর বান জেগে ওঠে, তার মধ্যে স্বার্থ লুকনো আছে । ঐ আলো দিয়ে মানুষ একে অন্যকে দেখতে পায়, বাপ ঐ আলোতে বাড়ি ফেরে, মা তার শিশুকে খুঁজে পায়, সবাই আপন আপন গৃহস্থালির কাজ করে ; কিন্তু তবু, যখনই আমি দূরের থেকে ঐ আলোগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখি, তখনই মনে হয় এগুলো জ্বালানো হয়েছে স্বেচ্ছামাত্র দেয়ালির উৎসবকে সফল করার জন্য । তার ভিতরে যেন আর কোনো স্বার্থ নেই ।

অকূল সমুদ্রে পথহারা নাবিক তারার আলোয় ফের পথ খুঁজে পায় ! সেই স্বার্থের সত্য উপেক্ষা করে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন—

‘ভূমি কত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে
কি উৎসবের লগনে ।’

বন্দরের আলোর দিকে তাকিয়ে যদি আমিও ভগবানের উদ্দেশে বলি,—

‘মোরা কত আলো জ্বালিয়েছ ঐ চরণে
কি আরতির লগনে ।’

তবে কি বহু বেশী ভুল বলা হবে ?

অনেক দূরে চলে এসেছি ! পাড়ের আলো ক্রমেই ঘান হয়ে আসছে । তবু এখনো দেখতে পাই, হুশ করে এক-একখানা জেলে-ডিঙি আমাদের পাশ

দিয়ে উলটো দিকে চলে যাচ্ছে। আসলে কিছু সে হুশ করে চলে যায় নি। সে ছিল দাঁড়িয়েই, কারণ তার গল্‌ই সমুদ্রের দিকে মদুখ করে আছে, আমরা তাকে পেরিয়ে গেলুম মাত্র।

আশ্চর্য, এত রাত অবধি পাড় থেকে এত দূরে তারা মাছ ধরছে !

এখন যদি ঝড় ওঠে তবে তারা করবে কি ? নৌকো যদি ডুবে যায় তবে তারা তো এতখানি জল পাড়ি দিয়ে ডাঙায় পৌঁছতে পারবে না। তবে তাবা এ রকম বিপজ্জনক পেশা নিয়ে পড়ে থাকে কেন ? লাভের আশায় ? নিশ্চয় নয়। সে তবু আমি বিলক্ষণ জানি। আমি একবার কয়েক মাসের জন্য মাদ্রাজের সমুদ্রপাড় আমার এক বন্ধুর বাড়িতে ছিলুম। তারই পাশে ছিল, একেবারে সমুদ্রের গা ঘেঁষে এক জেলেপাড়া। আমি পাকা ছটি মাস ওদের জীবনযাত্রাপ্রণালী দেখেছি। ওদের দৈন্য দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। আমাদের গরিব চাষারাও এদের তুলনায় বড়লোক, এমন কি, আমাদের আদিবাসীরা, সাঁওতাল ভীলারাও এদের চেয়ে অনেক বেশী সুখস্বাস্থ্যশ্রো জীবন যাপন করে। তোমাদের ভিতর যারা পুরুরী জেলেনের দেখেছ তারা আমার কথায় সায় দেবে।

তবে কি এরা অন্য কোনো সুযোগ পায় না বলে এই বিপদসঙ্কুল, কঠিন অথচ দুঃখের জীবন নিয়ে পড়ে থাকে ? আমার সেই মাদ্রাজী বন্ধু বললে, তা নয়, এরা নাকি খোলা সমুদ্র এত ভালোবাসে যে তাকে ছেড়ে মাঠের কাজে যেতে কিছুতেই রাজী হয় না। ঝড়ের সময় মাছ ধরা প্রায় অসম্ভব বলে তখন উপোস করে দিন কাটাতে, ক্ষুধায় প্রাণ অতিষ্ঠ হলে, ভুখা কাচ্চাবাচ্চাদের কান্না সহ্য করতে না পারলে সেই ঝড়েই বেরয় মাছ ধরতে আর ডুবে মরে সমুদ্রের অঁথে জলে।—তবু জল ছেড়ে ডাঙার ধান্দায় যেতে রাজী হয় না।

এবং নৌকোর মাঝি-মাল্লা, জাহাজের খালাসীদের বেলাও তাই। এদের জীবন এতখানি অভিশপ্ত নয়, জানি, কিন্তু এরাও ডাঙায় ফিরে যেতে রাজী হয় না। এমন কি, যে চাষা সাতশ পুরুর ধরে খেতের কাজ করেছে, সেও যদি দুর্ভিক্ষের সময় দু পয়সা কামাবার জন্য সমুদ্রে যায় তবে কিছুদিন পরই তাকে আর ডাঙার কাজে নিয়ে যাওয়া যায় না। আর পুরনো খালাসীদের তো কথাই নেই। গোঁপদাড়ি পেকে গিয়েছে, সমুদ্রের নোনা জল আর নোনা হাওয়ায় চামড়ার রঙটি রোনজের মতো হয়ে গিয়েছে, আর কদিন বাঁচবে তার ঠিক নেই, জাহাজে কেউ চাকরি দিতে চায় না, তবু পড়ে থাকবে খিদরিপুরের এক ঘিঞ্জি আড্ডায় আর উদয়াস্ত এ-জাহাজ ও-জাহাজ করে করে বেড়াতে চাকরির সন্ধানে। ওদিকে বেশ দু পয়সা জমিয়েছে। ইচ্ছে করলেই দেশের গাঁয়ের তেঁতুলগাছতলায় নাতি-নাতনীর পাখার হাওয়া খেতে খেতে গল্পগল্ব বলতে বলতে দুটি চোখ বন্ধতে পারে।

সমুদ্রের প্রতি এদের কেমন যেন একটা 'নেশা' আছে, সে সম্বন্ধে তারা একটু লাজত। কেন, তা জানি নে। তুমি যদি বল, 'তা, চৌধুরীর পো' চৌধুরী পো বলে সম্বোধন করলে ওরা বড় খুশী হয়—'দু-পয়সা তো

কামিয়েছ, আর কেন এ-জাহাজে ও-জাহাজে ঝকঝক করি কাজ করা। তার চেয়ে দেশে গিয়ে আল্লা-রসূলের নাম স্মরণ কর, আখেরের কথা ভাববার সময় কি এখনো আসে নি?’

বড় কাচুমাচু হয়ে বড়ো বলবে, ‘না, ঠাকুর, তা নয়।’ দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে বলবে, ‘আর দুটি বছর কাম করলেই সব সুরাহা হয়ে যাবে। দু-পয়সা না নিয়ে নাতি-নাতনীদে ঘাড়ে চাপতে লজ্জা করে।’

একদম বাজে কথা। বড়ো জাহাজের কামে ঢোকে যখন তার বয়স আঠারো। আজ সে সত্তর। এই বাহান বৎসর ধরে সে দেশে টাকা পাঠিয়েছে ভালো করে ঘর-বাড়ি বানাবার জন্য, জমি-জমা কেনার জন্য। এখন তার পরিবারের এত সচ্ছল অবস্থা যে, ওরা জমিদারকে পর্যন্ত টাকা ধার দেয়। আর বড়ো বলে কিনা ব্যাটা-ভাইপো নাতি-নাতনী তাকে দু-মুঠো অন্ন খেতে দেবে না!

সমুদ্রের প্রতি কোনো কোনো জাহাজ-কাপ্তানের এত মায়্যা যে বড়ো বয়সে তারা বাড়ি বানায় ঠিক সমুদ্রের পাড়ে, এবং বাড়িটার চপ্‌ও কিছ্রুত-কিমাকার! দেখতে আদপেই বাড়ির মতো নয়, একদম হুবহু জাহাজের মতো—অবশ্য মাটির সঙ্গে যোগ রেখে যতখানি সম্ভব। আর তারই চিলেকোঠায় সাজিয়ে রাখে কম্পাস, দূরবীন, ম্যাপ, জাহাজের স্টিয়ারিং হুইল এবং জাহাজ চালাবার অন্যান্য যাবতীয় সরঞ্জাম। বাড়ির আর কাউকে বড়ো সেখানে ঢুকতে দেয় না—ইউনিফর্ম পরা না থাকলে জাহাজের ও-জায়গায় তো কাউকে যেতে দেওয়া হয় না—এবং সে সেখানে পাইপটা কামড়ে ধরে সমস্ত দিন বিড়িবিড়ি করে ‘খালাসীদের’ বকাঝকা করে। ঝড়বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। তখন সে একাই একশ। ‘জাহাজ’ বাঁচাবার জন্য সে তখন খেপে গিয়ে ‘ব্রিজ’ময় দাবড়ে বেড়ায়, ‘টেলিফোনে’ চিংকার করে ‘এঞ্জিন-ঘরকে’ হুকুম হাঁকে, ‘আরো জলদি’; ‘পূরো স্পীডে’, কখনো বা বরসাতিটা গায়ে চাপিয়ে ‘ডেকের’ তদারকি করে ভিজে কাঁই হয়ে ফিরবে। ঝড় না থামা পর্যন্ত তার দম ফেলার ফুরসত নেই, ঘুমুতে যাবার তো কথাই ওঠে না। ঝড় থামলে হাঁফ ছেড়ে বলবে, ‘ওং, কি বাঁচনটাই না বেঁচে গিয়েছি। আমি না থাকলে সব ব্যাটা আজ ডুবে মরত। আজকালকার ছোঁড়ারা জাহাজ চালাবার কিস-সু-টি জানে না।’ তারপর টেবিলে বসে আঁকাবাঁকা অঙ্করে ‘জাহাজের’ ক্রুদের ধন্যবাদ জানাবে, তারা যে তার হুকুম তামিল করে জাহাজ বাঁচাতে পেরেছে তার জন্য। তার পর ঝড়ের ধাক্কায় জাহাজ যে কোথায় ছিটকে পড়েছে তার ‘বৈয়ারিং’ নেবে বিস্তর ল্যাটিটুড-লংগিটুড কষে এবং শেষটায় হাঁটু গেড়ে ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়ে পরম পরিতৃপ্ত সহকারে হাই তুলতে তুলতে আপন ‘কেবিনে’ শূতে যাবে।

তিন দিন পরে গুম গুম করে ‘জাহাজ’ থেকে নেমে সে পাড়ার আড্ডায় যাবে গল্প করতে—‘জাহাজ’ বন্দরে এসে ভিড়েছে কি না! সেখানে সেই মারাত্মক ঝড়ের একটা ভয়ঙ্কর বর্ণনা দিয়ে শেষটায় পাইপ কামড়াতে কামড়াতে

বলবে, ‘আর না, এই আমার শেষ সফর। বড়ো হাড়ে আর জলঝড় নয় না।’ সবাই হা-হা করে বলবে, ‘সে কি, কাপ্তেন, আপনার আর তেমন কি বয়স হল?’ কাপ্তেনও ‘হে-হে’ করে মহাখশী হয়ে ‘জাহাজে’ ফিরবে।

আমি আরো দুই শ্রেণীর লোককে চিনি যারা কিছুতেই বাসা বাঁধতে চায় না।

দেশ-বিদেশে আমি বিস্তর বেদে দেখেছি। এরা আজ এখানে কাল ওখানে, পরশু আরো দূরে, অন্য কোথাও। কখন কোন্ জায়গায় কোন্ মেলা শুরুর হবে, কখন শেষ হবে, সব তাদের জানা! মেলায় মেলায় গিয়ে কেনা-কাটা করবে, নাচ দেখাবে, গান শোনাবে, হাত গুনবে, কিন্তু কোথাও স্থির হয়ে বেশী দিন থাকবে না। গ্রীষ্মের খরদাহ, বর্ষার অবিরল বৃষ্টি সব মাথাও করে চলেছে তো চলেছে, কিসের নেশায় কেউ বলতে পারে না। বাচ্চাদের লেখাশড়া শেখা-বার চাড় নেই, তাদের অসুখ-বিসুখ করলে ডাক্তার বদ্বিরলও তোয়াক্কা করে না। যা হবার হোক, বাসা তারা কিছুতেই বাঁধবে না। বাড়ির মায়া কি তারা কখনো জানে নি, কোন দিন জানবেও না।

ইংলণ্ড দশ বছর ধরে চেষ্টা করে আসছে এদের কোনো জায়গায় পাকা-পাকি ভাবে বসিয়ে দিতে। টাকা-পয়সা দিয়েছে, কিন্তু না, না, না, এরা কিছুতেই কোনো জায়গার কেনা-গোলাম হয়ে থাকতে চায় না। ইংলণ্ড যে এখনো তার দেশে প্রাথমিক শিক্ষার হার শতকরা পুরো একশ করতে পারে নি তার প্রধান কারণ এই বেদেরা। এরা তো আর কোনো জায়গায় বেশী দিন টিকে থাকে না যে এদের বাচ্চারা ইস্কুলে যাবে? শেষটায় ইংরেজ এদের জন্য ভ্রাম্যমান পাঠশালা খুলেছে, অর্থাৎ পাঠশালার মাস্টার শেলেট-পেনসিল নিয়ে ভবঘুরে হয়ে তাদের পিছন পিছন তাড়া লাগাচ্ছে, কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা, তারা যেমন ছিল তেমনি আছে।

খোলা-মেলায় সন্তান এরা,—গাড়ীর ভিতর বন্ধ হতে চায় না।

কিন্তু এদের সবাইকে হার মানায় কারা জান?

রবীন্দ্রনাথ যাদের সম্বন্ধে বলেছেন,

‘ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন

চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।’

এই যে আরব-সাগর পাড়ি দিয়ে আদন বন্দরের দিকে যাচ্ছি এরা সেই দেশের লোক। সৃষ্টির আদিম প্রভাত থেকে এরা আরবের এই মরুভূমিতে ঘোরাঘুরি করছে। এরা এদিক-ওদিক যেতে যেতে কখনো ইরানের সজল উপত্যকার কাছে এসে পেঁচিয়েছে, কখনো লেবাননের ঘন বনমর্মরধ্বনিও শুনতে পেয়েছে কিন্তু এসব জায়গায় নিশ্চিন্ত মনে বসবাস করার কণামাত্র লোভ এদের কখনো হয় নি। বরং মরুভূমির এক মরুদ্যান থেকে আরেক মরুদ্যান যাবার পথে সমস্ত ক্যারাভান (দল) জলের অভাবে মারা গেল—এ বাঁভংস সত্য তাদের কাছে অজানা নয়, তবু তারা ঐ পথ ধরেই চলবে, কোনো জায়গায় স্থায়ী বসবাসের প্রস্তাব তাদের মাথায় বজ্রাঘাতের ন্যায়।

জানি, এক কালে আরব দেশ বড় গরিব ছিল, কৃষ্টিম উপায়ে জলের ব্যবস্থা করতে পারত না বলে সেখানে চাষ-আবাদের কোনো প্রশ্নই উঠত না। কিন্তু হালে নজ্‌দ-হি'জাজের রাজা ইবনে সউদ' পেট্রল বিক্রি করে মার্কিনদের কাছ থেকে এত কোটি কোটি ডলার পেয়েছেন যে সে-কিছু কি করে খরচা করবেন তার কোনো উপায়ই খুঁজে পাচ্ছেন না। শেষটায় মেলা যন্ত্রপাতি কিনে তিনি বিস্তর জায়গায় জল সে'চে সেগ্দুলোকে খেত-খামারের জন্য তৈরী করে বেদুইনদের বললেন, তারা যেন মরুভূমির প্রাণঘাতী যাযাবরবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে এসব জায়গায় বাসের বাঁধে।

কার গোয়াল, কে দেয় ধনো !

সে সব জায়গায় তখন তালগাছের মতো উ'চু আগাছা গজাচ্ছে।

বেদুইন তার উট-খচ্চর, গাধা-ঘোড়া নিয়ে আগের মতোই এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। উটের লোমের তাঁবুর ভিতর বাসবাস করে। তৃষ্ণায় যখন প্রাণ ক'ঠাগত হয় তখন তার প্রিয় উটের ক'ঠ কেটে তারই ভিতরকার জল খায়। শেষটায় জলের অভাবে গাধা-খচ্চর, বউ-বাচ্চা সহ গদুষ্ঠীসুস্থ মারা যায়।

তবু 'পা-জমিয়ে' কোথাও নীড় বানাবে না।

এই সব তর্কচিন্তায় মশগুল হয়ে ছিলুম এমন সময় হুশ করে আরেকখানা জেলে-নৌকা পাশ দিয়ে চলে গেল। দেখি, ক্যাম্বিসের ছইয়ের নিচে লোহার উনুন জেলে বড়ো রান্না চাটিয়েছে। কল্পনা কি না বলতে পারব না, মনে হল ফোড়নের গন্ধ যেন নাকে এসে পৌঁছিল। কল্পনা হোক আর যাই হোক তর্কচিন্তা লোপ পেয়ে তন্দ্রেই ক্ষুধার উদ্বেক হল।

ওঁদি ক'বে শেষ ব্যাচের শেষ ডিনার খাওয়া হয়ে গিয়েছে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য' নিরীক্ষণ, তর্কচিন্তায় মনোবীক্ষণ বিলক্ষণ সুখনীয় প্রচেষ্টা কিন্তু ভক্ষণ-ডি'ডম উপেক্ষা করা সর্ব'ংশে অব'চীনের লক্ষণ।

তবু দেখি, যদি কিছ'জোটে, না হলে পেটে কিলনেরে শূয়ে পড়বো আর কি।

দশ পা যেতে না যেতেই দেখি আমার দুই তরুণ বন্ধু পল আর পার্সি 'রামি' খেলছে। আমাকে দেখে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'গুড ইটনিং, স্যার !'

আমি বললুম, 'হ্যালো', অর্থাৎ 'এই যে !'

তারপর ঈষৎ অভিমানের সুরে বললুম, 'আমাকে একলা ফেলে তাস খেলছ যে বড় ! জান, তাস ব্যাসন-বিশেষ, তা'সে অথবা কালক্ষয় হয়, গুণীরা বলেন—'

ওরা বাধা দিচ্ছে না বলে আমাকেই থামতে হল।

পার্সি বললে, 'যথার্থ' বলেছেন. স্যার !'

পল বললে, 'হ'ক' কথা। কিন্তু স্যার, আমরা তো এতক্ষণ আপনার

ডিনার যোগাড় করে কেবিনে গুঁছিয়ে রাখাতে—’

আমি বললুম, ‘সে কি হে?’

পার্সি বললে, ‘আজ্ঞে। যখন দেখলুম, আপনি ডিনারের ঘণ্টা শব্দে ও উঠলেন না, তখনই আমরা ব্যবস্থাটা করে ফেললুম।’

সোনার চাঁদ ছেলেরা। ইচ্ছে হচ্ছিল, দুজনকে দু-বগলে নিয়ে উল্লাসে নাগানৃত্য জুড়ে দি। কিন্তু বয়সে কম হলে হবে কি, ওজনের দিক দিয়ে ওরা আমার চেয়ে ঢের বেশী ভারি কী মদ্রদ্রবী। বাসনাটা তাই বিকাশ লাভ করল না। বললুম, ‘তবে চলো হাদাস’, কেবিনে।’

॥ ২ ॥

‘গাভলিকা-প্রবাহে’ অর্থাৎ ভিড়ের সঙ্গে মানুষ গা ভাসিয়ে দেয় কেন? তাতে সুবিধে এই;—আর পাঁচজনের যা গতি, তোমারও তাই হবে। এবং যেহেতু সংসারের আর পাঁচজন হেসে-খেলবে’চে আছে, অতএব তুমিও দিব্য তাদেরই মতো সুখে-দুঃখে ব’চে থাকবে।

আর যদি গাভলিকায় না মিশে একলা পথে চল তবে যেমন হঠাৎ গুপ্তধনের সম্ভান পেয়ে যেতে পার ঠিক তেমনি মোড় ফিরতেই আচমকা হয়তো দেখতে পাব, ব্যাঘ্রাচার্য-বৃহল্লাঙ্গুল থাবা পেতে সামনে বসে ন্যাজ আছড়াচ্ছেন!

গুপ্তধনটা একা পেয়েছিলে বলে সেটা যেমন তোমার একারই, ঠিক তেমনি বাধের মোকাবেলা করতে হবে তোমাকে একাই।

তাই বেশির ভাগ লোক সর্বনাশা ক্ষতির ভয়ে অত্যধিক লাভের লোভ না করে গাভলিকার সঙ্গে মিশে যায়।

জাহাজেও তাই। তুমি যদি আর পাঁচজনের সঙ্গে ঘুম থেকে জাগ তবে সেই ভিড়ে তুমি ঝটপট তোমার ‘বেড-টী’র কাপটি পাবে না। আর যদি খুব সকাল সকাল কিংবা আর সকলের চেয়ে দেরিতে ওঠো তবে চা-টি পেয়ে যাবে তুমি হাতেই, কিন্তু আবার কোনো দিন দেখবে, তখনো আগুন জ্বালা হয় নি বলে চায়ের অনেক দেরি, কিংবা এত দেরিতে উঠেছ যে ‘বেড-টী’র পাট উঠে গিয়ে তখন ‘ব্লেকফাস্ট’ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে বলে তোমার ‘বেড-টী’ মাঠে অর্থাৎ দরিয়ায় মারা গিয়েছে।

ইংরিজিতে একেই বলে, ‘নো রিস্ক, নো গেন’ অর্থাৎ একটুখানি ঝুঁকি যদি নিতে রাজী না হও তবে লাভও হবে না। লটারি জিততে হলে অন্তত একটা টিকিট কেনার রিস্ক নিতে হয়।

সেদিন ঝুঁকিটা নিয়ে সুবিধে হল না। চা-টা মিস্ করে বিরসবদনে ডেকে এসে বসলুম।

এক মিনিটের ভিতর পল আর পার্সির উদয়।

পল ফিস-ফিস করে কানে কানে বলল, ‘নতুন সব ‘বার্ডি’দের (—অর্থাৎ

‘চিড়িয়াঘের’) দেখেছেন, স্যার ?’

এরা সব নবাগত যাত্রী । কলম্বোয় জাহাজ ধরেছে । বেচারীরা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, ডেক-চেষ্টার পাতবার ভালো জায়গার সন্ধানে । কিন্তু পাবে কোথায় ? আমরা যে আগে-ভাগেই সব জায়গা দখল করে আসন-জমীন জমিয়ে বসে আছি—মাদ্রাজ থেকে ।

এ তো দুনিয়ার সব’ত হামেশাই হচ্ছে । মীটিঙে, ফুটবলের মাঠে সব’দাই আগে গিয়ে ভালো জায়গা দখল করার চেষ্টা সবাই করে থাকে । এমন কি রান্নাঘরের দাওয়ায় বসি ঠিক দরজাটির কাছে । মা রান্নাঘর থেকে খাবার নিয়ে বেরিয়েই সন্ধ্যার পয়লা দেবে আমাদের ।

ভাল জায়গায় বসতে পারাতে দুটো গুদু । একটা ভালো জায়গা পেয়েছ বলে এবং দ্বিতীয়টা তার চেয়েও বড় । বেশ আরাম করে বসে চিনে-বাদাম খেতে খেতে অলস নিরাসক্ত ভাবে তাকিয়ে দেখতে, অন্যেরা ফ্যা-ফ্যা করে কি ভাবে ভালো জায়গার সন্ধানে ঘুরে মরছে । পরিচিত এবং অপরিচিত লোক হলে তো কথাই নেই । ‘এই যে ভড় মশাই, জায়গা পাচ্ছেন না বুঝি ?’ বলে ফিক করে একটুখানি সদুপদেশ বিতরণ করবে, ‘কেন, ঐ দিকে তো মেলা জায়গা রয়েছে’, বলে হাতখানা মাথার উপর তুলে চতুর্দিকে ঘুরিয়ে দেবে । তার থেকে কেউই বুঝতে পারবে না, কোন দিকে জায়গা খালি । লোকটা দৃষ্টি দিয়ে বিষবৃষ্টি নিক্ষেপ করে গজরাতে গজরাতে তোমার সৃষ্টির আড়াল হবে !

আঃ ! এ সংসারে ভগবান তাঁর অসীম করুণায় আমাদের জন্য কত আনন্দই না রেখেছেন ! কে বলে সংসার মায়াময় অনিত্য ? সে বোধ হয় ফুটবলের মাঠে কখনো ভাল সীট পায় নি ।

আমি পল-পার্সিকে জিজ্ঞেস করলুম, ‘অদ্যকার প্রোগ্রাম কি ?’

পল বললে, ‘প্রথমত, জিমনাস্টিক্-হলে গমন ।’

‘সেখানকার কর্ম-তালিকা কি ?’

‘একটুখানি রোইং করব ।’

‘রোইং ? সেখানে কি নৌকো, বৈঠে, জল আছে ?’

‘সব আছে, শুধু জল নেই ।’

‘?’

বৈঠেগুলোর সঙ্গে এমন ভাবে স্প্রিং লাগানো আছে যে জল থাকলে বৈঠাকে যতখানি বাধা দিত স্প্রিং ঠিক ততখানি দেয় । কাজেই শুকনোয় বসে বৈঠে চালানোর প্র্যাকটিস আর পরিশ্রম দুই-ই হয় ।’

আমি বললুম, ‘উ’হু । আমার মন সাড়া দিচ্ছে না । আমাদের দেশে আমরা বৈঠে মারি দু হাত দিয়ে তুলে ধরে । তোমার কায়দাটা রপ্ত করে আমার কোনো লাভ হবে না ।’

পল বললে, ‘তাহলে প্যারালেল বার, ডাম্বেল কিছু একটা ?’

‘উ’হু ।’

পার্সি বললে, ‘তাহলে পলে আমাতে বক্সিং লড়ব । আপনি রেফারী

হবেন।’

‘আমি তো ওর তত্ত্ব কিছুই জানি নে।’

‘আমরা শিখিয়ে দেব।’

‘উহু।’

পল তখন ধীরে ধীরে বলল, ‘আসলে আপনি কোনো রকম নড়াচড়া করতে চান না। একসেরসাইজের কথা না হয় রইল কিন্তু আর সবাই তো সকাল-বিকেল জাহাজটাকে কয়েকবার প্রদক্ষিণ দেয় শরীরটাকে ঠিক রাখবার জন্য। আপনি তো তাও করেন না। কেন বলুন তো?’

আমি বললুম, ‘আরেক দিন হবে। উপস্থিত অধ্যাকার অন্য কর্মসূচী কি?’

পার্সি বললে, ‘আজ এগারোটায় লাউঞ্জে চেশ্বার মর্দাজক। তাই না হয় শোনা যাবে।’

পল আপত্তি জানাল। বললে, ‘যে লোকটা বেহালা বাজায় তার বাজনা শুনলে মনে হয়, দুটো হুলো বেরালে মারামারি লাগিয়েছে।’

পার্সি বললে, ‘ঐ তো পলের দোষ। বস্তু পিটপিটে। আরে বাপদু, যাচ্ছি তো সস্তা ফরাসী ‘মেসার্জের মারিতিম্’ জাহাজে আর আশা করছি, ক্রাইজলার এসে তোর কেবিনের জানলার কাছে চাঁদের আলোতে বেহালা দিয়ে সেরেনেড বাজাবেন!’

আমি বললুম, ‘আমাদের দেশে এক বড়ী কিনে আনল এক পয়সার তেল। পরে দেখে তাতে একটা মরা মাছি। দোকানীকে ফেরত দিতে গিয়ে বললে, ‘তেলে মরা মাছি।’ দোকানী বললে, ‘এক পয়সার তেলে কি তুমি একটা মরা হাতি আশা করেছিলে?’

পার্সি বললে, ‘এইবার আপনাকে বাগে পেয়েছি, স্যার! আপনি যে গল্পটি বললেন তার যে বিলিতি মর্দগটি আমি জানি সে এর চেয়ে সরেস।’

আমি চোখ বন্ধ করে বললুম, ‘কীর্তন কর।’

পার্সি বললে, ‘এই আমাদের পলেরই মতো এক পিটপিটে মেমসায়েব গিয়েছেন মোজা কিনতে। কোন মোজাই তাঁর পছন্দ হয় না। শেষটায় সবচেয়ে সস্তায় এক শিলিঙে তিনি এক জোড়া মোজা কিনলেন। দোকানী যখন মোজা প্যাক করছে তখন তাঁর চোখে পড়ল মোজাতে অতি ছোট্ট একটি ল্যাডার—’

আমি শূধোলুম, ‘ল্যাডার মানে কি? ল্যাডার মানে তো মই।’

‘আজ্ঞে, মোজার একগাছা টানার স্দুতো যদি ছিঁড়ে যায় তবে ঐ জায়গায় শূধু পড়েনগুলো একটার উপর একটা এমন ভাবে থাকে যেন মনে হয় সিঁড়ি কিংবা মই। তাই ওটাকে তখন ল্যাডার বলা হয়।’

আমি বললুম, ‘থ্যাঙ্কউ ; শেখা হল। তারপর কি হল?’

‘মেম বললেন, ‘ও মোজা আমি নেব না, ওতে একটা ল্যাডার রয়েছে।’

দোকানী বললে, ‘এক শিলিঙের মোজাতে কি আপনি একটা মার্বেল স্টেয়ারকেস আশা করেছিলেন, ম্যাডাম?’

আমি বললুম, ‘সাবাস, তোমার বলা গল্পটি আমার গাহ’স্থ্য সংস্করণের রাজসংস্করণ বলা যেতে পারে। তবুপরি তোমরা তো রাজার জাত।’

পার্সি বললে, ‘ও কথাটা নাই বা তুললেন, স্যার!’

আমি আমার চোখ বন্ধ করে বললুম, ‘জাহাজের দুর্বিষহ গতানুগতিক জীবনকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করবার জন্য কোম্পানি অধ্য অন্য কি ব্যবস্থা করেছেন?’

পার্সি বললে, ‘সঙ্গীতে যখন পলের আপত্তি তখন আমি ভাবছি ঐ সময়টায় আমি সেলুনে চুল কাটাতে যাবো।’

আমি হস্তদস্ত হয়ে বললুম, ‘অমন কর্মটি গলা কেটে ফেললেও করতে যেয়ো না, পার্সি! তোমার চুল কেটে দেবে নিশ্চয়ই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোমার ‘হজামত’ও করে দেবে।’

কথাটা বুঝতে পারলুম না, স্যার!’

আমি বললুম, ওটা একটা উদ্‌ কথার আড়। এর অর্থ, তোমার চুল নিশ্চয়ই কেটে দেবে ভালো করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাথাটিও মৃড়িয়ে দেবে।’

পার্সি আরো সাত হাত জলে। শূধোলে, চুল যদি ভালো করে কাটে তবে মাথা মৃড়োবে কি করে?’

আমি বললুম ‘তোমার চুল কাটবে শব্দার্থে, কিন্তু মাথা মৃড়োবে বক্তার্থে, অর্থাৎ মেটাফরিকালি। মোম্বা কথা তোমার সর্বস্ব লুণ্ঠন করবে। জাহাজে চুল কাটানোর দর্শনী পণ্ড মৃদ্রা।’

পল বললেন, ‘সে কি স্যার? চীন দেশে তো পাঁচ টাকায় কুড়ি বার চুল কাটানো যায়!’

আমি বললুম, ‘ভারতবর্ষেও তাই। এমন কি বিশ্বফ্যাশানের রাজধানী প্যারিসেও চুল কাটাতে পাঁচ টাকা লাগে না। ব্যাপারটা হয়েছে কি, জাহাজের ফাস্ট ক্লাসে যাচ্ছেন পয়সাওলা বড়লোকেরা। তাঁরা পাঁচ টাকার কমে চুল কাটান না। কাজেই রেট বেঁধে দেওয়া হয়েছে পাঁচ টাকা। আমাদের কথা বাহ দাও, এখন যদি কোন ডেকপ্যাসেঞ্জারও চুল কাটাতে যায় তবে তাকেও দিতে হবে পাঁচ টাকা।’

‘তা হলে উপায়? একমাথা চুল নিয়ে লন্ডনে নামলে পিসিমা কি ভাববেন? তার উপর পিসিমাকে দেখব জীবনে এই প্রথম, পিসিমার কথা উঠলে বাবা মা যে ভাবে সম্মীহ করে কথা বলেন তার থেকে মনে হয় তিনি খুব সোজা মহিলা নন। তা হলে পাঁচটা টাকা দরিয়ার জলে ভেসে গেল আর কি, একদম শব্দার্থে।’

আমি বললুম, ‘আমুপেই না। জিবুটি বন্দরে চুল কাটাতে। বিবেচনা করি, সেখানে চুল কাটাতে এক শিলিঙেরও কম লাগবে।’

পল বললে, ‘আমরা যখন বন্দরে রৌদি লাগাব তখন পার্সিটা একটা ঘিঞ্জি সেলুনে বসে চুল কাটাতে। তা হলে তার উপযুক্ত শিক্ষা হয়।’

পার্সি আমার দিকে করুণ নয়নে তাকাল।

আমি বললুম, ‘তা কেন? বন্দর দেখার পর তোমাতে আমাতে যখন

কাফেতে বসে কফি খাবো তখন পার্সি' চুল কাটাবে। চাই কি, হয়তো সেলদুনের বারান্দায় বসেই কফি খেতে খেতে পার্সি'কে আমাদের মহামূল্যবান সঙ্গসুখ দেব, অমূল্য উপদেশ বিতরণ করব।'

পার্সি' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বাও করে বললে, 'এ যাত্রায় আপনার সঙ্গে পরিচয় না হলে, স্যর, আমাদের যে কি হত—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'কিছুই হত না। আমার সঙ্গে বজ্র-বজ্র না করে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতে, পাঁচ-রকমের ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে আলাপচারি হত। অনেক দেখতে, কম শুনতে।'

দুজনাই সঙ্গে সঙ্গে কেটে পড়ল!

আমি আরব সাগরের আবহাওয়া সম্বন্ধে একখানা বিরাট কেতাব নিয়ে পড়তে লেগে গেলুম।

॥ ৩ ॥

আরবের তুলনায় বাঙালী যে অতিশয় নিরীহ সে বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয় কিন্তু আরব সাগর, সাগর হয়েও বঙ্গোপসাগরের উপসাগরের চেয়ে অনেক বেশী শান্ত এবং ঠাণ্ডা। খাদ্যজ থেকে কলম্ব পর্যন্ত অধিকাংশ যাত্রী সী-সিকনেসে বেশ কাবু হয়ে থাকার পর এখানে তাঁরা বেশ চাঙা হয়ে উঠেছেন। উত্তর-পূর্ব দিকে মস্ক-মস্ক মোসদুমী হাওয়া বইছে তখনো—এই হাওয়ায় পাল তুলে দিয়েই ভাস্কো দা গামা আফ্রিকা থেকে ভারতে পৌঁছতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই সময়ে ঐ হাওয়া ভারতের দিকে বয় সে আবিষ্কার গামার নয়। আরবরা এ হাওয়ার গতিবিধি সম্বন্ধে বিলক্ষণ ওকিব-হাল ছিল এবং বিশেষ স্বত্বতে (মোসদুম) এ হাওয়া বয় বলে এর নাম দিয়েছিল মোসদুমী হাওয়া। ইংরাজী শব্দ 'মনসুন' এবং বাঙলা 'মরশুম' এই মোসদুম শব্দ থেকে এসেছে। কিন্তু মোসদুমী হাওয়ার খানিকটে স্থান পাওয়ার পরও গামা একা সাহস করে আরব সাগর পাড়ি দিতে পারেন নি। আফ্রিকা থেকে একজন আরবকে জোর করে জাহাজের 'পাইলট' রূপে এনেছিলেন।

রোমানরাও নিশ্চয়ই এ হাওয়ার খবর কিছুটা রাখত। না হলে আরবদের বহু পূর্বে দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে তারা এতখানি ব্যবসা-বাণিজ্য করল কি করে? এখনো দক্ষিণ-ভারতের বহু জায়গায় মাটির তলা থেকে রোমান মন্ড্রা বেরোয়।

তারও পূর্বে গ্রীক, ফিনিশিয়ানরা এ হাওয়ার খবর কতখানি রাখত আমার বিদ্যে অত দূর পৌঁছয় নি। তোমরা যদি কেতাবপত্র ঘেঁটে আমাকে খবরটা জানাও তবে বড় খুশী হই।

এই হাওয়াটাকেই ট্যারচা কেটে কেটে আমাদের জাহাজ এগোচ্ছে। এ হাওয়া যতক্ষণ মোলায়েম ভাবে চলেন ততক্ষণ কোনো ভাবনা নাই। জাহাজ অস্প-স্বল্প দোলে বটে তবু উলটো দিক থেকে বইছে বলে গরমে বেগুন-পোড়া হতে হয় না। কিন্তু ইনি রক্তাক্ত, ধরতল জময় পরিগ্রাহি চিংকার

উঠবে। এবং বছরের এ সময়টায় তিনি যে মাসে অন্তত দু-তিনবার জাহাজ-গুলোকে ল'ডভ'ড করে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগে যান সে 'সুখবরটা' আবহাওয়ার বইখানাতে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে।

আবহাওয়ার বিজ্ঞান ঝড় ওঠবার পূর্বাভাস খানিকটা দিতে পারে বটে কিন্তু আরব সাগরের মাঝখানে যে ঝড় উঠল সে যে তার পর কোন দিকে ধাওয়া করবে সে সম্বন্ধে আগে-ভাগে কোনোকিছু বলে দেওয়া প্রায় অসম্ভব।

তাই সে ঝড় যদি পূর্ব দিকে ধাওয়া করে তবে ভারতের বিপদ; বোম্বাই, কারওয়ান, তিরু অনন্তপুরম্ (শ্রী অনন্তপুর, ট্রিভাণ্ডরম্) অঞ্চল ল'ডভ'ড করে দেবে যদি উত্তর দিকে যায় তবে পার্সিয়ান গল্ফ এবং আরব-উপকূলের বিপদ আর যদি পশ্চিম পানে আক্রমণ করে তবে আদন বন্দর এবং আফ্রিকার সোমালি-দেশের প্রাণ যায়-যায়।

একবার নাকি এই রকম একটা ঝড়ের পর সোমালিদের ওবোক শহরে মাত্র একখানা বাড়ি খাড়া ছিল। যে ঝড়ে শহরের সব বাড়ি পড়ে যায়, তার সঙ্গে যদি মাঝারিয়ার আমাদের জাহাজের মোলাকাত হয় তবে অবস্থাটা কি রকম হবে খানিকটা অনুমান করা যায়।

তবে আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, এ রকম ঝড়ের সঙ্গে মানুষের এক বারের বেশী দেখা হয় না। প্রথম ধাক্কাতেই পাতাল-প্রাপ্তি!

'পাতাল-প্রাপ্তি' কথাটা কি ঠিক হল? কোথায় যেন পড়েছি, জাহাজ ডুবে গেলে পাতাল অর্থাৎ নাকি পেঁচিয়ে না। খানিকটে নাবার পর ভারী জল ছিন্ন করে জাহাজ নাকি আর তলার দিকে যেতে পারে না। তখন সে ত্রিশঙ্কুর মতো ঐখানেই ভাসতে থাকে।

ভাবতে কি রকম অশুভ লাগে! সমুদ্রের এক বিশেষ স্তরে তাহলে যত সব জাহাজ ডোবে তারা যতদিন না জরাজীর্ণ হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায় ততদিন শূন্য ঘোরাফেরাই করবে!

জলে যা, হাওয়াতেই বোধকরি তাই। বেলুন-টেলুন জোরদার করে ছাড়তে পারলে বোধ হয় উড়তে উড়তে তারা এক বিশেষ স্তরে পেঁচিয়ে ঐখানেই স্থলতে থাকবে—না পারবে নিচের দিকে নামতে, না পারবে উপরের দিকে যেতে। তারই অবস্থা কল্পনা করে বোধ হয় মর্দনি-খাষিরা ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ-মর্ত্যের মাঝখানে ঝুলে থাকার কথা কল্পনা করেছিলেন।

আমাকে অবশ্য কখনো কোনো জায়গায় ঝুলে থাকতে হবে না। বিপ্রহরে এবং সন্ধ্যায় যা গুরুভোজন করে থাকি তার ফলে ডুবলে পাথরবাটির মতো তরতর করে একদম নাক-বরাবর পাতালে পেঁচিয়ে যাব। আহারাদির পর আমার যা ওজন হয় সে গুরুভার সমুদ্রের যে-কোনো নোনা জলকে অনায়াসে ছিন্ন করতে পারে। আমার ভাবনা শূন্য আমার মদুটাকে নিয়ে। মগজ সেটাতে এক রস্তুও নেই বলে সেটা এমনি ফাঁপা যে, কখন যে ধড়টি ছেড়ে হৃদয় করে চন্দ্র-সূর্যের পানে ধাওয়া করবে তার কিছ্র ঠিক-ঠিকানা নেই। হাজারো লোকের ভিড়ের মধ্যে যদি আমাকে সনাক্ত করতে চাও তবে শূন্য লক্ষ্য কোরো

কোন লোকটা দূর হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে নড়া-চড়া করছে।

অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলুম আমার সখা এবং সতীর্থ—একই তীর্থে বন্ধন যাচ্ছি তখন ‘সতীর্থ’ বলাতে কারো কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়—শ্রীমান পল কোথা থেকে একটা টেলিস্কোপ যোগাড় করে একদৃষ্টে দক্ষিণ পানে তাকিয়ে আছে। ভাবলুম, ঐ দিক দিয়ে বোধ হয় কোনো জাহাজ যাচ্ছে আর সে তার নামটা পড়ার চেষ্টা করছে।

আমাকে দাঁড়াতে দেখে কাছে এসে বললে, ‘ঐ দূরে যেন ল্যান্ড দেখা যাচ্ছে!’

আমি বললুম ‘ল্যান্ড নয়, আইল্যান্ড। ওটা বোধ হয় মাল-দ্বীপপুঞ্জের কোনো একটা হবে।’

পল বললে, ‘কই, ওগুলোর নাম তো কখনো শুনিনি নি!’

আমি বললুম, ‘শুনবে কি করে? এই জাহাজে যে এত লোক, এঁদের সম্বাইকে জিজ্ঞেস করো ওঁদের কেউ মালদ্বীপ গিয়েছেন কি না? অন্দরেই বা কেন? শূন্য জিজ্ঞেস করো, মালদ্বীপবাসী কারো সঙ্গে কখনো ওঁদের দেখা হয়েছে কি না? তাই মালদ্বীপ নিয়ে এ বিশ্বভুবনে কারো কোনো কৌতুহল নেই।’

‘আপনি জানলেন কি করে?’

‘শুনছি মালদ্বীপের লোকেরা খুব ধর্মভীরু হয়। এক মালদ্বীপবাসীর তাই ইচ্ছা হয়, তার ছেলেকে মুসলিম শাস্ত্র শেখাবার। মালদ্বীপে তার কোনো ব্যবস্থা নেই বলে তিনি ছেলেকে কাইরোর আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান;—ঐটেই ইসলামী শাস্ত্র শেখার জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা বিশ্ববিদ্যালয়। ছেলেটির সঙ্গে আমার আলাপ হয় ঐখানে। বহুবার দেখা হয়েছিল বলে সে আমাকে তার দেশ সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলেছিল, তবে সে অনেককাল হল বলে আজ আর বিশেষ কিছু মনে নেই।

‘ওখানে নাকি সবসুখ হাজার দুই ছোট ছোট দ্বীপ আছে এবং তার অনেকগুলোতেই খাবার জল নেই বলে কোনো প্রকারের বসতি নেই। মালদ্বীপের ছেলেটি আমায় বলেছিল, “আপনি যদি এরকম দশ-বিশটা দ্বীপ নিয়ে বলেন, এগুলো আপনার, আপনি এদের রাজা, তা হলে আমরা তাতে কণামাত্র আপত্তি জানাব না।” অন্যগুলোতেও বিশেষ কিছু ফলে না; সবচেয়ে বড় দ্বীপটার দৈর্ঘ্য নাকি মাত্র দু মাইল। মালদ্বীপের সুলতান সেখানে থাকেন এবং তাঁর নাকি ছোট্ট একখানা মোটর গাড়ি আছে। তবে সেখানে সব চেয়ে লম্বা রাস্তার দৈর্ঘ্য মাত্র দু মাইল সেখানে ওটা চালিয়ে তিনি কি সুখ পান তা তিনিই বলতে পারবেন।

‘মালদ্বীপে আছে প্রচুর নারকেল গাছ আর দ্বীপের চতুর্দিকে জাত-বেজাতের মাছ কিলবিল করছে। মাছের শূটকি আর নারকোলে নৌকো ভর্তি করে পাল তুলে দিয়ে তারা রওয়ানা হয় সিংহলের দিকে মোসদুমী হাওয়া বইতে আরম্ভ করলেই। হাওয়া তখন মালদ্বীপ থেকে সিংহলের দিকে বয়। সমস্ত বর্ষাকালটা

সৈয়দ মজতবা আলী রচনাবলী (৭ম)—২

সিংহলে ঐ সব বিক্রি করে এবং বদলে চাল ডাল কাপড় কেরোসিন তেল কেনে। কেনাকাটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তাদের নাকি সেখানে বহুদিন কাটাতে হয়, কারণ উলটো হাওয়া বইতে আরম্ভ করবে শীতের সূরুতে। তার আগে তো ফেরার উপায় নেই।’

পার্সি বললে, ‘কেন স্যর, এখন তো শীতকাল নয়। আমরা তো হাওয়ার উলটো দিকেই যাচ্ছি।’

আমি বললুম, ‘ভ্রাতঃ, আমাদের জাহাজ চলে কলে, হাওয়ার তোয়াক্কা সে করে খেড়াই। মালদ্বীপে কোনো কলের জাহাজ যায় না, খরচায় পোষায় না বলে। তাই আজ পর্যন্ত কোনো টুরিস্ট মালদ্বীপ যায় নি।’

‘তাই মালদ্বীপের ছোকরাটি আমায় বলেছিল, “আমাদের ভাষাতে ‘অতিথি’ শব্দটার কোনো প্রতিশব্দ নেই। তার কারণ বহুশত বৎসর ধরে আমাদের দেশে ভিনদেশী লোক আসেনি। আমরা এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যা অপেক্ষবৎপ যাওয়া-আসা করি তা এতই কাছাকাছির ব্যাপার যে কাউকে অন্যের বাড়িতে রাতিযাপন করতে হয় না।” তারপর আমায় বলেছিল, “আপনার নেমস্তম্ভ রইল মালদ্বীপ ভ্রমণের, কিন্তু আমি জানি, আপনি কখনো আসবেন না। যদিচ এসে যান তাই আগের থেকে বলে রাখছি, আপনাকে এর বাড়ি ওর বাড়ি করে করে অন্তত বছর তিনেক সেখানে কাটাতে হবে। খাবেন-দাবেন, নারকোল গাছের তলাতে চাঁদের আলোয় গাওনা-বাজনা শুনবেন, ব্যস, আর কি চাই!”

‘যখন শুনছিলাম তখন যে যাবার লোভ হয় নি এ-কথা বলব না। বাড়ী তিনটি বছর (এবং মালদ্বীপের ছেলেটি আশা দিয়েছিল যে সেখানে বাহা তিন তাহা তিরানবুই।) কিছু করতে হবে না, এবং শুধু তিন বৎসর না, বাকি জীবনটাই কিছু করতে হবে না। এ-কথাটা ভাবলেই যেন চিন্তবনের উপর দিয়ে মর্মর গান তুলে মন্দমিঠে মলয় বাতাস বয়ে যায়। একজামিনের ভাবনা, কেঁটার কাছে দু টাকার দেনা, সব কিছু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এক মদহুতেই মদ্রুতি। অহো!

‘কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ

দিবা-রাতি নাচে মদ্রুতি, নাচে বন্দ—

সে তরঙ্গ ছুটি রঙ্গ পাছে পাছে

তা তা থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ॥’

এ-সব আত্মচিন্তার সব কিছুই যে পল-পার্সিকে প্রকাশ করে বলেছিলুম তা নয়, তবে একটা কথা মনে আছে, ওরা যখন উৎসাহিত হয়ে মালদ্বীপে বাকিজীবনটা কাটাতে বলে আমাকে সে খবরটা দিলে তখন আমি বলেছিলুম,—

‘বাকি জীবন কেন, তিনটি মাসও সেখানে কাটাতে পারবে না। তার কারণ যেখানে কোন কাজ করার নেই, সেখানে কাজ না করাটাই হয়ে দাঁড়ায় কাজের কাজ। এবং সে ভয়াবহ কাজ। কারণ, অন্য যে-কোন কাজই নাও না কেন, যেমন মনে করো এগজামিন—তারও শেষ আছে, বি-এ, এম-এ, পি-এইচ-ডি,—তার পর আর কোনো পরীক্ষা নেই। কিংবা মনে করো উ’চু

পাহাড়ে চড়া। পাঁচ হাজার, দশ হাজার, ত্রিশ হাজার ফুট, যাই হোক না কেন তারও একটা সীমা আছে। কিন্তু ‘কাজ নেই’—এ হল একটা জিনিস যা নেই, কাজেই তার আরম্ভও নেই শেষও নেই। যে জিনিসের শেষ নেই সে জিনিস শেষ পর্যন্ত সহিতে পারা যায় না।

‘কিংবা অন্য দিক দিয়ে ব্যাপারটাকে দেখতে পারো।

‘আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মনে করো একটা ঘর। ঘরে আসল জিনিস—দি ইমপর্টেণ্ট এলমেন্ট—হল তার ফাঁকাটা, আমরা তাতে আসবাবপত্র রাখি, খাই-দাই, সেখানে রৌদ্রবৃষ্টি থেকে শরীরটা বাঁচাই। ঘরের দেয়ালগুলো কিন্তু এনব কাজে লাগছে না। অর্থাৎ ইমপর্টেণ্ট হল ফাঁকাটা, নিরেট দেয়ালটা নয়। তাই বলে দেয়ালটা বাদ দিলে চলবে না। দেয়ালহীন ফাঁকা হল ময়দানের ফাঁকা, সেখানে আশ্রয় জোটে না।

‘তাই গুরুদেব বলেছেন, মানুষের জীবনের অবসরটা হচ্ছে ঘরের ফাঁকটার মতো, সে-ই দেয় আমাদের প্রবেশের পথ কিন্তু কিছুটা কাজের দেয়াল দিয়ে সেই ফাঁকা অবসরটাকে যদি ঘিরে না রাখো তবে তার থেকে কোন সুবিধা ওঠাতে পারো না। কিন্তু কাজ করবে যতদূর সম্ভব কম। কারণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্চো, ঘরের মধ্যে ফাঁকাটা দেয়ালের তুলনায় পরিমাণে অনেক বেশী।’

তারপর আমি বললাম, ‘কিন্তু ভ্রাতুষ, আমার গুরুদেব এই তত্ত্বটি প্রকাশ করেছেন ভারি সুন্দর ভাষায় আর সুমিষ্ট ব্যঞ্জনায়, কিছুটা উষ্টার সসের হাস্য-কৌতুক মিশিয়ে দিয়ে। আমি তার অনুকরণ করব কি করে?’

‘কিন্তু মূল সিদ্ধান্ত এই,—মালদ্বীপের একটানা কর্মহীনতার ফাঁকাটা অসহ্য হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তার চতুর্দিকে সামান্যতম কাজের দেয়াল নেই বলে।’

একটানা এতখানি কথা বলার দরুন ক্লান্ত হয়ে ডেক-চেয়ারে গা এলিয়ে দিলুম।

তখন লক্ষ্য করলুম, পল ঘন ঘন ঘাড় চুলকোচ্ছে। তার পর হঠাৎ ডান হাতটা মূঠো করে মাথায় ধাঁই করে গুত্তা মেরে বললে; ‘পেয়েছি, পেয়েছি, এই বারে পেয়েছি।’

কি পেয়েছে সেইটে আমি শূন্যোন্মুখ পাবেই পারি বললে, ‘ঐ হচ্ছে পলের ধরন। কোনো একটা কথা স্মরণে আনবার চেষ্টা করার সময় সে ঘন ঘন ঘাড় চুলকায়। মনে এসে যাওয়া মাত্রই ঠাস করে মাথায় মারবে এক ঘূষি। ক্লাসেও ও তাই করে আমরা তাই নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে থাকি। এইবারে শুনুন, ও কি বলে।’

পল বললে, ‘কোনো নতুন কথা নয়, স্যার! তবে আপনার গুরুদ্ব তুলনাতে মনে পড়ে গেল আমাদের গুরুদ্ব ‘কনফুৎস’র (আমার মনে বড় আনন্দ হল যে ইংরেজ ছেলেরা ‘কনফুৎস’কে ‘আমাদের গুরুদ্ব’ বলে সম্মান জানাল—ভারতবর্ষের ইংরেজ ছেলে-বুড়ো বুদ্ধকে কখনো ‘আমাদের গুরুদ্ব’ বলে নি) এ বিষয়ে অন্য এক তুলনা। যদি অনুমতি দেন—’

আমি বললাম, ‘কী জ্বালা! তোমার এই চীনা লৌকিকতা—ভদ্রতা

আমাকে অতিষ্ঠ করে তুললে। ‘কন্-ফু-ৎস’র তত্বচিন্তা শুনতে চায় না কোন মক’ট ? জানো, ঋষি কন্-ফু-ৎস আমাদের মহাপুরুষ গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ? ঐ সময়েই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ইরানে জরথুষ্ট্র, গ্রীসে সোক্রেতেস-প্লাতো-আরিস্তোতেলেসে, প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের ভিতরে—তা থাক গে, তোমার কথা বলো !’

পল বললে, ‘সরি, সরি। কন্-ফু-ৎস বলেছেন, ‘একটি পেয়ালার আসল (ইমপর্টেণ্ট্) জিনিস কি ? তার ফাঁকা জায়গাটা, না তার পর্সেলেনের ভাগটা ? ফাঁকা জায়গাটাতেই আমরা রাখি জল, শরবত, চা। কিন্তু পর্সেলেন না থাকলে ফাঁকাটা আদর্শে কোনো উপকার করতে পারে না। অতএব কাজের পর্সেলেন দিয়ে অকাজের ফাঁকাটা ঘিরে রাখতে হয়। এবং শব্দ তাই নয়, পর্সেলেন যত পাতলা হয়, পেয়ালার ফদর ততই বেশী। অর্থাৎ কাজ করবে যতদূর সম্ভব সামান্যতম।’

তার পর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে কাণ্ড-টাও করে অর্থাৎ চীনা পদ্ধতিতে আমাকে হাঁটু আর মাথা নীচু করে অভিবাাদন জানিয়ে বললে,—

আমি বাধা দিয়ে বললুম, ‘ফের তোমার চীনে দৌজন্য ?’

বললে, ‘সরি, সরি। কিন্তু স্যার ঐ মালদ্বীপের কথা ওঠাতে আর আপনি আপনার গুরুদেবের কথা বলতে আমার কাছে ‘কন্-ফু-ৎস’র তত্বচিন্তা আজ সরল হয়ে গেল। ও’র এ বাণী বহুবার শুনেছি, অনেকবার পড়েছি কিন্তু আজ এই প্রথম—’

আমি বাধা দিয়ে বললুম, ‘চোপ।’

॥ ৪ ॥

কোনো কোনো জাহাজে কি যেন এক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হাওয়াকে ঠান্ডা করে সেইটে জাহাজের সবত্র চালিয়ে দেওয়া হয়। মনে হয়, এই রৌদ্রদগ্ধ, জ্বরতপ্ত বিরাট জাহাজরূপী লোহদানবকে তার মা যেন ঠান্ডা হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তার গায়ের জ্বালা জ্বাড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু পারেন কতখানি ? বরং রেলগাড়ি প্ল্যাটফর্মে প্ল্যাটফর্মে ছায়াতে দু-দশ মিনিট ঠান্ডা হবার সুযোগ পায়, কিংবা উপত্যকার ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় তার গায়ে এসে পাহাড়ের ছায়া পড়ে, ঘন শালবনের ভিতর দিয়েও গাড়ি কখনো কখনো বনানীর সিন্ধুচ্ছায়া লাভ করে, এবং সুদৃঙ্গ হলে তো কথাই নেই—সেখানকার ঠান্ডা তো রীতিমত বরফের বাক্সের ভিতরকারের মতো—কিন্তু জাহাজের কপালে এসব কিছুই নেই। একে তো দিগ্বিদগন্তব্যাপী জ্বলছে রৌদ্রের বিরাট চিতা, তার উপর সূর্য তার প্রতাপ বাড়িয়ে দিচ্ছেন সমুদ্রের জলের উপর প্রতিফলিত হয়ে। কালো চশমা পরেও তখন সৈদিকে তাকানো যায় না। রাত্রে অগ্নি অগ্নি ঠান্ডা হাওয়া বয় বটে, কিন্তু সে ঠান্ডাতে গা জ্বড়োবার পূর্বেই দেখা দেন পূর্বাকাশে সূর্য্য-মাষ্টার ফের তাঁর রোদের চাবুক হাতে নিয়ে। ভগবান তাঁকে দিয়েছেন লক্ষ লক্ষ কর,

এবং সেই লক্ষ লক্ষ হাতে তিনি নিয়েছেন লক্ষ লক্ষ পাকা কণির সোনািলি রঙের চাবুক। দেখা মাত্রই গায়ের সব কটা লোম কাটা দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের জাহাজে ঠাণ্ডা বাতাস চালানোর ব্যবস্থা ছিল না—অর্থাৎ সেটা অ্যার-কন্ডিশনন্ড নয়। কাজেই কি দিনের বেলা কি রাতে কখনো ভালো করে ঘুমোবার সুযোগ বঙ্গোপসাগর, আরব সমুদ্র কিংবা লাল দরিয়ায় মানুষ পায় না।

দুপুর রাত থেকে হয়তো ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে আরম্ভ করল। ডেকে বসে তুমি গা জড়োলে। কিন্তু তখন যে কেবিনে ঢুকে বিছানা নেবে তার উপায় নেই। সেখানে ওই ঠাণ্ডা হাওয়া যেতে পারে না বলে অসহ্য গুমোট গরম। গড়ের মাঠে ঠাণ্ডা হয়ে ফিরে এসে গলিবাড়িতে ঘুমোবার চেষ্টা করার সঙ্গে এর খানিকটে তুলনা হয়।

ডেকে যে আরাম করে ঘুমোবে তারও উপায় নেই। ঘুমোলে হয়তো রাত দুটোর সময়। চারটে বাজতে না বাজতেই খালাসীরা ডেকে বালতি বালতি জল ঢেলে সেখানে যে বন্যা জাগিয়ে তোলে তার মাঝখানে মাছও ঘুমোতে পারে না। তখন যাবে কোথায়? কেবিনে ঢুকলে মনে হবে যেন রুটি বানানোর তন্দুরে—আভ্‌নে—তোমাকে রোস্ট করা হবে।

এই অবস্থা চলবে ভূমধ্যসাগর না পেঁছনো পর্যন্ত।

তবে সামান্য এইটুকু যে, তোমাদের বয়েসী ছেলেমেয়েরা ঠাণ্ডা-গরম সংবন্ধে আমাদের মত এতখানি সচেতন নয়। পল পার্সি তাই যখন কেবিনের ভিতর নাক ফরফরাত আমি তখন ডেকে বসে আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে থাকতুম। তখন বই পড়তে কিংবা দেশের আত্মীয়স্বজনকে চিঠি লিখতে পর্যন্ত ইচ্ছে করে না।

মাঝে মাঝে ডেক-চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়তুম।

একদিন কেন জানি নে হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই সামনে দেখি এক অপরূপ মূর্তি!

ভদ্রলোক কোট-পাতলদুন-টাই পরেছেন ঠিকই কিন্তু সে পাতলদুন ঢিলে পাজামার চেয়েও বোধ করি চোড়া, কোট নেবে এসেছে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত আর মান-মর্নিয়া দাড়ির তলায় টাইটা আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে মাত্র। ওঁর বেশ-ভূষায়—ভুল করলুম, ‘ভূষা’-জাতীয় কোনো বালাই ওঁর বেশে ছিল না—অনেক কিছুরই দেখবার মতো ছিল কিন্তু প্রথম দর্শনেই আমি সব কটা লক্ষ্য করি নি, পরে ক্রমে ক্রমে লক্ষ্য করে অনেক কিছুরই শিখিছিলুম। উপস্থিত লক্ষ্য করলুম, তাঁর কোটে ব্রেস্ট পকেট বাদ দিয়েও আরো দু সারি ফালতো পকেট। তাই বোধ হয়, কোটটা দৈর্ঘ্যে হাঁটু পর্যন্ত নেমে এসেছে।

এঁকে তো এতদিন জাহাজে দেখি নি! ইনি ছিলেন কোথায়? তবে কি ইনি কলম্বাতে উঠেছেন? তা হলেও এ দুদিন ইনি ছিলেন কোথায়?

ভদ্রলোক সোজাসৃজি বললেন, ‘গুড নাইট!’

বিলিতি কায়দা-কেতা যদিও আমি ভালো করে জানি নে তবু অন্তত এইটুকু

জানি যে ‘গুড নাইট’ ওয়েশে বিদায় নেবার অভিবাদন—আমরা যে রকম যে কোনো সময় বিদায় নিতে হলে বলি, ‘তবে আসি।’ দেখা হওয়া মাত্রই কেউ যদি বলে, ‘তবে এখন আসি’ তবে বরষ লোকটা বাঙালী নয়। তাই তাঁর ‘গুড নাইট’ থেকে অন্তর্মান করলুম, ইনি যদিও বিলিতি বেশ ধারণ করেছেন তবু আসলে ভারতীয়।

আমি বললুম, ‘বৈঠগে।’

আমার বাঁদিকে পার্সি’র শূন্য ডেক-চেয়ার। তিনি তার-ই উপরে বসে পড়ে আমাকে বললেন, ‘আমার নাম আব্দুল আসফিয়া, নূর উদ্দীন, মুহম্মদ আব্দুল করীম সিদ্দীকী।’

আমার অজানাতেই আমি বলে ফেলেছিলাম ‘বাপ্‌স্’। কেন, সে কথা কি আর খুলে বলতে হবে? তবু বলি।

আমি মুসলমান। আমার নাম সৈয়দ মজতবা আলী, আমার পিতার নাম সৈয়দ সিকন্দর আলী। আমার ঠাকুরদাদার নাম সৈয়দ মুশররফ আলী। ভারতীয় মুসলমানের নাম সচরাচর তিন শব্দেই শেষ হয়। তাই এ’র আড়াই-গজী নামে যে আমি হক্‌চকিয়ে যাব তাতে আর বিচিত্র কি?

বিবেচনা করি, তিনিও বিলক্ষণ জানতেন। কারণ চেয়ারে বসেই, তিনি তাঁর অন্যতম পকেট থেকে বের করলেন একটি সুন্দর সোনার কেস্। তার থেকে একটি ভিজিটিং কার্ড বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, ‘নামটা একটু লম্বা। তাই এইটে নিন।’

আমি তো আরো অবাঁক। ভিজিটিং কার্ডের কেস্ হয় তা আমি জানি। কারণ ভিজিটিং কার্ড সুন্দর সূচিক্ত। যাঁদের তা থাকে তাঁদের কেউ কেউ সেটা কেসে রাখেন। যেমন মনে করো, ইনশুওরেন্সের দালাল, খবরের কাগজের সংবাদদাতা কিংবা ভোটার ক্যানভাসার। কিন্তু ও’দেরও তো কেস্ দেখেছি জর্ম’ন সিলভারের তৈরী। ভিজিটিং কার্ডের সোনার কেস্ পূর্বে আমি কখনো দেখি নি।

সেই বিস্ময় সামলাতে না সামলাতেই তিনি আরেক পকেটে হাত চালিয়ে ডুবুরির মতো গভীর তল থেকে বের করলেন এক সোনার সিগারেট কেস্। ও রকম কেস্ আমি শুধু স্বপ্নে আর সিনেমায় ফিল্ম-স্টারদের হাতে দেখেছি, বাস্তবে এই প্রথম সাক্ষাৎ। ডেকের অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ আলোতেও সেটা যা বলমল করে উঠল তার সঙ্গে তুলনা দেওয়া যায় শুধু স্যাকরা-বাড়ি থেকে সদ্য-আসা গয়নার সঙ্গে। কেসের এক কোণে আবার কি যেন এক নীল রঙের পাথর দিয়ে আলপনা এঁকে ইংরিজি অক্ষরে ভদ্রলোকের সেই লম্বা নামের গুটি দু-তিন আদ্যক্ষর। কেস্টি আবার সাইজেও বিরাট। নিদেনপক্ষে দ্বিশটি সিগারেট ধরবে। আমার সামনে কেসটি খুলে ধরে আরেক পকেট থেকে বের করলেন একটি লাইটার। তার উপরে জয়পুরী মিনার কাজ। হঠাৎ দেখলে মনে হয় জামিদারবাড়ির বড় গিঁদমাঝর কবচ কিংবা মাদুলি।

আমার মনের ভিতর দিয়ে হুড়-হুড় করে এক পল্টন সেপাইয়ের মতো

পঞ্চাশ সার প্রশ্ন চলে গেল ।

তার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, এ রকম লজ্জাড়া কোট-পাতলুনের ভিতর অত সব সুন্দর সুন্দর দামী দামী জিনিস লোকটা রেখেছে কেন ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন, এমন সব দামী মাল যার পকেটে আছে, সে ফাস্ট ক্লাসে না গিয়ে, আমার মতো গরিবের সঙ্গে টুরিস্ট ক্লাসে যাচ্ছে কেন ?

তৃতীয় প্রশ্ন—তা সে যাক গে । কারণ সব কটা প্রশ্নের পুরো ফর্দ এখানে দিতে গেলে আমার বাকি দিনটা কেটে যাবে । আর তোমাদেরও বুদ্ধিসুদ্ধ আছে, ভুল্ললোকের বর্ণনা শুনে তোমাদের মনেও সেই সব প্রশ্ন জাগবে যেগুলো আমার মনে জেগেছিল । তবে আর সেগুলো সবিস্তার বলি কেন ?

কিন্তু প্রশ্নগুলোর উত্তর পাই কি প্রকারে ?

তিনি বললে আমার চেয়ে ঢের বড় । তিনি যদি আলাপচারি আরম্ভ না করেন তবে আমি তাঁকে প্রশ্ন শুধাই কি করে ? মুরদুবীঘের আদেশ, ছেলেবেলা থেকেই শুনছি, বড়রা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন—ছোটরা উত্তর দেবে । সে আদেশ লম্বন করব কি করে ? বিশেষ করে বিদেশে, যেখানকার কায়দা-কৈত্য জানি নে । সেখানে দেশের গুরুজনদের আদেশ মরণ করা ভিন্ন অন্য পদার্থ আছে কি ?

আধ ঘণ্টাটাক কেটে গিয়েছে । ইতিমধ্যে আমি তাঁর দু-দুটো সিগারেট পুড়িয়েছি । ফের যখন তৃতীয়টা বাড়িয়ে দিলেন তখন আমাকে বেশ দৃঢ় ভাবে ‘না’ বলতে হল । সঙ্গে সঙ্গে সাহস সঞ্চার করে শুধালুম, ‘আপনি যাচ্ছেন কোথায় ?’

যেন প্রশ্ন শুনতে পান নি । আমিও চাপ দিলুম না ।

আমি খানিকক্ষণ পরে বললুম, ‘মাফ করবেন, আমি শ্রুতে চললুম, গুড নাইট ।’ বললেন, ‘গুড নাইট ।’

কী জানি, লোকটা কেন কথা বলে না । বোধ হয় জিভে বাত হয়েছে । কিংবা হয়তো ওর দেশে কথা বলাতেও রেশনের আইন চলে । যাক গে, কি হবে ভেবে ।

পরদিন সকালবেলা পল-পার্সিকে নিয়ে আমি যখন সংসারের যাবতীয় কঠিন কঠিন প্রশ্ন এবং সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত, এমন সময় সেই ভুল্ললোক এসে আবার উপস্থিত । আমিও ওদের সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিতেই তিনি তাঁর আরেকটা পকেটে হাত চালিয়ে বের করলেন একরাশ সুইস চকলেট, ইংরিজী টিফ এবং মার্কিন চুইংগাম্ । পল-পার্সি গুটি কয়েক হাতে তুলে নিয়ে যতই বলে, ‘আর না, আর না’, তিনি কিন্তু বাধা না হাত গুটোন না । ওদিকে মদুখ কোনো কথা নেই । শেষটায় বিষয় বদলে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন ।

আমরা খানিকটে ইতি-উতি করে পুনরায় নিজেদের গল্পে ফিরে গেলুম । তখন দেখি, ভাষণে অরুচি হলেও তিনি শ্রবণে কিছুমাত্র পশ্চাদ্গত নন । আমাদের গল্পের মাঝে মাঝে তাগমাফিক ‘হু’, ‘হী’, দ্বিব্য বলে যেতে লাগলেন । তারপর আমাদের তিনজনকে কিছুতেই ‘লাইম স্কোয়াশ’ খাওয়াতে না পেরে আস্তে আস্তে উঠে চলে গেলেন ।

উঠে যাওয়া মাঠই আমি পলকে শূন্যলুম, ‘এ কি রকম চিড়িয়া হে?’

পল বললে, ‘কলম্বোতে উঠেছেন। পকেট-ভর্তি দুর্নিয়ার সব টুকিটাকি, মিষ্টি-মিঠাই। যার সঙ্গে দেখা তাকেই কিছ-না-কিছ একটা অফার করেন।’

‘কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁকে কথা বলতে শুনিনি।’

আমি বললুম, ‘জিজ্ঞেস করে দেখতে হবে তো।’

পল বললে, ‘উত্তর কি পাবেন?’

বললুম, ‘ঠিক বলেছি, কাল রাত্রে তো পাইনি।’

এ’র সম্বন্ধে যে এত কথা বললুম, তার কারণ এ’র সঙ্গে পরে আমাদের খুব বন্ধুত্ব জমে গিয়েছিল; সে কথা সময় এলে হবে।

॥ ৫ ॥

পল বিজ্ঞ কণ্ঠে বললে, ‘কলম্বো থেকে আদন বন্দর ২০৮২ নাইল রাস্তা। জাহাজে ছদ্ম লাগে। মাঝখানে দ্বীপ-টীপ নেই, অন্তত আমার ম্যাপে নেই। তবে আদনের ঠিক আগেই সোকোত্রা দ্বীপ। সেটা হয়তো দেখতে পাব।’

আমি বললুম, ‘যদি রাত্রিবেলা ঐ জায়গা দিয়ে যাই তবে দেখবে কি করে? আর দিনের বেলা হলেও অতখানি পাশ দিয়ে বোধ হয় জাহাজ যাবে না। তার কারণ, বড় বড় দ্বীপের আশপাশে বিস্তর ছোট ছোট দ্বীপও জলের তলায় মাথা ডুবিয়ে শূন্যে থাকে। এর কোনোটার সঙ্গে জাহাজ যদি ধাক্কা খায় তবে আর আমরা সামনের দিকে এগব না—এঁগিয়ে যাব তলার দিকে।’

এদিকে কথা বলে যাচ্ছি, ওদিকে আমার বার বার মনে হতে লাগল, সোকোত্রা নামটা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। হঠাৎ আমার মাথার ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমার বাবার মাসী, মেসোমশাই তাঁদের দুই ছেলেকে নিয়ে গত শতকের শেষের দিকে মক্কায় হজ করতে গিয়েছিলেন এবং আমার খুব ছেলেবেলায় তাঁর কাছ থেকে সে ভ্রমণের অনেক গল্প আমি শুনিয়েছিলাম। আমার এই দাদীটি ছিলেন গল্প বলায় ভারি ওস্তাদ। রাত্রির রান্না না হওয়া পর্যন্ত তিনি আমাদের গল্প বলে বলে দিব্য জাগিয়ে রাখতে পারতেন এবং যেই চাচীর খবর দিতেন, রান্না তৈরী, অর্মানি তিনি বেশ কান্নাকাতি করে গল্পটা শেষ করে দিতে পারতেন। আমরা টেরই পেতুম না, আমাদের সামনে তিনি একটা ন্যাজকাটা হনুমান রেখে চলে গেলেন। আমাদের মনে হত গল্পটা যেন একটা আস্ত ডানাকাটা পরী।

সেই দাদীর মতো শুনিয়েছিলাম, সোকোত্রার কাছে এসে নাকি যাত্রীদের মদ্য শূন্যে যেত। জলের স্রোতের তোড়ে আর পাগলা হাওয়ার খাবড়ায় জাহাজ নাকি হুড়মুড়িয়ে গিয়ে পড়ত কোনো একটা ভুবন্ত দ্বীপের ঘাড়ে আর হয়ে যেত হাজারো টুকরোর খানখান। কেউ বা জাহাজের তত্তা, কেউ বা ভুবন্ত দ্বীপের শ্যাওলা-মাঝানো পাথর আঁকড়ে ধরে প্রাণপণ চিৎকার করত ‘বাঁচাও, বাঁচাও’,

কিন্তু কে বাঁচায় কাকে, কোথায় আলো, কোথায় তীর ! ক্রমে ক্রমে তাদের হাতের মৃদু শিথিল হয়ে আসত, একে একে জলের তলে লীন হয়ে যেত ।

দাদী যে ভাবে বর্ণনা দিয়ে যেতেন, তাতে আমি সব কিছু ভুলে দৃষ্টিশক্তি আকুল হয়ে উঠতুম, দাদী বাঁচলেন না, দাদীও ডুব গেলেন ! মনেই হত না, জলজ্যাস্ত দাদী আমাকে কোলে বসিয়ে গল্প বলছেন । শেষটায় বলতেন, ‘আমাদের জাহাজের কিছু হয় নি, এ সব ঘটেছিল অন্য জাহাজে । সে জাহাজে করে গিয়েছিলেন তোর বন্ধু ময়না মিয়ান ঠাকুরদা । জানিস তো, তিনি আর ফেরেন নি । খুদাতালা তাঁকে বেহেশতে নিয়ে গিয়েছেন । মক্কার হজের পথে কেউ যদি মারা যায় তবে তার আর পাপ-পুণ্যের বিচার হয় না, সে সোজা স্বর্গে চলে যায় ।

দাদী এ রকম গল্প বলে যেতেন অনেকক্ষণ ধরে আর একই গল্প বলতে পারতেন বহুবার । প্রতিবারেই মনে হত চেনা গল্প অচেনা রূপে দেখছি । কিংবা বলতে পারো, দাদী-বাড়ির রাঙা বৌদিকে যেন কখনো দেখছি রাস-মণ্ডল শাড়িতে, কখনো বুলবুল চশমে । (হায়, এ সব সুন্দর সুন্দর শাড়ি আজ গেল কোথায় !)

দাদীর গল্পের কথা আজ যখন ভাবি তখন মনে হয় দাদী তাঁর বর্ণনাতে আরব্য উপন্যাসের সাহায্য বেশ কিছু নিতেন । আরব্য উপন্যাসের রকম-বেরকমের গল্পের মধ্যে সমুদ্রযাত্রা, জাহাজডুবি, অচেনা দেশ, অজানা দ্বীপ সম্বন্ধে গল্প বিস্তর । সিন্ধবাদ নাবিকের গল্প পড়ে মনে হয়, জলের পীর বদর সাহেব যেন আইন বানিয়ে দিয়েছিলেন, যে জাহাজ ডুববে সেটাতেই যেন সিন্ধবাদ থাকে ।

আরব্য উপন্যাসে যে এত সমুদ্র-যাত্রার গল্প, তার প্রধান কারণ, আরবরা এক কালে সমুদ্রের রাজা ছিল আজ যে রকম মার্কিন-ইংরেজের জাহাজ পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে দেখা যায় । তার কারণ বৃদ্ধিতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না । আরব দেশের সাড়ে তিন দিকে সমুদ্র, তাই আরবরা সমুদ্রকে ডরায় না, আমরা যে রকম পশ্চিম-মেঘনাকে ডরাই নে, যদিও পশ্চিমারা গোয়ালন্দে পশ্চিম দেখে হনুমানজীর নাম স্মরণ করতে থাকে—বোধ হয় লক্ষ দিয়ে পেরবার জন্য । আরবদের পূর্বে ছিল রোমানরা বাদশা—আরবরা তাদের যুদ্ধে হারিয়ে ক্রমে ক্রমে তাদেরই মতো অবাধে অনায়াসে সমুদ্র যাতায়াত আরম্ভ করল । ম্যাপে দেখতে পাবে, মক্কা সমুদ্র থেকে বেশী দূরে নয় । আরবরা তখন লাল দরিয়া পেরিয়ে মৌসুমী হাওয়ায় ভর করে ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসা জুড়ল ।

এ সব কথা ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ আবার সোকোট্রা কথা মনে পড়ে গেল । দাদীমার সোকোট্রা স্মরণ করিয়ে দিল গ্রীকদের দেওয়া সোকোট্রা নাম ‘দায়োস্কারিদেশ’, সঙ্গে সঙ্গে হুশ-হুশ করে মনে পড়ে গেল যে পণ্ডিতেরা বলেন, এই ‘দায়োস্কারিদেশ’ নাম এসেছে সংস্কৃত ‘দ্বীপ-সুখাধার’ থেকে । আরবরা যখন এই দ্বীপে প্রথম নামল তখন ভারতীয় বোম্বেটেদের সঙ্গে এদের

লাগল ঝগড়া। সে ঝগড়া কত দিন ধরে চলছিল বলা শক্ত, কারণ আমাদের সমাজপতিরা তখন সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে কড়া কড়া আইন জারি করতে আরম্ভ করেছেন। আমার মনে হয়, এদেশ থেকে কোনো সাহায্য না পাওয়াতে এরা ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়ে যায়, কিংবা ঐ দেশের লোকের সঙ্গে মিলে মিশে গিয়ে এক হয়ে যায়—যে রকম শ্যাম, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে বহু শতাব্দীর আদান-প্রদানের পর এক দিন আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। খুব সম্ভব ঐ সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করারই ফলে। ভারতীয়েরা কিন্তু সোকোট্রায় তাদের একটি চিহ্ন রেখে গিয়েছে; সোকোট্রার গাই-গোরু জাতে সিদ্ধ দেশের। আশ্চর্য, সভ্যতার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কিন্তু তার পোষা গোরু-ঘোড়া শতাব্দীর পর শতাব্দী বেঁচে থেকে তার প্রভুর কথা চন্দ্রস্নান ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মোগল-পাঠানের রাজত্ব ভারতবর্ষ থেকে কবে লোপ পেয়ে গিয়েছে কিন্তু তাদের আনা গোলাপ ফুল আমাদের বাগানে আরো কত শত বৎসর রাজত্ব করবে কে জানে!

আমি চোখ বন্ধ করে আত্মচিন্তায় মগ্ন হলেই পল-পার্সি আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে অন্য কিছু একটায় লেগে যেত। আমি তাদের স্থানে বেরিয়ে দেখি, তারা লাউঞ্জে বসে চিঠি লিখেছে। আমাকে দেখে পার্সি শূদ্রালে, 'জাহাজে যে ফরাসী ডাক-টিকিট পাওয়া যায় তাই দিয়ে এ চিঠি চীন দেশে যাবে তো?'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়। এমন কি জিবুটি বন্দরের ডাকঘরেও যদি ছাড় তবু যাবে। কারণ জিবুটি বন্দর ফরাসীদের। কিন্তু যদি পোর্টসেইন্স বন্দরে ছাড় তবে টিকিট মিশর দেশে বাতিল বলে চিঠিখানা যাবে বেয়ারিং পোস্টে।'

'কিন্তু যদি পোর্টসেইন্সে পেঁছে জাহাজের লেটার-বকসে ছাড়ি?'

'তা হলে ঠিক।'

তারপর বললুম, 'হুঁ। তবে বন্দরে নেমে মিশরী ডাক-টিকিট লাগানোই ভালো।'

'কেন, স্যার?'

আমি বললুম, 'বৎস, আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে, চীন দেশে তোমার একটি ছোট বোন রয়েছে। সে নিশ্চয়ই ডাক-টিকিট জমায়। তুমি যদি বন্দরে বন্দরে ফরাসী টিকিট সাঁটো তাতে তার কি লাভ? মিশরী টিকিট পেলে কি সে খুশী হবে না? তাও আবার দাদার চিঠিতে!'

পার্সি আবার ভ্যাচর-ভ্যাচর আরম্ভ করলে—চুলকাটা সমস্যার সমাধান যখন আমি করে দিয়েছিলুম ঠিক সেই রকম—আমার সঙ্গে দেখা না হলে—

আমি বললুম, 'বাস, বাস। আর শোনো স্ট্যাম্প লাগাবার সময়, এক পয়সা, দু পয়সা, এক আনা, ছ পয়সা করে চোদ্দ পয়সার টিকিট লাগাবে—দু ম করে সুদ্ব একটা চোদ্দ পয়সার টিকিট লাগিয়ে না। বোন তাহলে এক ধাক্কাতেই অনেকগুলো টিকিট পেয়ে যাবে।'

ততক্ষণে পল এসে আমার সঙ্গে নিয়েছে। আস্তে আস্তে শূদ্রাল, 'সোকোট্রা দ্বীপের কথা ওঠাতে আপনি কি ভাবছিলেন?'

আমি বললাম, ‘অনেক কিছুর।’ এবং তার খানিকটে তাকে শুনিয়ে দিলুম।

পল দেখেছি পার্সির মতো সমস্তক্ষণ এটা-ওটা নিয়ে মেতে থাকে না। মাঝে মাঝে জাহাজের এক কোণে বসে বই-টাই পড়ে। তাই খানিকক্ষণ চুপ করে আমার কথাগুলো হজম করে নিয়ে বলল, ‘বিষয়টা সত্যি ভারি ইনট্রেস্টিং।’ সমুদ্রে সব প্রথম কে আধিপত্য করলে, তার পর কে, তারাই বা সেটা হারাল কেন, আজ যে মার্কিন আর ইংরেজ আধিপত্য করছে সেটাই বা আর কত দিন থাকবে? এবং তার পর আধিপত্য পাবে কে?’

আমি একটু ভেবে বললাম, ‘বোধ হয় আফ্রিকার নিগ্রোরা। ফিনিশিয়ান, গ্রীক, রোমান, ভারতীয়, চীনা, আরব, পোতুগীজ, ওলন্দাজ ইত্যাদি যাবতীয় জাতিই তো পালা করে রাজত্ব করলে—একমাত্র ওরাই বাদ গেছে। এখন বোধ হয় ওদের পালা। আর ম্যাপে দেখছ তো, কী বিরাট মহাদেশ, ওতে কোটি কোটি লম্বা-চওড়া স্বাভাবিক স্ত্রী-পুরুষ গম্গম করছে।’

পল বললে, ‘কিন্তু ওদের বুদ্ধিসমৃদ্ধি?’

আমি বললাম, ‘সে তো দুই পুরুষের কথা। লেগে গেলে একশ বছরের ভিতর একটা জাত অন্য সব কটা জাতকে হারিয়ে দিতে পারে। বরং পুরনো সভ্য জাত যারা আধ-মরা হয়ে গিয়েছে, তাদের নতুন করে বলিষ্ঠ প্রাণবন্ত করে রাজার আসনে বসানো কঠিন। একবার ছাচে ঢালাই করে যে মাল তৈরী করা হয়েছে তাকে ফের পিটে-ঠুকে নতুন আকার দেওয়া কঠিন—সেই তো হচ্ছে আজকের দিনের চীনা, ভারতীয় এবং আরো মেলা প্রাচীন জাতের নতুন সমস্যা।’

পল জিজ্ঞেস করলে, ‘ভারতীয়েরাও এককালে সমুদ্রে রাজত্ব করেছে নাকি?’

আমি বললাম, সে-কথা আজ প্রায় সবাই ভুলে গিয়েছে। কিন্তু সেজন্য তাদের দোষ দেওয়া অনুচিত। কারণ, ভারতীয়েরা নিজেই সে ইতিহাসের সম্ভাবন রাখেন না। অথচ আমার যতদূর জানা, তাতে তারা লাল দরিয়া থেকে চীনা সমুদ্র পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্য করেছে শ্যাম, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়াতে রাজত্বও করেছে। তার পর একদিন আমাদের সমাজপতিরা সমুদ্রযাত্রা বারণ করে দিলেন। খুব সম্ভব আমাদের সাম্রাজ্য বিস্তার তাঁরা পছন্দ করেন নি। তাই হয়তো তাঁরা বলতে চেয়েছিলেন, যে-দেশ জয় করেছে তারই আর পাঁচ জনের সঙ্গে মিলে-মিশে এক হয়ে যাও, আপন দেশে ফিরে আসার কোনো প্রয়োজন নেই।’

পল বললে, ‘আমার জীবনের এই বোল বৎসর কাটল চীনে কিন্তু ভারতের সঙ্গে চীনের কখনো কোনো যোগ হয়েছিল বলে শুনিনি। শব্দ শব্দেই বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে এসেছিল। কিন্তু সে তো কটমটে ব্যাপার!’

আমি বললাম, ‘অতিশয়। ও পাড়া মাড়িয়ে না। কিন্তু চীন-ভারতের মধ্যে একবার একটি ভারি চমৎকার মজাদার দোস্তি হয়েছিল। শুনবে?’

পল বললে, ‘তা আর বলতে! কিন্তু পার্সিটা গেল কোথায়? কুকুর-ছানার মতো ও যেন সমস্তক্ষণ নিজের ল্যাজ খুঁজে বেড়ায়। ওরে ও পার্সি!’

জিরাফ-কাহিনী

দিল্লীতে যখন পাঠান-মোগল রাজত্ব করত তখন সামান্যতম সুযোগ পেলেই বাঙলা দেশ স্বাধীন হয়ে যাবার চেষ্টা করত। বাঙলার প্রধান সুবিধে এই যে, সেখানে নদী-নালা বিল-হাওর বিস্তর এবং পাঠান-মোগলের আপন পিতৃভূমি কিংবা দিল্লীতে ও-সব জিনিস নেই বলেই তারা যখনই বিদ্রোহ দমন করতে এসে বাঙলার জল দেখত তখনই তাদের মুখে জল যেত শূন্যকিয়ে। দেশটা পিছলে, অভ্যাস না থাকলে দাঁড়ানো কঠিন।

এই রকম একটা সুযোগ পেয়ে বাঙলার এক শাসন-কর্তা স্বাধীন হয়ে রাজা হয়ে যান। রাজাটি একটু খামখেয়ালি ছিলেন। তা না হলে কোথায় ইরান আর কোথায় বাঙলা দেশ! তিনি সেখানে দূত পাঠালেন বিস্তর দামাী দামাী সওগাত সঙ্গে দিয়ে ইরানের সব চেয়ে সেরা কবি হাফিজকে বাঙলা দেশে নিমন্ত্রণ করার জন্য। চিঠিতে লিখলেন, 'হে কবি, তোমার সুন্দর তথা উদ্ভাস্ত কণ্ঠে তামাম ইরান দেশ ভরে গিয়েছে। ইরান ক্ষুদ্র দেশ, তোমার কণ্ঠস্বরিত্তির জন্য সেখানে আর স্থান নেই। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ বিরাট দেশ, এখানে এস, তোমার কণ্ঠস্বর এখানে প্রচুর জায়গা পাবে।' তার সরল অর্থ, ইরানে আর কটা লোক তোমার সত্যকার কবর করতে পারবে? এ-দেশের লোকসংখ্যা প্রচুর। এইখানে চলে এস।

হাফিজের তখন বয়স হয়েছে। তাঁর বড়ো হাড়-কথানা তখন আর দীর্ঘ ভ্রমণ আর দীর্ঘতর প্রবাসের জন্য দেশ ছাড়তে নারাজ। তাই কবি একাট সুন্দর কবিতা লিখে না আসতে পারার জন্য বিস্তর দুঃখ প্রকাশ করলেন।

বাঙলা দেশের সরকারী দলিল-দস্তাবেজে এ ঘটনার কোনো উল্লেখ নাই। এর ইতিহাস পাওয়া গিয়েছে ইরানের খাতাপত্র থেকে।

তার পরের রাজার দৃষ্টি গেল সেই সুন্দর চীন দেশের দিকে। কিন্তু চীন সম্রাটকে তো আর বাঙলা দেশে নিমন্ত্রণ করা যায় না? কাজেই রাজদূতকে বহু উত্তম উপঢৌকন দিয়ে চীনের সম্রাটকে বাঙলার রাজার আনন্দ-অভিবাধন জানানালেন।

চীন-সম্রাট সুন্দর বাঙলা দেশের রাজার সৌজন্য-ভদ্রতার পরিচয় পেয়ে পরম আপ্যায়িত হলেন। চীন বিস্ত্রশালী দেশ। প্রতিদানে পাঠালেন আরো বেশী মূল্যবান উপঢৌকন। সে রাজা কিন্তু ততদিনে রাজার রাজার দেশে চলে গিয়েছেন।

নূতন রাজা তখন ভাবলেন, চীনের সম্রাটকে আমি কি দিতে পারি যা তাঁর নেই! রাজদূতকে মনের কথা খুলে তাঁর উপদেশ চাইলেন। রাজদূতটি

১। এককালে বাঙলা দেশে প্রচুর হাফিজ পড়া হত। এখনও কেউ কেউ 'নেত্র নাই বাহা হোরি বিধুর বদন, কণ্ঠ নাই, চাই শূন্য ভ্রমর গুঞ্জন' 'সম্ভাব শতক'-এর বাঙলা অনুবাদ পড়েন। হাফিজের সব চেয়ে উত্তম বাঙলা অনুবাদ করেছেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

ছিলেন অতিশয় বিচক্ষণ লোক। তিনি যখন চীনে ছিলেন তখন চীন দেশের আচার-ব্যবহার বিশ্বাস-অবিশ্বাস পদ্ধতি-পদ্ধতিরূপে অনুসন্ধান করেছিলেন। বললেন, ‘চীনের বহু লোকের বিশ্বাস, গাছের চেয়ে উঁচু মাথাওয়া যে এক পয়মস্ত প্রাণী আছে সে যদি কখনো চীন দেশে আসে তবে সে দেশের শস্য তার-ই মাথার মতো উঁচু হবে।’

রাজা শুধালে, ‘কি সে প্রাণী?’

রাজদূত বললেন, ‘জিরাফ।’ আফ্রিকাতে পাওয়া যায়।’

রাজা বললেন, ‘আনাও আফ্রিকা থেকে।’

যেন চাটখানি কথা! কোথায় বাঙলা দেশ, আর কোথায় আফ্রিকা! আজ যে এই বিরাট বিরাট কলের জাহাজ দুনিয়ার সর্বত্র আনাগোনা করে, তার-ই একটাতে জিরাফ পোরা কি সহজ! তখনকার দিনের পালের জাহাজে আফ্রিকা থেকে বাঙলা দেশ, সেখান থেকে আবার চীন—ক’মাস, কিংবা ক-বছর লাগবে কে জানে? ততদিন তার জন্য ঐ অকুল ধরিয়ায় ঘাস-পাতা পাবে কোথায়—দেখাতি পাচ্ছি এই কলের জাহাজেই আমাদের শাক-সবজী স্যালাড্‌ খেতে দেয় অল্প—তার অন্যান্য তদারকি কি সহজ?

তখনকার দিনে আরব কারবারীরা আফ্রিকা, সোমালি, সিংহল হয়ে বাঙলা দেশে ব্যবসা করতে যেত। রাজা হুকুম দিলেন, ‘জিরাফ নিয়ে এস।’

জিরাফ এল। কি খেয়ে এল, কত দিনে এল, কিছই বলতে পারব না। রাজা জিরাফ দেখে ভারি খুশী। হুকুম দিলেন, ‘চীন সম্রাটকে ভেট দিয়ে এস।’

সেই চীন! জাহাজে করে! কত দিন লাগল কে জানে!

চীন-সম্রাট সংবাদ পেয়ে যে কতখানি খুশী হয়েছিলেন তার খানিকটে কল্পনা করা যায়। তিনি হুকুম দিলেন, প্রাণীটার জন্য খুব উঁচু করে আন্তাবল বানাও।

বলা তো যায় না, তার মনু’ড়টা মেঘে ঠেকবে, না চাঁদে ঠোঙ্গর লাগাবে!

দীর্ঘ ভ্রমণের পর জিরাফ যখন জিরিয়ে-জুরিয়ে তৈরী তখন শতদিন শ্রুতক্ষণ দেখে, চীন-সম্রাট পাত্র-অমাত্য-সভাসদসহ শোভাযাত্রা করে জিরাফদর্শনে বেরলেন। সঙ্গে নিলেন, বিশেষ করে, রাজচিত্রকর এবং সভাকবি।

সম্রাট জিরাফ দেখে গভীর আনন্দ লাভ করলেন। সভাসদ ধন্য ধন্য করলেন। আপামর জনসাধারণ গভীরতর সন্তোষ লাভ করল, —তাদের গুরুজন বলছিলেন যে এ রকম অদ্ভুত প্রাণী পৃথিবীতে আছে, এবং সে একদিন চীন দেশে আসবে, সেটা কিছই অনায়াস বলেন নি। যারা সন্দেহ করত তাদের মনু’ড়-গুলো এখন টেনে টেনে ঐ জিরাফের মনু’ড়টার মতো উঁচু করে দেওয়া উচিত।

সম্রাট চিত্রকরকে আদেশ দিলেন, ‘এই শতদিনবস চিত্রশ্রমণীয় করে রাখার জন্য তুমি এই জিরাফের একটি উত্তম চিত্র অঙ্কন করো!’

ছবি আঁকা হল।

সম্রাট কবিকে আদেশ করলেন, ‘তুমি এই শত অননুষ্ঠানের বর্ণনা ছন্দে বেঁধে ছবিতে লিখে রাখো।’

তাই করা হল।

গম্প শেষ করে বললুম, 'সে ছবির প্রিন্ট আমি কাগজে দেখেছি।'।

পল শুধালে, 'স্যর, আপনি কি চীনা ভাষা পড়তে পারেন?'

আমি বললুম, 'আদিপেই না। আমার এক বন্ধু চীনা শিখেছে স্বে-ভাষাতে বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ার জন্য। জানো তো, আমাদের বহু শাস্ত্র এ দেশে বৌদ্ধধর্ম লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু চীনা অনুবাদে এখনো বেঁচে আছে। আমার বন্ধু বৌদ্ধ শাস্ত্র খুঁজতে খুঁজতে এই অদ্ভুত কাহিনীর সাক্ষাৎ পায়। তারই বাঙলা অনুবাদ করে, ছবিসমূহ সেটা বাঙলা কাগজে ছাপায়। তা না হলে বাঙলা দেশের লোক কখনো এ কাহিনী জানতে পারত না, কারণ বাঙলা দেশে এসম্বন্ধে কোনো ইতিহাস বা দলিল-পত্র নেই।

পার্সি বললে, 'কিন্তু স্যর, এটা তো ইতিহাসের মতো শোনাল না! এ যে গম্পকে ছাড়িয়ে যায়।'

আমি বললুম, 'কেন বৎস, তোমার মাতৃভাষাতেই তো রয়েছে, 'ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন্' - সত্য ঘটনা গম্পের চেয়েও চমকপ্রদ।'

এবং আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস যে ঘটনার বর্ণনা মানুষকে গম্পের চেয়েও বেশী সজাগ করে না তুলতে পারে, সে ঘটনার কোনো ঐতিহাসিক মূল্য নেই। কিংবা বলব, যে লোক ঘটনাটার বর্ণনা দিয়েছে সে সত্যকার ঐতিহাসিক নয়। আমার দেশে এ রকম কাঠখোঁটা ঐতিহাসিক বেশী।

॥ ৬ ॥

কলরব, চিৎকার, তারস্বরে আতর্নাদ! কি হল, কি হয়েছে? তবে কি জাহাজে বোম্বেটে পড়েছে? বায়স্কেপে যে রকম দেখি, বোম্বেটেরা দু হাতে দুই পিস্তল, দুপাটি দাঁতে ছোরা কামড়ে ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে এক জাহাজ থেকে আরেক জাহাজ আক্রমণ করে? তার পর হঠাৎ কানের পর্দা ফাটিয়ে এক ভয়ংকর প্রলয়ংকর বিস্ফোরণ—বারুদ-গোদামে আগুন লেগে সেটা ফেটে গিয়েছে। তারই আগুন জাহাজের দড়াদড়ি পাল-মাস্তুলে লেগে গিয়ে সমস্ত জাহাজ দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠেছে।

নাঃ! স্বপ্ন। বাঁচলুম। সর্বাপ্ত ঘামে ভিজে গিয়েছে। চোখ মেলতে দেখি, কেবিনের সব কটা আলো জ্বলছে আর সামনে দাঁড়িয়ে পল আর পার্সি। পল দাঁড়িয়ে আছে সত্যি কিন্তু পার্সিটা জ্বলু না হটেনটট' কি যেন এক বিকট আফ্রিকান নৃত্য জুড়েছে—আফ্রিকান-ই হবে, কারণ ঐ মহাদেশেরই গা ঘেঁষে তো এখন আমরা যাচ্ছি।

তা আফ্রিকার হটেনটটীয় মাতৃ-ভাষা-ভব নৃত্যই হোক আর ইয়োরোপীয় মাৎসুক' কিংবা ল্যামবেথ-উয়েক্-ই হোক—আমি অবশ্য এ দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্যই দেখতে পাই নে, সঙ্গীতে তো আদৌ না—পার্সি এ সময়ে

আমার কোঁবনে এসে বিন-নোটিশে নাচ জুড়বে কেন ?

নাঃ, নাচ নয় । বেচারী উত্তেজনায় তিড়িং-বিড়িং করছে আর যে কাতর রোদন জানাচ্ছে সেটার 'সামারি' করলে দাঁড়ায় ;—

‘হায়, হায়, সব কিছু সাড়ে-সর্বনাশ হয়ে গেল, স্যার ! আপনি এখনো অকাতরে নাক ডাকাচ্ছেন । আমার জীবন বিফল হল, পলের জীবনও ব্যর্থ হয়ে গেল । জাহাজ রাতারাত ডুবসাঁতার কেটে জিবুটি বন্দরে পেঁাছে গিয়েছে । সবাই জামা-কাপড় পরে, ব্রেকফাস্ট খেয়ে পারে নামবার জন্য তৈরী, আর আপনি,—হায়, হায় !’

(এ বইখানার যদি ফিল্ম হয় তবে এ স্থলে ‘অশ্রুবর্ষণ ও ঘন ঘন দীর্ঘ-নিশ্বাস’)

আমি চোখ বন্ধ করলুম দেখে পার্সি এবারে ডুকরে কেঁদে উঠল ।

আমি শান্ত কণ্ঠে শুনালুম, ‘জাহাজ যদি জিবুটি পেঁাছে গিয়ে থাকে তবে এখনো এঞ্জিনের শব্দ শুনতে পারছি কেন ?’

পার্সি অসহিষ্ণুতা চাপবার চেষ্টা করে বললে, ‘এঞ্জিন বন্ধ করা না-করা তো এক মিনিটের ব্যাপার ।’

আমি বললুম, ‘নৌ-দ্রম্ণে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা বলে, এঞ্জিন বন্ধ হওয়ার পরও জাহাজ থেকে নামতে নামতে ঘণ্টা দুয়েক কেটে যায় ।’

পল এই প্রথম মুখ খুললে ; বললে, ‘বন্দর যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ।’

আমি বললুম, ‘দার্জিলিং থেকে কাগুনজম্বার চূড়োটা স্পষ্ট দেখা যায়, তাই বলে কি সেখানে দশ মিনিটে পেঁাছানো যায় ?’

তার পর বললুম, ‘কিন্তু এ সব কৃতর্ক । আমি হাতে-নাতে আমার বস্তুব্য প্রমাণ করে দিচ্ছি ।’

তার পর অতি ধীরে-সুস্থে দাড়ি কামাতে আরম্ভ করলুম । পল আমার কথা শুনে অনেকখানি আশ্বস্ত হয়েছে কিন্তু পার্সি তখনো বাস্তব-সমস্ত । আমাকে তাড়া লাগাতে গিয়ে দাড়ি কামানোর বদরুশটা এগিয়ে দিতে গিয়ে তুলে ধরে দাঁতের বদরুশ—এটে দিয়ে গাল ঘষলে মুখপোড়া হনুমান হতে কতক্ষণ—টাই ভেবে সামনে ধরে জেসিং গাউনের কোমরবন্ধটা । তারপর চা-রুটি, মাখম-আম্ভাতে অপূর্ব এক ঘণ্টা বানিয়ে আমার সামনে ধরে চতুর্দিকে ঘোরপাক খেতে লাগল—বাড়িতে জিনিসপত্র বাঁধাই-ছাঁদাই করার সময় পাঁপিটা যে রকম এর পা ওর পার ভিতর দিয়ে ঘোরপাক খায় এবং বাড়িসুদ্ধ লোককে চাটিয়ে তোলে ।

শেষটায় বেগতিক দেখে আমিও একটু তাড়াহুড়ো করে সদলবলে ডেকে এলুম

উপরে তখন আর সবাই অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে তাস পাশা, গালগণ্ডে ফিরে গিয়েছে ।

পল চোখে দূরবীন লাগিয়ে বললে, ‘কই, স্যার, বন্দর কোথায় ? আমি তো দেখতে পাচ্ছি, ধু-ধু করছে মরুভূমি আর টিনের বাস্তুর মতো কয়েক সার এক-

যেয়ে বাড়ি।’ -

আমি বললুম, ‘এর-ই নাম জিবুটি বন্দর।’

‘ঐ মরুভূমিতে দেখবার মতো আছে কি?’

‘কিছু না। তবে কি জানো, ভিন্দুদেশ পরদেশের ভিতর দিয়ে যাবার সময় অত-শত বাহ্যবিচার করতে নেই—বিশেষত এই অল্প বয়সে। চিড়িয়াখানায় যখন ঢুকেছ, তখন বাধ-সিঁঙি দেখার সঙ্গে সঙ্গে খটাশটাও দেখে নেওয়াই ভালো। আর কে জানে, কোন্ মোড় ঘুরতে কোন্ এক অপ্রত্যাশিত জিনিস বা অভিজ্ঞতা সপ্ত হব না? মোকামে পেঁছানোর পর না হয় জমা-খরচ করা যাবে, কোন্টা ভালো লাগল আর কোন্টা লাগল না।’

জাহাজ থেকে তড়-তড় করে সিঁড়ি ভেঙে ডাঙায় নামা যায় পৃথিবীর ভালো ভালো বন্দরেই। এখানে তাই পারে যেতে হল মোটর লগ্ন করে। জিবুটির চেয়েও নিকৃষ্ট বন্দর পৃথিবীতে হয়তো আছে কিন্তু আমার দেখার মধ্যে এটেই সব চেয়ে অপ্রিয়দর্শন ও বৈচিত্র্যহীন বন্দর। মরুভূমির প্রত্যস্ত-ভূমিতে বন্দরটি গড়ে তোলা হয়েছে একমাত্র রাজ্যবিস্তারের লোভে। এবং এ মরুভূমিকে কোনো প্রকারের শ্যামলিমা দেওয়া সম্পর্ক অসম্ভব জেনেই কেউ কোনোদিন কণামাত্র ঞেটা করে নি একে একটুখানি আরামদায়ক করার।

ডাঙা থেকে সোজা চলে গিয়েছে একটা ধূণোয় ভর্তি রাস্তা বন্দরের চৌক বা ঠিক মাঝখানে। তার পর সেখান থেকে এদিকে ওদিকে দু-চারটে রাস্তা গিয়েছে বটে কিন্তু বড় রাস্তাটা দেখার পর ও-সব গলিতে ঢোকান প্রবৃত্তি সুস্থলোকের হওয়ার কথা নয়। বড় রাস্তার দুদিকে সাদা চুনকাম-করা বাড়িগুলো এমন গুরু গুরু করে দাঁড়িয়ে আছে যে, বাড়ির বাসিন্দারাও বোধ করি এ-সব বাড়িতে ঢোকান সময় দোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ শুকনো ঢোক গেলে কিংবা বাঁ হাত দিয়ে ঘাড়ের ডান দিকটা চুলকে নেয়। ছোট গলির মূখে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখি, মাটির তৈরী দেয়াল-ছাদের ছোট ছোট ঘর, না, ঘর নয়, গহ্বর কিংবা গুহাও বলতে পারো। বৃষ্টি এদেশে এতই ছিটেফোঁটা হয় যে, ছাত গলে গিয়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। আর থাকলেই বা কি, এদেশে তো আর ঘাস-পাতা গজায় না যে তাই দিয়ে চাল বানাবে?

এর-ই ভিতরে মানুষ থাকে, মা ছেলেকে ভালোবাসে, তাই ভাইকে স্নেহ করে, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সবই হয়।

কিন্তু আমি এত আশ্চর্য হচ্ছি কেন? আমি কি কখনো গলির ঘিঞ্জি বাস্তব ভিতর ঢুকি নি—কলকাতায়? সেখানে দেখি নি কী দৈন্য, কী দুর্দশা! তবে আজ এখানে আশ্চর্য হচ্ছি কেন? বোধ হয় বিদেশে এ জিনিস প্রত্যাশা করি নি বলে, কিংবা দেশের দৈন্য দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি বলে বিদেশে তার অন্য রূপ দেখে চমকে উঠলুম।

এইখানেই মহামানব এবং হীনপ্রাণে পার্থক্য! মহাপুরুষরা দৈন্য দেখে

কখনো অভ্যস্ত হন না। কখনো বলেন না, এ তো সর্বগ্রহী হচ্ছে, অহরহ হচ্ছে, ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি। দৈন্য তাঁদের সব সময়ই গভীর পীড়া দেয়—যদিও আমরা অনেক সময় তাঁদের চেহারা দেখে সেটা বুঝতে পারি নে। তার পর একদিন তাঁরা সুযোগ পান, যে সুযোগের প্রতীক্ষায় তাঁরা বছরের পর বছর প্রহর গুনছিলেন, কিংবা যে সুযোগ তাঁরা ক্ষণে ক্ষণে দিনে দিনে আপন হাতে গড়ে তুলছিলেন, এবং এরই বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

“অখ্যাত অজ্ঞাত রহি দীর্ঘকাল হে রাজবৈরাগী, গিরিদরী-তলে
বর্ষার নিব্বার যথা শৈল বিদারিয়া উঠে জাগি পরিপূর্ণ বলে
সেই মত বাহিরিলে ; বিশ্বলোক ভাবিলে বিস্ময়ে যাহার পতাকা
অম্বর আচ্ছন্ন করে এত কাল এত ক্ষুদ্র হয়ে কোথা ছিল ঢাকা ॥”

তাই যখন হঠাৎ একদিন এক অরবিন্দ ঘোষ, এক চিত্তরঞ্জন দাশ এসে আমাদের মাঝখানে দেখা দেন তখন আমাদের আর বিস্ময়ের অবধি থাকে না। আজম, আশৈশব, অনটনমুক্ত বিলাসে জীবন যাপন করে হঠাৎ একদিন তাঁরা সব কিছু বিসর্জন করে গিয়ে দাঁড়ান গরীব দুঃখী, আতুর অভাজনের মাঝখানে। যে দৈন্য দেখে ভিতরে ভিতরে গভীর বেদনা পেতেন, সে দৈন্য ঘূঁচাতে গিয়ে তাঁরা তখন পান গভীরতর বেদনা। কিন্তু সত্যের জয় শেষ পর্যন্ত হবেই হবে।

“—তাই উঠে বাজি

জয়শব্দ তাঁর ? তোমার দক্ষিণ করে
তাই কি দিলেন আজি কঠোর আদরে
দুঃখের দারুণ দীপ আলোক যাহার
জ্বলিয়াছে বিশ্ব করি দেশের অধার
ধুবতারকার মতো। জয় তব জয়।”

কিন্তু এত সব কথা তোমাদের শোনাচ্ছি কেন ? তার কারণ গত রাতে জাহাজে বসে বসে আফ্রিকা মহাদেশ এবং বিশেষ করে যে সোমালি দেশের ভিতর জিবুটি বন্দর অবস্থিত তারই কথা ভাবছিলাম বলে। এবং সেই সোমালিদের দুঃখ-দৈন্য ঘূঁচাবার জন্য যে একটি লোক বিদেশী শত্রুদের সঙ্গে প্রাণ দিয়ে লড়েছিল তার কথা বার বার মনে পড়াছিল বলে।

ইয়োরোপীয় বর্ষারতার চূড়ান্ত বিকাশ দেখতে হলে পড়তে হয় আফ্রিকার ইতিহাস—ইংরেজ শাসিত ভারতের ইতিহাস তার তুলনায় নগণ্য।

পতুগীজ, ইংরেজ, জার্মান, ফরাসী বেলজিয়াম—কত বলব। ইয়োরোপীয় বহু জাত, কম জাত, বস্জাত, এই আফ্রিকায় একদিন এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সাম্রাজ্য বিস্তারের বর্ষার পার্শ্বিক ক্ষুধা নিয়ে, শকুনের পাল যেরকম মরা গোরুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভুল বললাম ; শকুনিদের উপর আবিচার করা হল, কারণ তারা তো জ্যান্ত পশুর উপর কোনো ঝাঁপ দেয় না। এই ইয়োরোপীয়রা এসে ছেকে ধরল সোমালি, নিগ্রো, বাস্টু, হটেনটটদের। তাদের হাতে-পায়ে বেঁধে মৃগী-লাদাই ঝাঁকার মতো জাহাজ ভর্তি করে নিয়ে গেল আমেরিকায়।

সৈয়দ মজতবা আলী রচনাবলী (৭ম)—৩

কত লক্ষ নিগ্রো দাস যে তখন অসহ্য যন্ত্রণায় মারা গেল তার নিদারুণ করুণ বর্ণনা পাবে ‘আণ্ডক্ল’ টম্‌স্‌ ক্যাবিন’ পুস্তকে—বইখানা পড়ে দেখো। ইংরিজী ভালো বদ্বতে না পারলে বাঙলা অনুবাদ ‘টম কাকার কুটির’ পড়লেই হবে—আমি ছেলেবেলায় বাঙলাতেই পড়েছিলাম।

আর আফ্রিকার ভিতরে যা করলে তার ইতিহাস আজও লেখা হয় নি। বিখ্যাত ফরাসী লেখক আঁদ্রে জিঁব কস্‌সো সম্বন্ধে একখানা বই লিখে এমনই বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন যে তাঁর মতো দূঃসাহসী না হলে ঐ সম্বন্ধে কেউ আর উচ্চবাচ্য করতে সাহস পায় না। আর লিখলেই বা কি, প্রকাশক পাবে না। প্রকাশক পেলেই বা কি? কাগজে কাগজে বেরুবে তার বিরুদ্ধে রুঢ় মন্তব্য, অশ্লীল সমালোচনা। তখন আর কোনো পুস্তক-বিক্রেতা তোমার বই তার দোকানে রাখবে না। তবু জেনে রাখা ভাল, এমন মহাজনও আছেন যারা এ সব বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও বই লেখেন, ছাপান, প্রকাশ করেন এবং লোকে সে সব পড়ে বলে দেশে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি হয়।

সোমালি দেশের উপর রাজত্ব করতে এসেছিল বিস্তর জাত : তাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত টিকে রইল ফরাসী, ইংরেজ ও ইতালীয়।

ব্রিটিশ-সোমালি দেশে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন মুহম্মদ বিন আম্মদুল্লা ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। নিরস্ত্র কিংবা ভাঙাচোরা বন্দুক আর তীর-ধনুকে সজ্জিত সোমালিরা তাঁর চতুর্দিকে এসে জড়ো হল অসীম সাহস নিয়ে—ইয়োরোপীয় কামান মেশিনগানের বিপক্ষে। এদিকে ইতালীয় এবং ব্রিটিশে সোমালি দেশের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে মারামারি, ওদিকে কিন্তু দুই দলই এক হয়ে গেলেন মোল্লা মুহম্মদের স্বাধীনতা প্রচেষ্টাকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য।

দুই পক্ষেরই বিস্তর হার-জিত হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোল্লাই ইয়োরোপীয়দের খেঁদিয়ে খেঁদিয়ে লাল-দারিয়ার পার পর্যন্ত পেঁচিয়ে দিলেন। ইংরেজ তখন সোমালিদের উপর রাজত্ব করার আশা ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রপারে দুর্গ বানিয়ে ভার-ই ভিতর বসে রইল লাল-দারিয়ার বন্দরগুলোকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য।

সারা সোমালি দেশে জয়ধ্বনি জেগে উঠল—সোমালি স্বাধীন। তখন ইংরেজ তাঁকে নাম দিল, ‘ম্যাড’ মোল্লা’ অর্থাৎ ‘পাগলা মোল্লা’, আমাদের গান্ধীকে যে-রকম একদিন নাম দিয়েছিল, ‘নেকেড্‌ ফকীর’ অর্থাৎ ‘উলঙ্গ ফকীর।’ হেরে যাওয়ার পর মুখ ভ্যাংচানো ছাড়া করবার কী থাকে, বলো?

কিন্তু হায়, খুব বেশী বৎসর গেল না। ১৯১৪-১৮র প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইয়োরোপীয়রা অ্যারোপ্লেন থেকে বোমা মেরে মানুষকে কাবু করার কৌশল শিখে গিয়েছে। তাই দিয়ে যখন আবার তারা হানা দিলে তখন মোল্লাকে সে সময়কার মতো পরাজয় স্বীকার করে আশ্রয় গ্রহণ করতে হল ভিন দেশে।

মোল্লা সেই অনাদৃত অবহেলায় আবার সাধনা করতে লাগলেন স্বাধীনতা জয়ের নতুন সম্মানে। কিন্তু হায়, দীর্ঘ বাইশ বৎসরের কঠিন যুদ্ধ, নিদারুণ কষ্টসাধনে তাঁর স্বাস্থ্য তখন ভেঙ্গে গিয়েছে। শেষ পরাজয়ের এক বৎসর পর, যে-উগবানের নাম স্মরণ করে বাইশ বৎসর পূর্বে তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামে

নেমেছিলেন তাঁরই নাম স্মরণ করে সেই লোক চলে গেলেন যেখানে খুব সম্ভব সাদা-কালোর দ্বন্দ্ব নেই।

এই যে জিবুটি বন্দরে বসে বসে চোখের সামনে তাগড়া লম্বা জোয়ান সোমালিদের দেখছি, তারাও নাকি তখন চিংকার করে কেঁদে উঠেছিল।

বীরের কাহিনী থেকে আমরা উৎসাহ সঞ্চয় করব, তা না হলে আমি এ দুঃখের কাহিনী তুললুম কেন? তার কারণ বদ্বিষয়ে বলার পূর্বে একটি কথা আমি বেশ জোর দিয়ে বলতে চাই।

‘ফরাসীরা বড় খারাপ’, ইংরেজ চোরের জাত’ এ রকম কথার কোনো অর্থ হয় না। ভারতবর্ষে বিস্তারিত পকেটমার আছে, তাই বলে কেউ যদি গাল দেয় ‘ভারতবাসীরা পকেটমার’ তা হলে অধর্মের কথা হয়। ‘ইংরেজ জাত অত্যাচারী’ এ-কথা বলার কোনো অর্থ হয় না।

তাই যখন অধর্ম অরাজকতা দেখি, তখন সংযম বর্জন করে তন্দ্রাভেদেই অস্ত্র-ধারণ করা অনুচিত। বহু জাত বহু বার করে দেখেছে, কোনো ফল হয় নি; হিংসা আর রক্তপাত শুধু বেড়েই গিয়েছে।

তাই মহাস্বাভাবিক অহিংসার বাণী প্রচার করেছেন। অহিংসা দিয়ে হিংসা জয় করতে হবে। এর চেয়ে মহৎ শিক্ষা আর কিছু নেই। ভারতবর্ষ যদি তাই দিয়ে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ-সংগ্রাম, লুণ্ঠন-শোষণ রুদ্ধ করতে পারে তবে পৃথিবীর ইতিহাসে সে সর্বসভ্য জাতি বলে গণ্য হবে।

এবং শেষ কথা—সব চেয়ে বড় কথা—

আমাদের যেন রাজ্যলোভ না হয়। এদের অন্যায় আচরণ দেখে আমরা যেন সতর্ক হই। আমরা দুঃশ বৎসর ধরে পরাধীন ছিলাম। পরাধীনতার বেদনা আমরা জানি। আমরা যেন কাউকে পরাধীন না করি!

॥ ৭ ॥

পল জিঙ্ক্স করলে, ‘একদৃষ্টে কি দেখছেন স্যার? আমি তো তেমন কিছু নয়নাভিরাম দেখতে পারছি নে।’

বললাম, ‘আমি কিঞ্চিৎ শালক হোমসগিরি করছি। ঐ যে লোকটা যাচ্ছে দেখতে পারছ? সে ঐ পাশের দোকান থেকে বেরিয়ে এল তো? দোকানের ‘সাইন-বোর্ডে’ লেখা ‘ফ্রিজার’, তাই লোকটার ঘাড়ের দিকটা দেখে অনুমান করছিলাম, জিবুটি বন্দরের নাপিতদের কোন পর্বায়ে ফেলি?’

পার্সি বললে, ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার ঠিক মনে আছে। আমি তো চুল কাটাবার কথা বেবাক ভুলে গিয়েছিলাম। চলুন ঢুকে পড়ি।’

আমি বললাম, ‘তা পারো। তবে কি না, মনে হচ্ছে, এ-দেশে কোদাল দিয়ে চুল কাটে।’

পার্সি বললে, 'কোদাল দিয়েই কাটুক, আর কাস্তে দিয়েই কামাক, আমার তো গত্যস্তর নেই।'

নাপিপত ভায়া ফরাসী ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা জানেন না। আমি তাকে মোটামুটি বুঝিয়ে দিলুম, পার্সির প্রয়োজনটা কি।

কিন্তু দোকানটা এতই ছোট যে, পল আর আমি সেখানে বসবার জায়গা পেলুম না। বারান্দাও নেই। পার্সিকে বললুম, তার চুল কাটা শেষ হলেই সে যেন বন্দরের চৌমাথার কাফেতে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

চৌমাথায় একটি মাত্র কাফে। সব কটা দরজা খোলা বলে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, খন্দের গিস-গিস করছে। কিন্তু এইটুকু হাতের-তেলো-পরিমাণ বন্দর, এখানে মেলার গোরুর হাট বসল কি করে?

ভিতরে গিয়ে দেখি, এ কি, এ যে আমাদের জাহাজেরই ডাইনিঙ রুম! খন্দেরের সব কজনাই আমাদের অতিশয় সুপরিচিত সহযাত্রীর দল। এ বন্দর 'দেখা' দশ মিনিটেই শেষ হয়ে যায় বলে, সবাই এসে জড়ো হয়েছেন ঐ একটি মাত্র কাফেতেই। তাই কাফে গুলজার। এবং সবাই বসেছেন আপন আপন টেবিল নিয়ে। অর্থাৎ জাহাজের ডাইনিঙ রুমে যে চারজন কিংবা ছজন বসেন এক টেবিল নিয়ে, ঠিক সেই রকম এখানেও বসেছেন আপন আপন গুদুটি নিয়ে।

এক কোণে বসেছে গুদুটিকয়েক লোক, উদাস নয়নে, শূন্যের দিকে তাকিয়ে। জাহাজে এদের কখনো দেখি নি। আশ্চর্য করলুম, এরাই তবে জিবুটির বাসিন্দা। জরাজীর্ণ বেশভূষা।

কিন্তু এ সব পরের কথা। কাফেতে ঢুকেই প্রথম চোখে পড়ে এ দেশের মাছি। 'চোখে পড়ে' বাক্যটি শব্দার্থেই বললুম, কারণ কাফেতে ঢোকান পুবেই এক ঝাঁক মাছি আমার চোখে থাবড়া মেরে গেল।

কাফের টেবিলের উপর মাছি বসেছে আলপনা কেটে, 'বারের' কাউন্টারে বসেছে ঝাঁকে ঝাঁকে, খন্দেরের পিঠে, হ্যাটে,—হেন স্থান নেই যেখানে মাছি বসতে ভয় পেয়েছে।

দু-গেলাস 'নিম্বু-পানি' টেবিলে আসা মাত্রই তার উপরে, চুমুক দেবার জায়গায়, বসল গোটা আষ্টেক মাছি। পল হাত দিয়ে তাড়া দিতেই গোটা কয়েক পড়ে গেল শরবতের ভিতর। পল বললে, 'ঐ ষ্ যা।'

আমি বললুম, 'আরেকটা অর্ডার দি?'

সবিনয়ে বললে, 'না, স্যার; আমার এমনিতেই ঘিন-ঘিন করছে। আর পরস্যা খরচা করে দরকার নেই।'

তখন তাকিয়ে দেখি, অধিকাংশ খন্দেরের গেলাসই পুরো ভর্তি।

ততক্ষণে ওয়েটার দুটি চামর দিয়ে গেছে। আমরাও চামর দুটি হাতে নিয়ে অন্য সব খন্দেরদের সঙ্গে কোরাসে মাছি তাড়াতে শুরু করলুম।

সে এক অপরূপ দৃশ্য! জন পণ্ডাশেক খন্দের যেন এক অদৃশ্য রাজা-ধিরাজের চতুর্দিকে জীবন-মরণ পণ করে চামর দোলাচ্ছে। ডাইনে চামর,

বায়ে চামর, মাথার উপরে চামর, টেবিলের তলায় চামর। আর তার-ই তাড়ায় মাছিগুলো যুথলুট কিংবা ছমছড়া হয়ে কখনো ঢোকে পলের নাকে, কখনো ঢোকে আমার মূখে। কথাবার্তা পর্যন্ত প্রায় বন্ধ। শুধু চামরের সাই-সাই আর মাছির ভন্-ভন্! রুশ-জর্মনে লড়াই!

মাত্র সেই চারটি খাস জিবুটি বাসিন্দে নিশ্চল নীরব। অনুমান করলুম, মাছি তাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, এবং মাছিদের সঙ্গে লড়নেওলা জাহাজ-যাত্রীর দলও তাদের গা-সওয়া। এরকম লড়াইও তারা নিত্য নিত্য দেখে।

তখন লক্ষ্য করলুম তাদের শরবৎ পানের প্রক্রিয়াটা। তারা চামর তো দোলায়ই না, হাত দিয়েও গেলাসের মুখ থেকে মাছি খেদায় না। গেলাস মুখে দেবার পূর্বে সেটাতে একটু মোলায়েম ঠোনা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে মাছিগুলো ইঞ্চি তিনেক উপরে ওঠা মাত্রই গেলাসটি টুক করে টেনে এনে চুমুক লাগায়। ঘনিপিত এদের নেই।

পলও লক্ষ্য করে আমাকে কানে কানে শুধোলে, ‘এ লক্ষ্মীছাড়া জায়গায় এ-সব লোক থাকে কেন?’

আমি বললুম, ‘সে বড় দীর্ঘ কাহিনী। অর্থাৎ এদের প্রত্যেককে যদি জিজ্ঞেস কর তবে শুনবে, প্রত্যেকের জীবনের দীর্ঘ এবং বৈচিত্র্যময় কাহিনী।’

এ সংসারে সর্বত্রই এক রকম লোক আছে যারা রাতারাত লক্ষপতি হতে চায়। খেত-খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-নোকরি কোনো কাজেই ওদের মন যায় না। অত খাটে কে, অত লড়ে কে?—এই তাদের ভাবখানা।

সিনেনায় নিশ্চয় দেখেছ, হঠাৎ খবর রটল আফ্রিকার কোথায় যেন সোনা পাওয়া গিয়েছে; সেখানে মাটির উপর-নিচে সর্বত্র তাল তাল সোনা পড়ে আছে আর অর্নি চলল দলে দলে দুনিয়ার লোক—সেই সোনা যোগাড় করে রাতারাত বড়লোক হওয়ার জন্য। সিনেমা কত রঙ-চঙেই না সে দৃশ্য দেখায়। অনাহারে তৃষ্ণায় পড়ে আছে, এখানে মড়া সেখানে মড়া। কোনো কোনো জায়গায় বাপ-না, বেটা-বেটী চলেছে এক ভাঙা গাড়িতে করে—ছেলেটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে, মেয়েটা ভিন্নি গেছে। বাপ টিনের ক্যানাস্তারা হাতে করে ধুকতে ধুকতে জল খঁজতে গিয়ে এ পাথরে টুকর খেয়ে পড়ে যাচ্ছে ও পাথরে ঠোকা খেয়ে জখম হচ্ছে। মায়ের চোখে জলের কণা পর্যন্ত নেই—বেন অসাড় অবশ হয়ে গিয়েছে।

এগিয়ে চলেছে, এগিয়ে চলেছে, এরা এগিয়ে চলেছে। এ ছাড়া উপায় নেই। থামলে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু, এগলে বাঁচলে বাঁচতেও পারো।

কজন পেঁছয়, কজন সোনা পায়, তার ভিতর কজন জনসমাজে ফিরে এসে সে ধন ভোগ করতে পারে, তার কোনো সরকারী কিংবা বেসরকারী সেনসাস কখনো হয় নি। তার হলেই বা কি? যাদের এ ধরনের নেশা জন্মগত তাদের ঠেকাবে কোন্ আদমশুমারী?

কিংবা হয়তো এদেরই একজন লেগে গেল কোম্পানী বানিয়ে, শেয়ার বিক্রি করে টাকা তুলতে। কেন? কোন্ এক বোম্বেটে কাস্তান কোন্ এক অজানা

দ্বীপে কোটি কোটি টাকার ধন নিয়ে উধাও হয়ে যায়। সেই দ্বীপ খুঁজে বের করতে হবে, সেই ধন উদ্ধার করে রাতারাতি বড়লোক হতে হবে। যে সমুদ্রে ঐ দ্বীপটার থাকার কথা সেখানে যাত্রী-জাহাজ বা মাল-জাহাজ কিছুই যায় না। সে দ্বীপে নাকি খাবার জল পর্যন্ত নেই। ঐ বোম্বেটে কাস্তান নাকি জলতৃষ্ণায় মারা গিয়েছিল। আরো কত রকম উড়ো খবর।

যে কোম্পানি খুললে, সে বলে বেড়াচ্ছে তার কাছে ম্যাপ রয়েছে ঐ দ্বীপে যাবার জন্য। সাধারণ লোক বলে, ‘কই, ম্যাপটা দেখি।’ লোকটা বলে, ‘আম্বার! তারপর তুমি টাকাটা মেরে দাও আর কি?’ কিন্তু রাতারাতি বড়লোক হওয়ার দল অত-শত শূন্য না। তারা কোম্পানির শেয়ারও কেনে না—পয়সা থাকলেও কেনে না। তারা গিয়ে কান্নাকাটি লাগায় লোকটার কাছে—‘খালাসী করে, বাবুচি’ করে। ‘আমাদের নিয়ে চল তোমার সঙ্গে। তখন-মাইনে কিছু চাই নে।’ কাস্তেনও ঐ রকম লোকই খুঁজছে,—শক্ত তাগড়া জোয়ান, মরতে যারা ডরায় না।

তারপর একদিন সে জাহাজ রওয়ানা হল। কিন্তু আর ফিরে এল না।

কিংবা ফিরে এল মাত্র কয়েকজন লোক। কিছুই পাওয়া যায় নি বলে এরা তাকে খুন করেছে। তখন লাগে পুলিশ তাদের পিছনে। মোকদ্দমা হয়, আরো কত কি?

পল কাফের সেই চারটি জিবুটিবাসীর দিকে তাকিয়ে ফিস-ফিস করে আমাকে শূন্যালে, ‘এরা সব ঐ ধরনের লোক?’

আমি বললাম, ‘না, তবে ওদের বংশধর। বংশধর অর্থে ওদের ছেলে-নাতি নয়, কারণ ও ধরনের লোক বিয়ে-থা বড় একটা করে না। ‘বংশধর’ বলছি, এরা ঐ দলেরই লোক, যারা রাতারাতি বড়লোক হতে চায়। কিন্তু আজকের দিনে তো আর সোনা পাওয়ার গুজোব ভালো করে রটতে পারে না,—তার আগেই খবরের কাগজগুলো প্লেন ভাড়া করে সব কিছু তদারক করে জানিয়ে দেয়, সমস্তটা ধাম্পা। কিংবা জাহাজ ভাড়া করার কথাও ওঠে না। প্লেনে করে ঝটপট সব কিছু সারা যায়। হেলিকপ্টার হওয়াতে আরো সুবিধে হয়েছে। একেবারে মাটির গা ছুঁয়ে ভালো করে সব কিছুই তদারক করা যায়।’

তাই এরা সব করে আফিং চালান, কিংবা মনে করো কোনো দেশে বিদ্রোহ হয়েছে—বিদ্রোহীদের কাছে বে-আইনী ভাবে বন্দুক-মেশিনগান ইত্যাদি বিক্রি।

যখন কিছুতেই কিছু হয় না, কিংবা সামান্য যে টাকা করেছিল তা ফুঁকে দিয়েছে, ওদিকে বয়সও হয়ে গিয়েছে, গায়ে আর জোর নেই, তখন তারা জিবুটির মতো লক্ষ্মীছাড়া বন্দরে এসে দু পয়সা কামাবার চেষ্টা করে, আর নতুন নতুন অসম্ভব অসম্ভব অ্যাভেঞ্চারের স্বপ্ন দেখে। জিবুটির মতো অসহ্য গরম আর মারাত্মক রোগ-ব্যাদির ভিতর কোন্ সুস্থ-মস্তিষ্ক লোক কাজের সম্মানে আসবে? কিন্তু এদের আছে কষ্ট সহ্য করার অসাধারণ ক্ষমতা। তাই এদের জন্য এখানে কিছু একটা জুটে যায়। এই যেমন মনে করো, এখান থেকে যে রেল-লাইন শুরু হয়ে আর্বির্নিয়ার রাজধানী আর্মিন্স-আবাবা অবধি গিয়েছে—প্রায় পাঁচ

শ মাইলের ধাক্কা । সে লাইনে তো নানা রকমের কাজ আছেই, তার উপর ওরই মারফতে ব্যবসা-বাণিজ্য যা হবার তা-ও হয় । ঐ সব করে, আর একে অন্যকে আপন আপন যৌবনের দৃষ্টদের্মের গণপ বলে ।

পাছে পল ভুল বোঝে তাই তাড়াতাড়ি বললুম, ‘কিন্তু এই যে চারটি লোক বসে আছে, ঠিক এরাই যে এ ধরনের অ্যাডভেঞ্চারার সে কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় । তবে হওয়ার সম্ভাবনা আছে—ঐটুকু যা কথা ।’

ইতিমধ্যে মূখে একটা মাছি ঢুকে যাওয়াতে বিষম খেয়ে কাশতে আরম্ভ করলুম । শান্ত হলে পর পল শূদ্রধালে, ‘এদের কথা শুনে এদের প্রতি করুণা হওয়া উচিত, না অন্য কোনো প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত, ঠিক বুদ্ধি উঠতে পারছি নে ।’

আমি অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললুম, ‘আমার কি মনে হয় জানো ? কেউ যখন করুণার সম্ভান করে তখনই প্রশ্ন জাগে, এ লোকটা করুণার পাত্র কি না ? কিন্তু এরা তো কারো তোয়াক্কা করে না । জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এরা আশা রাখে, স্বপ্ন দেখে, রাস্তার মোড় ঘুরতেই, নদীর বাঁক নিতেই সামনে পাবে পরী-স্থান, যেখানে গাছের পাতা রূপোর, ফল সোনার, যেখানে শিশিরের ফোঁটাতে হাত দিলেই তারা হীরের দানা হয়ে যায়, যেখানে—’

আরেকটুখানি কবিত্ব করার বাসনা হয়েছিল কিন্তু ইতিমধ্যে পার্সি মাছি তাড়াতে তাড়াতে এসে উপস্থিত । চেয়ারে বসে টেবিলের উপর রাখলো ও-দ্য-কলনের এক টাউস বোতল । মূখে হাসি, চোখে খুশি—বোতলের নয় পার্সি’র ।

আমি বোতলটা হাতে নিয়ে দেখি, দুনিয়ার সব চাইতে ডাকসাইটে ও-দ্য-কলন—খাস কলন শহরের তৈরী কলনের জল—Eau de Cologne ! 4711 মার্কা !

পার্সি বললে, ‘দাঁও মেরেছি স্যার ! বলুন তো এর দাম বোম্বাই কিংবা লন্ডনে কত ?’

আমি বললুম, ‘শিলিং বারো-চোদ্দ হবে ।’

লংকা জয় এবং সীতাকে উদ্ধার করেও বোধ হয় রামচন্দ্রজী এতখানি পবিত্র-ভূমির হাসি হাসেন নি । ভবু হনুমান কি করেছিলেন তার খানিকটে আভাস পেলুম, পার্সি’র বুক চাপড়ানো দেখে ।

‘তিন শিলিং, স্যার, তিন শিলিং ! সব মাত্র, কুল্লে, জস্ট;’ তিন শিলিং ! নট্ এ পেনি মোর, নট্ ঈভন এ রেড ফার্ডিং মোর ।’

এমন সময় দেখি, কাফের আরেক কোণ থেকে সেই আবুল আসাফিয়া—কি কি যেন—সিন্দ্বীকী সায়েব তার সেই লম্বা কোট আর ঝোলা পাতলুন পরে আমাদের দিকে আসছেন । ইনি আমাদের সেই বন্ধু যিনি সবাইকে লাইমজুস, চবলেট খাওয়ান—কিন্তু যার কঙ্গুসি কথা কওয়াতে ।

আমরা উঠে তাকে অভ্যর্থনা জানালুম ।

তিনি বসেই বোতলটা হাতে তুলে নিয়ে ডাক্তাররা যে রকম এক্সপের্টর প্লেট দেখে সেই রকম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন ।

পার্সি পুনরায় মৃদু হাস্য করে বললে, ‘একদম খাঁটি জিনিস ।’

আব্দুল আসফিয়া মূখ বন্ধ রেখেই নাক দিয়ে বললেন, ‘হুঁ !’

তারপর অনেকক্ষণ পরে অতি অনিচ্ছায় মূখ খুলে শূদ্রা বলেন, ‘ওটা কার জন্য কিনলে ?’

পার্সি বললে ‘পিসিমার জন্য ।’

আব্দুল আসফিয়া বললেন, ‘বোতলটার ছিপি না খুললে বিলেতে নামবার সময় তোমাকে প্রচুর কাস্টেম্‌সের ট্যাক্স দিতে হবে । এমন কি এ জাহাজে ওঠার সময়ও—তবে সে আমি ঠিক জানি নে ।’

পার্সি আমার দিকে তাকালে ।

আমি বললুম, ‘ছিপি খোলা থাকলে ওটা তোমার আপন ব্যবহারের জিনিস হয়ে গেল ; তাই ট্যাক্স দিতে হয় না ।’

অনেকক্ষণ পর আব্দুল আসফিয়া বললেন, ‘যখন খুলতেই হবে তখন এই বেলা খুলে ফেলাই ভালো ।’

আমরা সবাই—পার্সিও—বললুম, ‘সেই ভালো ।’

ওয়েটার একটা কক’ স্ক্রু নিয়ে এল । আব্দুল আসফিয়া পরিপাটী হাতে বোতল খুলে প্রথম কক’টার ভিতরের দিক শুকলেন, তারপর বোতলের জিনিস ।

একটু ভেবে নিয়ে আমাদের শৌকালেন ।

কোনো গন্ধ নেই ।

যেন জল—প্লেন, ‘নির্জলা’ জল !

পার্সি তো একেবারে হতভম্ব । অনেকক্ষণ পর সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে বললে, ‘কিন্তু ছিপি, সীল সবই তো ঠিক ?’

আব্দুল আসফিয়া বললেন, ‘এ সব ছোট বন্দরে পুঁলিশের কড়াকড়ি নেই বলে নানা রকমের লোক অনেক অজানা প্রক্ৰিয়ায় আসল জিনিস সরিয়ে নিয়ে মেকি কিংবা প্লেন জল চালায় ।’

আমি পলকে কানে কানে বললুম, ‘হয়তো আমাদেরই একজন “অ্যাড-ভেঞ্চারার” ।’

পাশের টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখি, খাস জিবুটি-বাসিন্দারা দরদ-ভরা আঁখিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে । অনুমান করতে বেগ পেতে হল না, এরা ব্যাপারটা ব্যথতে পেরেছে ।

পার্সিও খানিকটে বদ্ব্যতে পেরেছে । বলল, ‘যাত্রীরা বোকা কি না, তাই এ শয়তানিটা তাদের উপরই করা যায় । আর প্রতি জাহাজেই আসে এক জাহাজ —’

পল বাধা দিয়ে বললে, ‘পার্সি !’

পার্সি চটে উঠে বললে, ‘ওঃ, আর উনিই যেন এক মহা কন্-ফু-ৎস !’

জাহাজে ফেরার সময়, আব্দুল আসফিয়াকে একবার একা পেয়ে শূদ্রা বললুম, ‘ছোঁড়াটাকে বড় নিরাশ করলেন ।’

বললেন, ‘উপায় কি ? না হলে প্রতি বন্দরে মার খেত যে !’

গুণীরা বলেন, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে কথা বলবে।

জিবুটি ত্যাগ করার সময় পার্সি বন্দরের দিকে তাকিয়ে বললে, ‘লক্ষ্মীছাড়া জায়গাটা। ও-দ্য-কলনের খেদটা তখনো তার মন থেকে যায় নি। তাই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই কথাটা বলল।

ঘণ্টা খানেকের ভিতর উঠল ঝড়। তেমন কিছু মারাত্মক নয় কিন্তু ‘সী সিকনেস’ দিয়ে মানুষের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। পার্সিই প্রথম বিছানা নিল। বমি করতে করতে তার মুখ তখন সরষে ফুলের রঙ ধরেছে। ভাঙা গাল দুটো দেখে মনে হয় সত্তর বছরের বৃদ্ধো।

আমি নিজেকে যে খুব সুস্থ অনুভব করছিলাম তা নয়; তবু পার্সিকে বললাম, ‘তবে যে, বৎস, জিবুটি বন্দরকে কটু-কাটব্য করছিলে? এখন ঐ লক্ষ্মীছাড়া বন্দরেই পা দিতে পারলে যে দু’মিনিটেই চাঙ্গা হয়ে উঠতে। মাটিকে তাড়িলা করতে নেই—অস্তুত যতক্ষণ মাটির থেকে দূরে আছে—তা সে জলের তলাতে সাবমেরিনেই হোক, উপরে জাহাজেই হোক, কিংবা তারো উপরে বাতাসে ভর করে আরোপ্সেনেই হোক। তা সে যাক গে। এখন বৃদ্ধিতে পারলে গুণীরা কেন বলেছেন, অগ্র-পশ্চাৎ ইত্যাদি?’

পার্সি কিন্তু তেরী ছেলে। সেই ছটফটানির ভিতর থেকে কাতরাতে কাতরাতে বলল, ‘কিন্তু এখন যদি কোনো ডুবন্ত ধীরের মাটিতে ধাক্কা লেগে জাহাজখানা চোঁচির হয়ে যায় তখনো মাটির গুণগান করবেন নাকি?’

আমি বললাম, ‘ঐ য়্‌ যা! এতখানি ভেবে তো আর কথাটা বলি নি।’

পল তার খাটে বসে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। আশ্তে আশ্তে বললে, ‘জাহাজ যদি মাটিতে লেগে চোঁচির হয়ে যায় তবে তো সেটা মাটির দোষ নয়। জাহাজ জোরের সঙ্গে ধাক্কা দেয় বলেই তো খানখান হয়ে যায়। আশ্তে আশ্তে চললে মাটির বাধা পেয়ে জাহাজ বড় জোর দাঁড়িয়ে যাবে—ভাঙবে কেন? মাকে পর্যন্ত জোরে ধাক্কা দিলে চড় খেতে হয়, আর মাটি দেবে না?’

আমি উল্লসিত হয়ে বললাম, ‘সাধু, সাধু! তুলনাটি চমৎকার! তবে কি না আমার দুঃখ, বাঙলা ভাষায় এ নিয়ে যে শব্দ দুটো আছে তার pun তোমরা বৃদ্ধবে না। মা হচ্ছেন ‘মাদার’ আর ‘মাটি’ হচ্ছেন ‘দি মাদার’ কিংবা ‘আর্থ’।’

পল বললে, ‘বিলক্ষণ বুদ্ধোচ্ছিন্ন, Good Earth!’

পার্সি বিরক্ত হয়ে বললে, ‘পলের তুলনাটা নিশ্চয়ই চোরাই মাল।’

আমি বললাম, ‘সাধুর টাকাত্তে দু’সের দুধ, চোরের টাকাত্তেও দু’সের দুধ। টাকার দাম একই। তুলনাটা ভালো। তা সে পলের আপন মালই হোক আর চোরাই মালই হোক। তা সে কথা থাক। তুমি কিন্তু ‘সী সিকনেসে’ কাতর হয়ে ভয় পেয়ো না। এ ব্যামোতে কেউ কখনো মারা যায় নি।’

পার্সি 'চি'-'চি' করে বললে, 'শেষ ভরসাটাও কেড়ে নিলেন, স্যার ? আমি তো ভরসা করেছিলাম, আর বেশীক্ষণ ভুগতে হবে না, মরে গিয়ে নিষ্কৃতি পাবো।'

পল বললে, 'আগাছা সহজে মরে না।'

আমি বললাম, 'থাক, থাক। চলো, পল, উপরে যাই। আমরা তিনজনা মিলে 'সী সিক্‌নেস্কে' বড় বেশী লাই দিচ্ছি।'

পল বেরুতে বেরুতে বললে, 'হক কথা। পার্সির সঙ্গে একা পড়লে যে-কোনো ব্যামো বাপ-বাপ করে পালাবার পথ পাবে না।'

উপরে এসে দেখি, আব্দুল আসফিয়া কোথা থেকে এক জোরদার দুরবীন যোগাড় করে কি যেন দেখবার চেষ্টা করছেন। এ সব জাহাজ কখনো পাড়ের গা ঘেঁষে চলে না। তাই জোরালো দুরবীন দিয়েও বিশেষ কিছু দেখা যায় না। পল আমাকে শূধালে, 'কি দেখছেন উনি?'

আমি বললাম, 'আব্দুল আসফিয়া মুসলমান এবং মনে হচ্ছে ধর্মের তাঁর অনুরাগও আছে। লাল দরিয়ার এক পারে সোমালি-ভূমি, হাবসী মুন্স্লুক এবং মিশর, অন্য পারে আরব দেশ। মহাপুরুষ মুহম্মদ আরব দেশে জন্মেছিলেন, ঐ দেশে ইসলাম প্রচার করেন। মক্কা-মদীনা সবই তো ঐখানে।'

পল বললে, 'ইংরাজীতে যখনই কোনো জিনিসের কেন্দ্রভূমির উল্লেখ করতে হয় তখন বলা হয়, যেমন ধরুন সঙ্গীতের বেলায়, 'ভিয়েনা ইজ দি মেক্কা অব মিউজিক'—এ তো আপনি নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু বিশেষ করে মক্কা বলা হয় কেন? মক্কা তো আর তেমন কিছু বড় শহর নয়।'

আমি বললাম, 'পৃথিবীতে গোটা তিনেক বিশ্বধর্ম আছে অর্থাৎ এ ধর্ম-গুলো যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছে সেখানেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে নি—দুর-দুরান্তরে ছাড়িয়ে পড়েছে। যেমন মনে করো বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম এবং ইসলাম। কিন্তু পৃথিবীর বহু বৌদ্ধ কিংবা খ্রীষ্টান কোনো বিশেষ পুণ্যদিবসে এক বিশেষজায়গায় একত্র হয় না—মুসলমানরা যে রকম হাজার দিনে মক্কায় একত্র হয়। কোথায় মরক্কো, কোথায় সাইবোরিয়া আর কোথায় তোমার চীন—পৃথিবীর যে সব দেশে মুসলমান আছে সে সব দেশের লোককে সেদিন তুমি মক্কায় পাবে। শুনোছি, সেদিন নাকি মক্কার রাস্তায় দুনিয়ার প্রায় সব ভাষাই শুনতে পাওয়া যায়।'

'তাতে করে লাভ?'

আমি বললাম, 'লাভ মক্কাবাসীদের নিশ্চয়ই হয়। তীর্থযাত্রীরা যে পরস্পর খরচ করে তার সবই তো ওরা পায়। কিন্তু আসলে সে উদ্দেশ্য নিয়ে এ-প্রথা সৃষ্টি হয় নি। মুহম্মদ সাহেবের ইচ্ছা ছিল যে পৃথিবীর সব দেশের মুসলমানকে যদি একত্র করা যায় তবে তাদের ভিতর ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্ব বাড়বে। আমরা যখন বাড়িতে উপাসনা না করে গির্জায় কিংবা মসজিদে যাই তখন তারও তো অন্যতম উদ্দেশ্য আপন ধর্মের লোকের সঙ্গে এক হওয়া। মুহম্মদ সাহেব বোধ হয় এই জিনিসটাই বড় করে, সমস্ত পৃথিবী নিয়ে করতে চেয়েছিলেন।'

পল অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললে, ‘আমরা তো বড়দিনের পরবে প্রভু যীশুর জন্মস্থল বেথলেহেমে জড়ো হই নে। হলে কি ভালো হত না? তা হলে তো খ্রীষ্টানদের ভিতরও ঐক্য সখ্য বাড়ত।’

আমি আরো বেশী ভেবে বললাম, ‘তা হলে বোধ হয় রোমে পোপের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হত।’

কিন্তু থাক এসব কথা। আমার কোনো ক্যাথলিক পাঠক কিংবা পাঠিকা যেন মনে না করেন যে আমি পোপকে শ্রদ্ধা করি নে। পৃথিবীর শত শত লক্ষ লক্ষ লোক যাকে সম্মানের চোখে দেখে তাকে অশ্রদ্ধা করলে সঙ্গে সঙ্গে সেই শত শত লক্ষ লক্ষ লোককে অশ্রদ্ধা করা হয়। অতটা বেয়াদব আমি নই। বিশেষত আমি ভারতীয়। ছেলেবেলা থেকে শুন্যে আসছি, সব ধর্মকে শ্রদ্ধা জানাতে হয়।

॥ ৯ ॥

ঝড় থেমেছে। সমুদ্র শান্ত। ঝড়ের পর বাতাস বয় না বলে অসহ্য গরম আর গুমোট। এ যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাই কি প্রকারে?

নিষ্কৃতির জন্য মানুষ ডাঙায় যা করে, জলে অর্থাৎ জাহাজেও তা-ই। এক দল লোক বৃষ্টিমান। কাজে কিংবা অকাজে এমনি ডুব মারে যে, গরমের অত্যাচার সম্বন্ধে অনেকখানি অচেতন হয়ে যায়। বোকার দল শুধু ছটফট করে। ক্ষণে এটা করে, ক্ষণে ওটা নাড়ে, ক্ষণে ঘূমাবার চেষ্টা করে, ক্ষণে জেগে থাকতে গিয়ে আরো বেশী কষ্ট পায়।

জাহাজেও তাই। একদল লোক দিবা-রাত্রির তাস খেলে। সকাল বেলাকার আশু-রদ্দিট খেয়ে সেই যে তারা তাসের সায়রে ডুব দেয়, তারপর রাত বারোটো-একটো-দুটো অবধি তাদের টিকি টেনেও সে সায়র থেকে তোলা যায় না। লাগু সাপার খেতে যা দু-একবার তাস ছাড়তে হয়, ব্যাস—ঐ। তখন হয় বলে ‘কী গরম’, নয় ঐ তাসের জেরই খানার টেবিলে টানে। চার ইস্কাপন না ডেকে তিন বে-তরুণ বললে ভালো হত, পুনরপি ডবল না বলে সে কি আহাম্মুকই না করেছে!

জাহাজের বে-সরকারী ইতিহাস বলে, একটানা ছত্রিশ ঘণ্টা তাস খেলেছে এমন ঘটনাও নাকি বিরল নয়। এরা গরমে কাতর হয় না, শীতেও বেকাবু হয় না। ভগবান এদের প্রতি সদয়।

দাবাখেলার চর্চা পৃথিবীতে ক্রমেই কমে আসছে। আসলে কিন্তু দাবাড়েরাই এ ব্যাপারে দুনিয়ার আর সবাইকেই মাত করতে পারে। দাবাখেলায় যে মানুষ কি রকম বাহ্যজ্ঞানশূন্য হতে পারে, সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ‘পরশুরাম’ লিখেছেন, এক দাবাড়েকে যখন চাকর এসে বললে, ‘চা দেব কি করে?—দুধ ছিঁড়ে গেছে’ তখন দাবাড়ু খেলার নেশায় বললে, ‘কি জ্বালা,

সেলাই করে নে না ।’

আরেক দল শুধু বই পড়ে। তবে বেশীর ভাগই দেখাছি, ডিটেকটিভ উপন্যাস। ভালো বই দিবা-রাত্র পড়ছে এরকম ঘটনা খুব কমই দেখেছি।

আরেক দল মারে আড্ডা। সঙ্গে সঙ্গে গুনগুন করে—আড্ডার যেটা প্রধান ‘মেন্দু’—পরনিশ্চয়, পরচর্চা। সেগুলো বলতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু পাছে কোনো পাঠক ফস করে শুধায়, ‘এগুলো আপনি জানলেন কি করে, যদি নিজে পরনিশ্চয় না করে থাকেন?’ তাই আর বললাম না।

আরো নানা গুচ্ছ নানা সম্প্রদায় আছে, কিন্তু আব্দুল আসফিয়া কোনো গোত্রেই পড়েন না। তিনি আড্ডাবাজদের সঙ্গে বসেন না বটে, কিন্তু আড্ডা মারেন না—খেলা-নৌকার মাঝি যে রকম নদী পেরয়, কিন্তু ওপারে নাবে না। একথা পূর্বেই বলেছি, কিন্তু আজ হঠাৎ তাকে দেখি অন্যরূপে। খুলে কই।

পার্সি সেরে উঠে আবার জাহাজময় লম্ফ-বাম্প লাগিয়েছে। যেখানেই যাই সেখানেই পার্সি। মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে, তবে কি পার্সির জন আশেটক যমজ ভাই আছে নাকি? একই লোক সাত জায়গায় একসঙ্গে থাকবে কি করে?

সে-ই খবরটা আনলে।

কি খবর?

জাহাজ স্লুয়েজ বন্দরে পেঁছানোর পর ঢুকবে স্লুয়েজ খালে। খালটি একশ মাইল লম্বা। দু পাড়ে মরুভূমির বালু বলে জাহাজকে এগাতে হয় ঘণ্টায় পাঁচ মাইল বেগে। তাহলে লাগল প্রায় কুড়ি-বাইশ ঘণ্টা। খালের এ-মুখে স্লুয়েজ বন্দর, ও-মুখে সঙ্গীদ বন্দর। আমরা যদি স্লুয়েজ বন্দরে নেমে ট্রেন ধরে কাইরো চলে যাই এবং পিরামিড দেখে সেখান থেকে ট্রেন ধরে সঙ্গীদ বন্দর পেঁছাই, তবে আপনাদের আপন জাহাজই আবার ধরতে পারব। যদিও আমরা মোটামুটি একটা ত্রিভুজের দুই বাহু পরিভ্রমণ করব—আর স্লুয়েজ খাল মাত্র এক বাহু—তবু রেলগাড়ি তাড়াতাড়ি যাবে বলে আমরা কাইরোতে এটা ওটা দেখবার জন্য ঘণ্টা দশেক সময় পাব।

কিন্তু যদি স্লুয়েজ বন্দরে নেমে সময়মত ট্রেন না পাই, কিংবা যদি কাইরো থেকে সময়মত সঙ্গীদ বন্দরের ট্রেন না পাই আর সেখানে জাহাজ না ধরতে পারি, তখন কি হবে উপায়?

পার্সি অসহিষ্ণু হয়ে বললে, ‘সে তো কুক কোম্পানির জিম্মাদারি। তারাই তো এ ট্রেন—না এক্সকোর্শন, কি বলব?—বন্দোবস্ত করেছে। প্রতি জাহাজের জন্যই করে। বিস্তর লোক যায়। চলুন না, নোটিশ বোর্ডে দেখিয়ে দিচ্ছি—কুকের বিজ্ঞাপন।’

ত্রিমূর্তি সেখানে গিয়ে সার্ভিস মনোযোগ সহকারে প্রস্তাবটি অধ্যয়ন করলুম।

কিন্তু প্রস্তাবটির শেষ ছত্র পড়ে আমাদের আঁকল গুড়ুম নয়, দড়াম করে ফেটে গেল। এই এক্সকোর্শন—বন-ভোজ কিংবা শহর-ভোজ, যাই বলো, যাচ্ছি তো কাইরো ‘শহরে’—যাঁরা করতে চান তাঁদের প্রত্যেককে দিতে হবে সাত

পোশাড অর্থাৎ প্রায় একশ টাকা। পল বললে, ‘হরি, হরি,’ (অবশ্য ইংরাজীতে ‘গুড হেভেনস’, ‘মাই গুডনেস’ এই জাতীয় কিছু একটা) এত টাকা যদি আমার থাকবেই তবে কি আমি এই জাহাজে ফাস্ট ক্লাসে যেতুম না?’

আমি বেদনাতুর হওয়ার ভান করে বললুম, ‘কেন ভাই, আমরা কি এতই খারাপ লোক যে আমাদের এড়াবার জন্য তুমি ফাস্ট ক্লাসে যেতে চাও?’

পল তো লজ্জায় লাল হয়ে তোতলাতে আরম্ভ করলে।

আর পার্সি? সে তো হনুমানের মতো চক্ৰাকারে নৃত্য করে বলতে লাগল, ‘বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে। করো মস্করা স্যারের সঙ্গে! বোঝো ঠালা!’

আমি বললুম, ‘বাস, বাস।’ হয়েছে। হয়েছে। কিন্তু পার্সি, একশ টাকা তো চাটুখানি কথা নয়। আমাকেই তো টাল-মাটাল হয়ে টাকাটা টানতে হবে।’

পার্সিকে দমানো শক্ত। বললে, ‘অপরাধ নেবেন না, স্যার, কিন্তু আমি-ই বা কোন হেনরি ফোর্ড? কিংবা মিডাস্ রোটশিললট? কিন্তু আমি মনস্কুর করেছি, আমার জেবের শেষ পেনি দিয়ে আমি পিরামিড দেখবই দেখব। চীনা দেওয়াল দেখার পর পিরামিড দেখব না আমি? মদুখ দেখাব তা হলে কি করে? তার চেয়েও খারাপ, আয়নাতে নিজেরই মদুখ দেখব কি করে?’

অনেক আলোচনা, বিস্তার গবেষণা করা হল। শেষটায় স্থির হল, পিরামিড-দর্শন আমাদের কপালে নেই। গালে হাত দিয়ে যখন ত্রিমূর্তি আপন মনে সেই শোক ভোলাবার চেষ্টা করছি এমন সময় আব্দুল আসফিয়া মদুখ খুললেন।

তার সনাতন অভ্যাস অনুযায়ী তিনি আমাদের আলোচনা শুনে যাচ্ছিলেন। ভালো মন্দ কিছুই বলেন নি। আমরা যখন স্থির করলুম, আমরা দ্বিগুণা নেব না তখন তিনি বললেন, ‘এর চেয়ে সস্তাতেও হয়।’

আমরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে শুধালুম, ‘কি করে? কি করে?’

বললেন, ‘সে কথা পরে হবে।’

তার পর আপন চেয়ার ছেড়ে খানা-কামরার দিকে চলে গেলেন।

॥ ১০ ॥

পল আর পার্সিকে এখন আর বড় একটা দেখতে পাই নে। ওরা আব্দুল আসফিয়ার কোটের উপর ডার্কটিকিটের মত সেঁটে বসেছে—ছিনে জেকের মতো লেগে আছে বললে কমিয়ে বলা হয়, কারণ রক্ত শোষা শেষ হলে তবু ছিনে জেক কামড় ছাড়ে—ওরা খামের উপর ডার্কটিকিটের মতো, যেখানেই আব্দুল আসফিয়া সেখানেই তারা। মদুখে এক বুলি, এক প্রশ্ন—কি করে সস্তায় কাইরো গিয়ে সেখান থেকে সস্তাতেই ফের সঙ্গ বন্দরে জাহাজ ধরা যায়? আব্দুল আসফিয়া বলেন, ‘হবে, হবে, সময় এলে সবই হবে।’

শেষটায় জাহাজ যোদিন সূয়েজ বন্দরে পৌঁছবে তার আগের দিন তিনি

রহস্যটি সমাধান করলেন। অতি সরল মীমাংসা। আমাদের মাথার খেলো নি।

আব্দুল আসফিয়া বললেন, 'কুক কোম্পানির লোক টুরিসট সায়েব-সুবোদের নিয়ে যাবে গাড়িতে ফাস্ট ক্লাসে করে—সুয়েজ থেকে কাইরো, এবং কাইরো থেকে সঈদ বন্দর। কাইরোতে যে রাগি-বাস করতে হবে তার ব্যবস্থাও হবে অতিশয় খানদানী, অতএব মাগগী হোটেলে। আমরা যাব থার্ডে, এবং উঠব একটা সস্তা হোটেলে। তা হলেই হল।'

প্রথমটায় আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সর্ষিতে ফেরা মাত্র আমার মনে আরেকটি কঠিন সমস্যার উদয় হল। যদি কোনো জায়গায় আমরা ট্রেন মিস করি কিংবা অন্য কোনো দুর্ঘটনার মুখে পড়ে যাই আর শেষটায় সঈদ বন্দরে ঠিক সময়ে পৌঁছে জাহাজ না ধরতে পারি তবে যে আমাদের চক্ষু চড়ক গাছ। বরঞ্চ চা খেতে প্ল্যাটফর্মে নেমেছি, আর গাড়ি মাল-পত্র নিয়ে চলে গেল সে সমস্যারও সমাধান আছে কিন্তু জাহাজ চলে গেলে কত দিন সঈদ বন্দরে পড়ে থাকতে হবে, তার কি খরচা, নতুন জাহাজে নতুন টিকিটের জন্য কি গচ্ছা এসব তো কিছুই জানি নে। কুকের লোক এ সব বিপদ-আপদের জন্য জিম্মেদার, কিন্তু আব্দুল আসফিয়াকে জিম্মেদার করে তো আর আমাদের চারখানা হাত গজাবে না? তাঁকে তো আর বলতে পারব না, 'মশাই, আপনার পাল্লায় পড়ে এত টাকার গচ্ছা হল—আপনি সেটা ঢালুন।'

শেষের কথাটা বাদ দিয়ে আমার সমস্যাটা নিবেদন করাতে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় মাত্র একটি বাক্য বললেন, 'নো রিস্ক, নো গেন'—সোজা বাঙলায়, 'খেলেন দই রমাকান্ত আর বিকারের বেলা গোবন্দন' সে হয় না। তুমি যদি দই খেতে চাও তবে বিকারটা হবে তোমারই। মাগদুর মাছ ধরতে হলে গর্তে হাত দিতে হবে তোমাকেই। কিছুটা ঝুঁকি নিতে রাজী না হলে কোনো প্রকারের লাভও হয় না।

আব্দুল আসফিয়ার 'নো রিস্ক, নো গেন' এই চারটি কথা—চাটখানি কথ নয়—শুনে পল দৃশ্চিন্তা-ভরা গলায় বললে, 'তাই তো!'

পার্সি মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে বললে, 'সেই তো।'

আমি বললাম, 'ঐ তো।'

পল বললে, 'কিংবা মনে করুন কাইরোতে পথ হারিয়ে ফেললাম। আব্দুল আসফিয়া কি কাইরোর ভাষা জানেন? সেখানকার লোকে কি বুলি বলে তার নামই তো জানি নে।'

পার্সি বললে, 'দেখো পল, তুমি কি জানি জানো না তার ফিরিস্তি বানাবার এই কি প্রশস্ততম সময়? তাতে আবার সময়ও তো লাগবে বিস্তর।'

আমি পার্সিকে ফাঁকা ধমক দিয়ে বললাম, 'আবার!' পলকে বললাম, 'আরবী। কিন্তু কিছু কিছু লোক নিশ্চয়ই ইংরিজী ফরাসী জানে। রাস্তা ফের খুঁজে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই।'

পল বললে, 'যাবে নিশ্চয়ই। কিন্তু ততক্ষণে হয়তো জাহাজ বন্দর ছেড়ে

চলে গিয়েছে ।’

আরো অনেক অসুবিধার কথা উঠল। তবে সোজা কথা এই দাঁড়াল, একটা দেশের ভাষার এক বর্ণ না জেনে, এতখানি কম সময় হাতে নিয়ে সে দেশে ঘোরাঘুরি করা কি সমীচীন? এতই যদি সোজা এবং সস্তা হবে তবে এতগুলো লোক কুকের ন্যাজ ধরে যাচ্ছে কেন? একা-একা কিংবা আপন-আপন দল পার্কিয়ে গেলেই তো পারত। তাই দেখা যাচ্ছে আব্দুল আসফিয়ার ‘নো রিস্ক’, ‘নো গেন’ প্রবাবে—অন্তত এক্ষেত্রে—‘রিস্ক’ ন সিকে, গেন্ মেরে-কেটে চোন্দ পয়সা। রবি ঠাকুর বলেছেন,

‘আমার মতে জগৎটাতে ভালোটাই প্রাধান্য,—

মন্দ যদি তিন-চল্লিশ, ভালোর সংখ্যা সাতান্ন ।’

যদি আমাদের রিস্ক সাতান্ন আর গেন্ তিন-চল্লিশ হত তা হলেও আমরা কানাইলালের মতো সোল্লাসে ‘ইয়াল্লা’ বলে ঝুলে পড়তুম—যাচ্ছি তো মুসলমান দেশে।

তখন স্থির হল, আব্দুল আসফিয়াকে পাকড়াও করে আরেক দফা সবিস্তর সওয়াল জবাব না করে কোনো কিছু পাকাপাকি মনস্থির করা যাবে না।

ধূয়া-ভুয়া করে করে, বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর আমরা আব্দুল আসফিয়াকে পেলুম উপরের ডেকের এক কোণে, আপন মনে গুনগুনিয়ে গান গাইছেন। আমাদের দেখে, আমাদের কিছু বলার পূর্বেই বেশ একটু চড়া গলায় বললেন, ‘আমি কোনো কথা শুনতে চাই নে। আমি কোনো উত্তর দিতে পারব না। আমি কাইরো যাব। তোমরা আসতে চাও ভালো, না আসতে চাও আরো ভালো।’

সঙ্গে সঙ্গে যেন আরো একটা শব্দ শুনতে পেলুম—শব্দটা ফার্সী, ‘বুজ-দিল’—অর্থাৎ বকরির কলিজা, অর্থাৎ ‘ভীতুরা সব’।

এই শাস্ত্রপ্রকৃতির সদাশিব লোকটির কাছ থেকে আমরা এ-আচরণ প্রত্যাশা করি নি। এ যেন সেনাপতির আদেশ, ‘আমি তা হলে একাকী শত্রু-সৈন্য আক্রমণ করব, তোমরা আসো আর নাই আসো।’ হিমমূর্তি লগ্নড়াহত সার-মেয়বৎ নিম্নপদে হয়ে স্ব-স্ব আসনে ফিরে এলুম। কারো মুখে কথা নেই। নিঃশব্দে আহালাদ করে যে যার কেবিনে শূন্যে পড়লুম।

‘সিংহের ন্যাজে মোচড় দিতে নেই’ কথাটি অতি খাঁটি, কিন্তু আব্দুল আসফিয়া সিংহ না মকরট সেটা তো এখনো কিছু বোঝা গেল না। তার আচরণ তেজীবান না লেজীবানের লক্ষণ তার তো কোনো হাদিস পাওয়া গেল না।

পরদিন নিদ্রাভঙ্গে কেবিন ছেড়ে উপরে আসতেই দেখি হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড! এক দল লোক আব্দুল আসফিয়াকে ঘিরে নানা রকমের প্রশ্ন শূন্যে ছেঁচে। কুক

কোম্পানি কাইরো দেখবার জন্য চায় একশ টাকা আর আপনি বলেন, পঞ্চাশ টাকাতাই হয়, সেটা কি প্রকারে সম্ভব? আরেক দল বলে, তারাও আসতে রাজী কিন্তু যদি স্যাং কোনো প্রকারের গড়বড়-সড়বড় হয়ে যায় আর তারা জাহাজ না ধরতে পারে তখন যে ভয়ংকর বিপদ উপস্থিত হবে তার কি সমাধান?

অর্থাৎ ইতিমধ্যে আমাদেরই মত আমাদের গরিব সহযাত্রীরা জেনে গিয়েছে সম্ভ্রান্তেও কাইরো এবং পিরামিড দেখা যায়। কাজেই এখন আর পল, পার্সি, আমি এই ত্রিমূর্তি, এবং আব্দুল আসফিয়াকে নিলে চতুর্মুখ—এখন আর তা নয়, এখন সমস্যাটা সম্ভ্রান্তনয় হয়ে গিয়েছে, জনগণমন সাড়া দিয়েছে।

আব্দুল আসফিয়া কেবল মাঝে মাঝে বলেন, ‘হো জায়গা, সব কিছু হো জায়গা।’

হিন্দুস্তানী বলছেন কেন? তিনি তো ইংরিজী জানেন। তখন লক্ষ্য করলুম, যে সব দল তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তাদের ভিতর রয়েছে ফরাসী, জার্মান, স্পেনিশ, রুশ আরো কত কি। এরা সবাই বোঝে, এমন কোনো ভাষা ইহ-সংসারে নেই। তাই তিনি নিশ্চিত মনে মাতৃভাষায় কথা বলে যাচ্ছেন। ইংরিজি বললে যা, হিন্দুস্তানী বললেও তা। ফল একই।

এমন সময় আমাদের দলের সব চেয়ে সুন্দরী মহিলা মধুর এবং দরদভরা গলায় বললেন, ‘মসিয়ো আব্দুল, যদি কোনো কারণে আমরা জাহাজ মিস্ করি তখন যে আমরা মহা বিপদে পড়ব। আপনি তো আমাদের কাউকে তার অনিচ্ছায় জোর করে নিয়ে যাচ্ছেন না যে আপনাকে তখন জিম্মাদার হতে বলব?’

ক্লোদেং শেনিয়ের যা বললেন, তার মোটামুটি অর্থ, ‘আপনি যে আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন তার জিম্মাদারী আপনার নয়, কিন্তু যদি কোনো রকমের বিপর্যয় উপস্থিত হয় তবে তার গুরুত্বটা আপনি ভালো করে বিবেচনা করে দেখলে হয় না কি?’

উপস্থিত সকলের মনোভাব মহিলাটি যেন অতি ললিত ভাষায় বুদ্ধি দিয়ে দিলেন। সবাই চিৎকার করে সায় দিলে আপন আপন ভাষায়।

ফরাসী দল—উই উই,

জার্মান দল—ইয়া ইয়া,

ইতালীয় দল—সি সি,

একটি রাশান—দা দা,

গুটি কয়েক ভারতীয়—ঠিক হৈ ঠিক হৈ,

পল পার্সি—ইয়েস ইয়েস,

আমি নিজে কিছু বলি নি,—কিন্তু সে কথা যাক।

আব্দুল আসফিয়া উত্তরে ঘাড় নিচু করে বললেন, ‘আ জিম্মেদার হুঁ।’

তাঁকে যদিও কেউ জিম্মেদার হবার শর্ত চায় নি তবু তিনি জিম্মাদার, এটা সম্পূর্ণ তাঁরই দায়িত্ব!

চাকরির সম্বন্ধে গিয়ে এক বাঙালী বড় সাহেব ইংরেজকে খুশী করার জন্য বলে-
ছিল, ‘হুজুর আপনার বাঙালোতে আসবার জন্য ভয়ের চোটে পা আর ওঠে না।
যদি এক পা এগোই তো তিন কদম পিছিয়ে যায়।’ বড় সাহেব মাত্রই যে গাধা
হয় তা নয়,—এ সাহেবের বদ্বীশ ছিল। বাবুর কথা শেষ হতে না হতেই শুধাল,
‘তা হলে এখানে পেঁঁছিলে কি করে?’ সাহেব যে বাবুর বিনয় বচন এতখানি
শব্দার্থে নেবেন বেচারী সেটা অনুমান করতে পারে নি। প্রথমটা হকচকিয়ে
গিয়েছিল বটে কিন্তু চাকরির ফিকিরে বাঙালীর কাছে কোনো কসরত কোনো
কৌশলই অজানা নেই। একটিমাত্র শব্দকনো ঢোক না গিলেই বললে, ‘হুজুর,
তাই আমি আপন বাড়ির দিকে মুখ করে চলতে আরম্ভ করলুম আর এই দেখুন
দিব্য হুজুরের বাঙালোতে পেঁঁছে গিয়েছি।’

গম্পের বাকিটা আমার মনে নেই, তবে আব্দুল আসফিয়ার কাইরো ভ্রমণ
প্রস্তাবে উমেদাররা যদি এক পা এগোন তবে তিন পা পিছিয়ে যান। পল,
পার্সি আর আমি ছাড়া কেউই পাকাপাকি কথা দেন না, আমাদের পার্টিতে
আসছেন কি না। অথচ ঘড়িঘড়ি তরো-বেতরো প্রশ্ন। গাড়ি যদি মিস্ করি,
কাইরোতে হোটেলের যদি জায়গা না মেলে, যদি রাতিবেলা হয় আর আকাশে
চাঁদ না থাকে তবে ঐপরামিড দেখব কি করে, আরো কত কি বিদঘুটে সব প্রশ্ন।
ওঁদকে আব্দুল আসফিয়া আপন কেবিনে খিল দিবে শূয়ে আছেন। প্রশ্নের
ঠেলা নামলাতে হচ্ছে আমাদেরই—আমরা যেন ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম ভারতীয়
ভাইসরয়! শেষটায় আমরাও গা-ঢাকা দিতে আরম্ভ করলুম।

সম্ভার ঝোঁকে জাহাজ সুয়েজ বন্দরে পেঁঁছিল। সুয়েজ খালের মূখে এসে
জাহাজ নোঙর ফেলতেই ডাঙা থেকে একটা স্টীম-লঞ্চ এসে জাহাজের গা ঘেঁষে
দাঁড়াল। তখন জানা গেল আব্দুল আসফিয়ার দলে সবসম্মত আমরা নজন
যাচ্ছি। তাঁকে নিয়ে দশ জন।

কুকের গাইড স্টীম-লঞ্চে করে ডাঙা থেকে জাহাজে এসেছিল। দেখলুম,
তার দলে বারো জন যাত্রী। তা হলে আমাদের দশ জন এমন মশ্ব কি!

গাইড চড়চড় করে সিঁড়ি বেয়ে লঞ্চে নামল—পিছনে পিছনে তার দলের
বারো জন নামল পাণ্ডা-গরুর ন্যাজ ধরে পাপী যে রকম ধারা বৈতরণী
পেরোয়। আমাদের আব্দুল আসফিয়াও চড়চড় করে নামলেন যেন কত যুগের
ঝান্দু গাইড!

কুকের গাইড এ রকম ব্যাপার আগে কখনো দেখে নি। তার তর্জির
জিম্মদারী উপেক্ষা করে এক পাল লোক চলেছে আপন গোষ্ঠে বঁধে—এতখানি
রিস্ক নিয়ে—এ ব্যাপার তার কাছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। আব্দুল আসফিয়ার
দিকে যে ধরনে তাকালে তাতে সে দুর্বাসা হলে তিনি নিশ্চয়ই পড়ে থাক হয়ে
যেতেন—উনিই তো তার মক্কেল মেরেছেন।

তখন ভালো করে দেখলুম আব্দুল আসফিয়ার নবীন বেশভূষা। সেই
সৈয়দ মজতবা আলী রচনাবলী (৭ম)—৪

ঝুলে-পড়া আঠারো-পকেটি কোট, মাটি-ছোঁয়া চোঙা-পানা পাতলুন তিনি বর্জন করে পরেছেন, একদম ফাস্ট ক্লাস নেভি ব্লু সুট—কোট, পাতলুন ওয়েস্ট কোট সমেত—সোনালি বেনারসি সিল্কের টাই, তদুপরি ডাইমন্ড টাই-পিন, পায়ে পেটেস্ট লেদারের মোলায়েম জুতো, তদুপরি ফর্ন রঙের স্প্যাট, মাথায় উচ্চাসের ফেলট্ হ্যাট, গরম বলে বাঁ হাতে ধরে রেখেছেন নেবু রঙের কিড্ গ্লাভস্ ডান হাতে চামড়ার একটি পোর্টফোলিয়ো ।

বিবেচনা করলুম, এই সুটে আঠারোটা পকেট নেই বলে তিনি পোর্ট-ফোলিয়োতে টিফ চক্লেট, সিগারেট্ ভর্তি করেছেন ।

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ঘন নীলাকাশ কেমন যেন সূর্যের লাল আপন নীলে মিলে বেগুনি রঙ ধরেতে আরম্ভ করলে । তারই আভাতে লাল দরিয়ার আনলি জলে ফিকে বেগুনি রঙ ধরে নিচ্ছে । ভূমধ্যাগার থেকে, একশ মাইল পেরিয়ে আসছে মন্দমধুর ঠান্ডা হাওয়া । সে হাওয়া লাল দরিয়ার এই শেষ প্রান্তে তুলেছে ছোট ছোট তরঙ্গ । তার-ই উপর দিয়ে দূলে দূলে আসছে আমাদের স্টীমলগ । তার রঙ আসলে সাদা কিন্তু এই নীল লাল বেগুনির পাল্লায় পড়ে তারো রঙ যেন বেগুনি হতে আরম্ভ করলে ।

স্টীমলগটি শব্দপুচ্ছ রাজহংসবৎ । রাজহাঁস সাঁতার কেটে যাবার সময় যে রকম শব্দ বীচিতিরঙ্গ জাগিয়ে তোলে, এ তরণীটিও তেমনি প্রপেলারের তাড়নায় জাগিয়ে তুলেছে শব্দ ফেননিভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য চক্রাবর্ত । বড় জাহাজের বিরূপ প্রপেলার যখন এ রকম আবর্ত জাগায় তখন সৌদিকে তাকাতে ভয় করে, মনে হয় ঐ দয়ে পড়লে আর রক্ষে নেই কিন্তু ক্ষুদ্র লগের ছোট ছোট দয়ের একটি সরল মাধুর্য আছে । ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকা যায় ।

সূর্য অস্ত গেল মিশর মরুভূমির পিছনে । পশ্চিম সূর্যাস্ত, সমুদ্রের সূর্যাস্ত যেমন আপন আপন বৈশিষ্ট্য ধরে ঠিক তেমনি মরুভূমির সূর্যাস্তও এক দর্শনীয় সৌন্দর্য । সোনালী বালিতে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে সেটা আকাশের বদকে হানা দেয় এবং ক্ষণে ক্ষণে সেখানকার রঙ বদলাতে থাকে । তার একটা রঙ ঠিক চেনা কোন জিনিসের রঙ সেটা বদ্বতে না বদ্বতে সে রঙ বদলে গিয়ে অন্য জিনিসের রঙ ধরে ফেলে । আমাদের কথা বাদ দাও, পাকা আর্টিস্টরা পর্যন্ত এই রঙের খেলা দেখে আপন রঙের পেলেটের দিকে তাকাতে চান না ।

সুয়েজ বন্দরে ইংরেজ সৈন্যদের একটা ঘাঁটি আছে । তাই রবি ঠাকুরের ভাষায় ‘বড় সায়েবের বিবিগল্লো নাইতে নেমেছে ।’ কেউ আবার ছোট ছোট নৌকো করে এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করছে । নৌকোগুলি হালফ্যাশনের ক্যাম্বসে তৈরী । নৌকোর পাঞ্জর ভেনেস্টা কাঠের দড়ি শলা দিয়ে বানিয়ে তার উপর ক্যাম্বস মূড়ে দেওয়া হয়েছে । এ জাতীয় নৌকো কলাপ্ সিবল্-পোর্টেবল্ অর্থাৎ নৌ-ভ্রমণের পর ভেনেস্টার পাঞ্জর আর ক্যাম্বসের চামড়া আলাদা আলাদা করে নিয়ে, ব্যাগের ভিতর প্যাক্ করে বাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় । ওজন দশ সেরের চেয়েও কম । পরিপাটি ব্যবস্থা । অবশ্য নৌকো-গল্লো খুবই ছোট । দুজন মদুখোমুখি হয়ে কায়ক্লেশে বসতে পারে ।

মাঝখানে সামান্য একটু ফাঁকা জায়গা সেখানে জল বাঁচিয়ে টুকটাকি জিনিস রাখার ব্যবস্থা আছে। একজোড়া গদগদী দেখি সেখানে একটা পোর্টেবলের উপর রেকর্ড লাগিয়েছে রু ডানয়্যাবের।

ঐ তো মানুষের স্বভাব, কিংবা বলব বজ্রাতি। যেখানে আছে সেখানে থাকতে চায় না। যে জোড়া রু ডানয়্যাব বাজাচ্ছে তাদের যদি একদুনি ডানয়্যাব নদীর উপরে ভাসিয়ে দাও তবে তারা গাইতে শুরু করবে, 'মাই হার্ট ইজ ইন্ দি হাইল্যান্ড ; মাই হার্ট ইজ নট্ হিয়ার' !

তাকে যদি তখন তুমি স্কটল্যান্ডের হাইল্যান্ডে নিয়ে যাও তবে সে গাইতে আরম্ভ করবে, 'ইম্ রোজেন-গার্টন ফন্ সিস্‌দুসী' অর্থাৎ 'সিস্‌দুসীর গোলাপ-বাগানে'—সিস্‌দুসী পংস্‌দামে, বার্লিনের কাছে। তখন যদি তুমি তাকে বার্লিন নিয়ে যাও তবে সে গাইতে আরম্ভ করবে ভারতবর্ষের গান। জার্মানির বড় কবি কি গেয়েছেন শোনো,

গঙ্গার পার—মধুর গন্ধ ত্রিভুবন আলো ভরা—
কত না বিরাট বনস্পতিরে ধরে
পূরুষ রমণী সুন্দর আর শান্ত প্রকৃতি-ধরা
নতজানু হয়ে শতদলে পূজা করে।

আম্ গাঙ্গেস্ ডুফ্‌টেট্‌স্ লয়েস্টেট্‌স্
উন্ট্ রীসেন্‌বয়মে রুয়েন,
উন্ট্ শ্যোনে স্টিলে মেনশেন
ফর্ লটসরুমেন স্লিয়েন।

এবং সেখানেও-যখন মন ওঠে না তখন গেয়ে ওঠেন স্বপ্নপূরীর গান, যে পূরী কেউ কখনো দেখে নি, যার সঙ্গে আমাদের মত সাধারণ জনের কোনই পরিচয় নেই, কবিরাই শুধু যাকে মর্ত্যলোকে নামিয়ে আনার চেষ্টা করেন—

কোথা হায় সেই আনন্দনিকেতন ?
স্বপ্নেই শুধু দেখি সে ভুবন আমি,
রবিকর এল, কেটে গেছে হায়, যামী
ফেনার মতন মিলে গেল এ স্বপন।

আখ, ইয়েনেস ল্যান্ট ডের্ ভনে,
ডাস্ জে ইষ্ অফ্‌ট্ ইম্ ট্রাউম ;
ডখ্ কম্‌ট্ ডী মর্গে'ন'জনে,
ফেরক্‌স্টেট্‌স্ ভী আইটেল্‌শাউম।

আমি কিন্তু যেখানে আছি সেখানে থাকতেই ভালোবাসি। নিতান্ত বিপদে না পড়লে আমি আপন গাঁ ছেড়ে বেরতে রাজী হই নে। দেশভ্রমণ আমার দৃঢ় চোখের দৃশ্যমন। তাই যখন রবিঠাকুর আপন ভূমির গান গেয়ে ওঠেন তখন আমি উদ্বাহু হয়ে নৃত্য আরম্ভ করি। শোনো—

তোমরা বল, স্বর্গ ভালো
 সেথায় আলো
 রঙে রঙে আকাশ রাঙায়
 সারা বেলা
 ফুলের খেলা
 পারুলডাঙায় !
 হক না ভালো যত ইচ্ছে—
 কেড়ে নিচ্ছে
 কেই বা তাকে বলো, কাকী ?
 যেমন আছি
 তোমার কাছেই
 তেমনি থাকি !
 ঐ আমাদের গোলাবাড়ি
 গোরুর গাড়ি
 পড়ে আছে চাকা ভাঙা,
 গাবের ডালে
 পাতার লালে
 আকাশ রাঙা ।
 সম্মুখবেলায় গল্প বলে
 রাখো কোলে
 মিটমিটিয়ে জ্বলে বাতি ।
 চালতা-শাখে
 পেঁচা ডাকে
 বাড়ে রাত ।
 স্বর্গে যাওয়া দেব ফাঁকি
 বলছি, কাকী,
 দেখব আমরা কে কী করে ।
 চিরকালই
 রইব খালি ।
 তোমার ঘরে ।

এ ছেলে তার কাকীমার কোলে বসে গলা জড়িয়ে যা বলেছে সে-ই আমার
 প্রাণের গান, তাতে আমার সর্ব দেহ-মন সাড়া দেয় । বিস্তর দেশভ্রমণের পর
 আমি তাই এই ধরনের একটি কবিতা লিখেছিলাম । কত না ঝুলোঝুলি, তারো
 বেশী ধম্পে দেবার পর যখন কোনো সম্পাদক সেটা ছাপতে রাজী হন নি—
 ‘বসুমতী’র সম্পাদকও তাঁদেরই একজন—তখন তোমাদের ঘাড়ে আজ আর সেটা
 চাপাই কোন অধর্ম বৃদ্ধিতে ?

ধর্ম করে ধাক্কা লাগতে সর্বাধিক ফিরে এলাম । লগ্ন পড়ে লেগেছে । কিন্তু

এরকম ধাক্কা লাগায় কেন ? আমাদের গোয়ালন্দ চাঁদপুরে তো এরকম বেয়াধবী ধাক্কা দিয়ে জাহাজ পাড়ে ভিড়ে না !

আবার !

‘সেই পূর্ণিমা-সন্ধ্যায়,
দেশ পানে মন ধায় ।’

॥ ১৩ ॥

সুয়েজ বন্দর কিছু ফেলনা বন্দর নয় । বন্দরটার ‘সামরিক’ গুরুত্ব—স্ট্রাটেজিক ইম্পোর্টেন্স—আছে বলে ইংরাজকে তার নৌবহরের একটা অংশ এখানে রাখতে হয় । যে সব গোরাবাদের ক্যাম্বিসের নৌকোয় করে জলকেলি করতে দেখেছিলুম তারাই এই সব নৌবহরের তদারকি করে । ফলে তাদের জন্য এখানে দিবা একটা কলোনি গড়ে উঠেছে ।

কিন্তু কিছুই নয়, কিছুই নয়, পূর্বের তুলনায় আজ সুয়েজ বন্দরের কি আর জমক জোলুস ! কেপ অব গুড হোপের পথ না বেরনো পর্যন্ত, এমন কি তার পরও ভারতবর্ষ, বর্মী, মালয়, যবদ্বীপ, চীন থেকে যে-সব জিনিস রপ্তানি হত তার অধিকাংশই সমুদ্রপথে এসে নামত সুয়েজ বন্দরে—এবং ভুললে চলবে না, তখনকার দিনে প্রাচ্যই রপ্তানি করত বেশী । এখান থেকেই ফিনিশিয়ানরা, তার পরে গ্রীক, তার পর রোমান, তারপর আরবরা ভারতের দিকে রওয়ানা হত । ভারত থেকে মাল এনে সুয়েজে নামানো হত । সুয়েজ থেকে একটা খালে করে এসব মাল যেত কাইরোতে এবং সেখান থেকে নীল নদ বয়ে সে মাল পৌঁছত আলেকজেন্দ্রিয়ার—আরবীতে যাকে বলে ইস্কন্দরিয়া । সেখান থেকে ভেনিসের মাধ্যমে তাবৎ ইয়োরোপ ।

এই সব মাল কেনা-কাটা আমদানি রপ্তানিতে ভারতবর্ষের প্রচুর সদাগর-শ্রেষ্ঠী, মাঝি-মাল্লার বিরাট অংশ ছিল । যে যুগে ভাস্কে-দা-গামা এ পথকে নাকচ করে দেবার জন্য আফ্রিকা ঘুরে ভারতে আসার পথ বের করলেন সে যুগে পূর্বপ্রাচ্যের তাবৎ ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল ভারতীয় এবং সুয়েজ অঞ্চলের মিশরীয়দের হাতে ।

এক দিকে ভারতীয় এবং মিশরীয় ; অন্য দিকে ভাস্কে-দা-গামার বংশধর পর্তুগীজ দল ।

জাত ভুলে কথা কইতে নেই, তাই ইশারা-ইঙ্গিতে কই । এই যে পর্তুগীজ গুন্ডারা গোয়া নিয়ে আজ ঝাড়াঝাবড়ি করছে এ-কিছু নতুন নয় । ওদের স্বভাব ঐ । এক কালে তারা জলের বোম্বেটে ছিল, এখন তারা ডাঙার গুন্ডা । ‘বোম্বেটে’ শব্দের মূল আর অর্থ অনুসন্ধান করলেই কথাটা সপ্রমাণ হবে । ‘বোম্বেটে’ কিছু বাঙালীদের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে বানানো আজগুবি কথা নয় । ‘বোম্বেটে’ শব্দ এসেছে ঐ পর্তুগীজদের ভাষা থেকেই—bombardeiro, অর্থাৎ যারা না-বলে না-কয়ে যন্ত্র-তন্ত্র bomba—বোমা ফেলে । হয়তো বলবে, আমাদের

কলকাতাতেই কেউ কেউ এরকম বোমা ফেলে থাকে,—কিন্তু তাদের সংখ্যা এতই নগণ্য এবং ঘৃণ্য যে আজ তাবৎ কলকাতাবাসীকে কেউ বোম্বেটে নাম দেয় নি। কিন্তু তাবৎ পতু'গীজরাই এই অপকর্ম করত বলে তাদের নাম হয়ে গেল 'বোম্বেটে'।

ওদের দ্বিতীয় নাম—আমাদের বাঙলা ভাষাতেই—‘হারমদ’। সেটাও পতু'গীজ কথা ‘armada’ থেকে এসেছে। বিখ্যাত কোষকার স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস তাঁর সুবিখ্যাত অভিধানে এ শব্দের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন, ‘পতু'গীজ জলদস্যুরা যখন বাঙলা দেশের সন্মুখবন অঞ্চলে প্রথম হানা দেয় তখন তাদের অসহ্য অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাঙালীরা সন্মুখবন অঞ্চল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। আমাদের ঘরোয়া কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে আছে,—

‘ফিরিঙ্গির দেশখান বাহে কণ্‌ধারে।

রাগ্রিতে বহিষা যায় হারমদের ডরে ॥’

অর্থাৎ এই সব ‘হারমদ’—‘armada,’ ‘বোম্বেটে’ ‘bombardeiro’-দের ডরে তখন দক্ষিণ-বাঙলার লোক নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পারত না।

এস্থলে যদিও অবাস্তব, তবু প্রশ্ন, বাঙালীরা এত ভয় পেয়ে পালাল কেন ?

উত্তরে বলি, যে-কোনো বন্দরে, জাহাজ থেকে নেমে, এক পাল লোক সেটাকে লুট-তরাজ করতে পারে। এটা আদর্শেই কোনো কঠিন কর্ম নয়, যদি,—

এইখানেই এক বিরাট ‘যদি’—

যদি সে রাজা তার সমুদ্র-কুল রক্ষার জন্য নৌবহর মোতায়েন না করেন। জনপদ রক্ষা করার জন্য যে রকম পদলিস-সেপাই রাজাকেই রাখতে হয়, ঠিক তেমনি সমুদ্র-কুলবাসীদের হেপাজতির জন্য রাজাকেই নৌবহর রাখতে হয়।

কিন্তু হায়, তখন বাঙলা দেশ হুমায়ুন, আকবর মোগল বাদশাহের হুকুমে চলে। মোগলরা এদেশে এসেছে মধ্য এশিয়ার মরুভূমি থেকে। তারা শস্ত মাটির উপরে খাড়া পদাতিক, অশ্ববাহিনী, হস্তিশূর, উষ্ট্রবাহিনী চতুরঙ্গ সৈন্য-সামন্তের কি প্রয়োজন সে-তত্ত্ব বিলক্ষণ বোঝে, কিন্তু নৌবহর রাখার গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন। বাঙলা, উড়িষ্যা, গুজরাত থেকে তাদের কাছে অনেক করদণ আবেদন নিবেদন গেল—‘হুজুরেরা দয়া করে একটা নৌবহরের ব্যবস্থা করুন ; না হলে আমরা ধনে-প্রাণে মানে-ইজতে গেলুম।’

কথাগুলো একদম শব্দার্থে খাঁটি। ‘ধন’ গেল, কারণ, পতু'গীজ বোম্বেটে-দের অত্যাচারে ব্যবসা-বাণিজ্য আমদানী-রপ্তানি বন্ধ। ‘প্রাণ’ যায়, কারণ তারা বন্দরে বন্দরে লুট-তরাজের সময় যে-সব খুন-খারাবি করে তারই ফলে বন্দরগুলো উজাড় হতে চলল। মান-ইজত ? ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে পতু'গালের হাটবাজারে গোলাম-বদী, দাসদাসীরূপে বিক্রয় করছে।

কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা ! মোগল বাদশারা বসে আছেন পশ্চিম পানে, খাইবার-পাসের দিকে তাকিয়ে। ঐ থেকেই তাঁরা এসেছেন স্বয়ং, তাঁদের পূর্বে এসেছে পাঠান শক-হুন্-সিথিয়ান-এরিয়ান। তাই তাঁরা তৈরী করেছেন

চতুরঙ্গ। ওদের ঠেকাবার জন্য। নৌবহর চুলোয় যাক গে। ভারতবর্ষ তো কখনো সমুদ্রপথে পরাজিত এবং অধিকৃত হয় নি। তার জন্য বৃথা দৃষ্টিচ্যুতা এবং অযথা অর্থক্ষয় অতিশয় অপয়োজনীয়।

ফলে কি হল? পতু'গীজদের তাড়িয়ে দিয়ে ইংরেজ সমুদ্রপথেই মোগলদের মনুষ্য কেটে এদেশে রাজ্যবিস্তার করল।

সেকথা পরের কথা। উপস্থিত আমরা আলোচনা করছি, ভারতীয় উপকূল বাসীরা পতু'গীজদের সঙ্গে যে লড়াই দিয়েছিল তাই নিয়ে। এরা তো মোগলদের কাছ থেকে কোনো সাহায্যই পেল না, উলটে যারা লড়াইছিল, তাদের সঙ্গে আরম্ভ করলেন শত্রুতা।

গুজরাতের রাজা বাহাদুর শাহ্ বাদশাহ তখন লড়াইছিলেন পতু'গীজ বোম্বেটের সঙ্গে। তার প্রধান কারণ, গুজরাতের সুরট, রটচ (ভুগু), খম্বাত (Cambay, স্তম্ভপুরী) ভিতর দিয়ে উত্তর-ভারতের যাবতীয় পণ্যবস্তু ইউরোপ যেত। সে ব্যবসা তখন পতু'গীজ বোম্বেটেদের অত্যাচারে মর-মর। বাহাদুর শাহ্ বাদশাহর তখন দুই শত্রু। একদিকে সমুদ্রপথে পতু'গীজ, অন্যদিকে স্থলপথে রাজপুত। প্রথম রাজপুতদের হারিয়ে দিয়ে পতু'গীজদের খতম করার প্ল্যান করে তিনি পতু'গীজদের সঙ্গে করলেন—আর্মিস্টিস্—সমরকালীন সন্ধি। তারপর হানা দিলেন রাজপুতানায়।

দিল্লীতে তখন রাজত্ব করেন বাদশা হুমায়ুন। ইতিহাসে নিশ্চয়ই পড়েছে, তখন এক রাজপুতানী শাহ-ইন্-শাহ্ দিল্লীশ্বর জগদীশ্বরকে পাঠালেন রাখী। সেই রাখীর সম্মানার্থে হুমায়ুন ছুটলেন রাজপুতানার দিকে। বদ্বলেন না, বাহাদুর শাহ্ হেরে গেলে পতু'গীজদের আর ঠেকাতে পারবেন না। পূর্বেই বলিছি, নৌবহর নৌসাম্রাজ্য বলতে কি বৃষায়, মোগলরা সে কথা আদপেই বদ্বলত না।

হুমায়ুন রাজপুতানায় পৌঁছলেন দেরিতে। বাহাদুর শাহ্ বাদশাহ তখন রাজপুতানা জয় করে ফেলেছেন। রাজপুতানীরা জৌহররত্নে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। হুমায়ুন তখন আক্রমণ করলেন বাহাদুর শাহকে। বাহাদুর তখন পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন চম্পানির দুর্গে। সেখানে কি করে হুমায়ুন দুর্গ জয় করলেন, সে কাহিনী অবশ্য ইতিহাসে পড়েছে। ইতিমধ্যে বাহাদুর দুর্গ ত্যাগ করে পালিয়েছেন গুজরাতে আপন রাজধানী আহমদাবাদের দিকে। হুমায়ুন সৈদিকে তাড়া লাগাতে তিনি পালালেন সৌরাষ্ট্র অর্থাৎ কঠিওয়াড়ার দিকে। সেখানকার কোনো কোনো উপকূলে তখন পতু'গীজরা বেশ পা জমিয়ে বসেছে।

ইতিমধ্যে হুমায়ুন খবর পেলেন, বিহারের রাজা শের শাহ দিল্লী জয় করার উদ্দেশ্যে সৈদিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তখনই তিনি বাহাদুরকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে চললেন দিল্লীর দিকে। সেখানে শের শাহের কাছে মার খেয়ে তিনি পালালেন কাবুলে। তারপর শের শাহ ব্যস্ত হয়ে রইলেন, উত্তর ভারতে আপন প্রতিষ্ঠা কায়ম করতে বাহাদুরকে তাড়া দেবার ফুরসত তাঁর নেই।

বাহাদুর হাফি ছেড়ে বেঁচে বললেন, ‘এইবারে তবে পতু’গীজ বদমায়েশদের ঠান্ডা করি। পতু’গীজরা ততদিনে বুঝতে পেরেছে, বাহাদুরের পিছনে তখন আর শত্রু নেই। তাই তারা আরম্ভ করলে তাদের পুরনো বদমায়েশি। বাহাদুর শাহকে আমন্ত্রণ জানালে, তাদের জাহাজে এসে, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধ-চুক্তি সম্বন্ধে যাবতীয় আলোচনা-পরামর্শ করার জন্য।

বাহাদুর আহাম্মদের মত কেন গেলেন, সেই নিয়ে বিস্তর ঐতিহাসিক বহু আলোচনা-গবেষণা করেছেন। সে নিয়ে আজ আর আলোচনা বরে কোনো লাভ নেই।

তা সে যাই হোক, একথা কিন্তু সত্য, বাহাদুর জাহাজে ওঠা মাত্রই বুঝতে পারলেন, তিনি ফাঁদে পা দিয়েছেন। পতু’গীজদের বদ-মতলব তাঁকে খুন করার, তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ-সুলেহ করার জন্য নয়। তক্ষণি তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে—সাঁতরে পারে ওঠার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে দশ-বিশটা পতু’গীজও হাতে বৈঠা নিয়ে তাঁর পিছনে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই সব বৈঠে দিয়ে গুজরাতের শাহ ইন্‌শাহ্ বাদশাহ্ বাহাদুর শাহের মাথা ফাটিয়ে দিলে।

পতু’গীজদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের এই শেষ লড়াই।

*

*

*

কিন্তু আজ সুয়েজ বন্দরে ঢোকার সময় আমি দেশপানে ফিরে গিয়ে এসব কথা পাড়াছি কেন?

কারণ, এই সুয়েজের রাজাকেই বাহাদুর তখন ডেকেছিলেন তাঁর নৌবাহিনী নিয়ে এসে পতু’গীজদের বিরুদ্ধে তাঁকে নৌ-সমরে সাহায্য করতে। পূর্বেই বলেছি, সুয়েজও বেশ জানত, পতু’গীজদের বোম্বেটেগিরি তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য কতখানি মারাত্মক। শুধু বাহাদুর নয়, তাঁর পূর্ব-পুরুষগণও বার বার এঁদের ডেকেছেন, দূরে দিলে পতু’গীজদের একাধিকবার ঝিঙে-পোস্ত চন্দন-বাটা করেছেন।

তারা তখন যেসব কামান এনেছিল সেগুলো ফেরত নিয়ে যায় নি। গুজরাতের বাদশা যখন বললেন, ‘এগুলো রেখে যাচ্ছেন কেন?’ তখন তারা বলেছিল, ‘এই সব পতু’গীজ বদমায়েশরা আবার কখন হানা দেবে তার ঠিক-ঠিকানা কি? আবার তখন কামান নিয়ে আসার হাসামা-হুজ্জাত ঠেলবার কি প্রয়োজন?’

এ ঘটনার দশ বৎসর পর আকবর গুজরাত জয় করেন। তিনি কামান-গুলো দেখে তাদের পূর্ববর্তী ইতিহাস জেনেও নৌ-বাহিনী নৌ-সমরের মূল্য বুঝতে পারেন নি। তাই পতু’গীজরা জিতল। তাদের হারিয়ে দিয়ে ইংরেজ জিতল। ক্রমে ক্রমে মাদ্রাজ কলকাতা হয়ে তাবৎ ভারতবর্ষে আপন রাজ্য বিস্তার করল।

*

*

*

আজ সুয়েজে ঢুকে সেই কথাই স্মরণে এল, এই সুয়েজের লোকই একদিন আমাদের সঙ্গে একজোট হয়ে পতু’গীজ বর্বরতার বিরুদ্ধে কী লড়াই-ই না দিয়েছিল!

সম্মিলিত ফিরে এলুম। দেখি, বখেড়া লেগে গিয়েছে। বন্দরে নেমে যে ধপ্পরের ভিতর দিয়ে যেতে হয় সেখানে আমাদের—অর্থাৎ আব্দুল আসফিয়ার দলকে আটকে দিয়েছেন বন্দরের কর্তারা। কেন, কি ব্যাপার? আমাদের হেল্‌থ সার্টিফিকেট কই? সে আবার কি জ্বালা? দিব্য তো বাবা লগ্ন থেকে নেমে পায়ে হেঁটে এখানে এলুম, স্টেচারে চেপে কিংবা মড়ার খাটিয়ায় শূয়ে আসে নি; তবে আমাদের হেল্‌থ সম্বন্ধে এত সন্দেহ কেন? ‘উঃ’, কর্তারা বলছেন, আমরা যে ভিতরে ভিতরে বসন্ত, প্লেগ, কলেরা, ৭৫৭৫৫ জ্বর ‘সে আবার কি মশাই?’ স্পটেড ফীভার (ভৌতিক সমস্যা; আলপনা-কাটা জ্বর?) ইত্যাদি যাবতীয় ম্যালারিক রোগে ভুগছি না তার সার্টিফিকেট কই। আমরা যে এসব প্যাপিষ্ঠ রোগ তাঁদের সোনার দেশ মিশরে ছড়াব না, তার কি জিহ্মাদারি?

শূনে পার্সি বলছে, ‘সার, এসব মারাত্মক রোগেই যদি ভুগব, তবে বাপ-মার সেবাপ্রদীপ ছেড়ে, পাদ্রীনাহেবের শেষ ধর্মবচন না শূনে এখানে আসব কেন?’

দ্যাশের লোক প্রতুল সেন বলছে, ‘মিশরের সঙ্গে এরকম ধারা দূশমনি আমরা করতে যাব কেন?’

তার বউ রমা বলছে, ‘পিরামিড তোমাদের গৌরবের বস্তু; আমাদের যে-রকম তাজমহল। তার কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ সে বিচারের সুযোগ না দিয়ে আপনারা আপন দেশের প্রতি কি অবিচার করছেন, বদ্বতে পারছেন কি?’

আমি কানে কানে রমাকে শূখালুম, ‘তবে কুকের সঙ্গে যে সব লোক এসেছিল তারা পেরুল কি করে?’

রমা বললে, ‘চূপ করুন; ওরা যে ঐ সব হলদে হলদে কাগজ দেখালে। আমাদেরও আছে। জাহাজে ফেলে এসেছি। আমরা তো জানতুম না এখানে ওসব রাবিশের দরকার হবে। কুকের লোক জানত, ওরা তাই সার্টিফিকেট এনেছিল।’

ওঃ! তখন মনে পড়ল, পাসপোর্ট নেবার সময় ভ্যাক্সিনেশন ইনকুলেশন করিয়েছিলুম বটে এবং ফলে একখানা হলদে রঙের সার্টিফিকেটও পেয়েছিলুম বটে। সেইটে নেই বলেই এখানে এ গদর্শ।

কিন্তু এ শিরঃপাড়া তো আমাদের নয়। আব্দুল আসফিয়া যখন আমাদের দলের নেতা তখন তাঁরই তাঁ বোঝা উচিত ছিল যে ঐ ম্যাটমেটে হলদে রঙের কাগজটা আমাদের সঙ্গে নিয়ে আসা অতিশয় প্রয়োজনীয়। এই সামান্য কাণ্ড-জ্ঞান যার নেই—

চিন্তাধারায় বাধা পড়ল। দেখি, পল আমার হাত টানছে, আর কানে কানে বলছে, ‘চলুন, জাহাজে ফিরে যাই।’

কিন্তু আব্দুল আসফিয়া কোথায়?

তিনি দেখি নিশ্চিন্ত মনে, একে সিগারেট দিচ্ছেন, ওকে টাফ খাওয়াচ্ছেন, তাকে চকলেট গেলাচ্ছেন। কোলে আবার একটা বাচ্চা ! খোদায় মালুম কার ?

লোকটা তাহলে বন্দ পাগল ! পাগলের সংস্পর্শ ত্যাগ করাই ধর্মাদেশ।

পলের হাত ধরে পোর্ট-আপিস ছেড়ে সমুদ্রের কিনারায় পৌঁছলুম। তখন দেখি আমাদের জাহাজ ভৌ-ভৌ করে ভৌ-ভৌ।

॥ ১৫ ॥

দেশভ্রমণ আমি বিস্তর করেছি। সামান্য কিছু ঘটতে না ঘটতেই আমি বিচলিত হয়ে পড়ি নে। রিক্রেশমেন্ট রুমে চা খেতে গিয়েছি, ওদিকে গাড়ি আমার বাস-তোরঙ্গ বিছানা-বালিশ নিয়ে চলে গিয়েছে, বিদেশে-বিভূইয়ে মনি-ব্যাগ চুরি যাওয়াতে আমি কপর্দকহীন, ইতালির এক রেস্টোরাঁয় দুই দলে ছোরা-ছুরি হচ্ছে—আমি নিরীহ বাঙালী এক কোণে দেয়ালের চুনকামের মতো হয়ে গিয়ে আত্মগোপন করার চেষ্টা করছি—এ সব ঘটনা আমার জীবনে একাধিকবার ঘটেছে কিন্তু এবার সুয়েজ বন্দরে, আব্দুল আসফিয়ার পাল্লায় পড়ে যে বিপদে পড়লুম তার সঙ্গে অন্য কোনো গর্দীশের তুলনা হয় না।

আমাদের জাহাজ তার আপন পথে চলে গিয়েছে। আমরা এখানে আটকা পড়েছি হেল্থ সার্টিফিকেট নেই বলে। তা হলে এখানকার কোনো হোটেলে উঠতে হয় এবং প্রতি জাহাজে ধনা দিতে হয়, আমাদের জায়গা দেবে কি না। খুব সম্ভব দেবে না। কারণ সেই পোড়ারমুখো হেল্থ সার্টিফিকেট না থাকলে জাহাজেও উঠতে দেয় না। এখানে ‘জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ’ নয়, এখানে ‘জলে সাপ, ডাঙায়ও সাপ।’

জাপানী আক্রমণের সময় একটা গাইয়া গান শুনিয়েছিলুম,

সা রে গা মা পা ধা নি

বোমা পড়ে জাপানী

বোমা-ভরা কালো সাপ

ব্রিটিশে কয় ‘বাপ রে, বাপ !’

তাই মনে হল, জাপানীরা যেন জলে ডাঙায়, উভয়ত হেল্থ সার্টিফিকেটের সাপ ফেলে গেছে।

আর ডাঙার হোটেলে থাকতে দেবেই বা কদিন ? আমাদের ট্যাকে যা কড়ি তার খবর হোটেলওয়ালা ঠিক ঠিক ঠাহর করতে পেরে নিশ্চয়ই আমাদের ‘দুন্দুর’ করে তাড়িয়ে দেবে। তখন যাব কোথায়, খাব কি ? তখন অবস্থা হবে সুয়েজ বন্দরের ধনী-গরিব সন্তালের কাছে ভিখ-মাগবার। কিন্তু কেউ কিছুর দেবে কি ? রেল-ইন্সটিশানে যখন কেউ এসে বলে, ‘মশাই, মনিব্যাগ চুরি গিয়েছে ; চার গন্ডা পয়সা দিন, বাড়ির ইন্সটিশানে যেতে পারব, তখন কি কেউ শোনায় মাত্রই পয়সা ঢালে ?

ইয়া আল্লা, এ কোথায় ফেললে, বাবা ? এ যেন অকুল সমুদ্রের মাঝখানে ধীপবাস ।

মানুষ যখন ভেবে ভেবে কোনো কিছুর কুল-কিনারা করতে পারে না তখন অন্যের উপর নির্ভর করার চেষ্টা করে । পল-পার্সিকে নিয়ে ফিরে গেলুম আব্দুল অসফিয়ার কাছে ।

তিনি দীর্ঘ ঠিক সেই মূহুর্তেই পোর্ট অফিসারকে শূধাচ্ছেন, তা হলে হেল্‌থ সাটিফিকেট কোথায় পাওয়া যায় ?

এ যেন পাগলের প্রশ্ন ! হেল্‌থ সাটিফিকেট তো পাওয়া যাও আপন দেশে ; এখানে পাব কি করে ?

তাই আপন কানকে বিশ্বাস করতে পারলুম না যখন অফিসার বললেন, 'কেন, ঐ তো পাশের দফতরে ।'

তাহলে এতক্ষণ ধরে এ-সব টানা-হ্যাঁচড়ার কি ছিল প্রয়োজন ? ভালো করে শোনার পূর্বেই আমরা সব কটা প্রাণী ছুট দিলুম সেই দফতরের দিকে । জলের সাপ, ডাঙার সাপ, সা-রে গা-মার জাপানী সাপ সব কটা তখন এক জোটে যেন আমাদের তাড়া লাগিয়েছে ।

দফতরের দরওয়াজা খোলাই ছিল । দেখি, এক বিরাট-বন্দু ভদ্রলোক ছোট্ট একখানা চেয়ার তাঁর বিশাল কলেবর গুঁজে-পুঁরে টেবিলের উপর পা দৃখানি তুলে ঘূমুচ্ছেন । আমরা অট্টরোল করে না ঢুকলে নিশ্চয়ই তাঁর নাকের ফরফরানি শুনতে পেতুম । আমাদের, 'হেল্‌থ সাটিফিকেট,' 'হেল্‌থ সাটিফিকেট,' 'প্লীজ' 'প্লীজ' এই উৎকট সমবেত সঙ্গীতে—অবশ্য ইয়োরোপীয় সঙ্গীত, যার এক সপ্তকে বাজে তোড়ী অন্য সপ্তকে পূরবী—ভদ্রলোক চেয়ার-সুখ লাফ মেরে উঠলেন ।

শতকরা নিরানন্দুই জন যাত্রী হেল্‌থ সাটিফিকেট নিয়ে বন্দরে নামে । স্তরাং এ ভদ্রলোকের শতকরা নিরানন্দুই ঘণ্টাই কাটে আধো ঘুমে, আধো জাগরণে । তাই আমরা কি বেদনায় কাতর হয়ে তাঁর কাছে এসেছি, সেটা বুঝতে তাঁর বেশ একটু সময় লাগল ।

তাঁর ভাষা আমরা বুঝি নে, তিনি আমাদের ভাষা বোঝেন না । তৎসঙ্গেও যে মারাত্মক দঃসংবাদ তিনি দিলেন তার সরল প্রাঞ্জল অর্থ, যে-প্রাক্তর আমাদের পরীক্ষা করে সাটিফিকেট দেবেন তিনি বাড়ি চলে গেছেন ।

গোটা সাতেক ভাষায় তখন যে আতঁরব উঠলো তাকে বাঙলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়,—

ঐ য-যা !

ফরাসীরা বলেছিল, 'ম' দিয়ে, ম' দিয়ে !'

জর্ম'নরা বলেছিল, 'হের গট্, হের গট্ !'

ইরাণীরা বলেছিল, 'ইয়াল্লা, ইয়া খুদা !'

আর কে কি বলেছিল, মনে নেই ।

কিন্তু স্ফটিকভাঁর অসীম করুণা, আল্লাতালার বেহুঁ মেহেরবানি, রাখে কেউ মারে কে, ধন্যবাদ ধন্যবাদ, শূনি অপিসার বলছেন, 'কিন্তু আপনারা যখন

ব'হাল তবিলতে, দিব্য ঘোরাফেরা করছেন, তখন আপনারা নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যবান। সাটি'ফিকেট আমিই দেব। এই নিন ফর্ম। ফিল্ অপ্ করুন।' বলেই এক-তাড়া বিদ্রী নোংরা বাদামী ফরম আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন। কিন্তু আমার মনে হল, আহা কী সুন্দর! যেন ইন্সকুলের প্রোগ্রেস-রিপোর্ট, আর সব কটাতে লেখা আছে আমি ক্লাসে ফাস্ট হয়েছি।

শকুনির পাল যে রকম মড়ার উপর পড়ে, আমরা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লুম সেই 'গাজী মিয়া'র বক্তাবিন' উপর। উহু, ভুল উপমা হল, বীভৎস রসের উপমা দিতে আলংকারিকরা ব্যরণ করেছেন। তাহলে বলি, ফাঁসির হুকুম নাকচ করে দেবার অধিকার পেলে মা যে রকম নাকচের ফর্মের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ওংসাহে, উৎকজনায় আমাদের সম্বাইকার মাথা তখন ঘুলিয়ে গিয়েছে। ফর্মে প্রশ্ন, 'কোন সালে তোমার জন্ম?' কিছতেই মনে পড়ছে না, ১৮০৪—না ১৭০৪? প্রশ্ন, 'কোন বন্দরে জাহাজ ধরেছ?' বেবাক ভুলে গিয়েছি, হংকং না তিব্বত! প্রশ্ন, 'যাবে কোথায়?' হায়, হায়, ঠাকের বাকি আড়াই গাছা চুল ছিঁড়ে ফেললুম, তবু কিছতেই মনে পড়ছে না, শনিগ্রহে না ধ্রুবতারা!

তা সে যাক্ গে, আমরা কি লিখেছিলুম তাই নিয়ে উৎকণ্ঠিত হওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। পরে জানলুম, সেই সহৃদয় অপিসারটি ইংরিজ পড়তে পারেন না।

ঝপাঝপ বেগনি স্ট্যাম্প মেরে তিনি আমাদের গন্ডা আড়াই সাটি'ফিকেট ঝেড়ে দিলেন। আমরা সেগুলো বসরাই গোলাপের মতো বদুকে গুঁজে খোলা-খোঁয়াড়ের গরুর মতো বন্দরের অপিস থেকে সড়সড় করে স্বাধীনতার মস্ত বাতাসে বেরিয়ে এলুম। এখন আমরা ইচ্ছে করলে কেপ্ কম্ব্রিন যেতে পারি, ইচ্ছে না করলে কোথাও যাবো না।

পল বললে, 'স্যর, কি লিখতে কি লিখেছি, কিছুটি জানি নে।'

আমি বললুম, 'কিছু পরোয়া করো না, ভাই! আশ্মা তদবৎ!'

ফরাসী রমণী হেসে বললেন, 'মিসিয়ো পল, আমাকে যদি জিজ্ঞেস করত, তুমি বকরী না মানুষ? তা হলে আমি প্রথম খানিকটে ব্যা ব্যা করে নিতুম, তার পর আপন মনে খানিকটে ফরাসী বলে নিয়ে দেখতুম কোনটা ভালো শোনাচ্ছে এবং সেই হিসেবে লিখে দিতুম বকরী না মানুষ।'

তারপর খানিকটে ভেবে নিয়ে বললেন, 'অবশ্য বকরীর সম্ভাবনাই ছিল বেশী।'

আমার বদুকে বড্ড বাজল। নিজের প্রতি এ যে অতিশয় অহেতুক অশ্রদ্ধা। বললুম, 'মাদ্‌মোয়াজেল, বরঞ্চ 'কোঁকিল' লিখলে আমি আপত্তি জানাতুম না। আপনার মধুর কণ্ঠ—'

'বাস, বাস, হয়েছে, হয়েছে; থ্যাংক্স!'

ততক্ষণে রেল-স্টেশনের কাছে এসে পৌঁছেছি। দূর থেকে দেখি, ট্রেন দাঁড়িয়ে। আমরা পা চালালুম। কিন্তু গেটের কাছে আসতে না আসতেই ট্রেন-খানা 'ধ্যাৎ, ধ্যাৎ' করে যেন আমাদের ঠাট্টা করে প্র্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে গেল।

এবং একটা লোক—চেনা-চেনা মর্নে হল—আমাদের দিকে হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে বিদায় জানালে, তার পর যেন কত না বিরহবেদনাতুর সেই ভাবে দু-হাতের উল্টো দিক দিয়ে অদৃশ্য অশ্রু মুছলে।

এ মস্করার অর্থ কি ?

শুনলুম, আজ সম্ভ্রাম্য কাইরো যাবার শেষ ট্রেন এই চলে গেল। কাল সকালের ট্রেন ধরলে কাইরো মাথায় থাকুন সঙ্গীদ বন্দরে পেঁছতে পারব না, অর্থাৎ নির্ঘাত জাহাজ মিস করব। এই শেষ ট্রেন ছিল আমাদের শেষ ভরসা।

এ দুঃসংবাদ শুনে আমি তো মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়লুম।

কিন্তু ভগবান মানুষকে নিয়ে এ রকম লীলা-খেলা করেন কেন ? সেই যদি সুয়েজ বন্দরে আটক হতে হল, সেই যদি বোট মিস করতে হল, তবে ঐ হেলথ সার্টিফিকেটের প্রথম খোঁয়াড়ে আটকা পড়লেই তো হত। সে ফাঁড়া কাটিয়ে এসে এখানে আবার কানমলা খাবার কি প্রয়োজন ছিল ?

শুনেছি, কোনো কোনো জেলার ফাঁসির আসামীকে নারিক গারদের দরজা সামান্য খুলে রেখে জেল থেকে পালাবার সুযোগ দেয়। আসামী ভাবে, জেলার বেথেয়ালে দরজা খুলে রেখে গিয়েছে। তার পর অনেক গা-ঢাকা দিয়ে, একে এাড়িয়ে, ওকে বাঁচিয়ে যখন সে জেলের সামনে মস্ত বাতাসে এসে ভাবে সে বেঁচে গেছে, ঠিক তখনই তাকে জাবড়ে ধরে দুই পাহারাওয়ালার—সঙ্গে জেলার। জেলার তাকে চুমো খেয়ে বলে, ‘ভাই, জীবন কত দুঃখে ভরা। তার থেকে তুমি নিষ্কৃতি পাবে, কাল ভোরে। আহাম্মুখের মতো সে-নিষ্কৃতি থেকে এই হয়ে নিষ্কৃতির চেষ্টা তুমি কেন করছিলে, সখা ?’

পরদিন তার ফাঁসি হয়।

আমার মনে হয়, ফাঁসির চেয়েও ঐ যে জেলের বাইরে ধরা-পড়া সেটা অনেক কঠোর, কঠিন, নির্মম।

কারণ, মৃত্যু, সে তো কিছুর কঠিন কঠোর অভিজ্ঞতা নয়। ডাক্তাররাও বলেন, রোগে মানুষ কষ্ট পায়, কিন্তু ঠিক প্রাণত্যাগ করার সময় মানুষ কোনো বেদনা অনুভব করে না।

তাই গুরুদেব বলছেন,—

“কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়
জয় অজানার জয় !”

ঠিক সেই রকমই এক মহাপুরুষ—হিটলারের নৃশংসতার বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন বলে এ’র ফাঁসি হয়—জেলে বসে কবিতা লিখেছিলেন,

ডু কান্সট্ উনস্ ডুস্ ডেস টেডেস ট্যারেন্
ট্রয়েমেন্স্ ফ্যারেন্
উনট্ মাখসট্ উনস্ আউফ আইনমাল্ ফ্রাই।

তুমি আমাদের মৃত্যুর দ্বার দিয়ে হাতে ধরে নিয়ে চল ।

--আমরা যেন স্বপ্নে চলছি--

হঠাৎ দেখি, আমরা স্বাধীন ।

এই বই ছোটদের জন্য লেখা । তারা হয়তো শূন্যে, মৃত্যুর কথা তাদের শোনাচ্ছি কেন ? আমার মনে হয়, শোনানো উচিত । সাধারণত বড়রা ছোটদের যত আহাম্মুখ মনে করেন আমি বড়ো হয়েও সে রকম ভাবি নে ।

আমার যখন বয়স তেরো, তখন আমার সব চেয়ে ছোট ভাই বছর দুয়েক বয়সে মারা যায় । ভারী সুন্দর ছেলে সে । আমার কোলে বসতে বসে ভালোবাসত । ঐ দু বছর বয়সে সে আমার সাইকেলের রডে বসে হ্যান্ডেল আঁকড়ে ধরে থাকত আর আমি বাড়ির লনে পাক লাগাতুম । মাঝে মাঝে সে খল-খল করে হেসে উঠত আর মা বারম্বার দাঁড়িয়ে খুশী হয়ে আমাদের দিকে তাকাতেন কিন্তু মাঝে মাঝে বলতেন, 'থাক, হয়েছে । এখন ওকে তুই নামিয়ে দে ।'

এক দিন সে চলে গেল ।

আমি বসে কষ্ট পেয়েছিলাম ।

তখন আমায় কেউ বুঝিয়ে বলে নি, মৃত্যু কাকে বলে ? তার অর্থ যদি আমাকে তখন কেউ বুঝিয়ে বলত তবে বেদনা লাগত হত ।

বড়রা ভাবেন, ছোটদের বেদনাবোধ কম । সম্পূর্ণ ভুল ধারণা ।

তোমরা যারা আমার বই পড়ছ, তোমাদের কেউই কি ভাইবোন হারাও নি ? সে বুঝবে ।

কবিগুরু ছোট ভাই-বোন ছিলেন না । তাই বিস্ময় মানি, তিনি কি করে লিখলেন,—

কাকা বলেন, সময় হলে

সবাই চলে

যায় কোথা সেই স্বর্গপারে ।

বল তো কাকী

সত্যি তা কি একেবারে ?

তিনি বলেন, যাবার আগে

তন্দ্রা লাগে

ঘণ্টা কখন ওঠে বাজি,

দ্বারের পাশে

তখন আসে

ঘাটের মাঝি ।

বাবা গেছেন এমনি করে

কখন ভোরে

তখন আমি বিছানাতে ।

তেমনি মাখন

গেল কখন

অনেক রাতে ।*

এই কার্কাটি সত্যই ছোট ছেলের বেদনা বুঝতেন ।

কিন্তু মূল কথা থেকে কত দূরে এসে পড়েছি । তাই মৃত্যু সম্বন্ধে শেষ কথা বলে মূল কথায় ফিরে যাই । ভগবানে আমার অবিচল বিশ্বাস । তাই আমি জানি, আমি যখন মরণের সিংহদ্বার পার হব তখন দেখব, বাবা, ঠাকুরদা, তাঁর বাবা, তাঁর বাবা আরো কত শত উদ্ভূত-পূর্বদুষ সৌম্যবদনে এগিয়ে আসছেন, আমাকে তাঁদের মাঝখানে বরণ করে নেবার জন্য । এবং জানি, জানি, নিশ্চয় জানি, তাঁদের সঙ্কলের সামনে দাঁড়িয়ে, আমার মা আমার ছোট ভাইকে হাসিমুখে কোলে নিয়ে । তার চেয়েও আশ্চর্য বোধ হয়, যখন মনের চোখে ছবি দেখি, আমার এই ছোট ভাই, একদা টলটলায়মান পায়ে আমার মায়ের দিকে এগিয়ে এসেছিল, তাঁকে আপনজনের মধ্যে নিয়ে যাবার জন্য, তাঁর কোলে ওঠার জন্য । সে তো ও-লোকে গিয়েছিল মায়ের বহু পূর্বে ।

আমি যখন সে-লোকে যাব তখন ভগবান শূদ্রাবনে, ‘তুমি কি চাও ?’ আমি তৎক্ষণাৎ বলব, ‘একখানা বাইসিকেল ।’ পাওয়া মাত্রই তাতে ভাইকে রুড়ে চাড়ে স্বর্গের লনে চক্কর লাগাব । সে খল-খল করে হাসবে । মা দেখবে, কিন্তু কক্খনো বলবে না, ‘থাক, হয়েছে । এখন ওকে তুই নামিয়ে দে ।’

*

*

*

*

অতএব সব বিপদ থেকেই নিষ্কৃতি আছে । গাড়ি গেছে তো গেছে তাতে ভয় পাবার অত কি ?

দেখি, আব্দুল আসফিয়া নেই ।

আমাদের এই অকূল সমুদ্র আর অন্তহীন মরুভূমির মাঝখানে ফেলে দিয়ে লোকটা পালাল নাকি ?

স্টেশনের বাইরে তাঁর খোঁজ করতে এসে দেখি, তিনি এক জরাজীর্ণ মোটর গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে রসালাপ আরম্ভ করেছেন । অনন্দমান করলুম তিনি ট্যাক্সি-যোগে কাইরো পেঁছবার চেষ্টাতে আছেন ।

কিন্তু ট্যাক্সিগুলারা আমাদের মজ্জমান অবস্থা বিলক্ষণ বুঝে গিয়েছে এবং যা দর হাঁকছে তা দিয়ে দখানি নতুন ট্যাক্সি কেনা যায় ।

আব্দুল আসফিয়া তাকে বহুতর ধর্মের কাহিনী শোনাবার চেষ্টা করলেন, ততোধিক ভারত-মিশরীয় মৈত্রীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন এবং সর্বশেষে তিনি মুসলমান সেও মুসলমান, সে-সত্যের দোহাই-কসম খেলেন কিন্তু ট্যাক্সিগুলটি ধর্মে মুসলমান হলেও কর্মে খাঁটি দুর্যোধন । বিনা যুদ্ধে সে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি এগোবে না ।

আব্দুল আসফিয়ার চোখে-মুখে কিন্তু কোনো উম্মার লক্ষণ নেই । ভগদ-

পদাহত তিভিক্‌দু শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তিনি তখন চললেন হেল্‌থ আপিসের দিকে ।
আমিও পিছু নিলুম ।

সেই বিরাট-বপু ভদ্রলোক, যিনি আমাদের সার্টিফিকেট দিয়ে প্রথম ফাঁড়া থেকে উদ্ধার করেছিলেন তিনি ততক্ষণে আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন । এবারে তাঁকে জাগাতে গিয়ে আব্দুল আসফিয়াকে রীতিমত বেগ পেতে হল ।

তাঁকে তখন তিনি যা বললেন, তার সরল অর্থ, তিনি ডাকাতকে ডরান না, ডাকাত বন্দুক উঁচালে তিনিও বন্দুক তুলতে জানেন, কিন্তু এরকম বন্দুকহীন ডাকাতের বিরুদ্ধে লড়বার মতো হাতিয়ার তো তাঁর নেই । অবশ্য তিনি ঘাবড়ান নি, কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা করবেনই ; তবে কি না অফিসারটি যদি একটু সাহায্য করেন তবে আমাদের উপকার হয়, তাঁরও পূণ্য হয় ।

অফিসার বললেন, ‘চলুন ।’

তিনি ট্যাক্সিওলাদের সঙ্গে দু-চারটি কথা বলেই আমাদের জানালেন কত দিতে হবে । হিসেব করে দেখা গেল, গাড়িতে ফাস্ট ক্লাসে যা লাগত, ট্যাক্সিতে তাই লাগবে । আমরা তাতেই খুশী । কাইরো তো পেঁছব, পোর্টসেইদে তো জাহাজ ধরতে পারব, তবে আর ভাবনা কি ?

আমরা হুড়ুমুড়ু করে দুখানা ট্যাক্সিতে কীটাল বোঝাই হয়ে গেলুম ।

আমি অফিসারকে ধন্যবাদ দিয়ে ওঠার সময় বললুম, ‘আপনি আমাদের জন্য এতখানি করলেন । সত্যি আপনার দয়ার শরীর ।’

তিনি ভাঙা-ভাঙা ইংরাজীতে যা বললেন, তা শুনে আমি অবাক । তার অর্থ, তাঁর শরীর আদপেই দয়ার শরীর নয় । তিনি কিছুমাত্র পরোপকার করেন নি । আমরা এক পাল ভিখিরী যদি সুয়েজ বন্দরে আটকা পড়ে যাই তবে শেষ পর্যন্ত তাঁদেরই ঘাড়ে পড়ব । আমাদের তাড়াতে পেরে তিনি বেঁচে গেছেন—ইত্যাদি ।

আমি আপত্তি জানিয়ে মোটরে বসে ভদ্রলোকের কথাগুলো ভাবতে লাগলুম ।

হঠাৎ বন্ধুতে পারলুম ব্যাপারটা কি—বহু দিন পূর্বেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে যাওয়াতে ।

রবীন্দ্রনাথের গানের ভাঙারী ছিলেন তাঁর দাদার নাতি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর । আমার এক চিত্রকর বন্ধু, বিনোদবিহারী একদিন তাঁর দরবানীটি ধার নিলে—বেচারী চোখে দেখতে পেত কম । কয়েক দিন পরে সেটা ফেরত দিতে গেলে দিন্দাবাদু জিজ্ঞেস করলেন, ‘কি রকম দেখলে ?’

‘আজ্ঞে, চমৎকার !’ বিনোদ এত দূরের জিনিস এর আগে কখনো দেখতে পায় নি ।

‘তবে ওটা তোমার কাছেই রেখে দাও । লোকে বহু জ্বালাতন করে । আজ এটা এ চায়, কাল ওটা ও চায়, পরশু ওটা সে চায় । আমি পেরে উঠি নে । তোমার কাছেই ওটা থাক ।’

বিনোদ একাধিকবার চেষ্টা করেও সে দরবানী ফেরত দিতে পারে নি ।

এই হল খানদানী লোকের পরোপকার করার পদ্ধতি । সে দেখায়, যেন সে আদর্শেই পরোপকার করে নি । নিতান্ত নিজের মঙ্গলের জন্য, আগাগোড়া সে স্বার্থ-পরের মতো কাজ করেছে ।

বদ্বল্লম, এ অফিসারটিও দিন্দুবাবুর সগোত্র । ইচ্ছে করেই ‘সগোত্র’ শব্দটি ব্যবহার করলুম ; আমার বিশ্বাস, ইহ-সংসারের যাবতীয় ভদ্রলোক একই গোত্রের — তা তাঁরা রাক্ষস হন আর চন্ডাল হন, হিন্দু হন আর মুসলমান হন, কাম্বী হন আর নর্ডিক হন ।

ততক্ষণে আমরা বন্দর ছেড়ে মরুভূমিতে ঢুকে গিয়েছিলাম । পিছনে তাকিয়ে দেখি, শহরের বিজলি বাতী ক্রমেই নিম্প্রভ হয়ে আসছে—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো স্মৃতি যে রকম আবছায়া-আবছায়া হতে থাকে ।

॥ ১৬ ॥

মরুভূমির উপর চন্দ্রালোক ! সে এক অদ্ভুত দৃশ্য ! সে দৃশ্য বাঙলাদেশের সবুজ শ্যামলিমার মাঝখানে দেখা যায় না । তবে যদি কখনো পশ্চিমের বিরাট বালুচড়ায় পূর্ণিমা-রাতে বেড়াতে যাও—রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই যেতেন এবং ‘নিশীথে’ গল্প তার পটভূমিতে লেখা—তাহলে তার খানিকটে আশ্বাদ পাবে ।

সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন ভুতুড়ে বলে মনে হয় । চোখ চলে যাচ্ছে দূর দিগন্তে, অথচ হঠাৎ যেন কাপসা আবছায়া পর্দায় ধাক্কা খেয়ে থেমে যার । মনে হয়, যেন দেখতে পাচ্ছি, তবু ঠিক ঠিক দেখতে পারছি নে, চিনতে পারছি তবু ঠিক ঠিক চিনতে পারছি নে । চতুর্দিকে ফটফটে জ্যোৎস্নার আলো যেন উপচে পড়ে ; মনে হয় এ-আলোতে অক্লেশে খবরের কাগজ পড়া যায়, অথচ এ আলোতে লাল কালোর তফাত যেন ধূচেতে চায় না । মেঘলা দিনে এর চেয়ে অনেক ক্ষীণালোকে রঙের পার্থক্য অনেক বেশী ধরা পড়ে ।

তাই,

মনে হল পাখি, মনে হল মেঘ, মনে হল কিশলয়,

ভালো করে যেই দেখিবারে যাই মনে হল কিছু নয় ।

দুই ধারে ঐকি প্রাসাদের সারি, অথবা তরুর মূল

অথবা এ শুধু আকাশ জুড়িয়া আমারই মনের ভুল ?

মাঝে মাঝে আবার হঠাৎ মোটরের দু-মাথা উঁচুতে ফুটে ওঠে, জ্বল-জ্বল দুটি ছোট সবুজ আলো ; ওগুলো কি ? ভুতের চোখ নাকি ? শুনেছি ভুতের চোখই সবুজ রঙের হয় । নাঃ ! কাছে আসতে দেখি উটের ক্যারাভান —এদেশের ভাষাতে যাকে বলে ‘কাফেলা’ (কবি নজরুল ইসলাম এ শব্দটি বাঙলায় ব্যবহার করেছেন) । উটের চোখের উপর মোটরের হেডলাইট পড়তে চোখ দুটো সবুজ হয়ে আমাদের চোখে ধরা দিয়েছে । দেশে গরু-বলদের চোখে আলো পড়ে ঠিক এই রবমই হয়, কিন্তু বলদের চোখে যে লেভেলে দেখি উটের সৈয়দ মুরজতবা আলী রচনাবলী (৭ম)—৫

চোখে তার অনেক উপরে দেখতে পেলুম বলে এতখানি ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম।

আর কেনই পাব না বল? জনমানবহীন মরুভূমির ভিতর দিয়ে চলেছি, রাগি বেলা—আবার বলছি, রাগিবেলা। মরুভূমি সম্বন্ধে কত গল্প, কত সত্য, কত মিথ্যে পড়েছি ছেলেবেলায়। তৃষ্ণায় সেখানে বেদুইন মারা যায়, মৃত্যু থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য বেদুইন তার পুত্রের চেয়ে প্রিয়তর উটের গলা কাটে, সেখান থেকে উটের জমানো জল খেয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্য, তৃষ্ণায় মতিচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে সে হঠাৎ কাপড়-চোপড় ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে সূর্যের দিকে জিত দেখিয়ে নাচে আর শব্দকণ্ঠে বীভৎস গলায় গান জোড়ে,

তুই আমার কি করতে পারিস তুই ক্যা রে?

তুই—(অশ্লীলবাক্য)—তুই ক্যা রে?

এবং তার চেয়েও বদখন্দ বেতলা ‘পদ্য’।

যদি মোটর ভেঙে যায়? যদি কাল সম্বধি অবধি এ রাস্তা দিয়ে আর কোনো মোটর না আসে? পণ্ট দেখতে পেলুম এ গাড়ি রওনা হওয়ার পূর্বে পাঁচশ গ্যালন জল সঙ্গে তুলে নেয় নি; তখন কি হবে উপায়?

কিন্তু করুণাময়কে অসীম ধন্যবাদ, পল-পার্সি দেখলুম অন্য ধরনের ছেলে। তারা সেই জরাজীর্ণ মোটর গাড়ির কটকটাই মরকট বিকট ভট কোটি কোটিন্‌হ ধাবাই (তুলসীদাস তাঁর রামায়ণে বানরদের কলরোলের বর্ণনা দিতে গিয়ে ‘ট’-এর অনুপ্রাস ব্যবহার করেছেন) শব্দ ছাপিয়ে বিকটতর কটকট করছে। তাদের কী আনন্দ!

পল : ‘সব-কিছু ভালো করে দেখে নে; মাকে যাবতীয় জিনিস যেন গুঁছিয়ে লিখতে পারি।’

পার্সি : ‘তোমার জীবনে এই তুই প্রথম একটা খাঁট কথা কইলি। কোনো জিনিস যেন বাদ না পড়ে। ওঃ, মরুভূমির ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। জাহাজে চড়ার সময় কি কম্পনা করতে পেরেছিলুম, জাহাজে চড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফোঁকটে মরুভূমির ভিতর দিয়ে চড়ে যাব?’

পল : ‘ঠিক বলেছি। আর মা-বাবা কী রকম আশ্চর্য হবেন, ভাব দিকনি! কিন্তু, ভাই, ওনারা যদি তখন ধমক দেন, জাহাজ ছেড়ে তোমরা এ রকম বাউন্ডলিপনা করতে গিয়েছিলে কেন? তখন?’

পার্সি বললে : ‘ঐ তেঁ তোমার দোষ! সমস্তক্ষণ ভয়ে মরিস। তখন কি আর একটা সদৃশের খুঁজে পাব না? ঐ স্যার রয়েছেন। ওঁকে জিজ্ঞাসা কর না। উনি কি বলেন।’

আমি বললুম : ‘দোষ দেবেন, তো তখন দেবেন। এখন সে আলোচনা করতে গিয়ে দেখবার জিনিস অবহেলা করবে নাকি? বিশেষত, যদি আমাদের অভিযান অন্যায্য কর্মই হয়ে থাকে, সেটাকে যখন রদ করার শক্তি আমাদের হাতে নেই।’

পার্সি বললে : ‘আর ফিরে গিয়েই বা কি লাভ? আমাদের জাহাজ তো অনেকক্ষণ হল ছেড়ে দিয়েছে।’

চালাক ছেলে সব দিকে খেয়াল রাখে ।

মরুভূমিতে দিনের বেলা যে রকম প্রচণ্ড গরম, রাত্রেও ঠিক তেমনি বিকট শীত । বৈজ্ঞানিকেরা তার একটা অত্যুৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা দেন বটে, কিন্তু ধোপে সেটা কতখানি টেকে আমি যাচাই না করে বলতে পারব না । উপস্থিত শব্দ এইটুকু বলতে পারি, জাহাজে দিনের পর দিন রাতের পর রাত দুঃসহ গরমে হাড়মাস যেন আচার হয়ে গিয়েছিল ; ঠান্ডা বাতাসের পরশ পেয়ে সর্বাজ যেন জলে-ভেজা জুই ফুলের মত ফুলে উঠল ।

এ ধরনের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে একাধিকবার হয়েছে । পেশাওয়ার, জালালাবাদের ১২০।১২২ ডিগ্রী সওয়ার পর আমি থাক-ই জম্বারের ৬০ ডিগ্রীতে পেঁছতে কী আরাম অনুভব করেছিলুম সে বর্ণনা অন্যত্র করেছি । কোথায় ? উহু, সেটি হচ্ছে না । বললেই বলবে, আমি সুযোগ পেয়ে আমার অন্য বইয়ের বিজ্ঞাপন এখানে নিখরচায় চালিয়ে দিচ্ছি ।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম মনে নেই । যখন মোটরের হঠাৎ একটুখানি জোর ঝাঁকুনিতে ঘুম ভাঙল তখন দেখি চোখের সামনে সারি সারি আলো । কাইরো পেঁছে গিয়েছি । গাড়ির আর সবাই তখনো ঘুমোচ্ছে । আমার সন্দেহ হল জ্বাইভারও বোধ করি ঘুমোচ্ছে । গাড়ি আপন মনে বাড়ির দিকে চলেছে ; সোয়ার ঘুমিয়ে পড়লেও ঘোড়া যে রকম আপন বাড়ি খুঁজে নেয় ।

পার্সিকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিয়ে বললুম : ‘তবে না, বৎস, বলোছিলে, মরুভূমির সব টুকটাকি পৰ্ব্বস্ত মনের নোট বুক টুকে নেবে ?’ যেন আমি নিজে কতই না জেগে ছিলুম ।

পার্সিও তালেবর ছেলে । তখনই দিলে পলের কানে ধরে একখানা আড়াই-গজী টান । আমি পার্সিকে যা বলেছিলুম সে পলকে তাই শুনিয়ে দিলে । পল বেচারী আর কি করে ? সে আস্তে আস্তে মাদমোয়াজেল শোনিয়েকে জাগিয়ে দিয়ে বললে, ‘কাইরো পেঁছে গিয়েছি ।’

বাঙলা দেশে কথায় কয়—পশ্চিম বাঙলায় বলে কি না জানি নে—‘সায়ের বিবিকে মারলেন চড়, বিবি বাঁদীকে দিলেন ট্যাঙ্গা, বাঁদী বেরালকে মারলে লাথি, বেরাল খামছে দিলে নুনের ছালাটাকে ।’

সংসারে এই রীতি ।

এখানে অবশ্য প্রবাদ টায়টায় মিলল না । তাই পল অতি সবিদ্যে মেম-সাহেবকে জাগিয়ে দিলে ।

মাদমোয়াজেল হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে পাউডার বের করে নাকে ঘষতে ঘষতে ফরাসীতে শূধালেন,—আমার বিশ্বাস ফরাসিনীরা ঘুমন্ত অবস্থায়ও চোঁটে লিপস্টিক লাগাতে পারেন এবং লাগান—‘আমরা কোথায় পেঁছলুম, মিসরো ?’

‘ল্য ক্যার ।’

পল বেশ খানিকটে ফরাসী জানত । আমাকে শূধালে : ‘ল্য ক্যার’ অর্থ ‘দি কাইরো’ । ‘ল্যাটা আবার পুংলিঙ্গ । একটা শহরের আবার পুংলিঙ্গ

শ্রীলিঙ্গ কি করে হয় ?’

আমি বললাম : ‘অত বিদ্যে আমার নেই, বাপু ! তবে এইটুকু জানি এ-বাবদে ফরাসীই একমাত্র আসামী নয় । আমরা ব্রহ্মপুত্রকে বলি নদ, অর্থাৎ পংলিঙ্গ এবং গঙ্গাকে বলি নদী, অর্থাৎ শ্রীলিঙ্গ । কেন বলি জানি নে ।’

পার্সি বললে : ‘আমরা ‘রেজরাই বা জাহাজকে ‘শী’ অর্থাৎ শ্রীলিঙ্গ দিয়েছি কেন ?’

আমি বললাম : ‘উপস্থিত এ আলোচনা অক্সফোর্ডের জন্য মূলতুর্বাঁ রেখে দাও—সেখানেই তো পড়তে যাচ্ছে—এবং নিশির কাইরোর সৌন্দর্য্যটি উপভোগ করে নাও ।’

সত্যি, এরকম সৌন্দর্য্য সচরাচর চোখে পড়ে না । আমরা যখন চন্দননগর থেকে কলকাতা পেঁছাই তখন মাঝখানে ঘন বসতি আর বিস্তর জোরালা বাতি থাকে বলে কলকাতার রোশনাই ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারি নে । এখানে মর্তুর্ভূমি পেরিয়ে হঠাৎ শহর বলে একসঙ্গে সব কটা আলো চোখে পড়ে এক অদ্ভুত মরীচিকার সৃষ্টি করে ।

ছ-তলা বাড়ির উপরে—অবশ্য বাড়িটা দেখা যাচ্ছে না—দেখি, লাল আলোতে জ্বালানো শেলাইয়ের কলের ছুঁচ ঘন ঘন উঠছে নামছে, আর সবুজ আলোর চাক্ষা ঘুরেই যাচ্ছে ঘুরেই যাচ্ছে । নিচে এক বিলিতি কোম্পানির নাম । আমার মনে হল, হায় ! কলটার নাম যদি ‘উষা’ হত । সেদিন আগবে যেদিন ভারতীয়—যাক গে ।

আরো কত রকমের প্রজ্বলিত বিজ্ঞাপন । এ বিষয়ে কলকাতা কাইরোর বহু পিছনে ।

করে করে শহরতলীতে ঢুকলাম । কলকাতার শহরতলী রাত এগারোটায় অঘোরে ঘুমোয় । কাইরোর সব চোখ খোলা—অর্থাৎ খোলা জানালা দিয়ে সারি সারি আলো দেখা যাচ্ছে । আর রাস্তার কথা বাদ দাও । এই শহরতলীতেই কত না রেস্টোরাঁ, কত না ‘কাফে’ খোলা ; খন্দেদে খন্দেদে গিসগিস করছে । (আমাদের যে রকম চায়ের দোকান, মিশরীদের তেমনি ‘কাফে’ অর্থাৎ কফির দোকান । আমি প্রায়ই ভাবি কফির দোকান যদি ‘কাফে’ হতে পারে তবে চায়ের দোকান ‘চাফে’ হয় না কেন ? ‘চলো, ভাই, চাফেতে যাই’ বলতে কি দোষ ?)

আবার বলছি রাত তখন এগারোটো । আমি বিস্তর বড় বড় শহর দেখছি, কাইরোর মতো নিশাচর শহর কোথাও চোখে পড়ে নি ।

কাইরোর রাস্তার খুশবাইয়ে রাস্তা ম ম করছে । মাঝে মাঝে নাকে এসে এমন ধাক্কা লাগায় যে মনে হয় নেমে পড়ে এখানেই চাটি খেয়ে যাই । অবশ্য রেস্টোরাঁগুলো আমাদের পাড়ার চায়ের দোকানেরই মতো নোংরা । তাতে কি যান্ন-সাসে ? কে যেন বলেছে, ‘নোংরা রেস্টোরাঁতেই রান্না হয় ভালো ; কালো গাই কি সাদা দুধ দেয় না ?’

আমার খেতে কোনো আপত্তি নেই । কিন্তু ঐসব সায়েব-মেমরা যখন

রয়েছেন। তাঁরা ‘ম’ দিয়ে, ‘হ্যার গট’ কি যে বলবেন তার তো ঠিকঠিকানা নেই।

আর্চিম্বিতে দুখানা গাড়িই দাঁড়াল। বসে বসে সবাই অসাড় হয়ে গিয়েছি। সবাই নেমে পড়লুম। সকলেরই মনে এক কামনা। আড়ামোড়া দিয়ে নি, পা দুটো চালিয়ে নি, হাত দুখানা ঘুরিয়ে নি।

এমন সময় আব্দুল আসফিয়া আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, মাথা পিছনের দিকে ঈষৎ ঠেলে দিয়ে, হাত দুখানা সামনের দিকে সম্প্রসারিত করে, পোলিটিশিয়নদের কায়দায় শ্রদ্ধানন্দ-পাকী লোকচার ঝাড়তে আরম্ভ করলেন, কিন্তু ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে,—

‘মেদাম, মেদমোয়াজেল, এ মেসিয়ো’—

(ভদ্রমহিলাগণ, ভদ্রকুমারীগণ এবং ভদ্রমহোদয়গণ)

আমরা সকলেই একগুণে তৃষ্ণার্ত এবং ক্ষুধাতুর। নগরী প্রবেশ করতঃ আমরা প্রথমেই উত্তম কিংবা মধ্যম শ্রেণীর ভোজনালয়ে আহাৰাধি সমাপন করব। কিন্তু প্রশ্ন, সেখানে খেতে দেবে কি? জাহাজে যা দেয় তা-ই। সেই বিশ্বাসদ্রুপ, বিশ্বাসদ্রুতর স্টু, তদিতর পুডিং। অর্থাৎ সেই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কিংবা অ্যাংলো-ইজিপ্শিয়ন—যাই বলুন—রস-কষহীন খানা।

পক্ষান্তরে, ‘এই শরতলীতে যদি আমরা কিঞ্চিৎ আদম এবং অকৃত্রিম মিশরীয় খাদ্য, মিশরীয় পদ্ধতীতে সুপক্ক খাদ্য, ভোজন করি তবে কি এক নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চার হবে না?’

আমরা কিছু বলার পূর্বেই তিনি হাত দুখানা গুটিয়ে নিয়ে বাঁ হাত দিয়ে ঘাড়ের ডান দিকটা চুলকোতে চুলকোতে বললেন : ‘অতি অবশ্য, রেস্টোরাঁ-গুলো নোংরা। চেয়ার-টেবিল সাফ-সুৎসেরো নয়, কিন্তু মেদাম, মাদমোয়াজেল, মেসিয়ো, আমরা তো আর টেবিল-চেয়ার খেতে যাচ্ছি নে। আমরা খেতে যাচ্ছি খানা। জাহাজের রান্না যখন আমাদের খুন করতে পারে নি, তখন এ রান্নাই বা করবে কি করে? আপনারাই বলুন!’

কেউ কিছু বলার পূর্বেই পার্সি চেঁচিয়ে উঠলো : ‘অফ্‌কোস্, অফ্‌কোস্—আলবত, আলবত, আমরা নিশ্চয়ই যাব। আমরা যখন মিশরীয় হাওয়াতেই শ্বাস নিচ্ছি, মিশরীয় জলই খাব, মিশরীয় খাদ্য খাব না কেন?’

মাদমোয়াজেল শেনিয়ে বললেন : ‘যাঁরা খেতে চান না, তাঁরা খাবেন না। আমি যাচ্ছি।’

আর আমি বুকলুম, ফরাসীদেশটা কতখানি স্বাধীনতার দেশ। স্বাধীনতা ফরাসীদের হাড়ে-হাড়ে মজ্জায়-মজ্জায়।

শেনিয়ে ছিলেন আমাদের মধ্যে সব চেয়ে ডেলিকট প্রাণী। জাহাজের রান্না তাঁর পছন্দসই ছিল না বলে তিনি টোস্ট, দুধ, ডিম, মটর, কফি, আলুসেদ্ধ খেয়ে প্রাণ ধারণ করতেন। তিনি যখন রাজ্য তখন—?

আমার মনে হয়, আমরা যে তখনই সবাই নিকটতম রেস্টোরাঁয় হুড়মুড় করে ঢুকলুম তার একমাত্র কারণ এই নয় যে, মাদমোয়াজেল ঢুকতে প্রস্তুত, আমার

মনে হয়, আর সবাইও তখন মিশরী খানার এক্সপেরিমেন্ট করবার জন্য তৈরী। এবং সর্বোত্তম কারণ সবাই তখন ক্ষুধায় কাতর। কোথায় কোন খানদানী রেস্টোরাঁয় কখন পেঁয়াজ তার কি ঠিক-ঠিকানা? এবং হয়তো ততক্ষণে সব মাল কাবার। খেতে হবে মাখন-রুট, দিতে হবে মৃগী-মটনের দর। তার চেয়ে ভরভর খুশবাইয়ের খাবারই প্রশস্ততর। হাতের কাছে যা পাচ্ছি তাই ভালো, সেই নিয়ে খুশী।

রবি ঠাকুর বলেছেন,

‘কাছের সোহাগ ছাড়বে কেন

দূরের দুরাশাতে?’

ইরানী কবি ওমর খৈয়ামও বলেছেন,

Oh, take the Cash, and let the Credit go,

Nor heed the rumble of a distant Drum!

কাস্তি ঘোষ তার বাঙলা অনুবাদ করেছেন,

‘নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতায় শূন্য থাক,

দূরের বাদ্য লাভ কি শূনে, মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক!’

*

*

*

রেস্তোরাঁগুলো ছুটে এসে আমাদের আদর-কদর করে অভ্যর্থনা (ইসতিক্-বাল) জানালে। তার ‘বয়-রা’ বগ্নিশখানা দাঁতের মূলো দেখিয়ে আকর্ষণ হাসলে। তর্জিঘাড় তিনখানা ছোট ছোট টেবিল একজোড় করে, চেয়ার সাজিয়ে আমাদের বসবার ব্যবস্থা করা হল, রান্নাঘর থেকে স্বয়ং বাবুচী’ ছুটে এসে তোয়ালে কাঁধে বার বার ঝুঁকে ঝুঁকে সেলাম জানালে। বসতে গিয়ে দেখি, শ্যামবাজারের সেই লোহার চেয়ার। শীত-গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই বসতে গেলে ছাঁকা দেয়।

আমি তখন আমার অভিজ্ঞতা গিলছি। অর্থাৎ দেখছি, বয়গুলোর কী সুন্দর দাঁত! এরকম দুধের মত সুন্দর দাঁত হয় কি করে? সে দাঁতের সামনে এরকম রক্তকরবীর মতো রাঙা ঠোঁট এরা পেল কোথা থেকে? এবং ঠোঁটের সীমান্ত থেকেই সর্বাস্থে ছড়িয়ে পড়েছে কী অদ্ভুত এক নবীন রঙ! এ রঙ আমার দেশের শ্যামল নয়, এ যেন কি এক রোঞ্জ রঙ! কী মসৃণ কী সুন্দর!

কিন্তু সর্বাধিক মনোরম বাবুচী’র ভুঁড়িটা। ওঃ! কী বিশাল, কী বিপুল, কী জাঁদরেল!

তার থেকেই অনুমান করলুম আমরা ভালো রেস্তোরাঁতেই ঢুকছি।

ইতিমধ্যে আবদুল আসফিয়া এবং মাদমোয়াজেল শেনিয়ে বাবুচী’কে নিয়ে খুদ রান্নাঘরে চলে গিয়েছেন, আহারাধির বাছাই-তদারক করতে এবং গোটা-চারেক ছোকরা এসে আমাদের চতুর্দিক ঘিরে চেঁচাচ্ছে, ‘ব্যাং বালিশ, ব্যাং বালিশ!’

সে আবার কী যন্ত্রণা?!?!!

বুঝতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না ; কারণ এদের সকলের হাতে কাঠের ব্যস্ত আর গোটা দুই করে বুরদুশ । ততক্ষণে আবার মনে মনে ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনা করে বুঝে নিয়েছি, আরবীতে ‘ট’ নেই বলে ‘বুট’ হয়ে গিয়েছে ‘বুৎ’ এবং ‘প’ নেই বলে ‘পলিশ’ হয়ে গিছে ‘বালিশ’—একুনে দাঁড়াল ‘বুৎ বালিশ’ ! তাই আরবরা পণ্ডিত জওয়াহরলালের নাম উচ্চারণ করে ‘বালিশ জওয়াহরলাল !’ ভাগ্যিস আরবী ভাষায় ‘ট’ নেই । থাকলে নিরীহ ‘পণ্ডিত’ আরবিস্থানের ‘ব্যাণ্ডিট’ হয়ে যেতেন ! আদন অঙ্গলের আরবীতে আবার ‘গ’ নেই, তাই তারা ‘গাম্ভীর’ নাম উচ্চারণ করে ‘জাম্ভী’ । অবশ্য সেটা কিছু মন্দ নয়,—সত্যের জন্য ‘জ্ঞান দি’ বলেই তো তিনি প্রাণ দান করে দেহত্যাগ করলেন ।

বাঙালী তেঁড়ি কাটতে ব্যস্ত, ইংরেজ সমস্তক্ষণ টাইটা ঠিক গলার মাঝখানে আছে কিনা তার তদারকিতে ব্যস্ত, শিখেরা পাগড়ি বধিতে ঘণ্টাখানেক সময় নেন, কাবুলীরা হামেহাল জুতোতে পেরেক ঠোকাতে ব্যতিব্যস্ত, আর কাইরো-বাসীরা দেখলুম, ‘বুৎ বালিশের’ নেশাতে মশগুল । তা না হলে রাত দুপুরে গন্ডায় গন্ডায় বুৎ-বালিশওয়ালারা কাফে রেস্টোরাঁয় ধমা দিতে যাবে কেন ?

তবে হ্যাঁ, পালিশ করতে জানে বটে । স্পিরিট দিয়ে পুরনো রঙ ছাড়ালে, সাবানজল দিয়ে অন্য সব ময়লা সাফ করলে, ক্রীম লাগালে, পালিশ ছেঁয়ালে, প্রথম হালকা ক্যাম্বিস পরে মোলায়েম সিল্ক দিয়ে জুতোর জোলুস বাড়ালে । তখন জুতোর যা অবস্থা ! তাতে তখন আয়নার মতো মৃৎ দেখা যায় । বুরদুশের ব্যবহার তো প্রায় করলেই না—চামড়া নাকি তাতে জখম হয়ে যায় ।

কিন্তু আশ্চর্য বোধ হল, সেই ঝাঁকচককে জুতোজোড়াকে সর্বশেষে কাপড় দিয়ে ঘষে অল্প—অতি অল্প—ম্যাটমেটে করে দিল কেন ? এতখানি মেহনত চাকচিক্য জাগানোর পর সেটাকে ম্যাটমেটে করে দেবার কি অর্থ ?

একটা গল্প মনে পড়ল :

এক সাহেব পেস্টিগিলকে অর্ডার দিলেন একটা জন্মদিনের কেক বানাবার জন্যে । কেকের উপরে যেন সোনালী নীলে তাঁর নামের আদ্য অক্ষর পি. বি. ডাব্লুইউ লেখা থাকে । ডেলিভারি নেবার সময় দোকানদারকে বললেন, ‘হুঁ’ কেকটি দেখাচ্ছে উত্তম, কিন্তু হরফগুলো বানানো হয়েছে সোজা অক্ষরে । আমি চাই ট্যারচা ধরনে, ঝরাল ডিজাইনে ।’

দোকানী খন্দেরকে সম্বুদ্ধ করতে চায় । বললে, ‘এক্ষুনি করে দিচ্ছি । জন্মদিনের ব্যাপার—চার্ট্রখানি কথা নয় ।’

প্রচুর পরিশ্রম বরে সে কেকের উপরটা চেঁচে নিলে । তারপর প্রচুরতম গলদহম হয়ে তার উপর হরফগুলো বাঁকা ধরনে আঁবলে, আরো মেলা ফুল ঝালর চতুর্দিকে সাজালে ।

সায়ের বললেন, ‘শাবাশ, উত্তম হয়েছে ।’

দোকানী খুশী হয়ে শুধালে, ‘প্যাক করে আপনাকে দেব, না, কোনো বিশেষ ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে হবে ?’

সায়ের হেসে বললেন, ‘কোনোটাই না । আমি ওটা নিজেই খাবো ।’

বলেই ছুরি দিয়ে চাক্‌লা চাক্‌লা করে গব-গব করে আশু কেকটা গিললেন ।
দোকানী তো থ । তাহলে অত-শত করার কি ছিল প্রয়োজন ?

বুৎ বালিশের বেলাও তাই ।

বুৎ বালিশগুলোকে শুধালুম, পালিশ কমিয়ে দেওয়ার কারণটা কি ?

একটুখানি হকচকিয়ে সামলে নিয়ে বললে, ‘গাইয়রাই শুধু অত্যধিক চাকচিক্য পছন্দ করে । শহরের ভদ্রলোক সব জিনিসেরই মেকদার মেনে চলেন ।’

অ—অ—অ—!

তখন মনে পড়ল, অবন ঠাকুরও বলেছেন, ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা আগের দিনে সোনার গয়না পরে পালকিতে বেরুবার সময় তার উপর মলমলের পট্টি বেঁধে নিতেন । বহু বেশী চাকচিক্য নাকি গ্রাম্যজনসুলভ বর্বরতা !

॥ ১৭ ॥

আমরা তেতো, নোনা, ঝাল, টক, মিষ্টি এই পাঁচ রস দিয়ে ভোজন সমাপন করি । ইংরেজ খায় মিষ্টি আর নোনা ; ঝাল অতি সামান্য, টক তার চেয়েও কম এবং তেতো জিনিস যে খাওয়া যায়, ইংরেজের সেটা জানা নেই । তাই ইংরিজী রান্না আমাদের কাছে ভোঁতা এবং বিস্বাদ বলে মনে হয় । অবশ্য ইংরেজ ভালো কেক-পেসট্রি-পুডিং বানাতে জানে—তাও সে শিখেছে ইতালিয়ানদের কাছ থেকে এবং এ-কথাও বলবে আমাদের সম্ভেদ রসগোল্লার তুলনায় এ-সব জিনিস এমন কী, যে নাম শুনে মুহূর্তে যাব ?

মিশরীয় রান্না ভারতীয় রান্নার মামাতো বোন—অবশ্য ভারতীয় মোগলাই রান্নার । আমি প্রমাণ করতে পারব না, কিন্তু বহু দেশে বহু রান্না খেয়ে আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে, মোগলরা এ-দেশে যে মোগলাই রান্নার তাজমহল বানালেন (এবং ভুললে চলবে না, সে রান্না তাঁরা আপন দেশে নির্মাণ করতে পারেন নি, কারণ ওঁদের মাতৃভূমি তুর্কীস্থানে গরম মশলা গজায় না) তারই অনুকরণে আফগানিস্থান, ইরান, আরবীস্থান, মিশর—ইস্টেক স্পেন অর্থাৎ আপন আপন ক্ষুদ্রে ক্ষুদ্রে রান্নার তাজমহল বানাতে চেষ্টা করেছে । এ রান্নার প্রভাব পূর্বে ইয়োরোপের গ্রীস, হাঙ্গেরি, রুম্যানিয়া, যুগোস্লাভিয়া, আলবেনিয়া, ইতালি পর্যন্ত পেঁাছেছে ।

এ সব তত্ত্ব আমার বহুদিনকার পরের আবিষ্কার । উপস্থিত আব্দুল আসফিয়া আর ক্রোদেৎ নিয়ে এলেন বারকোশে হরেক রকম খাবারের নমুনা । তাতে দেখলুম, রয়েছে মৃগী মূসল্লম, শিক কাবাব, শামী কাবাব আর গোটা পাঁচ-ছয় অজানা জিনিস । জানা জিনিসগুলো যে ঠিক ঠিক কলকাতাই খুশবাই নিয়ে এল তা নয়, কিন্তু তাতেই বা কি ? জাহাজের আইরিশ স্টু আর ইটালিয়ান মাকারনি খেয়ে খেয়ে পেটে তো চড়া পড়ে গিয়েছে ; এখন

এ-সব জিনিসই অমৃত। আমার প্রাণ অবশ্য তখন কাঁদছিল চারটি আতপ চাল, উচ্ছেভাজা, সোনামুগের ডাল, পটলভাজা আর মাছের ঝোলের জন্য—অত-শত বলি কেন, শুধু ঝোল-ভাতের জন্য—কিন্তু ওসব জিনিস তো আর বাঙলা দেশের বাইরে পাওয়া যায় না, কাজেই শোক করে কি লাভ?

তাই দেখিয়ে দিলুম, আমার কোন্ কোন্ জিনিসের প্রয়োজন সেই বারকোশ থেকেই।

পাশের টেবিলে দেখি, একটা লোক তার প্লেটে দুটি শশা নিয়ে খেতে বসেছে। দুটি শশা—তা সে যত তিন ডবল সাইজই হোক না—কি করে মানুষের সম্পূর্ণ ডিনার হতে পারে, বহু চিন্তা করেও তার সমাধান করতে পারলুম না। তাও আবার দোকানে ঢুকে, টেবিল-চেয়ার নিয়ে, সস্-চার্টার্ন সাজিয়ে! আর ইংলন্ডের মতো ‘খানদানী’ দেশেও তো মানুষ রাস্তায় দুটো আপেল কিনে চিবিয়ে—রেস্তোরায় ঢুকে সস্-চার্টার্ন নিয়ে সেগুলো খেতে বসে না। তবে কি এদেশ ইংলন্ডের চেয়েও খানদানীতর? এদেশে কি এমন সব সর্বনেশে আইন-কানুন আছে যে রাস্তায় শশা বিক্রি বারণ, যে-রকম শিবঠাকুরের আপন দেশে,

‘কেউ যদি পা পিছলে পড়ে,
পায়দা এসে পাকড়ে ধরে,
কাজীর কাছে হয় বিচার
একুশ টাকা দণ্ড তার
সেথায় সম্ব্য ছটার আগে,
হাঁচতে হলে টিকিট লাগে;
হাঁচলে পরে বিনা টিকিটে—
দমদমাদম্ লাগায় পিঠে,
কোটাল এসে নসিয়া ঝাড়ে—
একুশ দকা হাঁচিয়ে মারে।’^১

কি জানি কি ব্যাপার!

এমন সময় দেখি, সেই লোকটা শশা চিবুতে আরম্ভ না করে তার মাঝখানে দিলে দু হাতে চাপ। অমনি হড়হড় করে বোরিয়ে এল পোলাও-জাতীয় কী যেন বস্তু, এবং তাতেও আবার কি যেন মেশানো। আমি তো অবাক! হোটেল-ওয়ালাকে গিয়ে বললুম, ‘যা আছে কুলকপালে, আমি ঐ শশাই খাব।’

এল দুখানা শশা।^২ কাঁটা দিয়ে একটুখানি চাপ দিতেই বোরিয়ে এল পোলাও। সে পোলাওয়ের ভিতর আবার অতি ছোট ছোট মাংসের টুকরো (এদেশে যাকে বলা হয় ‘কিমা’), টমাটোর কুচি এবং গুঁড়নো পনীর। বদ্বলদুম এ-সব জিনিস পুরেছে সম্ব্য শশার ভিতর এবং সেই শশাটা সর্বশেষে ঘিয়ে

১ স্দকুমার রায়, আবোল-তাবোল, পৃঃ ৩২, তৃতীয় সিগনেট সংস্করণ

২ আসলে শশা নয়, এক রকমের ছোট লাউ।

ভেজে নিয়েছে। যেন মাছ-পটলের দোলমা—শুধু মাছের বদলে এখানকার শশায় পোলাও, মাংস, টমাটো এবং চীজ! তার-ই ফলে অপূর্ব এই চীজ।

শশাকে চাঙি করে পোলাওয়ের সঙ্গে মুখে দিয়ে বদলদুম, একই গ্রাসে একই সঙ্গে ভাত, মাংস, সম্ভজী, ফল এবং ‘সেভরি’ খাওয়া হয়ে গেল।

আর সে কী সোয়াদ! মুখে দেওয়া মাত্র মাখনের মতো গলে যায়।

এ রকম পাচেক পাঁচ পদ আমি পৃথিবীতে আর কোথাও খাই নি।

আরেকটা জিনিস খেলদুম সে-ও অতুলনীয়। মিশরিসিম-বীচি। ‘আলীবাবা’ বায়স্কাপে যে সব বিরাট বিরাট উঁচু তেলের জালা দেখেছ, তারই গোটা দুর্ভিন্তি সিমিতে ভর্তি করে সমস্ত রাত ধরে চালায় সিম্বধর্ম। সেই সিমি অলিভঅয়েল আর এক রকমের মশলা মিশিয়ে খেতে দেয় সকাল বেলা থেকে। আমরা খেলদুম রান্ধরে। তার যা সোয়াদ!—এখনো জিভে লেগে আছে। আমাদের সিমবীচি তার কাছে কিছুই না। পল-পার্সিও মদ্রু কণ্ঠে স্বীকার করলে চীন দেশের সোয়াবীনও এর সামনে কেন, পিছনেও দাঁড়াতে পারে না।

শুনলুম এই সিম-বীচি গরিব থেকে আরম্ভ করে মিশরের রাজ্য দু-সম্ভা খেয়ে থাকেন। হোটেলওয়াল বুললে, পিরামিড-নির্মাতা এক ফারাও-মহারাজা নাকি এই বীন খেতে এত ভালবাসতেন যে, প্রজাদের বারণ করে দিয়েছিলেন তারা কেউ যেন বীন না খায়! সাধে কি আর লোকে ফারাওদের খামখেয়ালি বলত?

শুনলুম এই বীনের আরবী শব্দ ‘ফুল’।

পরের দিন সকাল বেলাকার ঘটনা। কিন্তু এর সঙ্গে যোগ আছে বলে এই সুবাদেই বলে নি।

কাইরোতে ফরাসী, গ্রীক, ইতালী, ইংরেজ বসবাস করে বলে এবং জাত-বেজাতের বিস্তর টুরিস্ট আসে বলে কাইরোর বহু দোকানী তরো-বেতরো ভাষায় সাইন-বোর্ড সাজায়। পরদিন সকাল বেলা আমরা যখন শহরের আনাচে কানাচে ঘুরছি তখন দেখি, এক সাইন-বোর্ডে লেখা—

FOOL'S RESTAURANT

পল, পার্সি আমি একসঙ্গেই বোর্ডটা দেখেছিলাম। একসঙ্গেই থ মেরে দাঁড়িয়ে গেলুম। একসঙ্গেই অট্টহাস্য করে উঠলুম।

“আহাম্মদদের রেস্তোরাঁ।”

বলে কি?

তখন হঠাৎ ঝাঁ করে আমার মনে পড়ল Fool শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে ‘ফুল’ অর্থাৎ ‘বীন’ অর্থাৎ ‘সিমের বীচি’ অর্থে। “আহাম্মদ” অর্থে নয়। অর্থাৎ এ দোকানী উত্তম ‘সিম-বীচি’ বেচে। তার পর দোকানের সামনে আমরা ত্রিমূর্তি উৎকীর্ণ করে দেখি, যে কটি খন্ডের সেখানে বসে আছে তাদের সকলেরই সামনে শুধু সিম-বীচি—‘ফুল’—‘Fool’।

*

*

*

*

হাসলে তো?

আমিও হেসেছিলাম।

কিন্তু তার পর কলকাতা ফিরে—বহু বৎসর পরে—দেখি, এক দোকানের সাইন-বোর্ডে লেখা।

“কপির শিঙাড়া”

অর্থাৎ ফুলকপির-পূর-দেওয়া শিঙাড়া। এই তো?

আমি কিন্তু ‘কপি’ শব্দের অর্থ নিলাম ‘বাদর’। অর্থাৎ বাদরদের শিঙাড়া। তা হলে অর্থ দাঁড়াল, ও-দোকানে যারা শিঙাড়া খেতে যায় তারা বাদর। অর্থাৎ Fool’s Restaurant তে যে রকম আহাম্মুকরা যায়!

যেমন মনে করো, যখন সাইন-বোর্ডে লেখা থাকে,—

“টাকের ঔষধ”

তখন কি তার অর্থ, ‘টাকা’ দিয়ে এ ঔষধ তৈরী করা হয়েছে? তার অর্থ এ ঔষধ টেকোদের জন্য। অতএব ‘কপির শিঙাড়া’র অর্থ ফুলকপি দিয়ে বানানো শিঙাড়া নয়, ‘কপি’—বাদরদের জন্য এ শিঙাড়া!

বিজ্ঞাপনে মানুষ জানা-অজানাতে—অজানাতেই বেশী—কত যে রসিকতার সৃষ্টি করে তার একটা সচিব কলেকশন করেছিল আমার এক ভাইপো। ‘হবি’টা মন্দ নয়। তার মধ্যে একটা ছিল;—

বিসুদ্ধ রাস্তার হাটওয়াল।

মচ্ছ—চার আনা

মাঙ্গশ—আট আনা

নিড়ামিস—ছয় আনা

যাক্ গে এসব কথা। আবার কাইরো ফিরে যাই। আহালাদি সমাপ্ত করে আমরা ফের গাড়িতে উঠলাম। আব্দুল আসফিয়া দেখলাম ড্রাইভারদের নিজের পয়সায় খাওয়ালেন। তার পর গাড়িতে উঠে বললেন, ‘কাইরোতে ট্যাক্সি চালাবার অনুমতি তোমাদের নেই। অথচ আমরা তোমাদের বাইরে থেকে নিয়ে এসেছি। আমাদের যেখানে খুশি নিয়ে গিয়ে দু’পয়সা কামাতে পারো।’

তারা তো প্রাজল প্রস্তাবখানা শুনেনে আলমাদে আটখানা। কিন্তু আব্দুল আসফিয়া যে দর হাঁকলেন তা শুনেনে তাদের পেটের ‘ফুল’ পয়স্তু আচমকা লাফ মেরে গলা পয়স্তু পেঁছে গেল।

ব্যাপারটা হয়েছে কি, আব্দুল আসফিয়া ইতিমধ্যে কাইরোতে ট্যাক্সি ফি মাইলে কত নেয় তার খবরটা জেনে নিয়েছেন এবং হাঁকছেন তার চেয়ে অনেক কম। এবার তিনি ওদের বাগে পেয়েছেন। ওরা বেশী কিছু আপত্তি জানালেই তিনি অভিমানভরা কণ্ঠে বলেন, ‘তা ভাই, তোমরা যদি না যেতে চাও তবে যাবে না। আমি তো আর তোমাদের বাধ্য করতে পারি নে। তোমাদের যদি, ভাই, বড় বেশী পয়সা হয়ে যাওয়ায় আর কামাতে না চাও, তা হলে আমি আর কি করতে পারি বলো? আল্লা তালাও তো কুরান শরীফে বলেছেন, ‘সন্তুষ্টি সদ’গুণ’।

তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তবে, ভাইরা, আমরা, তা হলে অন্য ট্যাক্সি নি। তোমরা সুয়েজ ফিরে যাও। আল্লা তোমাদের সঙ্গে থাকুন; রসুল তোমাদের আশীর্বাদ করুন। কিন্তু ভাই, এ ক-ঘণ্টা তোমাদের সঙ্গে কেটেছিল বড় আনন্দে।'

কেটেছিল আনন্দে না কচু! পারলে আব্দুল আসফিয়া ওদের গলা কাটতেন।

কিন্তু আশ্চর্য হলুম লোকটার 'ভণ্ডামি' দেখে। গুটিকয়েক টাকা বাঁচবার জন্য কি অভিনয়ই না লোকটা করলে!

আর পায়রার মতো বকবকানি! এবং এ সেই লোক যে জাহাজে যে-ভাবে মৃত্যু বন্ধ করে থাকত তাতে মনে হত কথা বলা রেশন্ড হয়ে গিয়েছে।

ঠিক আব্দুল আসফিয়ার দরে নয়, তার চেয়ে সামান্য একটু বেশী রেটে তারা শেষটায় রাজী হল।

আব্দুল আসফিয়া মোগলাই কণ্ঠে বললেন, 'পিরামিড'। ততক্ষণে আমরা কাইরো শহরের ঠিক মাঝখানে ঢুকে গিয়েছি।

কোথায় লাগে কলকাতা রাত বারোটার সময় কাইরোর কাছে। গণ্ডায় গণ্ডায় রেস্টোরাঁ, হোটেল, সিনেমা, ডান্স-হল, কাবারে। খন্দেদে খন্দেদে তামাম শহরটা আবজাব করছে।

আর কত জাত-বেজাতের লোক।

ঐ দেখ, অতি খানদানী নিগ্রো। ভেড়ার লোমের মতো কৌকড়া কালো চুল, লাল লাল পুরু দুখানা ঠোঁট, বোঁচা নাক, ঝিনুকের মতো দাঁত আর কালো চামড়ার কী অসীম সৌন্দর্য! আমি জানি এরা তেল মাখে না, কিন্তু আহা, ওদের সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন তেল ঝরছে। এদের চামড়া এতই সুচিকণ সুসুগন্ধ যে আমার মনে হয়, এদের শরীরে মশা-মাছি বসতে পারে না—পিছল পড়ে মশার পা ছুঁতানা কম্পাউন্ড ফ্রেকচর হয়ে যায়, ছ মাস পট্টবেঁধে হাসপাতালে থাকতে হয়।

ঐ দেখো, সদ্দানবাসী। সবাই প্রায় ছ ফুট লম্বা। আর লম্বা আলখালা পরেছে বলে মনে হয় দৈর্ঘ্য ছ ফুটের চেয়েও বেশী। এদের রঙ রোঞ্জের মতো। এদের ঠোঁট নিগ্রোদের মতো পুরু নয়, টকটকে লালও নয়। কিন্তু সবচেয়ে দেখবার মতো জিনিস ওদের দুখানি বাহু একেবারে শ্যামসন্মত পৃথিবীতে আজানুলম্বিত—অর্থাৎ জানুর শেষ পর্যন্ত যেখানে হাঁটুর হাড়ি অর্থাৎ 'নী ক্যাপ' সেই অবধি।

গ্রীলামচন্দ্রের বাহু ছিল আজানুলম্বিত এবং তাঁর রঙ ছিল নবজলধরশ্যাম, কিংবা নবদুর্বাদলশ্যাম। তবে কি শ্যামবর্ণ কিংবা রোঞ্জ-বর্ণ না হলে বাহু এতখানি লম্বা হয় না? তবে কি ফর্সাদের হাত বেঁটে, শ্যামলিয়ারদের হাত লম্বা? কে জানে! সুযোগ পেলে কোনো এক নৃতাত্ত্বিককে জিজ্ঞেস করতে হবে।

হঠাৎ দেখি, সম্মুখে হে-হে-ই-ই-ই-ই কাণ্ড! লোকে লোকারণ্য?

সমস্ত রাস্তা জুড়ে এত ভিড় যে দুখানা গাড়িকেই বাধা হয়ে দাঁড়াতে হল। আমি বারণ করার পূর্বেই পল পার্সি দুজনাই লাফ দিয়ে উঠে গেল হুডের উপর। ওরা দেখতে চায়, ভিড়ের মাঝখানের ব্যাপারটা কি। আমার ওসব জিনিস দেখবার বয়স গেছে। মাদমোয়াজেল রুবেং শেনিয়ে পর্বস্ত উঠি উঠি করছিলেন; আমি তাঁকে বাইরে যেতে বারণ করলুম।

ইতিমধ্যে ঘোড় সওয়ার পুলিশ এসে রাস্তা খানিকটে সাফ করে দেওয়াতে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চললো। পল-পার্সি হুড থেকে নেমে এসে আমার দৃশ্যে বসেছে।

আমাকে কিছুটা জিজ্ঞেস করতে হল না, ব্যাপার কি। ওরা উত্তেজনাতে তিড়িং-তিড়িং করে লাফাচ্ছে। একসঙ্গে কথা বলছে। শেষটায় পলকে বাধা দিয়ে আমি বললুম, ‘পার্সি, তুমিই বলো কি হয়েছিল?’

‘ঐ যে আপনি দেখলেন সুদানবাসীদের, তাদেরই এক জন একটা ইংরেজ-সেপাইয়ের গলা ধরেছে বাঁহাত দিয়ে আর ঠাস্-ঠাস্ করে করে চড় মারছে ডান হাত দিয়ে। গোরা কিছুই করতে পারছে না, কারণ সুদানীর হাত লম্বা বলে গোয়াকে এমনই দূরে রেখেছে যে, গোরা তার গাল নাগাল পাচ্ছে না। এ রকম তো চলল মিনিট দু-তিন। তার পর পুলিশ এসে গোয়াকে ধরে নিয়ে চলে গেল।’

আমি অশ্চর্য হয়ে শুধালুম, ‘সুদানীই তো ঠ্যাঙাচ্ছিল, তাকে ধরে নিয়ে গেল না? যে মার খেল তাকে ধরে নিয়ে গেল, যে মার দিলে তাকে ধরে নিয়ে গেল না, এটা কি করে হয়?’

পল-পার্সি সম্ভরে বললে, ‘সেই তো মজার কথা, ম্যার! সাংহাই-টাংহাই কোনো জায়গাতে কেউ যদি গোয়াকে ঠ্যাঙায়, তবে তাকেই ঠ্যাঙাতে-ঠ্যাঙাতে পুলিশ থানায় নিয়ে যায়। কেউ একবারের তরেও প্রগ্ন করে না দোষটা কার?’

আমি তখন ড্রাইভারকে রহস্য সমাধান করার জন্য অনুরোধ জানালুম।

ড্রাইভার বললে, ‘দারোয়ানীর কাজ এ-দেশে করে সুদানীরা। তাদের উপর কারোবাসীদের অসীম বিশ্বাস। কোনো সুদানী কখনো কোনো প্রকারের বিশ্বাসঘাতকতা করে নি, এ কথা আমি বলতে পারব না, কিন্তু আমার কানে কখনও পৌঁছয় নি। এরা বড়ই ধর্মপ্রাণ। পাঁচ ওক্ৎ নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, হজ্জ যায়, তসবী জপে। আর বসে বসে বাড়ি আগলায়।’ এই যে সুদানী গোয়াকে মার দিচ্ছিল, সে এক রেস্টোরার দারোয়ান। গোরা রেস্টোরার খেয়ে-দেয়ে পয়সা না দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল বলে হোটেলওয়ালা তাকে চ্যালেঞ্জ করে খেল ঘুরায়। তখন সুদানী দারোয়ান তার যা কর্তব্য তাই করেছে। পুলিশ একবার জিজ্ঞেস করে বিশ্বাস করেছে সুদানীকে, আর ধরে নিয়ে গিয়েছে গোয়াকে। নবাই জানে, সুদানীরা বড় শাস্ত্র শ্বভাব, তারা মারপিটের ধার ধারে না।’

যাও সব বোঝা গেল। কিন্তু একটা কথা স্বীকার করব; একা একা কারো সাহায্য না নিয়ে, পল্টনের গোয়াকে ঠ্যাঙাতে পারে সুদানীই। পাঠান পায়ে কি না জানি নে। পারলে পারতেও পারে, কিন্তু তার বাহু আজানুলম্বিত নয়

বলে সেও নিশ্চয় দূ-চার ঘা খাবে ।

কাইরোতে বৃষ্টি হয় অতি দৈবাৎ । তা-ও দূ-এক ইঞ্চির বেশী নয় । তাই লোকজন সব বসেছে হোটেল-কাফের বারান্দায় কিংবা চাতালে । শুনলুম, এখানকার বায়স্কেপও বেশীর ভাগ হয় খোলামেলাতে ।

বাঙলা দেশে আমরাও চায়ের দোকানে বসে গালগল্প করে সময় কাটাই । কেউ কেউ হয়তো রোজ একই দোকানে গিয়ে ঘণ্টা দুয়েক কাটায়, কিন্তু কাফেতে বসে দিনের বেশীর ভাগ সময় কাটানোর রেওয়াজ আরম্ভ হয় ফ্রান্সের থেকে । কাবুলে দেখবে, চার বন্ধু চলেছেন বরফ ভেঙে চা-খানায় গিয়ে গল্পগুজোব করবেন বলে—যেন বাড়িতে বসে ও-কর্মটি করা যায় না । ওদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলে, ‘বাড়িতে মদ্রুশ্বরী রয়েছে, কখন এসে কাকে ধমক লাগান তার ঠিক নেই । কিংবা হয়তো বলবেন, দেখ বাছা, ফিরোজ বখৎ, যাও দিকিনি আমার বাড়িতে—(আড়াই মাইলের ধাক্কা) সেখানে গিয়ে মামাকে বলো, আমার নাকের ফুসকুড়িটা একটু সেরেছে, তিনি যেন চিন্তা না করেন । আর দেখো, আসবার সময় ধোপানীকে একটু শূদ্বিখে এসো—(সে আরো দেড় মাইলের চক্কর)—আমার নীল জোশ্বা,—ইত্যাদি ।

‘এবং সব চেয়ে বড় কারণ, বাড়িতে মা-জ্যাঠাইমা ওরকম জালা জালা চা দিতে রাজী হন না । ওনারা যে কঞ্জুস তা নয় । আমি যদি একটুখানি বলি, জ্যাঠাইমা, আমার বন্ধুরা এসেছে, ওরা বলেছে, পিসিমার বিয়ের দিনে আপনি যে দূশ্বা-মুসল্লম করেছিলেন তারা সেইটে খাবে । কিন্তু ওদের বায়নাঙ্কা, দূশ্বার ভিতর যেন কোফতা পোলাও আর মূগণী থাকে, মূগণীর ভিতর যেন কিমা পোলাও আর আন্ডা থাকে এবং আন্ডার ভিতর যেন পোনা মাছের পুর থাকে,—জ্যাঠাইমা তন্দণ্ডেই লেগে যাবেন ঐ বিরাট রান্না করতে । তাতে দশ-বিশ টাকা যা লাগে লাগুক ।

‘অথচ আমাদের চায়ের খরচা এক সম্ভ্যায় কতটুকুন ? দূ আনা চার আনা, মেরেকেটে আট আনা । উহঁং সেটি হচ্ছে না । ঘন ঘন চা খেলে নাকি ক্ষিদে মরে যায়, আহারের রুচি একদম কমে লোপ পেয়ে যায় ।

‘তাই ভাই, চায়ের দোকানই প্রশস্ততর । সেখানে এক বার ঢুকতে পারলে বাবা-চাচার তস্বতস্বার ভয় নেই, মামা-বাড়িতে গিয়ে বাবার নাকের ফুসকুড়িটার লেটেস্ট বুলেটিন ঝাড়তে হয় না, জালা-জালা চা পাওয়া যায়, অন্য দূ-চার জন ইয়ার দোস্তের সঙ্গে মোলাকাতও হয়, তাস-দাবা যা খুশি খেলাও যায়—সেখানে যাব না তো, যাব কোথায় ?’

প্রথম বারেই প্রথম কাবুলী ভদ্রসন্তান যে আমাকে এই সব কারণ এক নিশ্বাসে বদ্বিখে বলেছিল তা নয়, একাধিক লোককে জিজ্ঞেস করে ক্রমে ক্রমে চায়ের দোকানে যাবার যাবতীয় কারণ আমি জানতে পেরেছিলুম ।

আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, এঁরা সত্য কথাই বলেছিলেন, এবং এঁরা যে ঘর ছেড়ে চায়ের দোকানে যান তাতে আপত্তি করবার কিছুই নেই ।

কিন্তু প্রশ্ন, বাঙালীদের বেলাও তো এই সব আপত্তি-ওজ্জ্বল হাত টেকে। আমাদের মা-পিসিরাও চান না আমরা যেন বড় বেশী চা গিলি, বাবা-কাকাও ফাই-ফরমাসেস দেওয়াতে অতিশয় তৎপর; তবে আমরা চায়ের দোকানকে বাড়ির ঝুইংরুম করে তুলি নে কেন?

এর সদ্ব্তর আমি এষাবৎ পাই নি। তা সে যাই হোক, এটা বেশ লক্ষ্য করলুম, রাত বারোটা-একটা অবধি কাফেতে বসে সময় কাটানোতে কাইরোবাসী সবচেয়ে বড় ওস্তাদ; বন্ধুর বাড়িতে জমানো আড্ডা দশটা-এগারটার ভিতর ভেঙে যায়, কারণ বাড়িসুদ্ধ লোক তাড়া লাগায় খাওয়া-দাওয়া করে শূন্যে পড়ার জন্যে। এখানে সে ভয় নেই। উঠি-উঠি করে কেউই ওঠে না। বাড়ির লোকেরও অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। তারা আর একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছে। শুনছি, এখানকার কোনো কোনো কাফে খোলে রাত বারোটায়ে!

মোটর গাড়ি বড় তাড়াতাড়ি চলে বলে ভালো করে সব-কিছু দেখতে পেলুম না। কিন্তু এইবারে চোখের সামনে ভেসে উঠল অতিরমণীয় এক দৃশ্য! নাইল, নীল নদ।

আমি পূর্ব বাংলার ছেলে। যা-তা নদী আমাকে বোকা বানাতে পারে না। আমি যে গাঙে সাতার কাটতে শিখেছি সেই ছোট মনু নদ থেকে আরম্ভ করে আমি বিস্তর মেঘনা-পদ্মা, গঙ্গা-যমুনা এবং পরবর্তী যুগে গোদাবরী-কৃষ্ণা-কাবেরী-তাপ্তী-নর্মদা-সিন্ধু, ইয়োরোপে রাইন-ডানয়ুব-মোজেল-রোন দেখেছি। নদী দেখলে আর পাঁচ জন বাঙালের মতো আমিও গামছা খুঁজতে আরম্ভ করি—ঐ নদীতে কটা লোক গত সাতশ বছরে ডুবে মরেছিল তার স্টাটিস্টিক্সের সন্ধান না নিয়ে—একটা ডিঙি কি কৌশলে চুরি করা যায় তার সন্ধানে মাথায় গামছা বেঁধে নি, পার্টনিকে কি প্রকারে ফাঁকি দিয়ে থেয়া নৌকো থেকে নামতে হয় সেটা এক মূহুর্তেই আবিষ্কার করে ফেলি।

এই যে পৃথিবীর সবচেয়ে মধুর ভাটিয়ালী গীত! সৃষ্টিকর্তা যদি তাঁর পূর্ব-বাঙলার লীলাঙ্গনে শত শত নদীর আলপনা না আঁকতেন তবে কি কখনো ভাটিয়ালী গানের সৃষ্টি হত? আর এ কথাও ভাবি তিনি রচেন্নেন মোহনিনী প্রবাহিনী আর আমরা তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রচিছি ভাটিয়ালী। অবশ্য তাঁরই কাছ থেকে ধার করে! আমরা যখন ও—ও—ও—বলে ভাটিয়ালীর লম্বা সুর ধরি, মাঝে মাঝে কাঁপন জাগাই তখন কি স্পষ্ট শুনতে পাও না, দেখতে পাও না, ‘ও—’র লম্বা টানে যেন নদী শান্ত হয়ে এগিয়ে চলছে, যখন কাঁপন লাগাই তখন মনে হয় না, নদী যেন হঠাৎ থমকে গিয়ে দাঁড়ের সৃষ্টি করেছে?

প্যারিস-ভিয়েনার রসিকজনের সম্মুখে আমি আমার হাজারোটা নদী কাঁধে বয়ে নিয়ে হাজির করতে পারব না, কিন্তু ভাটিয়ালীর একখানা উত্তম রেকর্ড শুনিয়ে দিতে পারি।

আমি বে-আক্কেল তাই একবার করেছিলাম। তার কি জরিমানা দিয়েছিলুম শোনো।

ভিয়েনাতে পাশের ঘরে থাকত এক রাশান। সে এসেছিল সেখানে

কন্সটিনেন্টাল সঙ্গীত শিখতে। ভিয়েনা শহর বেটোফেন মোৎসার্টের কর্মভূমি—আমাদের যে রকম তানসেন, ত্যাগরাজ, বাঙালীর যে রকম রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইল্লাম।

ভিয়েনা ডানয়্যুব নদীর পারে। ‘ব্লু ডানয়্যুব’ তোমাদের কেউ কেউ হয়তো শুনেছে।

একদিন সেই রাশান বলল, ‘ডানয়্যুব ফানয়্যুব সব আজ-বাজে নদী। এই সব নদী থেকে আর কি গান বেরিয়েছে যে পাল্লা দেবে আমার রাশার ভল্গা নদী থেকে আর ভল্গার মাঝির গান উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠেছে? তুমি ‘গড’-‘ফড’ কি সব মানো, না? আমি মানি নে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি প্রকৃতিকে। তারই অন্যতম মধ্য প্রকাশ নদীতে। সেই নদীকে আমরা মাধুর্যে হার মানাই ভল্গা মাঝির গান দিয়ে।’^৩

বাড়ি ফেরা মাত্রই সে ভল্গা-মাঝির রেকর্ড শোনাগেলো। আমি মূগ্ধ হয়ে বললাম, ‘চমৎকার!’

কিন্তু ততক্ষণে আমার বাঙাল রক্ত গরম হয়ে উঠেছে। বাঙালরা অবশ্য জানে, তার অর্থ কি? ‘ঘটি’ অর্থাৎ পশ্চিম-বাঙলার লোক তাই নিয়ে হাসা-হাসি করে করুক। আমার তাতে কোনো খেদ নেই। ওরা তো আমাদের ভাটিয়ালী ভালোবাসে, আমরা তো ওদের ‘বাউল’ শুনে ‘বাউলে’ হয়ে যাই।

আমার গরম রক্ত তখন টগবগ করে বলছে, ‘বাঙলা দেশ শত শত নদীর দেশ। রাশাতে আর ক-টা নদী আছে? তারই একটা, ভল্গা। সে নদী হারিয়ে দেবে বাঙলা দেশের তাবৎ নদীকে? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।’

ভাগ্যিস, আশ্বাসউদ্দনের ‘রিঙলা নায়ের মাঝি’ আমার কাছে ছিল। সেইটে চড়িয়ে দিলাম রাশানের গ্রামোফোনে।

সে চোখ বন্ধ করে শুনলে। তার পর বললে—যা বললে তার অর্থ—‘ধাপ্পা’।

আমি বললাম ‘মানে?’

সে বললে, ‘সুদূর অতি উচ্চ শ্রেণীর এবং তার চেয়েও বেশী কানে ধরা পড়ে ওর অভিব্যক্তি। আমি করজোড়ে স্বীকার করছি, এ রকম গীত আমি পূর্বে কখনো শুনিনি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলবো, এ গীত লোক-গীত নয়। কারণ বিশ্বরক্ষাত্তের কোনো ভূমিতেই গ্রাম্য গীতে এতগুলো ‘নোট’ লাগে না। তাই বলছিলাম তুমি ধাপ্পা দিচ্ছে।’

আমি বললাম, ‘বাহা, ঐ হল ভাটিয়ালির বৈশিষ্ট্য। ও যতখানি ওঠা-নামা করে পৃথিবীর আর কোনো লোক-গীত তা করে না।’

কিছুতেই স্বীকার করে না ওটা লোক-গীত। তার ধারণা ওটা লোক-গীত এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মাঝখানে উপস্থিত ঝুলছে, আর কয়েক বৎসর যেতে না

৩ রবীন্দ্রনাথও এই ‘দৃষ্ট’ করেছেন তাঁর ‘বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল’ গানে। রেকর্ডে গেয়েছেন, শ্রীযুক্তা রাজেশ্বরী বাসুদেব।

যেতেই কোনো গৃহী সেটাকে 'উচ্চাঙ্গ' শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে বরণ করে তুলে নেবেন।

তার পর এক দিন সে স্বীকার করলে। বি বি সি-র কল্যাণে। বি বি সি পৃথিবীর লোক-গীত শোনাতে শোনাতে ভাটিয়ালী শুনিয়ে বললে এটা পূব বাঙলার লোক-গীত।

আমি লড়াই জিতলুম কিন্তু তখন থেকেই শূন্য হল আমার জরিমানা। আশ্চর্য লাগছে না, যে জিতলে সে দেবে জরিমানা? হয়, প্রায়ই হয়। মার্কিনিংরেজ জার্মানি জয় করে বহু বৎসর ধরে সেখানে ঢেলেছে এবং এখনো ঢালছে বিস্তর টাকা। সে কথা যাক, জরিমানাটা কি ভাবে দিতে হল বুঝিয়ে বলি।

এর পর যখনই সে আমাকে সাজা দিতে চাইত তখনই তার বেয়লালাতে বাজাতে আরম্ভ করত ভাটিয়ালির সুর।

বোঝ অবস্থাটা! বিদেশ-বিভূঁইয়ে একেই দেশের জন্য মন অকুপাকু করে তার উপর ভাটিয়ালির করুণ টান!

রবীন্দ্রনাথের শ্রীকণ্ঠাবদূর মতোঃ আমি কাতর রোদনে তাঁকে বেয়লা বশ্য করতে অনুন্নয়-বিনয় করতুম।

কিন্তু আজও বলি, লোকটা যা বেয়লালাতে ভাটিয়ালি চড়াতে পারত তার তুলনা হয় না।

কত দেশ ঘুরলুম, কত লোক দেখলুম, কত অজানা জনের প্রীতি পেলাম, কত জানা জনের দূর্ব্যবহার, হিটলারের মতো বিরাট পুরুষের উত্থান-পতন দেখলুম, সে সব বড় বড় জিনিস প্রায় ভুলে গিয়েছি, কিছু এই সব ছোটখাটো জিনিস কিছুতেই ভুলতে পারি নে। মনে হয় যেন আজ সকালের ঘটনা।

চাঁদের আলোতে দেখছি, নীলের উপর দিয়ে চলেছে মাঝারি ধরনের খোলা মহাজনী নৌকা—হাওয়াতে কাত হয়ে তেঁকেণা পাল পেটুক ছেলের মত পেট ফুলিয়ে দিয়ে। হাওয়া বইছে সামান্যই, কিন্তু এই পেটুক পাল এর ওর সবার হাওয়াই খাবার যেন কেড়ে নিয়ে পেটটাকে ঢাকের মতো ফুলিয়ে তুলেছে। ভয় হয়, আর সামান্য একটুখানি জোর হাওয়া বইলেই, হয় পালটা এক ঝটকায় চৌচির হয়ে যাবে, নয় নৌকোটা পেছনের ধাক্কা খেয়ে গোটা আড়াই ডিগবাজি খেয়ে নীলের অভলে তলিয়ে যাবে।

এই নীলের জল দিয়ে এ দেশের চাষ হয়। এই নীল তাঁর বদকে ধরে সে চাষের ফসল মিশরের সর্বত্র পেঁাছিয়ে দেন। তাই এ দেশের কবি গেয়েছেন :

ওগো নীলনদপ্রাবিতা ধরণী আমি ভালোবাসি তোরে,

ঐ ভালোবাসা ধর্ম আমার কর্ম আমার গুণে।

পিরামিড ! পিরামিড !! পিরামিড !!!

কোনো প্রকাশের আশ্চর্য প্রকাশ করতে হলে আমরা তিনটে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন—!!!—দিই। তাই কি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে তিনটে পিরামিড ? কিংবা উল্টোটা ? তিনটে পিরামিড ছিল বলে আমরা তিনবার আশ্চর্য হই ?

এই পিরামিডগুলো সম্বন্ধে বিশ্বজুড়ে যা গাধা গাধা বই লেখা হয়ে গিয়েছে তার ফিরিস্তি দিতে গেলেই একখানা আস্ত জলে-ডাঙায় লিখতে হয়। কারণ এই তিনটে পিরামিড পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো কীর্তিস্তম্ভ—যুগ যুগ ধরে মানুষ এদের সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্বের জলপনা-কলপনা করেছে, দেয়ালে-খোদাই এদের লিপি উদ্ধার করে এদের সম্বন্ধে পাকা খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছে, জান তো, পিরামিডের ঠিক মাঝখানে একটা কুটুরিতে বিশ্বের ধনদৌলত জড়ো করা আছে—তারই পথ অনুসন্ধান করেছে পাকা সাড়ে ছ হাজার বছর ধরে। ইরানী, গ্রীক, রোমান, আরব, তুর্কী, ফরাসী, ইংরেজ, পর পর সবাই এদেশ জয় করার পর প্রথমেই চেষ্টা করেছে পিরামিডের হাজার হাজার মণ পাথর ভেঙে মাঝখানের কুটুরিতে ঢুকে তার ধনদৌলত লুট করার। কিন্তু আশ্চর্য, যিনি শেষ পর্যন্ত ঢুকে পড়লেন তিনি ধন লুটের মতলবে ঢোকে ন। তিনি ঢুকেছিলেন নিছক ঐতিহাসিক জ্ঞান সংয়ের জন্য। ফারাওয়ের রাজমিস্ত্রীরা কুটুরি বানানো শেষ করার পরে বেরোবার সময় এমন-ই মস্ত পাথর দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে বাইরের দেয়ালে পালিশ পলিস্তরা লাগিয়ে দেয় যে, পৃথিবীর মানুষের সাড়ে ছ হাজার বছর লাগল ভিতরে যাবার রাস্তা বের করতে !

মিশরের ভিতরে-বাইরে আরও পিরামিড আছে, কিন্তু গিজের অঞ্চলের যে তিনটে পিরামিডের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে, সেগুলোই ভূবন-বিখ্যাত, পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম।

রাজা	নির্মাণের সময়	ভূমিতে দৈর্ঘ্য	উচ্চতা
খুফু	৪৭০০ খ্রীঃ পূঃ	৭৫৫ ফুট	৪৮১ ফুট
খাফ্রা	৪৬০০ " "	৭০৬ "	৪৭১ "
মেনকাওরা	৪৫৫০ " "	৩৪৬ "	২১০ "

প্রায় পাঁচশো ফুট উঁচু বললে, না দেখে চট করে পিরামিডের উচ্চতা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায় না। এমন কি চোখের সামনে দেখেও ধারণা করা যায় না, এরা ঠিক কতখানি উঁচু। চ্যাংটা আকারের একটা বিরাট জিনিস আস্তে আস্তে স্ক্রীণ হয়ে পাঁচশো ফুট উঁচু না হয়ে যদি চোঙার মতো একই সাইজ রেখে উঁচু হত, তবে স্পষ্ট বোঝা যেত পাঁচশো ফুটের উচ্চতা কতখানি উঁচু !

বোঝা যায়, দূরে চলে গেলে। গিজের এবং কাইরো ছেড়ে বহু দূরে চলে যাওয়ার পরও হঠাৎ চোখে পড়ে তিনটে পিরামিড, সব কিছু ছাড়িয়ে, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। আর পিরামিড ছেড়ে যদি সোজা মরুভূমির ভিতর দিয়ে চলে যাও, তবে মনে হবে সাহারার শেষ প্রান্তে পেঁছে যাওয়ার পরও বুঝি পিরামিড দেখা যাবে !

তাই বোঝা যায়, এ বস্তু তৈরি করতে কেন তেইশ লক্ষ টুকরো পাথরের প্রয়োজন হয়েছিল। ‘টুকরো’ বলতে একটু কমিয়ে বলা হল, কারণ এর চার-পাঁচ টুকরো একত্রে করলে একখানা ছোটখাটো এঞ্জিনের সাইজ এবং ওজন হয়। কিংবা বলতে পারো, ছ ফুট উঁচু এবং তিন ফুট চওড়া করে এ পাথর নিয়ে একটা দেয়াল বানাতে সে দেয়াল লম্বায় ছ’শ পঞ্চাশ মাইল হবে। অর্থাৎ সে দেয়াল কলকাতা থেকে দার্জিলিং গিয়ে আবার ফিরে আসতে পারবে!

সবচেয়ে বড় পিরামিডটা বানাতে নাকি এক লক্ষ লোকের বিশ বৎসর লেগেছিল।

ভেবে কুল-কিনারা পাওয়া যায় না, সে সম্রাটের কতখানি ঐশ্বর্য আর প্রতাপ ছিল, যিনি আপন রাজধানীর পাশে এক লক্ষ লোককে বিশ বছর খাওয়াতে-পরতে পেরেছিলেন। অন্য খরচের কথা বাদ দাও, এই এক লক্ষ লোকের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য যে বিরাট প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন সেটা গড়ে তোলা এবং তাকে বিশ বছর ধরে চালু রাখা তারাই করতে পারে, যারা সভ্যতার খুব একটা উঁচু স্তরে উঠে গিয়েছে।

এইবারে আমরা পিরামিড নির্মাণের কারণের কাছে পৌঁছে গিয়েছি।

প্রথম কারণ সকলেরই জানা। ফারাওরা (সম্রাটরা) বিশ্বাস করতেন, তাঁদের শরীর যদি মৃত্যুর পর পচে যায় কিংবা কোনো প্রকারের আঘাতে ক্ষত হয়, তবে তাঁরা পরলোকে অনন্ত জীবন পাবেন না। তাই মৃত্যুর পর তাঁদের দেহকে ‘মামি’ বানিয়ে সেটাকে এমন একটা শক্ত পিরামিডের ভিতর রাখা হত যে, তার ভিতরে ঢুকে কেউ যেন ‘মামি’কে ছুঁতে পর্যন্ত না পারে। কিন্তু হায়, তাঁদের এ-বাসনা পূর্ণ হয় নি। পূর্বেই বলেছি, হাজার হাজার বছর চেষ্টা করে দৃষ্ট (অর্থাৎ ডাকাতরা) এবং শিষ্টেরা (অর্থাৎ পণ্ডিতেরা) শেষ পর্যন্ত তাদের গোপন কবরে ঢুকতে পেরেছেন। তাই করে অবশ্য গোপত কোনো কোনো ফারাওয়ের মনোবাহা পূর্ণ হয়েছে—পণ্ডিতেরা তাদের মামি সম্বন্ধে জাদুঘরে সাজিয়ে রেখেছেন। সেখানে তাঁরা অক্ষত দেহে মহাপ্রলয়ের দিন গুনছেন, যেদিন তাঁরা নব দেহ নব যৌবন ফিরে পেয়ে অমৃতলোকে অনন্ত জীবন আরম্ভ করবেন।

কিন্তু যদি ইতিমধ্যে আরেকটা বিশ্ববৃদ্ধ লেগে যায়? ফলে গুল্টিকয়েক অ্যাটম বম পড়ে? তবে?

আমার মনে ভরসা, এঁরা যখন চোর-ডাকু ধনিক-পণ্ডিতের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে এত হাজার বৎসর অক্ষত দেহে আছেন তখন মহাপ্রলয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবেন-ই যাবেন। অ্যাটম বম পড়ার উপক্রম হলে আমি বরং তারই একটার গা ধোঁষে গিয়ে বসব। মামিটা রক্ষাকবচের মতো হয়ে তার দেহকে তো বাঁচাবেই, সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও বাঁচিয়ে দেবে। চাই কি, গোটা শহরটাই হয়তো বেঁচে যাবে!

পিরামিড নির্মাণের দ্বিতীয় কারণ,—এই কারণের উল্লেখ করেই আমি এ অনদ্বেদ আরম্ভ করেছি—

ফারাওরা বলতে চেয়েছিলেন, সভ্যতার যে স্তরে আমরা এসে পেঁাচেছি, আমরা যে প্রতাপশালী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছি, সেগুলো যেন এই পিরামিডের মতো অজর অমর এবং বিশেষ করে অপরিবর্তনীয় হয়ে থাকে। ‘পরিবর্তন যেন না হয়’, ‘যা আছে তাই থাকবে’, এই ছিল পিরামিড গড়ার দ্বিতীয় কারণ। পিরামিড জগদ্দল পাথর হয়ে—অতি শব্দার্থে জগদ্দল পাথরই বটে—যুগ যুগ ধরে আমাদের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য, রাজবংশ, ধর্মনীতি, সব কিছু অপরিবর্তনীয় করে চেপে ধরে রাখবে।

তাই পিরামিড দেখে মানুষের মনে জাগে ভয়। আজ যদি সেই ফারাওরা বেঁচে থাকতেন, তবে তার প্রতি জাগত ভীতি। এই পিরামিড যে তৈরী করতে পেরেছে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার কল্পনাও তো মানুষ করতে পারে না।

তাজমহলের গীতিরস কঠিন মানুষের পাষণ হৃদয়কেও গলিয়ে দেয়, কুতুবমিনারের ঋজু দেহ উন্নতশির দূর্বলজনকে সবল হয়ে দাঁড়াতে শেখায় এই দুই রস কাব্যের, সঙ্গীতের প্রাণ। তাজমহল নিয়ে তাজমহলের মতো কবিতা রচনা করা যায়, কিন্তু পিরামিড নিয়ে কবিতা হয়েছে বলে শুনিনি। বরষ পিরামিডের দোহাই দিয়ে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের অনুকরণে আজ এক নতুন ইজিপ্সিয়ান অর্ডিন্যান্স তৈরী করা যায়।

কিন্তু হায়, ফারাওরা ‘অপরিবর্তন’ের যে অর্ডিন্যান্স জারি করে বিরাট পিরামিড গড়েছিলেন, সেটা টিকল না। ফারাও বংশ ধ্বংস হল, দূর ইরানের রাজারা মিশর লণ্ডভণ্ড করে দিল, তারপর গ্রীক, রোমান এবং শেষটায় সারা মিশরের লোক ইসলাম গ্রহণ করে সম্পূর্ণ নতুন পথে চলল। মুসলমানরা দেহ এবং আত্মার পার্থক্য চেনে। অনন্ত জীবন পাওয়ার জন্য দেহটাকে যে মার্মি করে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই, সে কথা তারা বোঝে।

কিন্তু ফারাওদের দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। প্রায় সব দেশেই মানুষ উন্নতির চরম শিখরে পেঁাছে বলেছে, ‘এই ঠিক জায়গায় এসে পেঁাচেছি, আর এগিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই। যা সপ্তয় করোঁছি তাই বেঁচে থাকুক, সেইটেই অপরিবর্তনীয় হয়ে থাক।’ ফলে হয়েছে পতন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন এই বিষয় নিয়ে ‘তাজমহলের’ মতো কবিতা লিখেছেন তখন আমার আর বাক্যব্যয় করার কি প্রয়োজন?

॥ ১৯ ॥

চাঁদের আলোতে বিশ্বজন তাজমহল দেখবার জন্য জড় হয়।

পিরামিডের বেলাও তাই।

চতুর্দিকে লোকজন গিসগিস করছে। এদেশের মেলাতেও বোধ করি এত জিড় হয় না।

অবশ্য তার কারণও আছে। নিতান্ত শীতকাল ছাড়া গরমের দেশে দিনের

বেলা কোনো জিনিস অনেকক্ষণ ধরে রসিয়ে রসিয়ে দেখা যায় না। বিশেষ করে যেখানে কোন সূক্ষ্ম কারুকাজ দেখবার বালাই নেই সেখানে তো আরো ভালো। তাজের মিহি কাজ চাঁদের আলোতে চোখে পড়ে না, তবু সবসুধ মিলিয়ে তার যে অপূর্ব সামঞ্জস্য চাঁদের আলোতে ধরা দেয় দিনের কড়া আলোতে সেটা দর্শককে ফাঁকি দেয় বলে মানুষ চাঁদের আলোতে তাজ দেখে। পিরামিডে সে রকম কোনো নৈপুণ্য নেই, তবুপরি পিরামিডের চতুর্দিকে মরুভূমি বলে সেখানে দিনের বেলাকার গরম পীড়াদায়ক, কাজেই নিতান্ত শীতকাল ছাড়া দিনের বেলা কম লোকই পিরামিড দেখতে যায়।

পকাস্তুরে শীতের দেশে ব্যবস্থা অন্যরকম। আমি ফুটফুটে চাঁদের আলোতে কলোন গির্জার পাশ দিয়ে শীতের রাতে হি-হি করে বহুবার বাড়ি ফিরেছি। কাক-কোকিল দেখতে পাই নি।

পল পার্সি আর আমাদের দলের আরো কয়েকজন পিরামিডের মাঝখানকার কবর-গৃহ দেখতে গেছেন। আমি যাই নি।

আমি বসে বসে শুনছি, জাত-বেজাতের কিচিরমিচির, স্যাণ্ডউইচ খোলার সময় কাগজের মড়মড়, সোডা-লেমেনড খোলার ফটাফট। ইয়োরোপীয়েরা খাবার ব্যবস্থা সঙ্গে না নিয়ে তিন পা চলতে পারে না। পিরামিড হোক আর নিমতলাই হোক, মোকামে পেঁছনো মাত্রই বলবে, ‘টম, বাস্কেটটা এই দিকে দাও তো। ডিক্‌ তুমি ক্লাসিক থেকে চা ঢালো’ আর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ‘ডার্লিং, আপেলগুলো ভুলে যাও নি তো?’ ইতিমধ্যে হ্যারি হয়তো গ্রামোফোনের জাঁতা চালিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য যদি দলে মেয়েরা ভারী হন তবে কোনো কিছুই শুনতে পাওয়া যায় না। ‘লার্ভলি’, ‘গ্র্যাণ্ড’, ‘সবলাইম’ ইত্যাদি শব্দ তখন যে ঘ্যাটি তেরী হয় তার কোনটা কি, ঠিক ঠাহর করা যায় না।

কোনো কোনো ট্যুরিস্ট আমাকে বলেছেন, নায়াগ্রার গম্বীর জল-নির্বোষ শুনতে হলে নাকি মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে যেতে নেই। যে ধর্মান তাদের ভিতর ওঠে তাতে নাকি নায়াগ্রার—থাক, মেয়েরা আমার উপর এমনিতেই চটে আছেন। কিন্তু আমার উপর চটে আর লাভ কি? ওঁরাবাদের খাস-পেয়ারা কবি রবি ঠাকুরই এ-বাবদে কি বলেছেন?—

‘ছেলেরা ধরিল পাঠ, বড়ারা তাম্রক,
এক দণ্ডে খুলে গেল রমণীর মূখ।’

পল-পার্সি ফিরে এসেছে। আমি শুধালুম, ‘কি দেখলে, বাছারা?’ তারপর নোটবুক খুলে বললুম, ‘গুছিয়ে বলো, সব কিছু টুকে নেব; আমি তো বে-আক্কেলের মতো এইখানে বসে বসে সময় কাটালুম।’

পার্সি করুণ কণ্ঠে বললে, ‘আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবেন না, স্যর। দেখেছি কচু পোড়া। মশালের আলোতে হাতের তেলো চোখে পড়ে না। তারই জোরে বিশ্বর সূড়ঙ্গ পেরিয়ে একটা চৌকো ঘরে শেষটায় পেঁছলুম। বেসাক ভেঁ ভেঁ। এক কোণে একখানা ভাঙা ঝাঁটা পর্যন্ত নেই। গাইড বললে, “ব্যান্‌ ফিরে চলুন।” আপনি তখনই বারণ করলেন না কেন?’

আমি বললুম, 'বারণ করলে কি শুনতে? বাকী জীবন মনটা খুঁতখুঁত করতো না, ফারাওয়ার শেষ শোওয়ার ঘর দেখা হল না? এ হল দিল্লীর লাভ্‌ডু।'

শুধালে, 'সে আবার কি?'

আমি বুঝিয়ে বললুম।

পল বললে, 'গাইড বলছিল, পিরামিডের যে বিরাট বিরাট পাথর সেগুলো নাকি টেনে টেনে নদীর ওপার থেকে এখানে আনা হয়েছিল। আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না—ওর যা ইংরেজী!'

আমি বললুম 'ঠিকই বলেছে। নীলের এপারে পাথর পাওয়া যায় না। তাই ওপার থেকে পাথর কেটে ভেলায় করে এপারে নিয়ে আসা হত। আর সে যুগে মানুষ চাকা কি করে বানাতে হয় জানত না বলে সেই পাথরগুলো ধাক্কা দিয়ে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেত। কাঠ বাঁশ দিয়ে পথ তৈরী করা হত পিছলে নিয়ে যাবার সুবিধের জন্য। এবং শুনছি, সে পথে নাকি ঘড়া ঘড়া তেল ঢালা হত, সেটাকে পিছলে করার জন্যে। আশ্চর্য নয়! এর ছটা পাথরে যখন একটা এঞ্জিনের আকার ধরতে পারে, এবং স্পষ্ট দেখছি, এঞ্জিন রেল লাইন থেকে কাত হয়ে পড়ে গেলে তাকে খাড়া করবার জন্য আজকের দিনের কপিফল পর্যন্ত কি রকম হিমশিম খায়, তখন তো তেল-ঘি ঢালার কথা আর অবিশ্বাস করা যায় না।'

তখন আলোচনা আরম্ভ হল চাকা আবিষ্কার নিয়ে। আগুন যে রকম মানুষকে সভ্যতার পথ দেখিয়ে দিল, চাকাও মানুষকে ঠিক তেমনি বাকি পথটুকু অক্লেশে চলতে শেখালে। শুনছি, ভারতের মোন-জো-দড়োতে প্রথম চাকা আবিষ্কার হয় এবং ক্রমে ক্রমে সেটা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

আমরা এখনো যখন পার্লিক চাঁড় তখন বোধ হয় সেই আদিম যুগে ফিরে যাই, যখন মানুষ চাকা আবিষ্কার করতে শেখে নি। ছজন বেয়ারা একটি মেয়েকে বইতে গিয়ে ঘেমে নেয়ে যায়, ঘড়ি ঘড়ি জিরায় আর গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খায়; ওদিকে একজন রিক্সাওয়ালা দুটো লাশকে দিবা টেনে নিয়ে যায়—সবই চাকার কল্যাণে।

আব্দুল আসফিয়া বললেন, 'চাকা এরা আবিষ্কার করতে পারে নি সত্যি, কিন্তু হাতের নৈপুণ্যে এরা আর সবাইকে হার মানিয়েছে। এই যে হাজার হাজার টন লক্ষ লক্ষ পাথর একটার গায়ে আরেকটা জোড়া দিয়েছে, সেখানে এক ইঞ্চির হাজার ভাগের এক ভাগের কাজ। আজকের দিনের জহুরীরা, চশমা বানানো ওলারাও এত সূক্ষ্ম কাজ করতে পারে কি না সম্ভেদ আর জহুরীদের কাজ তো এক ইঞ্চি আধ ইঞ্চি মাল নিয়ে। এরা সামলেছে লক্ষ লক্ষ ইঞ্চি।'

আমরা শুধালুম, 'তা হলে তারা সে নৈপুণ্য কোনো সূক্ষ্ম কলা নির্মাণে, কোনো সৌন্দর্যসৃষ্টিতে প্রয়োগ করল না কেন?'

আব্দুল আসফিয়া বললেন, 'সেটা দেখতে পাওয়া যায় তাদের মন্দিরগারে, তাদের প্রস্তরমূর্তিতে।'

হায়, সেগদুলো এখন দেখবার উপায় নেই।

পার্সি ততক্ষণে বালু জড়ো করে বালিশ বানিয়ে তারই উপর মাথা দিয়ে শূয়ে পড়েছে। তথালোচনার প্রতি তার একটা বিধিদস্ত আজন্মলক্ষ্য নিরাকুশ বৈরাগ্য আছে। স্বতই ভক্তিভরে মাথা নত হয়ে আসে।

আব্দুল আসফিয়া বললেন, ‘অনেক রাত হয়েছে। শহরে ফেরা যাক।’

পল অনেকক্ষণ ধরে গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবছিল। মোটরের দিকে যেতে যেতে বললে, ‘আমার কিন্তু সমস্ত জিনিসটা একটা হিউজ ওয়েস্ট বলে মনে হয়।’ আমরা সবাই চূপ করে শুনলুম।

আমাদের দলের মধ্যে একটি প্রোটা মহিলা ছিলেন। তিনি বললেন, ‘না, মিসিয়ো পল। পিরামিডের একটা গুণ আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। এর সামনে দাঁড়ালে, বয়সের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, আমাকেও তরুণী বলে মনে হয়।’

একটা কথার মতো বটে।

আমি বললুম, ‘শাবাশ!’

॥ ২০ ॥

মানুষের চেহারা জাগ্রত অবস্থায় এক রকম, ঘুমন্ত অবস্থায় অন্য রকম। শহরের বেলাতেও তাই। জাগ্রত অবস্থায় কোনো মানুষকে বেশ চালাক-চতুর বলে মনে হয়, কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় তাকেই দেখায় আস্ত হাবা গঙ্গারামের মতো। দুপুর বেলা লালদীঘি গমগম করে, রাত্রে সেখানে গা ছমছম করে। আমাদের পাড়া পার্ক সার্কাসের ট্রাম ডিপো অঞ্চল দুপুরবেলা ঘুমিয়ে পড়ে, সম্মুখ হোটেলগুলো যেন কোরাস গান গেয়ে ওঠে।

রসের ক্ষেত্রে আমি ছেলে-বুড়োতে তফাত করি নে। আট বছরের ছেলে মহাভারত পড়ে সুখ পায়, আশী বছরের বুড়োও আনন্দ পায়। আবার আট বছরের ছেলে দিব্য কীর্তন গেয়ে শুনিয়ে দিলে, ষাট বছরের সুরকানা পিঁড়িত ধরতে পারলে না, সেটা কীর্তন না বাউল! অর্থাৎ রসবোধের ক্ষমতা বয়সের উপর নির্ভর করে না।

কিন্তু কোনো কোনো ছোটখাটো রস বয়সের উপর নির্ভর করে। আট বছরে সিগারেট খেয়ে কোনো লাভ নেই, আঠারোতেই রাস্তায় মার্বেল খেলার রস শূন্য হয়ে যায়। ঠিক তেমনি রাতের শহর ছোটদের জন্য নয়। তুলনা দিয়ে বলি; সকাল আটটায় আট বছরের ছেলেকে আটখানা ট্যাক্সি ডাকতে পাঠাতে পারি, কিন্তু রাত দশটায় দশ বছরের ছেলেকে দশ জায়গায় পাঠাতে পারি নে।

কিন্তু যে-সব দুঃখে ছেলেরা—যেমন পল পার্সি—রাত দুটোর সময় জেগে আছে, তাদের নিয়ে কি করা যায়? আব্দুল আসফিয়া অভয় জানিয়ে বললেন,

কাইরোতে এমন সব নাচের জায়গা আছে, যেখানে বাপ্ মা আপন ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আনন্দ করতে যান !

তারই একটা 'কাবারে'-তে যাওয়া হল ।

খোলাতে । উপরে মন্ডু আকাশ । চতুর্দিকে জাপানী ফানুসে ঢাকা রঙ-বেরঙের আলোর জ্যোতি ক্ষীণ বলে উপরের দিকে খানিকক্ষণ তাকালে গম্ভীর আকাশের গায়ে চটুল তারার মিটমিটে নাচ দেখা যায় ।

শ'খানেক ছোট ছোট টেবিল । এক প্রান্তে স্টেজ । ডাইনে বাঁয়ে উইণ্ড নেই, পিছনে শূন্য হৃদয় শূন্যতার এক পার্টির মতো কিংবা বলতে পারো, সাপের ফণার মতো উঁচু হয়ে উগার কাছে নিচের থেকে বেঁকে আছে স্টেজের বিরাট ব্যাকগ্রাউন্ড । শূন্যতে আবার ঢেউ-খেলানো—এ রকম ছোট্ট সাইজের ঝিনুক সমুদ্রপাড়ে কুড়িয়ে পাওয়া যায়—দেখতে ভারি চমৎকার । ব্যাকগ্রাউন্ডের পিছনে এরই আড়ালে গ্রীনরুম নাকি, না মাটির নিচে সুড়ঙ্গ করে ?

হঠাৎ সব কিছু অস্বকার হয়ে গেল । ভাবছি ব্যাপার কি । পল পার্সি'কে কানে কানে বললুম, 'মিনিব্যাগ চেপে ধরো । বলা তো যায় না, বিদেশ-বিভূ'ই জায়গা ।'

নাঃ, আলো জ্বলতে দেখি, শূন্যতার সামনে এক স্ফিন্‌ক্স । পিরামিডের পাশে আমরা স্ফিন্‌ক্সের পাথরের মূর্তি দেখছি—অবশ্য এর চাইতে পাঁচশো গুণে বড় । স্ফিন্‌ক্স মিশরের সম্রাট ফারাওয়ের প্রতিমূর্তি । মূখ্যটা রাজারই মতো, শূন্য শক্তি আর প্রতাপ বোঝানোর জন্য শরীরটা সিংহের ।

পিছন থেকে বেরিয়ে এল ছিটি মেয়ে । গলা থেকে পা অবধি ধবধবে সাদা শেমিজের মতো লম্বা জামা পরা । রাস্তায় মিশরী মেয়েদের এ রকম জামা পরতে দেখছি । তবে অন্য রঙের ।

আস্তে আস্তে তারা স্ফিন্‌ক্সের চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচতে আরম্ভ করল । বড় মন্ডু পদক্ষেপ । পায়রা যে-রকম নিঃশব্দ পদসঞ্চারে হাঁটে । চাঁদ যে রকম আকাশের উপর দিয়ে তারার ফুলকে না মাড়িয়ে আকাশের এপার-ওপার হয় ।

পায়ে ঘুঙুর নেই, হাতে কঁকিন নেই । শূন্য থেকে থেকে সমের একটু আগে তেহাইয়ের সময় থেকে বাঁশি, খঞ্জনী আর ঢোলের সামান্য একটুখানি সঙ্গীত । বড় করুণ, অতি বিষাদে ভরা । নীলনদের এপার থেকে মা যেন ওপারের ছেলেকে সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফেরার জন্য ডাকছে । এ ডাক আমি জীবনে বহুবার শুনছি । যে মা-ই ডাকুক না কেন, আমি যেন সে ডাকে আমার মায়ের গলা শুনতে পাই ।

সে ডাক বদলে গেল । এবারে শুনতে পাচ্ছি অন্য স্বর । এ যেন মা ছেলেকে ঘুম থেকে জাগাবার চেষ্টা করছে । এ গলায় গোড়ার দিকে ছিল অনুন্নয়-বিনয় । তার পর আরম্ভ হল আশা-উদ্দীপনার বাণী । সঙ্গীত জোরালো হয়ে আসছে । পদক্ষেপ দ্রুততর হয়েছে । ছিটি নয় এখন মনে হচ্ছে যেন ষাটটি মেয়ে দ্রুত হতে দ্রুততর লয়ে নৃত্যঙ্গন অপূর্ণ আলিঙ্গনে পরিপূর্ণ করে

দিয়েছে ! আর পদক্ষেপের কণামাত্র স্থান নেই ।

স্বপ্নে অজানা লিপি, অচেনা বাণী মানুষ যেমন হঠাৎ কোনো এক ইন্দ্রজালের প্রভাবে বদলে ফেলে, আমি ঠিক তেমনি হঠাৎ বদলে গেলুম নাচের অর্থটা কি । এ শুধু অর্থবিহীন পদক্ষেপ নয়, ব্যঞ্জনাহীন হস্ত-বিন্যাস নয় । নর্তকীরা নব মিশরের প্রতীক । এরা প্রাচীন মিশরের প্রতীক স্ফিনক্সকে তার যুগ-যুগান্ত-ব্যাপী নিদ্রা থেকে জাগরিত করতে চাইছে । সে তার লুপ্ত গোরব নিয়ে সূর্যপূজাল ছিন্নভিন্ন করে আবার মিশরে স্মৃতিপ্রতিষ্ঠিত হোক, বিদেশী ঐশ্বর্যতন্ত্রের কুহেলিকা উদ্‌ঘাটন করে সেই প্রাচীন সর্বিতার নবীন মূর্তি দ্বালোক ভুলোক উদ্ভাসিত করুক ।

তবে কি আমারই মনের ভুল ? দেখি, স্ফিনক্স মূর্তির মূখে যেন হাসি ফুটে উঠেছে । এ কি জাদুকরের ভানদৃষ্টি, না সৃষ্টিকর্তার অলৌকিক আশীর্বাদ ?

আবার অশ্ধকার হয়ে গেল ।

নিদ্রিতের চোখে যে রকম পড়ে, আমার চোখে ঠিক তেমনি এসে পড়ল পশ্চিমাকাশ থেকে চন্দ্রান্তের রক্তছটা আর পূর্বাকাশ থেকে নব অনুগোধয়ের পূর্বাভাস ।

জয় মিশরভূমির জয় ।

॥ ২১ ॥

ইংরেজীতে কি যেন একটা প্রবাদ আছে,—

Early to bed and early to rise

তার পর কি যেন সব হয় ? হ্যাঁ বাঙলাটা মনে পড়েছে ; —

সকাল সকাল শূতে যাওয়া সকাল বেলা ওঠা,

স্বাস্থ্য পাবে বিদ্যে হবে, টাকাও হয় মোটা ।

গ্রামের তুলনায় শহরে টাকা বেশী, রাস্তায় রাস্তায় বিদ্যের ভান্ডার ইন্সকুল-কলেজ, আর শহরবাসীকে অজর অমর করে রাখবার জন্য কত ডাক্তার-কবিরাঞ্জ-হেঁকিম না খেয়ে মরছে তার হিসেব রাখে কে ? তাই বোধ হয় শহরের লোক সকাল সকাল শূতে যাওয়ার আর সকাল বেলা ওঠার প্রয়োজন বোধ করে না । গ্রামের লোক তাই এখনো ভোরবেলা ওঠে । কাইরো শহর তাই এখনো ঘুমুচ্ছে—অবশ্য নাক ভাকিয়ে নয় ।

আবুল আসফিয়া বললেন, ‘তা ঠিক, কিন্তু মুসলমানদের প্রথম নমাজ পড়তে হয় কাক-কোকিল ডাকার পরলা । এদেশে তাদের বড় বড় মসজিদ-মাদ্রাসা আজহর পাড়ায় । সেখানেই যাওয়া যাক । তারা নিশ্চয়ই ঘুম থেকে উঠেছে ।’

উত্তম প্রস্তাব । কিন্তু মসজিদের নমাজীদের দেখবার জন্য এই সদূর কাইরো শহরে আসা কেন ? আপন কলকাতায় জাকারিয়া স্ট্রীটে গেলেই হয় !

উ'হু, সেইটেই নারিক কাইরোর প্রবীণ অঙ্গল। অবশ্য পিরামিডের তুলনায় অতিকায় নবীন—বয়স মাত্র এক হাজার বৎসর, কিঞ্চিৎ এদিক-ওদিক। প্রাচ্যের রোমান্টিক নগরী কাইরো বলতে জগৎজনের মনে আরবিস্থানের যে রঙীন তসবির ফুটে ওঠে সে বস্তু নারিক এখনো ঐ অঙ্গলেই পাওয়া যায়।

ট্রাম কিন্তু তখনই চলতে আরম্ভ করেছে। কলকাতার ট্রামের তুলনায় অতিশয় লজ্জাড় এবং ছুটির দিনে ইন্স্কুল-কলেজের মতো ফাঁকা।

পয়লা ট্রাম দেখা মাত্রই আব্দুল আসফিয়া তড়িঘড়ি ট্যাক্সিওলাদের পাওনা পয়সা বৃষ্টিয়ে দিয়ে বিদেয় করে দিয়েছেন। পয়সা বাঁচবার এ ফাঁকির সবাই জানে কিন্তু বিদেশ-বিভূ'ইয়ে কে জানে কোন ট্রাম কোথায় যায়? আপন কলকাতাতেই যখন ট্রামের গুবলেটে নিত্য নিত্য কালীঘাট যেতে গিয়ে পে'ছে যাই মৌলা আলী, কিংবা বলতে পারো মর মর অবস্থায় মেডিকেল কলেজে না পে'ছে ট্রাম ভিড়ল নিমতলায়! 'বল্ হার, হরি বল!'

আব্দুল আসফিয়া বললেন, 'আল্লা আছেন, ভাবনা কি।'

‘তব সাথী হয়ে দশ মরুতে

পথ ভুলে তবু মরি

তোমারে তাজিয়া মসজিদে গিয়া

কি হবে মস্ত স্মরি!’

শব্দ খুব ভরসা পেলুম না। হরিই বলো আর আল্লাই বলো, তাঁরা সব ক-জনা এই কটা বাউন্ডলের জন্য অন্য সব কিছুর ছেড়ে দিয়ে এই অবেলায় ঠিক ট্রাম ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় পাঠাবার তদারকিতে বসে আছেন—এ ভরসা করতে হলে যতখানি বিশ্বাসী হতে হয় আমি ঠিক ততখানি নই। তা হই আর না-ই হই, আর পাঁচ জনের সঙ্গে সঙ্গে ট্রামেই উঠতে হল।

রাস্তা ক্রমেই সরু হয়ে আসছে। পৃথিবীর সর্বত্র যা হয়—খোলা-মেলার নতুন শহর থেকে নোংরা ঘিঞ্জি পুরানো শহরে ঢোকবার সময়।

রাস্তার দু'দিকে দোকান-পাট এখনো বন্ধ। দু-একটা কফির দোকান খুলিখুলি করছে। ফুটপাথের উপর লোহার চেয়ারের উপর পশ্চাসনে বসে দু-চারটি সুদানী দারোয়ান তসবী টপকাচ্ছে, খবরের কাগজগুলার দোকানের সামনে অল্প একটু ভিড়, চাকরবাকররা হনহন করে চলেছে বড় মায়েবদের বাড়ি পে'ছিতে ঘের হয়ে গিয়েছে বলে।

তরল অশ্বকার সরল আলোর জন্যে ক্রমেই জায়গা করে দিচ্ছে। কালো চুলের মাঝখানে সাদা সি'থি ফুটে উঠেছে। তার উপর দেখা যাচ্ছে লাল সি'দুরের পোছ। আকাশ বাতাসের এই লীলা-খেলাতে সব কিছুর পট্টাপটি দেখা গেল তা নয়, কিন্তু ট্রামের জানালার উপর মাথা রেখে আধো ঘুমে আধো জাগরণে জড়ানো জড়ানো হয়ে সব কিছুরই যেন কিছু কিছু দেখা হল। স্বপ্নে ঘুমে জাগরণে মেশানো অভিজ্ঞতা ভাষাতে প্রকাশ করা কঠিন। ছবিতে এ জিনিস ফোটানো যায় অনেক অঙ্গুণে। তাই বোধ হয় চিত্রকরদের সূর্যোদয়ের ছবি, সাহিত্যের সূর্যোদয়কে প্রায়ই হার মানায়।

সবচেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছিল মসজিদের চুড়ো (মিনার)-গদুলোকে। কুৎব-মিনার যারা দেখেছে তারাই জানে তার সৌন্দর্য কি। মনে হয় সে যেন পৃথিবীর ধূলো-মাটির প্রাণী নয়। সে যেন কোনো রাজাধিরাজের উষ্ণীষ—দেশের আপামর জনসাধারণের বহু উর্ধ্ব দাঁড়িয়ে ভগবানের আপন হাতের অভিষেক আশীর্বাদের পরশ পাচ্ছে।

তবু কুৎবের পা মাটিতে ঠেকেছে। এদের বহু মিনার দাঁড়িয়ে আছে আল্লার নামাজের ঘর মসজিদের উপর। কিন্তু এরা জানে উপরের দিকে আল্লার কাছে যাওয়ার অর্থ কি। সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যতই উপরের দিকে যাচ্ছে ততই ভয়ে জড়সড় হয়ে সরু হয়ে যাচ্ছে—কাসের গান্দা-গোন্দা ছেলেও যে-রকম হেড মাস্টারের সামনে শরকাঠিটি হয়ে যায়। কিন্তু দুলোক আর সবিতা যেন ওদের অভয় দিচ্ছেন। আকাশ যেন তাঁর আপন নীলাম্বরী তাদের পরিণয়ে দিতে এসেছেন—পিছনের দিকটা পরা হয়ে গিয়েছে, আর সবিতা যেন অরুণালোকের লম্বা লম্বা দাঁড় ফাঁস লাগিয়ে তাদের খাড়া রাখবার চেষ্টা করছেন। তাই দেখে ওমর খৈয়াম বললেন,

And lo ! the Hunter of the East has caught
The Sultan's turret in a noose of light.

(Fitzgerald)

কাস্তি ঘোষের ইংরিজী অনুবাদ সচরাচর উক্ত কিন্তু এস্থলে আমি একটু আপত্তি জানাই। তাঁর অনুবাদে আছে,—

পূর্ব-গগনের দেব শিকারীর স্বর্ণ-উজল কিরণ তাঁর

পড়ল এসে রাজপ্রাসাদের মিনার যেথা উচ্চ শির ! (কাস্তি ঘোষ)।

আসলে কিন্তু সূর্যালোক তাঁরের মতো মিনারের উপর আঘাত দিতে পারে আবার 'নুস'—ফাঁসের মতোও তাকে জড়িয়ে ধরতে পারে। তফাত বিশেষ কিছুর নেই আর 'পাগলা' কবিরা কত যে উদ্ভট উপমা দেয় তার কি ইয়ত্তা আছে? তবে কি না অনুবাদের বেলা মূল্যের যত কাছে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

প্রকৃতির গড়া নীল, আর মানুষের গড়া পিরামিডের পরেই মিশরের মসজিদ ভুবন-বিখ্যাত এবং সৌন্দর্যে অতুলনীয়। পৃথিবীর বহু সম্রাটদের শৃংখলা এই মসজিদগুলোকেই প্রাণভরে দেখবার জন্য সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে কাইরোতে আসেন। পিরামিড যারা বানিয়েছিল তাদের বংশধররাই এ-সব মসজিদ তৈরী করেছে কিন্তু এদের গায়ে ইতিমধ্যে কিষ্টিং ইরানী, গ্রীক, রোমান এবং পরবর্তী যুগে বিস্তর আরব-রক্ত ঢুকে পড়েছিল বলে এরা মসজিদগুলো বানিয়েছে ভিন্ন শৈলীতে। বিশেষত—পূর্বেই বলেছি—পিরামিড তার লক্ষ লক্ষ মণ ওজন নিয়ে মাটির উপর ভারীকি চালে বসে আছে, তার রাজা যে ভাবে প্রজাদের বৃকের উপর জগম্বল পাথরের মতো বসতেন তারই অনুকরণ করে। পরবর্তী যুগের

১ স্বর্গীয় কাস্তি ঘোষ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আর বহু গুণী-জনের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে এ-অধমও তাঁর অনুবাদে উচ্ছ্বসিত।

মসজিদ যারা বানিয়েছিল তারা মুসলমান। তারা রাজার রাজা সৃষ্টিকর্তাকে দেয় সর্বোচ্চ স্থান। তাই তাদের মসজিদের মিনারগুলো উপরের দিকে খেয়ে চলেছে দ্যালোকেশ্বরের সম্মানে। কিংবা বলতে পারো তারা দাঁড়িয়ে আছে, মুসলমান নমাজ পড়ার সময় যে রকম প্রতিদিন পাঁচ বার সোজা হয়ে আল্লার সামনে দাঁড়ায়। তাই পিরামিডে ভীতিরস, মসজিদে গীতিরস।

পল পার্সি দেখলুম এ রসে ঈষৎ বণ্ডিত। আমরা পুরনো কাইরোর মাঝখানে পেঁছতেই ট্রাম ছেড়ে একটা মসজিদের অদৃষ্টপূর্ব সৌন্দর্য দেখতে আরম্ভ করেছি; ওরা দেখি, মা-মাসীর তন্মিতে গিয়ে শীতের গঙ্গাস্নানের সময় আমরা যা করি তাই করছে। গঙ্গা যে সুন্দর সেটা স্বীকার করছে কিন্তু তাতে নিমজ্জিত হওয়ার আনন্দ সম্বন্ধে সন্দেহান।

পার্সি একটু ঠোঁটকাটা। হক কথা—অর্থাৎ যেটাকে সে হক ভাবে, সেটা টক হলেও ক্যাট ক্যাট করে বলতে পারে। পলের ভাবটা একটু আলাদা। অশ্বখামা যদি পিটুলি-গোলা খেয়ে সানন্দে তান্ডব নৃত্য জোড়ে তবে পার্সি তাকে তন্মহুর্ভে বলে দেবে যে দুধের বদলে তাকে বোল দিয়ে ফাঁক দেওয়া হয়েছে, আর পল ভাববে, কি হবে ওর ভুল ভাঙিয়ে তার আনন্দটি নষ্ট করতে, ও যে আনন্দ পাচ্ছে তাতে তো কারো কোনো লোকসান হচ্ছে না।

পার্সি বললে, ‘হুঃ! যত সব! পিরামিড? হ্যাঁ বন্ধি। মোক্ষম ব্যাপার। চারটিখানি কথা নয়। পারি ও রকম একটা বানাতে? মানলুম, এ মসজিদটা সুন্দর কিন্তু এটা বানানো আর তেমন কি?’

পার্সিও মসজিদ দেখে বে-এস্তোরার হয় নি। সে কথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু এ যুক্তিটা তারও মনঃপুত হল না। শুধালে, ‘পারো তুমি বানাতে?’ ‘আলবত।’

আমি বললুম, ‘সম্প্রদেহের কিঞ্চৎ অবকাশ আছে। আজকের দিনে যে সব কল-কল্যাণ দিয়ে নানা রকম অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস তৈরী করা যায় তাই দিয়ে পিরামিড তৈরী করা অসম্ভব নয়। কিন্তু এ মসজিদে যে নিপুণ মোলারেম কারুকার্য আছে সে রকম করবার মতো হাত আজকের দিনে আর কারো নাই। আর থাকলেই বা কি? সেটা তো হবে নকল। তুমি যদি একটা বিরাট দীঘি খোঁড়ো তবে এ কথা কেউ বলবে না, এটা অমুকদীঘির নকল। তুমি যদি একটা পিরামিড বানাও তবে কেউ বলবে না এটা পিরামিডের নকল, কারণ সব পিরামিডই হুবহু একই প্রকারের, কোনোটা বেশী বড় কোনোটা কম বড়। কিন্তু তুমি যদি ‘হ্যামলেট’-খানা নকল করে মাসিক প্রতিকায় পাঠাও তবে তারা ছাপবে না, বলবে নকল। তুলনাটা মনঃপুত হল না? তবে বলি, তুমি যদি মোনালিজার ছবি পর্যন্ত হুবহু একে ফেলো তবে সবাই বলবে, নকল, তবে ওস্তাদের হাত বটে, ‘বাঃ!’ কেউ বলবে না, ‘আঃ!’

পল শুধালে, ‘বাঃ’ আর ‘আঃ’-এর তফাতটা কি?’

আমি বললুম, ‘যেখানে শৃঙ্খলা হাতের ওস্তাদী কিংবা ঐ জাতীয় কিছু একটা, যেমন মনে করো মাটির থেকে একশ হাত উপরে একটা দাঁড়ির উপর হেঁটে

চলে যাওয়া, কিংবা মনে করো সিঙ্গিটার মূখের ভিতর আপন মূখুটো ঢুকিয়ে দেওয়া, এক কথায় সার্কাসের তাবৎ কসরত দেখে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলি, ‘বাঃ !’ পিরামিডের বেলাও তাই, বলি ‘বাঃ !’ কিন্তু অমিতাভের উত্তম প্রতিকৃতিতে তাঁর শাস্ত প্রশান্ত মূখচ্ছবি কিংবা মাদম্মার মূখে বিগলিত মাতুরস দেখে আমরা রসের সাগরে ডুবতে ডুবতে বলি, ‘আঃ ! কি আরাম ! কি সৌন্দর্য !’ ‘বাঃ’-এর কেরদানি যতই কঠিন, যতই রোমাণ্ডকর হক না কেন তার শেষ মূল্য ‘আঃ’-এর জিনিসের চেয়ে কম। এভারেস্টের চূড়ায় ওঠা যত কঠিনই হোক না, তার মূল্য তির্যাসী পথিককে এক পাশ জল দেওয়ার চেয়ে অনেক কম। এই যে পার্সি বললে, সে পিরামিড বানানোর মতো কঠিন কর্ম করতে পারে না, সেইটেই সব কিছু যাচাই করার শেষ কণ্ঠিপাথর নয়। শেক্সপীর খুব সম্ভব দড়ির উপরে ধেই ধেই করে নৃত্য করতে পারতেন না। তাই বলে ঐ কর্ম তার ‘হ্যামলেটের’ চেয়ে মূল্যবান এ রায় কে দেবে ? আসলে দুটো আলাদা জিনিস। তুলনা করাই ভুল। পিরামিডে আছে ইঞ্জিনিয়ারিং হুনের-হেমকণ্ঠ (স্কিল) আর মসজিদে আছে রসসৃষ্টি (আর্টিস্টিক ক্রিয়েশন)।

ইতিমধ্যে দেখি একটি মিশরীয় জাম্বা-জোম্বা-পরা ছাত্র আজহর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মসজিদ থেকে বেরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে আসছে। চেহারা দেখে ভারতীয় বলেই মনে হল।

॥ ২২ ॥

আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স পুরো-পাক্কা এক হাজার বৎসর। অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, প্যারিস, বার্লিন এর চেয়ে কয়েকশ বছরের ছোট। তবু আজ যে সব গুণীজ্ঞানীর নাম পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এঁরা ঐ-সব ইয়োরোপীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র। আজহর থেকে যারা বেরোন তাঁদের নাম তো শুনতে পাই নে। হ্যাঁ, মনে পড়ল, মিশরের গাধী বলতে যাকে বোঝায় সেই সাঁদ জগলুল পাশা ছিলেন আজহরের ছাত্র। কিন্তু আর কারো নাম শুনতে পাই নে কেন ?

আশ্চর্য ! মুসলমানরা যখন স্পেন দখল করল তখন তারা সেখানে আজহরের অনুরণে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ল। প্যারিস য়ুনিভার্সিটির গোড়াপত্তন যারা করেন, তাঁদের অনেকেই লেখা-পড়া শিখিছিলেন স্পেনের মুসলমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। এবং প্রথম দিককার পাঠ্যপুস্তকগুলো পর্যন্ত আরবী বই থেকে লাতিনে অনুবাদ করা। আজ আর আজহরের নাম কেউ করে না, করে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের।

কিন্তু আশ্চর্য হই কেন ? একদা এই ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান ভারতবর্ষের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। গ্রীকরা আমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখিছিল। পরবর্তী যুগে ইয়োরোপীয়েরা আমাদের কাছ থেকে শূন্যের ব্যবহার শিখল (লক্ষ্য করেছ বোধ হয় রোমান হরফে যখন I, II, X, XII, C M, লেখ তখন শূন্যের

ব্যবহার আদর্শেই হয় না) এবং তারই ফলে তাদের গণিত-শাস্ত্র কী অসাধারণ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল। আরবরা চরক সূত্রভেদে অনুবাদ করলে, আরো কত কী। একাদশ শতকে ভারত আক্রমণকারী সুলতান মাহমুদের সভাপরিষদ অল-বীরুনী সংস্কৃত শিখে ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে বই লেখেন তা পড়ে সে যুগের মুসলিম জগৎ অবাক হয়ে ভারতবর্ষের গুণগান করেছিল। তারও পরবর্তী যুগে সম্রাট আওরঙ্গজেবের বড় ভাই দারা শীকুর উপনিষদ সম্বন্ধে ফার্সী বই লিখতেন তর্জমা হয়ে যখন ইয়োরোপে বেরলো তখন সে-বই নিয়ে ইয়োরোপে কী তোলপাড়ই না হয়েছিল। সে যুগের সেরা দার্শনিক শোপেন-হাওয়ার তখন বলেছিলেন, ‘এ-বই আমার জীবনের শেষ কটা দিন শান্তিতে ভরে দেবে।’ ঐ সময়েই বিশ্বকবি গ্যোটে শকুন্তলার অনুবাদ পড়ে ঘন ঘন ‘সাধু, সাধু’ বলেছিলেন।

এখনো ভারতবর্ষের, আজহরের পুরনো সম্পদের সম্মান ইয়োরোপীয়রা করে কিন্তু আজকের দিনে যারা শুধু সংস্কৃত কিংবা মিশরে আরবীর চর্চা নিয়ে পড়ে থাকেন তাঁদের নাম কেউ করে না। তারা এমন কিছু সৃষ্টি করতে পারেন না কেন যা পড়ে বিশ্বজন বিমোহিত হয়ে পূনরায় ‘সাধু, সাধু’ রবে হৃৎকার তোলে?

হায় এঁদের সৃজনী শক্তি ফুরিয়ে গিয়েছে। কেন ফুরলো? তার একমাত্র কারণ, এক বিশেষ যুগে এসে এরা ভাবলেন এঁদের সব কিছু করা হয়ে গিয়েছে, নতুন আর কিছু করবার নেই, পুরনো পর্দা ভাঙিয়ে খেলেই চলবে।

এবং তার চেয়েও মারাত্মক কথা, এরা অন্যের কাছ থেকে আর কিছু শিখতে চান না। এঁদের দৃষ্ট দেখে তাই স্তম্ভিত হতে হয়।

আজহরের ছেলোটিকে জিজ্ঞেস করলুম, ‘তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্স কোমিশিট্রি বটনি পড়ানো হয়?’

সে শূন্যালে, ‘এ-সব কি?’

অনেক কষ্টে বোঝালুম।

সে বললে, ‘ধর্মশাস্ত্রে যা নেই, তা জেনে আমার কি হবে?’

আমি বললুম, ‘অতিশয় হক কথা। ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো গতি নেই, কিন্তু দ্বাতঃ, তোমার পা যদি আজ আছাড় খেয়ে ভেঙে যায় আর ডাক্তার বলে, এত্নরে করে দেখতে হবে কোন জায়গায় ভেঙেছে, তখন কি ধর্মশাস্ত্রে এত্নরে-র কল বানাবার সম্ভান পাবে?’

উত্তরে কি বলেছিল মনে নেই। ‘ধর্ম রক্ষা করবেন’ এই জাতীয় কিছু একটা। কিন্তু ইতিমধ্যে দেখি, পল পার্সি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তত্বালোচনা পার্সিকে বিকল করে সে-কথা পূর্বেই বলেছি, কিন্তু এত্নলে পল পর্যন্ত বিচল হয়ে পড়লো। আমি যখন একটু থেমেছি তখন দেখি তারা এক দোকানীর সঙ্গে বরদস্তুর করছে।

কি ব্যাপার? মিশরের পিরামিডের ভিতর যে সব টুক-টাকি জিনিস পাওয়া গিয়েছে তারই কিছু কিছু এখানে বিক্রি হচ্ছে। আমি বললুম, ‘এ-সব

তো মহামূল্যবান জিনিস, ওগুলো কেনার কাড়ি আমাদের কাছে আসবে কোথেকে, আর মিশরী সরকার সেগুলো যাদুঘরে সাজিয়ে না রেখে বাজারে বিক্রি করার জন্য ছাড়বেই বা কেন ?’

দোকানী বললে, ‘একই জিনিস এত অসংখ্য পিরামিডে এত বেশী পাওয়া গিয়েছে যে সেগুলো সরকার বাজারে ছেড়েছে—ভালোগুলো অবশ্য যাদুঘরে সাজানো আছে—এবং দামও তাই বেশী নয় ।’

আমি কিনি কিনছি, কিনি কিনছি করছি, এমন সময় সেই আজহরের ছেলটি আমার কানে কানে বললে, ‘তাই যদি হবে, তবে ওর দোকানের পিছনের কারখানাতে কি সব তৈরী হচ্ছে ? চলুন না, কারখানাটা দেখে আসবেন ।’

আমি বললুম, ‘কি আর হবে দেখে ? জার্মানিতে তৈরী কাশ্মীরী শাল, জাপানে তৈরী ‘খাঁটি’ ‘অতিশয় খাঁটি’ ভারতীয় খন্দর, কলকাতায় তৈরী জার্মান ওষুধ এসব তো বহু বার দেখা হয়ে গিয়েছে । ওর থেকে নতুন আর কি তত্ত্বলাভ হবে ?’

পল পার্সকে বললুম, ‘পাশের ছেলের খাতা থেকে টুকলি করা আর এই জাল মাল তৈরী করাতে কোনো তফাত নেই ।’

পল বললে, ‘মাষ্টার ধরতে পারলে কান মলে দেন ।’

আমি বললুম, ‘সরকারও মাঝে মাঝে এদের কান মলে দেয় ।’

তখন হঠাৎ খেয়াল হল, আজহরী ছেলটি যে ফিস-ফিস করে কানে কানে কথা বলেছিল, সেটা বাঙলায় । তৎক্ষণাৎ তাকে শুধালুম, ‘আপনি কি বাঙালী ?’

সে বললে, ‘হাঁ ।’

তার পর শুনলুম, বধ’মানে বাড়ি, দশ বছর বয়সে এখানে সে এসেছে । বাঙলা প্রায় ভুলে গিয়েছে । আরো চার বছর অর্থাৎ সবসম্মুখ বারো বছর এদেশে কাটিয়ে ফের বধ’মানে ফিরে যাবে ।

সেখানে ফিরে গিয়ে কি করবে ? এই আরবী বিদ্যের কদর তো ভারতবর্ষে নেই ? তাতে আশ্চর্য হবারই বা কি ? কাশী থেকে বারো বছর সংস্কৃত শিখে বধ’মানে ফিরলে তার পাণ্ডিত্যেরই বা মূল্য দেয় কে ? তাকেও তো সেখানে উপোস করতে হয় । একেও তাই করতে হবে । আজ’ আর প্রাচীন শাস্ত্রের পাণ্ডিত্যকে কেউ সম্মান করে না ।

কিন্তু ছেলটির দেখলুম তাই নিয়ে কোনো দুর্ভাবনা নেই । বাপ ধার্মিক লোক ছেলেকে ধর্মশিক্ষা করতে পাঠিয়েছেন, তাই শিখে সে দেশে ফিরে যাবে, তার পর যা হবার তাই হবে ।

ঘলের কেউ এ-দোকানের সামনে দাঁড়াচ্ছে, কেউ ও-দোকানের সামনে দাঁড়াচ্ছে । কেনাকাটা হচ্ছে অতি সামান্য । টুকি-টাকি নাড়াচাড়াতে আনন্দ অনেক বেশী — খরচাও তাতে নেই । এই করে করে আমরা সমস্ত দিন কাটিয়ে দিতে পারতুম, কিন্তু হঠাৎ ঘলের একজন স্মরণ করিয়ে দিলেন, আমাদের

পোর্ট-স্ট্রেনের ট্রেন ধরতে হবে আটটায়। আব্দুল আসফিয়াকে স্মরণ করিলে দিতে তিনি বললেন, ‘চলুন।’ কিন্তু তার হাবভাবে কোনো তাত্ত্ব নেই।

অতি অনিচ্ছায় ট্রামে উঠতে হল। আজহরের ছেলেরা আমার সঙ্গে বাঙালি কথা কইতে পেয়ে আমার সঙ্গে ছাড়তে চায় না। সেও চললো আমাদের সঙ্গে। আরবী ভাষা এখন তার জীবনের মূলমন্ত্র, কিন্তু তাই বলে কি মাতৃভাষা বাঙালার মায়া এত সহজে কাটানো যায় ?

ঘ্যাচাঙ করে ট্রাম দাঁড়াল। কি ব্যাপার ? আগের একটা ট্রাম মোড় নিতে গিয়ে লাইন থেকে ছিটকে পড়েছে। বাদবাকি সব ট্রাম তার পিছনে গল্গালিকায় দাঁড়িয়ে। লোহার ডাঙা দিয়ে জনকয়েক লোক হিটকে-পড়া ট্রামটাকে লাইনে ফেরত নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। চেষ্টার চেয়ে চিংকার চেঁচামেঁচ হচ্ছে বেশী। লম্বা লম্বা আলখাল্লা উড়িয়ে রাস্তার ছেলে বড়ো ট্রামটার চতুর্দিকে ছুটোছুটি লাগিয়েছে। আর কত প্রকারেরই না উপদেশ, আদেশ অনবরত ট্রামের ভিতর বাহির দুদিক থেকেই উপছে পড়ছে ! দেশের হরির লুঠ এর কাছে লাগে কোথায় ?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজাটা রসিয়ে রসিয়ে দেখছি, এমন সময় দলের একজনের হুঁশ হল, আটটায় যে আমাদের ট্রেন ধরতে হবে। আমার দেহ-মন কিন্তু ঐ রণাঙ্গন থেকে তখন কিছুতেই সরছিল না। কারণ ইতিমধ্যে দেখি, ট্রামটা কি পশ্চিতিতে ফের লাইনে তোলা যায় তাই তার দুইটি দলের সৃষ্টি হয়েছে। যারা ডিপো থেকে এতক্ষণে এসে পৌঁছেছে তারা বাতলাচ্ছে এক প্রকারের রণকোশল, আর সব কটা ট্রামের ড্রাইভার, কন্ডাক্টরের দল সে রণকোশলের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছে অন্য জিহাদ। ব্যাপারটা তখন এমনি চরমে পৌঁছেছে যে উভয় পক্ষ তখন লোহার ডাঙা হাতে করে মুখোমুখি হয়ে সদৃশ সগর্বে সর্বপ্রকারের আশ্ফালন কর্ম সৃষ্টি পশ্চিতিতে শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে নিয়ে চলেছে। দুই দলের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন ট্রামের যাত্রী এবং রাস্তার লোক। আর রাস্তার ছোঁড়ারা আলখাল্লা উড়িয়ে তাদের চতুর্দিকে পাই-পাই করে ঘুরছে, বোঁ করে মধ্যস্থান দিয়ে ইম্পার-উস্পার হয়ে যাচ্ছে, ধরা পড়ে কখনো বা দু-একটা চড়-চাপড়ও খাচ্ছে।

একটা ‘ফাস্টো কেলাস্’ লড়াইয়ের পূর্বরাগ কিংবা পূর্বভাস !

কিন্তু হায় পৃথিবীর কত সংকর্মই না অসম্পূর্ণ রেখে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয়। এই যে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, নিধিরামকে একদিন মোকা-মাফিক আছাসে উত্তম-মধ্যম দেব, তার পূর্বেই তো ম্যাট্রিক পাস করে ইন্সকুল ছাড়তে হল ! আর নিধি রাস্কেলটা ফেল মেরে পড়ে রইল ইন্সকুলে। কী অন্যায় অবিচার ! নিধিটা লেখাপড়ায় একটা আশু বিদ্যোদগার, সে কথা জানি, কিন্তু আরো কত খাটাশও তো ম্যাট্রিক পাশ করে। ও করলেই বা কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত ? আমিও তো দুটো কিল মারার সুযোগ পেতুম। এই সব অবিচার দেখে সংসারের প্রতি আমার তখন যেমন ধরে গিয়েছিল।

আজও তাই হল। দলের লোকের ত্যাগ। তখন আর বেশী সময় হাতে

নেই। ট্যাক্সি নিতে হল।

বুকে আপিসের সামনে যাত্রার দলের হনুমানের ন্যাজের মতো পাঁচ পাকানো কিউ Q। কেউ কেউ ওটাকে U বলে বলে W-ও বলে থাকেন, কারণ জায়গার অভাব থাকলে কিউ সচরাচর এই রকম শেপ-ই নিয়ে থাকে। অথচ গাড়ি ধরার সময় তখন মাত্র পাঁচ মিনিট। আব্দুল আসফিয়া কিউ-এতে দাঁড়ালেন। আমি তাঁকে বললুম, ‘ট্রেন মিস্ নিয্যাত।’ তিনি বললেন, ‘আপনারা স্টেশনে যান।’

স্টেশনে কখন কোন প্রাটফর্ম থেকে গাড়ি ছাড়বে তার খবর নিয়ে যখন সেই প্রাটফর্মের মুখে দাঁড়ালুম, তখন গেট-চেকার ভাঙা-ভাঙা ইংরাজিতে শোখালে,—

‘আপনারা যাবেন কোথায়?’

‘পোর্টসইদ।’ (সমবেত সঙ্গীতে)

‘তবে ট্রেন গিয়ে আসন নিচ্ছেন না কেন?’

তাই শুনে পড়ি-মরি হয়ে এক দল দিল ছোট ট্রেনের দিকে, আরেক দল যাবে কি যাবে না এই ভাবে ন যথো ন তস্থো হয়ে রইল দাঁড়িয়ে, নড়লুম না আমরা তিন জন, পল, পার্সি আর আমি।

পল বললে, ‘আমাদের টিকিট এখনো কাটা হয় নি।’

চেকার ছোকরা বললে, ‘আপনারা যান।’

মনে হল ছোকরাটি বুদ্ধিমান। আমাদের চেহারা-ছবি দেখে এঁচেছে, আমরা ফাঁকি দিয়ে গাড়ি চড়ার তালে নই। আমরা যখন পরসাদ দেবার জন্য তৈরী তখন আমাদের ঠেঁকিয়ে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই।

আমার মন তখন যাব-যাব করছে। তখন পলের কথাতে বুদ্ধলুম, সে কতখানি ভদ্র ছেলে। আমাকে বললে, ‘আব্দুল আসফিয়াকে ছেড়ে আমরা যাব না।’

সেই উৎকট সংকটের সময়ও আমার মনে পড়ল, ধর্মরাজ বুদ্ধিষ্ঠিরও বিশেষ অবস্থায় স্বর্গে যেতে রাজী হন নি।

আমাদের চোখের সামনে স্টেশনের বিরাট ঘড়ি। সেটা তখন দেখাচ্ছে, ৭, ৫৯।

কলাপুসিবল্ গেটের ভিতর দিয়ে দেখছি, আমাদের ট্রেনের গার্ড বীরোচিত ধীরপদে টহল দিচ্ছে, আর মাঝে মাঝে টাকিঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে।

মিশর তো প্রাচ্য দেশ, আরামের দেশ, অনপনক্‌চুয়ার্‌লিটির দেশ। ওরা আবার সময়মতো গাড়ি ছাড়ার যবনিকা পৃথতি শিখলকোথা থেকে? সংসারের অবিচারের প্রতি আবার আমার ঘোষা ধরল। ট্রেন তো বাবা, সব’গ্রই নিত্য নিত্য লেট যায়। এই যে সোনার মল্লুক ইংলন্ড, যার প্রশংসায় এ পোড়ার দেশের সবাই পঞ্চমুখ দশানন, সেই দেশ সম্বন্ধেই শুনোছি, এক ডেলি প্যাসেঞ্জারের ট্রেন রোজ লেট যেত এবং বেচারী তাই নিয়ে অনেক আবেদন-ক্রন্দন করার পর একদিন সত্যি সত্যি কটায় কটায় ঠিক সময়ে ট্রেন স্টেশনে সৈয়দ মজতবা আলী রচনাবলী (৭ম)—৭

এল। লোকটি উল্লাসভরে স্টেশন-মাস্টারকে কনগ্রাচুলেট করাতে মাস্টার বিমর্ষ বদনে বললে, 'এটা গতকালের ট্রেন ; ঠিক চাঁদ্বশ ঘণ্টা লেট।'

সেই পরানের দ্যাশ বিলেতেই যদি এই ব্যবস্থা তবে এই খানদানী গেরেম-ভারী মিশরে মানুষ কি শৃঙ্খমাত্র আমাদের দলকে ভ্যাংচাবার জন্যই কন্টকে কন্টকে ট্রেন ছাড়তে চায় ?

দেখি, গার্ড সাহেব দোদুল্যমান গতিতে আমাদের দিকে আসছে। চেকারকে কি যেন শৃঙ্খলে তার পর উত্তর শূনে আমাকে বললে, 'আর তো সময় নেই, গাড়িতে উঠুন।'

লোকটির সৌজন্যে আমি সম্মোহিত হয়ে গেলুম। কে আমরা, আমাদের জন্য ওর অত দরদ কিসের ? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, আমরা মার্কিন টুরিস্ট নই যে তাকে কাঁড়া-কাঁড়া সোনার মোহর টিপস দেব। মিশরের ট্রেন লোহালক্কড়ের বটে, কিন্তু মিশরীয় গার্ডের দিল মহম্মদের খুনে তৈরী।

আমি পাগল-পারা খুঁজছি সৌজন্য ভদ্রতার আরবী, তুর্কী, ফার্সী বাক্য, যা দিয়ে আমি তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। ইংরিজীতে তো আছে শব্দ ছাই, 'থ্যাঙ্কু' ফরাসীতে 'মের্সি' 'মের্সি', জর্মানেও নাকি 'ডাঙ্ক' না 'ডাঙ্ক' কি যেন একটা আছে কিন্তু ঐ সামান্য একটা দুটো শব্দ দিয়ে গার্ড-সাহেবের সৌজন্য-সমুদ্রে আমার হাল পানি পাবে কেন ?

তবুও তেরিয়া হয়ে বলে গেলুম, 'আনা উশকুরকুম' 'চোক তশকুর এদরং এফন্দং', খেলি তশকুর মিদমহাতান, কুরবান্' আরো কত কী, উল্টা-সুল্টা। তার মোশ্বা অর্থ, 'মহাশয় যে সৌজন্য দেখাইলেন, তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে যদুগ-যদুগাস্তব্যাপি অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে কিন্তু হাল্ফিল্ আমরা লেইবজ্জ-শকটে আরোহণ করিতে অক্ষম যেহেতুক আমাদের পরমমিত্র চরমসখা শ্রীশ্রীমান আবদুল আসফিয়া নরুউদ্দিন মুহম্মদ আবদুল করীম সিদ্দীকীকে পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তর গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।'

সঙ্গে সঙ্গে আরবী, তুর্কী, ফার্সী তিন ভাষাতেই বিস্তর ক্ষমা ভিক্ষা করলুম।

আর মনে মনে মোক্ষম চটিছি আবদুল আসফিয়ার উপর। লোকটার কি কণামাত্র কান্ডজ্ঞান নেই ? দলের নেতা হয়ে কোনো রকম দায়িত্ব বোধ নেই ? সাধে কি ভারতবর্ষ স্বরাজ্য থেকে বঞ্চিত !

হঠাৎ পল-পার্সি দিল ছুট। তারা আবদুল আসফিয়াকে দেখতে পেয়েছে। এবং আশ্চর্য, লোকটা তখনো নিশ্চিন্ত মনে রেলের এক কর্মচারীকে স্টেশনের বড় ঘড়িটা দেখিয়ে দেখিয়ে কি যেন বোঝাচ্ছে। বোঝাচ্ছে কহু ! নিশ্চয়ই বোঝাচ্ছে, ওদের ঘড়ি ফাস্টে যাচ্ছে। তা যাচ্ছে তো যাচ্ছে, সে কথা বুঝিয়ে কি তোমার টাকেতে চুল গজাবে—ওঁদিকে ট্রেন মিস করে ?

কথার মাঝখানেই পল আর পার্সি পিছন থেকে তাঁকে দু হাতে ধরে দিলে হ্যাঁচকা টান। তার পর দিল ছুট গাড়ির দিকে। আমিও পিড়ি-মরি হয়ে সেদিকে। দলের যারা ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল তারাও জয়োল্লাসে হুংকার দিয়ে উঠেছে। আবদুল আসফিয়া হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছেন। স্টেশনের

আন্তর্জাতিক জনতা যে যার পথ ভুলে তাকিয়ে রয়েছে আমাদের দিকে। পদূলিস দিয়েছে হুইস্‌ল্‌। তবে কি দিনে দূপদূরে ফিউন্যাপিং! কিন্তু এ তো,

‘উল্টো বুদ্ধালি রাম, ওরে উল্টো বুদ্ধালি রাম,

কারে করলি ঘোড়া, আর কার মন্থে লাগাম?’

এখানে তো বুদ্ধো-ধাড়িকে পাকড়ে নিয়ে চলেছে দ্বুটো চ্যাংড়া!

গাড়ি ঠিক সময়ে ছেড়েছিল না লেটে, আব্দুল আসফিয়ার ঘড়ি ঠিক না রেলের ঘড়ি ঠিক এ সব সূক্ষ্ম প্রশ্নের সমাধান হল না। গার্ড সায়েব যে ভাবে পিছন থেকে পাকা হাতে আমাদের ধাক্কা দিয়ে দিয়ে গাড়িতে ওঠালে তার থেকে অনুমান করলুম, এ প্রকারের কর্ম করে করে তার হাত বান্দু হয়ে গিয়েছে।

আব্দুল আসফিয়া তখনো পলকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন, তাঁর ঐ ঘড়িটাই সুইজারল্যান্ডের ক্রনোমিটার পরীক্ষায় পয়লা প্রাইজ পেয়েছিল। মিশরীয়দের সময়-জ্ঞান নেই। আমরাও অতিশয় সরল। চিলে কান নিয়ে গেল শুনেনি—

॥ ২৩ ॥

আহা! সুন্দর দেশ!

খালে-নালায় ভর্তি। গাড়ি মিনিটে মিনিটে গম্, গড়ম্, গড়ড়ম্ করে সে খাল নালায় উপর দিয়ে পেরুচ্ছে। তারপর গাড়ি বলে ‘বড়ঠাকুরপো-ছোটঠাকুরপো’, ‘বড়ঠাকুরপো-ছোটঠাকুরপো’, তারপর ফের নালায় উপর ‘গম্’, ‘গড়ম্’, ‘গড়ড়ম্’। আর গাড়ির শব্দ যে এত মিষ্টি কে জানত? এ ট্রেন মিস করলে আর দেখতে হত না!

খাল-নালা তো হললুম, কিন্তু এক-একটি নদ-নদী এমনই চওড়া যে বোধ করি সেগুলো নীলেরই শাখা-প্রশাখা। আর সেগুলোতে জলে-ডাঙার মাঝখানে ফাঁক প্রায় নেই। নিত্যন্ত বর্ষাকাল ছাড়া আমাদের নদীর জল যান তলিয়ে, আর পাড়গুলো থাকেন খাড়া হয়ে। সে জল অত নিচু থেকে উপরে তোলা যায় না বলে সে জল থেকেও নেই। চাষী তাই দিয়ে শীতকালে আরেকটা ফসল তুলতে পারে না। এদেশের লোক সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে চাষবাস শেখার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের একমাত্র নদী নীলের গা থেকে এত হাজার হাজার খাল নালা কেটে রেখেছিল যে সে নদী গভীর হবার সুযোগ পায় নি এবং ফলে নীলের জল দেশটাকে বারো মাস টেটস্বর করে রাখে।

খেতভরা ধান গম কার্পাস! সবুজে সবুজে ছয়লাপ। মাঝে মাঝে খেজুর-গাছের সারি, আর কখনো বা এখানে একটা সেখানে একটা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষেতের পাহারা দিচ্ছে।

আর নদীর উপর দিয়ে চলেছে উঁচু উঁচু তেঁকোণা পাল তুলে দিয়ে লম্বা লম্বা নৌকো। এ দেশে বৃষ্টি প্রায় হয় না বলে নৌকোতে ছইয়ের ব্যবস্থা প্রায় নেই। জোর হাওয়ায় নৌকাগুলো চলেছে দ্রুতগতিতে। পালের দাঁড়ি ছিঁড়ে

গেলে নৌকো যে ডুবে যাবে সে ডরভয় এদের নেই। তবে বোধ করি এদেশে দমকা হাওয়া হঠাৎ এসে নৌকোকে এলোপাতাড়ি ধাক্কা লাগায় না।

সবুজ খেত, নানারঙের পাল, ঘোর ঘন নীল আকাশ, চল্ চল্ ছল্ ছল্ জল মনটাকে গভীর শান্তি আর পরিপূর্ণ আনন্দে ভরে দেয়। গাড়ির জানালার উপরে মুখ রেখে আধ-বোজা চোখে সে সৌন্দর্য'র স পান করছি, আর ভাবছি, এই সৌন্দর্য' দেখার জন্যেই তো বহুলোক রেলগাড়ি চড়বে, আমি যদি এদেশে থাকবার সুযোগ পেতুম তবে প্রতি শনিবারে রেলচড়ে যে দিকে খুশি চলে যেতুম! কিছু না, শুধু নৌকো, জল, খেত আর আকাশ দেখে দেখে দিনরাত কাটিয়ে দিতুম।

রাতের কথায় মনে পড়ল, চাঁদের আলোতে এ সৌন্দর্য' নেবে অন্য এক ভিন্ন রূপ। সেটা দেখবার সুযোগ হল না—এখানটায়, এবারে।

মাঝে মাঝে নদী, নৌকো, খেজুরগাছ সব-কিছু ছাড়িয়ে দেখতে পাই সেই তিনটে বিরাট পিরামিড। কত দূরে চলে এসেছি তবু তারা মাঝে মাঝে মুখ দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছে, আবার কাছের গাছের পিছনে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, আবার মুখ দেখাচ্ছে। তখনই বৃষ্টিতে পারলুম, পিরামিডগুলো কত উঁচু! কাছের থেকে যেটা স্পষ্ট ব্যুতে পারি নি।

কম্পার্টমেন্টের মাঝখান দিয়ে চলাফেরার পথ—কলকাতার ট্রামগাড়িতে যে রকম। সেই পথ দিয়ে যে কত রকমের ফেরিওয়ালা এল গেল তার হিসেব রাখা ভার। কমলালেবু, কলা, রুটি থেকে আরম্ভ করে নোটবুক, চিরুনি, মোজা, দড়ি, লটারির টিকিট হেন বস্তু নেই যা ফেরিওয়ালা দু'চার বার না দেখালে—মনে হল লোহার সিস্টেম এবং আস্ত মোটর গাড়ি মাত্র এই দুই বস্তুই বোধ করি ফেরি করা হল না।

এক কোণে দেখি জাম্বা-জোম্বা-পরা এক মোলানা সায়েব হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন আর তাঁকে ঘিরে বসেছে এক পাল ছোকরা—তারাও পরেছে জাম্বা-জোম্বা, তাদের মাথায় ও লাল ফেজ টুপিতে প্যাঁচানো পাগড়ি। দু-চার জন সাধারণ যাত্রীও দলে ভিড়ে বক্তৃতা শুনছে। পাশের এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলুম, ইনি আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ছুটি-ছাটায় যখন গ্রামের বাড়ি যান তখন তাঁর প্রিয় শিষ্যেরা তাঁর সঙ্গে তাঁরই বাড়ি যায়। সমস্তকণ চলে জ্ঞানচর্চা। ট্রেনের অন্য লোকও সে শাস্ত্রচর্চা কান পেতে শোনে।

উত্তম ব্যবস্থা! প্রাচীন যুগে গুরুগৃহে বাস এবং বর্তমান যুগের কলেজে গিয়ে পড়াশুনো করা দুটোর উত্তম সমন্বয়। মাঝখানে থার্ড ক্লাস গাড়ির প্যাসেঞ্জার, চাষাভুষারাও এদের জ্ঞানের কিছুটা পেয়ে গেল। আমাদের দেশের চাষারা তো প্রফেসরদের জ্ঞানের একরত্তিও পায় না।

সঙ্গে সঙ্গে ফেরিওয়ার কাছ থেকে কলামুলো কিনে নিয়ে মোলানা সায়েব খাচ্ছেন, ছেলেদেরও খাওয়াচ্ছেন। সেও পরিপাটি ব্যবস্থা।

হরেকরকম ফেরিওয়ালাই তো গেল। এখন এলেন আরেক মনীষী। মুখে এক গাল হাসি—আপন মনেই হাসছে—পরনে লজবড় কোট-পাতলদুন, নোংরা

শার্ট, টাইয়ের 'নট'-টা ট্যারচা হয়ে কলারের ভিতর ঢুকে গিয়েছে, আর হাতে এক তাড়া রঙিন ছবিতে ভর্তি, হ্যান্ডবিল-প্যাম্ফ্লেট।

কেন যে আমাদেরই বেছে নিলে বলতে পারব না। বোধ হয় আমাদেরই সব চেয়ে বেশী বোকা-বোকা দেখাচ্ছিল। ফেরিগুলারা বোকাকেই সঙ্কলের পয়লা পাকড়াও করে এ তো জানা কথা।

এক গাল হাসির উপর আরেক পোঁচ মূর্চক হাসি লেপটে দিয়ে 'শুধালে, 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে, স্যার?'

ইয়োরোপীয় জাহাজ চড়ে মেজাজ খানিকটে বিলিতি রঙ ধরে ফেলেছে। বলতে যাচ্ছিলুম, তোমার তাতে কি? কিন্তু মনে পড়ল, মিশর প্রাচ্য দেশ, এ প্রশ্ন শুধনো অভদ্রতা কিংবা অর্নাধিকার প্রবেশ নয়। বললুম, 'পোর্ট স্ট্রীট।' 'তার পর?'

মোগলাই মেজাজ চেপে নিয়ে বাঙালী কণ্ঠে বললুম, 'ইয়োরোপ।'

'ওঃ, তাই বলুন। কিন্তু ইয়োরোপ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, তার আগে এই মিশরের পাশের দেশ প্যালেস্টাইনটা ঘুরে আসুন না।' আমি তো একে-বারে থা। হরেকরকমের ফেরিওলা তো দেখলুম। কেউ বিক্রি করে ছ পয়সার জুতোর ফিতে, কেউ বিক্রি করে পাঁচশ টাকার সোনার ঘড়ি, কিন্তু একটা আস্ত দেশ বিক্রির জন্য তার আড়কাটি ট্রেনের ভিতর ঘোরাঘুরি করবে, এ-ও কি কখনো বিশ্বাস করা যায়? তবু ব্যাপারটা ভালো করে জেনে নেবার জন্য শুধালুম, 'আপনি বুঝি দেশ বিক্রি করেন?'

সে আমার কোনো কথার উত্তর না দিয়ে আরেক গাল হেসে তার হাতের তাড়ার ভিতর থেকে কি একটা খুঁজতে আরম্ভ করলে। ইতিমধ্যে আমার পাশের ভদ্রলোক তাকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন। সে ঝুপ করে বসে পড়ে তার হাতের ডাই থেকে বের করলে প্যালেস্টাইনের হরেকরকম ছবিওলা একখানা রঙচঙা প্যাম্ফ্লেট। তার উপর দেখি মোটা-মোটা অক্ষরে লেখা প্যালেস্টাইন 'Palestine, The Land of the Lord', 'প্রভুর জন্মভূমি' ইত্যাদি আরো কত কী! তারপর বললে, 'দেশ বিক্রি করি? হ্যাঁ, তাই বটে, তবে কি না আপনি যে ভাবে ধরেছেন, ঠিক সে ভাবে নয়। কিন্তু সে-কথা পরে হবে। উপস্থিত দেখুন তো, কী চমৎকার দেশে আপনাকে যেতে বলছি। যে-দেশে প্রভু জীজাস্ ক্রাইস্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আপনি নিশ্চয় প্রভুর—'

আমার ভারি বিরক্তি বোধ হল। এসব লোক কি ভাবে? ভারতবর্ষের লোক যীশুর নাম শোনে নি? তেড়ে বললুম, 'The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham begat'—ইত্যাদি ইত্যাদি,—চড়চড় করে মথি-লিখিত সদুসমাচার থেকে মুখস্থ বলে যেতে লাগলুম, প্রভু যীশুর ঠিকুজি কুলজি। লোকটা কিন্তু একদম না দমে গিয়ে বললে, 'ঠিক, ঠিক। এই দেখুন, সেই জায়গা যেখানে প্রভু জন্ম নিলেন। একটা সরাইয়ের আস্তাবলে। মা মেরি আর তাঁর বর যোসেফ তখন প্যালেস্টাইন থেকে এই মিশরের দিকে আসাছিলেন। বেংলেহেম

গ্রামে সন্ধ্যা হল। সরাইয়ে জায়গা না পেয়ে মা-মেরি আশ্রয় নিলেন আস্তাবলে। এই দেখুন সেই আস্তাবলের ছবি। কত চিত্রকরই না এ ছবি একেছেন। কত যুগ ধরে। তার পর দেখুন, নাজারেং গ্রামের ছবি। যোসেফ সেখানে ছুতোরের কাজ করতেন, আর মা-মেরি যেতেন জল আনতে। এই দেখুন—’

আমি বললুম, ‘বাস, বাস, হয়েছে। কিন্তু আপনি আমার মদুশকিলটা আদর্শেই বদ্বতে পারেন নি। আমি যদি পোর্টস্টেড থেকে ‘প্রভুর জন্মভূমি প্যালেস্টাইনে’ চলে যাই তবে সেখানে ফিরে এসে ইয়োরোপে যাবার জন্য আমাকে নতুন করে জাহাজের টিকিট কাটতে হবে। তার পরসা দেবে কে?—না হয় প্যালেস্টাইন তীর্থ-দর্শন-খর্চা আমি কোনো গতিকে, কে’দে-কোকিয়ে সামলে নিলুম। এক জাহাজের টিকিট একই জায়গা যাবার জন্য দু-দুবার কাটবার মতো পরসা কিন্তু আমার নেই।’

আড়কাঠি তো হেসেই কুটিকুটি। আমি বিরক্ত। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে, ‘জাহাজের ডবল ভাড়া লাগবে কেন? আপনি যে জাহাজে করে পোর্টস্টেডে এসেছেন সেই কোম্পানিরই আরেকখানা জাহাজ পনেরো দিন পর সেখানে এসে ইয়োরোপ যাবে। আপনি সে জাহাজে গেলেন কিংবা এ জাহাজে গেলেন তাতে কোম্পানির কি ক্ষতিবৃদ্ধি? ডবল পরসা নিতে যাবে কেন? আর ঐ পনেরো দিনে আপনি দেখে নেবেন প্যালেস্টাইন।’

আমি বললুম, ‘হঁ, হঁ-উ-উ—কিন্তু সে জাহাজে যদি সীট না থাকে?’

লোকটার ধৈর্য ও অসীম। সর্বমুখে বদ্বদেবের মতো করুণার হাসি হেসে বললে, ‘কে বললে থাকবে না? এখন তো অফ সীজন্, স্ল্যাক পিয়েরিয়েড, অর্থাৎ যাত্রীর ভিড় নেই। আপনি যে জাহাজে এলেন তার কি অধেকখানা ফাঁকা ছিল না। আসছে জাহাজ গড়ের মাঠ।’

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলুম। চিন্তাশীল লোক বলে নয়। আসলে সব কিছু বদ্বতেই আর পাঁচ জনের তুলনায় আমার একটু বেশী সময় লাগে। ব্রেন-বন্ডে আল্লাতারা রিসিভিং সেটটা দিয়েছেন অতিশয় নিকুট পর্যায়ের। বাল্বগুলো গরম হতে লাগে মিনিট তিন। তার পরও চিন্তির। তিনটে স্টেশন গুবলেট পার্কিয়ে দেয় শূদ্ধ কড়া শিশ। কিছুই বদ্বতে পারি নে।

হঠাৎ মাথায় একটা প্রশ্ন এল। জানৌ বোধ হয়, অগা বোকারা মাঝে মাঝে, অর্থাৎ বছরে দু-একবার, পাকা স্যানার মতো দু-একটা প্রশ্ন ওঠাতে পারে। তাই শূধালুম, ‘কিন্তু আমি প্যালেস্টাইন গেলে তোমার টাকে কি চুল গজাবে? তোমার তাতে কি লাভ?’

লোকটা এইবারে একটু বিরক্ত হল। প্রশ্নটা মোক্ষম কঠিন বলে, না ‘টাক টাক’ করলুম বলে ঠিক বদ্বতে পারলুম না। আমার মগজ তখন ঐ একটা কঠিন প্রশ্ন শূধবার ধকল কাটাতে গিয়ে হাঁপাতে আরম্ভ করছে।

বললে, ‘আমার কি লাভ? আমার লাভ বিস্তর না হলেও অল্প। অর্থাৎ অল্প-বিস্তর। বদ্বিয়ে বলি। আপনাকে নিয়ে যাবো কুকের আপিসে। তাদের

কাছ থেকে কাটবেন আপনার পয়সা গন্তব্যস্থল, প্যালেস্টাইনের রাজধানী জেরুজালেমের টিকিট। ন্যায্য ভাড়াই দেবেন। কিন্তু কুক্ আমাকে দেবে কমিশন—’

আমি শূধালুম, ‘কুক্ তোমাকে কমিশন দিতে যাবে কেন?’

আমার বন্ধুর ‘প্রাথব’ দেখে লোকটা প্রায় হতাশ হয়ে বললে, ‘প্যালেস্টাইন সরকার কুক্কে পয়সা দেয়, তার দেশে টুরিস্ট নিয়ে যাবার জন্য তাতে করে সরকারের দ্ব পয়সা লাভ হয়। তাই তারা কুক্কে দেয় কমিশন, কুক্ তারই খানিকটে দেয় আমাকে। তারা তো আর ট্রেনে ট্রেনে খদ্দেরের সম্মানে টো-টো করতে পারে না। ঐ কম’টি করি আমি। তাই আমার হয় কিঞ্চিৎ মদুনাফা। বন্ধুলেন তো?’

পাছে লোকটা আমাকে ফের বোকা বানিয়ে দেয়, তাই তাড়াতাড়ি বললুম, ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, বন্ধুেছি, বন্ধুেছি, বিলক্ষণ বন্ধুেছি।’ যদিও আমি ততখানি সংসারী বন্ধু ধরি নে বলে ঐ সব কমিশন-ফমিশনের মারপ্যাঁচ আদ্যপেই ধরতে পারি নি।

কিন্তু লক্ষ্য করলুম, সে প্যাটপ্যাট করে আমার হ্যাণ্ড-ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে আছে। তার উপরে মোটা-মোটা হরফে লেখা ছিল ALI, লোকটা শূধলে, ‘ব্যাগটা আপনার?’

আমি বললুম, ‘হ্যাঁ।’

‘বাঃ। তা হলে তো আপনি মুসলমান। আর জেরুজালেম মুসলমানদের তীর্থভূমি—মস্কার পরেই তার স্থান। আব্রাহামাভ্রামাহম্মদ সাবেক রাষ্ট্রে আরব থেকে জেরুজালেমে এনে সেখান থেকে স্বর্গদর্শনে নিয়ে যান। জেরুজালেমের সে জায়গাটার উপর এখন মসজিদ-উল্-আকসা। বিরাট সে মসজিদ, অশ্রুত তার গঠন। এই কিছুদিন হল আপনাদের দেশেরই রাজা হাইদ্রাবাদের নিজাম সেটাকে দশ লক্ষ টাকা খরচ করে মেরামত করে দিয়েছেন। দেখতে যাবেন না সেটা?’

তারপর বললে, ‘আসলে কি জানেন? আসলে জেরুজালেম হল ধর্মের ত্রিবেণী। ইহুদি, খ্রীষ্টান আর মুসলমান ধর্ম এখানে এসে মিলেছে। এক জলে তিন পাখি।’

তীর্থ দেখলে পূণ্য হয়, কি না হয়, সে কথা আমি কখনো ভালো করে ভেবে দেখি নি। কিন্তু হিন্দুদের কাশী, বৌদ্ধদের রাজগীর যখন দেখেছি, তখন এ তিনটেই বা বাদ যাবে কেন? বিশেষ কোনো ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আমি আদ্যপেই পছন্দ করি নে। তাকেই বলে কমুনালিজম। স্ট্রিক্ত কর্তা যখন তাঁর অসমী করুণায় এতগুলো ধর্ম বানিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই সব-কটাতেই কিছু-না-কিছু আছে। আর বিশেষ করে মা ভারি খুশি হবে, যখন শুনবে আমি বয়ঃ-উল্-মদুদন্দ (‘পূণ্যভূমি অর্থাৎ জেরুজালেম’) দর্শন করছি। তাঁর বাবাও মস্কা অবধি পেঁছতে পেরেছিলেন—বয়ঃ-উল্-মদুদন্দ দেখেন নি। সেখানে শূর্নেছি, অতি উত্তম তসবী (জপমালা) পাওয়া যায়। এক গাছা কিনে দিলে

মা যা-খুশী হবে। সাত বকৎ নমাজ পড়ার সময় (মদুসলমানরা সচরাচর পড়ে পাঁচ বকৎ —মা পড়ে সাত) মা তসবী গুনবে, আর আমার উপর ভারি খুশী হবে।

* * *

পল আর পার্সি অবশ্য অত্যন্ত দুঃখিত হল। পার্সি বললে, ‘আমাদের ফেলে আপনি চলে যাচ্ছেন প্যালেস্টাইন! আপনি না বলিছিলেন, ভূমধ্য-সাগরের নানা জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখাবেন, ইটালি আর সিসিলি, তার পর কসি’কা আর সার্ডিনিয়ার ভিতর দিয়ে জাহাজ যাবা। সময়, ভিসুভিয়স, আরো কত কী দেখাবেন?’

আমি স্বার্থপর, পাষণ্ড। পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলুম। তবু হাতজোড় করে মাপ চাইলুম।

পল পার্সির দিকে তাকিয়ে বললে, ‘ছি, পার্সি! স্যার ধর্মের জায়গা দেখতে ভারি ভালোবাসেন। এ সুযোগ ছাড়বেন কেন?’

তবু আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

এক দিকে বশুজুন, আরেক দিকে মায়ের তসবী।

সংসার কি শুদ্ধ দৃষ্টেই ভরা?

পরিশিষ্ট

প্যালেস্টাইন ভ্রমণ যে এ পুস্তকের অংগ হতে পারত না তা নয়। কিন্তু পল আর পার্সি সঙ্গে না থাকলে সে বই তোমাঘের বয়সী ছেলে-মেয়েদের কাছে ভালো লাগবে না বলে আমার বিশ্বাস। সে-বই হয়ে যাবে নিতান্তই বয়সীদের জন্য।

মানুষ বই লিখে বশুজনকে উৎসর্গ করে। আমি প্যালেস্টাইন সম্বন্ধে না-লেখা ভ্রমণ-কাহিনী উৎসর্গ করলুম মিত্রদ্বয় পল এবং পার্সিকে।

ভবঘুরে ও অহা

শ্রীমদ্ভক্তা সরোজিনী হট্টাঙ্গ-কে
প্রাণ ও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান মোরামতির সময় অন্যতম আইন করলেন, যে সব শব্দ বাঙলায় অত্যাধিক প্রচলিত হয়ে গিয়েছে সেগুলোকে বদলাবার প্রয়োজন নেই। তবে কি ‘খৃষ্ট’ এবং ‘খৃষ্টা’ শব্দ যথেষ্ট প্রচলিত ছিল না যে ওগুলোকে খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টা শব্দ করা হল? এবং এই নতুন বানান কি খুব শুদ্ধ? প্রথমত, খ্রী-তে দীর্ঘ ঙ্কার কেন? আমার কান তো বলছে, আমি হৃদয়ই শুনেছি; দ্বিতীয়ত, গ্রীকরা তো ‘ক্ট’ বলে না—বলে ‘ক্ট’। অতএব অতি বিশুদ্ধ যদি লিখতেই হয় তবে লেখা উচিত খ্রিস্ট। ‘খৃষ্ট’ লেখার স্বপক্ষে আমার অন্য যুক্তি, কথটা সম্প্রদায় ‘ঘৃষ’ ধাতু, ‘ঘৃষিত’, ‘মর্দিত’ অর্থেই গ্রীকে ব্যবহৃত হয় (এনয়েন্টেড)—অর্থ—‘স্নেহাসিক্ত’—‘স্নেহঘৃষিত’। ঘৃষ্ট এবং খৃষ্ট তাই হুবহু একই শব্দ (Thou anointest my head with oil; Psalms No 23, v5—এখনও পূর্ব বাঙলার গ্রামাঞ্চলে বিয়েবাড়ীতে নিমন্ত্রিত রবাহৃত রমণীদের মাথা তৈল ‘ঘৃষ্ট’ করা হয়; আমি কান্টরাসিক নই, হলে মার্কিনী পদে তৈল-মর্দন করে যে পদোন্নতি হয়, সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতুম; ভাষায়ও to butter up কথাটা আছে)। ‘খ্রী’-এর চেয়ে ‘খৃ’ লেখাতে ছাপাখানারও বোধ হয় সুবিধা বেশী এবং সর্বশেষ যুক্তি, খৃষ্টানরা যেরকম ‘এক্স’ অক্ষর ও ক্রুশ চিহ্ন প্রভৃ যীশুর সম্মানার্থে আলাদা করে রেখেছেন, আমরাও নাহয় ‘খৃ’-টি তাঁরই জন্য রেখে দিলুম।

*

*

*

ধর্মের ইতিহাস পড়ার সময় আমার সব সময়ই আশ্চর্য বোধ হয়েছে যে, বুদ্ধ খৃষ্ট, মুহম্মদ (দ) যখন যুগ-পরিবর্তক মহান বাণী প্রচার করেছেন, তখন গুণী-জ্ঞানী যত না তাঁদের চতুর্দিকে সমবেত হয়েছেন, তার চেয়ে বেশী সমবেত হয়েছে সর্ব-হারার দল। হজরৎ মুহম্মদের প্রথম শিষ্যের বহুলাংশ ক্রীতদাস, দীনহীন; খৃষ্টের শিষ্যগণ জেলে (এবং জেলে যে চাষার চেয়েও গরীব হয়, সে-ও জানা কথা) এবং তিনি পাপী-তাপী, মদ্যবিক্রেতা এবং পাপিষ্ঠা রমণীকে (মেরি ম্যাগডলীন) সঙ্গ দিতে কুণ্ঠিত হতেন না বলে সে-যুগে নিন্দাভাজন হয়েছেন। এই মহাপুরুষদের বিনাশ কামনা করেছেন সে-যুগের পদস্থ ব্যক্তিরাই। বুদ্ধের শিষ্য মহামগ্গলায়ন ও সারিপুত্ত অসংখ্য দীনহীন পথের ভিখারীকে প্ররজ্যা দিয়ে যে শিষ্য করেছিলেন, সে-কথা জাতক পড়লেই জানা যায়। বুদ্ধকে রাষ্ট্রের বিপক্ষে দাঁড়াতে হয় নি বলে তিনি রাজসম্মান ও শ্রেষ্ঠী অনার্থপিণ্ডদের অর্থও পেয়েছিলেন, খৃষ্ট কাউকেই পান নি, এবং নবী মুহম্মদ আবু বকর ও ওমরের মত সামান্য দু’একটি আদর্শবাদী শিষ্য পেয়েছিলেন।

মার্কস ঠিক কি ভাষায় বলেছিলেন বলতে পারবো না, কিন্তু তাঁর অন্যতম মূল বক্তব্য ছিল যে, অর্থনৈতিক কারণ ভিন্ন কোনো বিরাট আন্দোলন পৃথিবীতে হয় না। বৌদ্ধ, জৈন, জরথুষ্ট্রী, খ্রীষ্ট, ইসলাম—এই পাঁচটি পৃথিবীর বড় বড় আন্দোলন—হিন্দু এবং ইহুদী ধর্ম কোনো ব্যক্তিবিশেষের চতুর্দিকে গড়ে ওঠে

নি বলে এগুলো উপস্থিত বাদ দেওয়া যেতে পারে— ১) তাই মনে প্রশ্ন জাগে, এদের পিছনে অর্থনৈতিক কারণ ছিল, কি ছিল না ?

মার্ক'স এই পার্টিটি আন্দোলনকে তাঁর অর্থনৈতিক ছকে ফেলে বিচার করেছিলেন কি না জানি নে, কিংবা যে-যুগে তিনি তাঁর ছক নির্মাণ করেন, সে যুগে হয়তো এইসব ধর্ম আন্দোলনের ইতিহাস ব্যাপকভাবে ইয়োরোপীয় ভাষায় লিখিত তথা অনুদিত হয় নি বলে তাঁকে তার মাল-মশলা যোগাতে পারে নি।

খৃষ্টের সময় অর্থনৈতিক কুব্যবস্থা চরমে পৌঁছেছে। শোষক সম্প্রদায় জেরুজালেমে জিহোভার মন্দির প্রায় ব্যাধিকং হোসে পরিবর্তিত করে ফেলেছে— যীশু সেখান থেকে তাদের তাড়িয়ে দিচ্ছেন (মার্ক ১১:১৫)—খাজনা-ট্যাক্সে মানুষ জর্জর। যীশু, মুহম্মদ, বুদ্ধ সকলেই আত্মা, অবিনশ্বর জীবন ও নির্বাণের গুঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার করেছেন, সহজ সরল ভাষায় চরম সত্য প্রকাশ করেছেন, রোগশোকমুগ্ধ অনন্ত জীবনের স্থান দিয়েছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সকলেই নতুন ধন-বস্তু-পদ্ধতি প্রচলিত করতে চেয়েছিলেন এবং তারই ফলে অসংখ্য দীনদুঃখী—এবং প্রধানত তারা—তাঁদের চতুর্দিকে সমবেত হয়েছিল। খৃষ্ট যে কামিজ নিয়ে গেলে জোশ্বা দিতে বলেছেন, সে কিছু মূল্যের কথা নয়। তার মহাপ্রস্থানের পর নবনির্মিত খৃষ্টসমাজের যে বর্ণনা পাই, তার থেকে মনে হয় মার্ক'স যে ভাবী আদর্শ সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন, তাই সফল হয়ে গিয়েছে, সবাই 'সই পেয়েছির দেশে'র তুল্যাদিকারী নাগরিক :

And all that believed were together, and had all things common ; and sold their possessions and goods and parted them to all men, as every man had need... and the multitude of them that believed were of one heart and one soul : neither said any of them that ought of the things which he possessed was his own ; but they had all things common..... Neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of lands or houses sold them, and brought the prices of the things that were sold and laid them down at the apostle's feet ; and distribution was made unto every man according as he had need. (Acts : 2 & 4).

হজরত মুহম্মদ মক্কাতে যতদিন একেশ্বরবাদ ও আল্লাহর মাহাত্ম্য প্রচার করেছিলেন, ততদিন মক্কাবাসী তাঁর উপর অসন্তুষ্ট ছিল না, কিন্তু তিনি যখন নবীন ধন-বস্তু-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চাইলেন, তখনই মক্কার পদস্থ জনেরা তাঁর প্রাণ-নাশের সংকল্প করল। পরবর্তী যুগের ইসলামে এই নবীন ধন-বস্তু-পদ্ধতির প্রাধান্য ঐতিহাসিক মাত্রেরই জানা আছে। ইরানের এক

১ আমার মনে হয়, শংকর ও চৈত্যান্যের সময় বড় দুটো আন্দোলন হয়েছিল, কিন্তু এখানে দীর্ঘ আলোচনার স্থানাভাব।

আরব গভর্নর তখন দ্রুত করে বলেছিলেন, এই যে আজ হাজার হাজার ইরানী মুসলমান হচ্ছে, সেটা ইসলামের জন্য নয়, আর্থিক সুবিধা পাচ্ছে বলে ।^১

জরথুষ্ট্রের আমলে দ্বন্দ্ব বেধেছে—একদিকে কৃষি ও গো-পালন, অন্যদিকে যাবাবর বৃত্তি ও লুণ্ঠন । জরথুষ্ট্র দেশের ধনবৃদ্ধির জন্য কৃষি-গো-পালনের রীতি প্রবর্তন করতে চাইলে শত্রুপক্ষের হস্তে প্রাণ হারান । তাঁর ‘ধর্ম’ কিন্তু জয়লাভ করলো ।

বুদ্ধের সময় তপোবন প্রথা প্রায় উঠে গিয়েছে, বন-জঙ্গল সাফ করা হয়ে গিয়েছে—বিস্তার লোক ভিক্ষুকের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে । ওদিকে ছোট ছোট অসংখ্য রাজ্য তাদের অর্থনৈতিক কর্মবিকাশের চরমে পৌঁছে এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে রাজ্যে রাজ্যে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা না করলে আর সমস্ত দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় না ; অথচ জাতকে দেখতে পাই, কেউ আপন রাষ্ট্রের প্রত্যন্ত প্রদেশ ত্যাগ করে ভিন্ন রাজ্যে প্রবেশ করতে গেলেই তাকে মেরে ফেলা হচ্ছে । বুদ্ধ এসব নিরমদের সংঘের অন্নবস্ত্র দিয়ে পাঠালেন ভিন্ন রাজ্যে শান্তির বাণী প্রচার করতে—তাদের বিশেষ বেশ পরানো হল, যাতে করে সবাই তাদের সহজে চিনতে পারে । গোড়ার দিকে নিশ্চয়ই কিছু ভিক্ষু মারা গিয়েছিলেন ; পরে এঁরা অল্পে অল্পে রাজ্য থেকে রাজ্যান্তরে গেলেন । ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়লো, একা সৃষ্টি হল এবং তাই সর্ব-ভারতের মৌর্য রাজ্য সংস্থাপিত হল ।

আমি একথা বলছি না যে, দেশের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও নবীন ধনবটন পদ্ধতি প্রচলন করাই মহাপুরুষদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ; আমার বক্তব্য তাঁরা এগুলোকে অবহেলা তো করেনই নি, বরং অত্যন্ত জোর দিয়েছিলেন বলেই ‘হ্যান্ডনট’ ‘প্লেটোরিয়া’ ‘সর্বহারার’ প্রথম এসে জুড়েছিল । কয়েক শতাব্দী পর ফের দেখা দেয়, আবার সেই শোষকের দল, পাদ্রীপুরুষ-মোল্লারপে । এঁরা আর ধনবটনের কথা তোলেন না—আচার অনুষ্ঠান, পূজা-প্রার্থিস্তের কথাই বার বার বড় গলায় গান ।

ধর্মের এই অর্থনৈতিক দিকটা নিয়ে এখনো কোনো ভালো চর্চা হয় নি ॥

কই সে ?

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসবোধ, গ্যাটের ভূয়োদর্শন, শেক্সপীয়রের মানব-চরিত্রজ্ঞতা সামান্য জনও কিছু না কিছু উপলব্ধি করতে পারে । সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীকে দিয়েছেন মাত্র একটি হিমালয় ; আমাদের মানসলোকে এই তিনজনই তিনটি হিমালয় । সাধারণ জন দূরে থেকেও এঁদের গান্ধীর্ষ-মাধুর্য দেখে

২ তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে ইসলামের আদর্শবাদ এদের কেউই বুঝতে পারে নি । বস্তুতঃ ইসলামের সাম্যবাদ, একেশ্বরবাদ, হজরতের সরল জীবনাদর্শ বহু লোককে অভিভূত করে ।

বিশ্বময় বোধ করে—চুড়াতে অধিরোহন করেন অম্প মহাত্মাই। আরো হয়তো একাধিক হিমালয় এ-ভূমিতে, অন্যান্য ভূমিতে আছেন—ভাষা ও দুরত্বের কুহেলিকায় আজও তাঁরা লুপ্তায়িত।

এছাড়া প্রত্যেক পাঠকেরই আপন-আপন অতি আপন প্রিয় কবি আছেন। তাঁদের কেউ কেউ হয়তো বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নি,—হয়তো তাঁদের সে মেধা নেই; এঁদের স্বীকার করে নিয়েও আমরা এঁদের নাম বিশ্বকবিদের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে বলি না।

আমি দুজন কবিকে বড় প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। আমারই মোভাগ্য, এঁদের একজন বাঙালী—চন্ডীদাস, অন্য জন জর্ম'ন, নাম হাইনে। প্রথমে উঠতে পারে, বড় বড় কবিদের ছেড়ে এঁদের প্রিয় বলে বরণ করেছি কেন? কারণটা তুলনা দিয়ে বোঝালে সরল হয়। রাজবাড়ির ঐশ্বর্য দেখে বিমোহিত হই, বিনোবাজীর ব্যস্তিত্ব দেখে বাক্যক্ষুধিত হয় না, কিন্তু রাজবাড়িতে তথা বিনোবাজীর সাহচর্যে থাকবার মত কোতুল যদি বা দু'একদিনের জন্য হয়, তাঁদের সঙ্গে অহরহ বাস করতে হলে আমার মত সাধারণ জনের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসবে।

চন্ডীদাসকে নিয়ে ষোল, আর হাইনেকে নিয়ে সতের বছর বয়েস থেকে ঘর ফরাছি। একদিনের তরে কোনো প্রকার অস্বস্তি বোধ করি নি। আমি জানি, এ-বিষয়টি আরো সরল করে বুঝিয়ে বলা যায়, কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। কারণ প্রত্যেকেরই আপন-আপন প্রাণপ্রিয় ঘরোয়া কবি আছেন—শেক্সপীয়র গ্যোটে নিয়ে ঘর করেন অম্প লোকই—তাঁরা এতক্ষণে আমার বক্তব্যটি পরিস্কার বুঝে গিয়েছেন। নিজের পিঠ কখনো নিজে দেখি নি, কিন্তু সেটা যে আছে সে-কথা অন্য লোককে যুক্তিতর্ক দিয়ে সপ্রমাণ করতে হয় না।

চন্ডীদাস ও হাইনের মত সরল ভাষাতে হৃদয়ের গভীরতম বেদনা কেউ বলতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ আর গ্যোটেও অতি সরল ভাষায় কথা বলতে জানতেন, কিন্তু তাঁরা সৃষ্টি-রহস্যের এমন সব কঠিন জিনিস নিয়ে আপন আপন কাব্য-লোক রচনা করেছেন যে সেখানে তাঁদের ভাষা বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দৃষ্টিগত হতে বাধ্য। চন্ডীদাস, হাইনে তাঁদের, আমাদের হৃদয়-বেদনালোকের বাইরে কখনো যেতে চান নি। তাঁরা গান গেয়েছেন, আমাদের আঙ্গিনায় তেঁতুলের ছায়ায় বসে—তারা-ঝরা-নির্ঝরের ছায়াপথ ধরে ধরে তাঁরা সপ্তর্ষির গগনাজন পেঁছে সেখানকার অমর্ত্য গান গান নি।

চন্ডীদাসকে সব বাঙালীই চেনে, হাইনের পরিচয় দি।

আমাদের পরিচিত জনের মাধ্যমেই আরম্ভ করি।

যাঁরা গত শতাব্দীতে ইয়োরোপে সংস্কৃতচর্চা নিয়ে কিশিগম্ন আলোচনা করেছেন তাঁরাই আউগুস্ট্‌স্‌ ভিল্‌হেল্ম্‌ ফন্‌ শ্লেগেলের সঙ্গে পরিচিত।

জর্ম'নির বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়েই সর্বপ্রথম সংস্কৃত চর্চার জন্য আসন প্রস্তুত করা হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি এই আসনে অধ্যাপকরূপে বিরাজ করতেন। এক দিকে তিনি সংস্কৃতের নাট্যকাব্যের সঙ্গে পরিচিত, অন্য দিক দিয়ে তখন-

কার গৌরবভাস্কর ফরাসী সাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্য ভোগ করেছিলেন বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যসম্রাজ্ঞী মাদাম দ্য স্তালের সখা ও উপেষ্টারূপে। তাই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ছাড়াও পড়াতেন নন্দনশাস্ত্র বা অলংকার। এক বৎসর যেতে না যেতে হাইনে বন্ এলেন আইন পড়তে। গ্নেগেলের বক্তৃতা শুনে তিনি এমনই অভিভূত হয়ে গেলেন যে আইনকে তিনি নির্বাসনে পাঠালেন।

গ্নেগেল অলংকার পড়াবার সময় নিজেকে গ্রীক লাতিন ফরাসী জর্ম'নের ভিতর সীমাবদ্ধ করে রাখতেন না। ঘন ঘন সংস্কৃত কাব্যোপবনে প্রবেশ করে গদ্য গদ্য গীতাঞ্জলির সঙ্গীততা তাঁর শিষ্যদের সামনে তুলে ধরতেন। হাইনের বয়স তখন একুশ-বাইশ। সেই সর্বজনমান্য প্রবীণ জ্ঞানবৃদ্ধ রসিকজননমস্যা গ্নেগেলের কাছে হাইনে একদিন নিয়ে গেলেন তাঁর একগদ্য সরল কবিতা।

‘উত্তম, উত্তম কবিতা, কিন্তু তোমাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। বহু বেশী পূরনো অলংকারের ছড়াছড়ি, নিজের কথায় আড় কবিতাকে কৃত্রিম করে ফেলেছে।’ দরদর বৃকে হাইনে মৃদু আপত্তি জানালেন। গ্নেগেল নির্ভয় সমালোচক। বললেন, ‘বৃক্ষেছি, বৃক্ষেছি। কিন্তু তোমার কাব্যরাণী এখনো পরে আছেন জবরজপ জামাকাপড়, তাঁর মূখে বহু বেশী কালো তিল, তাঁর ক্ষীণ কটি আর কত ক্ষীণ করবে, তাঁর খোঁপা যে আকাশে উঠে গেছে। একে ভালোবাসার যুগ তোমার পেরিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু বৃদ্ধ, তোমার ভাস্কর কাব্যলক্ষ্মী ঘূমিয়ে আছেন কে জানে কোন্ ইন্দ্রজালের মোহাচ্ছন্ন মায়ায় উত্তর দেশে। নিভৃত নিজ'নে। প্রেমাতুর, বিরহ-বেদনায় বিবর্ণ কত না তরুণ রাজপুত্র বেরিয়েছেন তাঁর সম্মানে। হয়তো তুমিই, —তুমিই বৃদ্ধ সেই ভানুমতী মন্ত পড়ে তাঁকে দীর্ঘ শব্দরীর দীর্ঘতর নিদ্রা থেকে জাগরিত করবে। ঘণ্টাবাদন বেজে উঠবে চতুর্দিকে, বনস্পতি গান গেয়ে উঠবে, প্রকৃতিও জেগে উঠবে আপন জড়নিদ্রা থেকে। জর্ম'ন কাব্যলক্ষ্মীর চতুর্দিকের প্রাকার ধ্বংসাবশেষ রূপান্তরিত হবে স্বর্ণোজ্বল রাজপ্রাসাদে। গ্রীসের সুদূরপুত্রগণ আবার এসে অবতীর্ণ হবেন তাঁদের চিরনবীন দেবসজ্জার মহিমায়……প্রার্থনা করি আপোজ্ঞো দেব তোমার প্রতি পদক্ষেপের দিকে অবিচল দৃষ্টি রাখুন।’

হাইনের জীবনীকার বলেন, কোনো সুদূরই তরুণ হাইনেকে এতখানি উত্তেজিত করতে পারে নি—সে যুগের আলংকারিক-শ্রেষ্ঠের কয়েকটি কথায় তাঁকে যতখানি সোমাচ্ছন্ন করেছিল। রসরাজ গ্নেগেল স্বহস্তে হাইনের মস্তকে কবির রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছেন।

এর কিছুদিন পরে,—হাইনে তখনো কলেজের ছাত্র,—বেরল তাঁর কবিতার বই, “বৃখ ড্যার লীডার,” “গানের বই,” কিন্তু এর অনুবাদ “গীতাঞ্জলি” করলেই ঠিক হয়। আমরা “অঞ্জলি” বলতে যা বৃঝি সেটা ইয়োরোপেও আছে, কিন্তু ঠিক শব্দটি নেই। গানের বইখানা পড়ার পর স্পষ্টই বোঝা যায়, ‘অঞ্জলি’ শব্দটি ইয়োরোপে থাকলে হাইনে অতি নিশ্চয় এটাই ব্যবহার করতেন—কারণ এর অনেকগুলিই তাঁর প্রথমা প্রিয়র পদপঞ্চকে অর্পিত প্রণয়প্রদূনাঞ্জলি।

সমস্ত জর্মনি সাত দিনের ভিতর এই কলেজের ছোকরার জয়ধ্বনি গেয়ে উঠল। হাইনে জর্মনি কাব্যে আনলেন এক নতুন সুর। অথচ সত্য বলতে কি এই সুরে কিছুমাত্র নতুনত্ব নেই, কারণ গীতিগুণি সরলতম ভাষায় রচিত। সরল ভাষা ব্যবহার করা তো আর বিশ্বসাহিত্যে কিছু নতুন নয়। কিন্তু জর্মনি কাব্যে ঐটেই হল এক সম্পূর্ণ নবীন সুর—কারণ জর্মনিদের বিশ্বাস তাদের ঐতিহ্য তাদের সংস্কৃতি এমনই এক অবর্ণনীয় কুহেলিকাধন আত্মোপলব্ধি-প্রচেষ্টা এবং অর্ধসফলতা-অর্ধনৈরাশ্যে আচ্ছাদিত যে সেটা সরল ভাষায় কিছুতেই প্রকাশ করা যায় না। হাইনে দেখিয়ে দিলেন সেটা যায়। যে রকম সবাই যখন বলেছিল, অসম্ভব, তখন মধুসূদন দেখিয়ে দিয়েছিলেন, অমিত্রাক্ষরে বাঙলা কাব্যসৃষ্টি করা যায়।

হাইনের কবিতা সরল। সকলেই জানেন সরল ভাষায় লেখা কঠিন। সেটাও আয়ত্ত করা যায়। আয়ত্ত করা যায় না—সরল কিন্তু অসাধারণ হওয়া। ‘সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিন্দু অনলে পুড়িয়া গেল’—সরল অথচ বিরল লেখা।

ইংরেজীতে হাউসমানের সঙ্গে হাইনের তুলনা করা হয়। শুনতে পাই হাউসমানের ‘প্রপ শা ল্যাডের’ মত কোনো ইংরেজী কবিতার বই এত বেশী বিক্রয় হয় নি—প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। সাধারণ জন পড়েছে বইখানা সরল বলে, গুণগীরা কিনেছেন বিরল বলে। পাঠককে অনুরোধ করি, দৃজনারই লেখা তুলিয়ে পড়তে। হাইনে অনেক উঁচুতে।^১

হাইনের কবিতা বাঙলায় অনুবাদ করেছেন প্রধানত সত্যেন্দ্র দত্ত। ‘তীর্থ’ সলিল ও তীর্থ ‘রেণু’তে—এবং হয়তো অন্যান্য পুস্তকেও কিছু কিছু আছে। আর করেছেন যতীন্দ্র মোহন বাগচী।^২

এর বই যোগাড় করতে পারি নি, আমি ১৩১৭ সনের প্রবাসীতে পড়েছি।

১ Edmund Wilson মার্কিন সমালোচক। আমি যে তাঁকে শ্রদ্ধা করি তার প্রধান কারণ তিনি এলিয়েটকে অপ্রিয় সত্য বলতে জানেন। হাইনে হাউসমান সম্বন্ধে তিনি বলেন,

There is immediate emotional experience in Housman of the same kind that there is in Heine, whom he imitated and to whom he has been compared. But Heine, for all his misfortunes, moves at ease in a large world. There is in his work an exhilaration of adventures, in travel, in love etc. Doleful his accents may sometimes be, he always lets in air and light to the mind. But Housman is closed from the beginning. His world has no opening horizons etc. “The Triple Thinkers,” p. 71

২ পরে জানতে পারি, বাঙলায় সর্বপ্রথম অনুবাদ করেন শ্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে।

‘ডী রোজ, ডী লীলিয়ে, ডী টাউবে’ দি রোজ, দি লিলি, দি ডাভের’ অনুবাদ করেছেন :

গোলাপ, কমল, কোপাত, প্রভাত রবি—

ভালবাসিতাম কত যে এসবে আগে,

সে সব গিয়েছে, এখন কেবল তুমি,

তোমারি মূর্তি পরাণে কেবল জাগে !

নিখিল প্রেমের নির্ঝর—তুমি সে সবি—

তুমিই গোলাপ, কমল, কোপাত, রবি ।

(বাগচী, প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৭)

এবারে সত্যেন দত্তের একটি :

জাগিন্দ্র যখন উষা হাসে নাই,

শুধান্দ “সে আবিবে কি ?”

চলে যায় সাঁঝ আর আশা নাই,

সে ত’ আসিল না, হাস, সখি ?

নিশীথে রাতে ক্ষুধা হৃদয়ে

জাগিয়া লুটাই বিছানায় ;

আপন রচন ব্যর্থ স্বপন

দুখ ভারে নুয়ে ডুবে যায় ।

ভারতবর্ষের প্রভাব হাইনের কবিতায় খুব বেশী আছে বলা যায় না । তাঁর পূর্ববর্তী হিমালয় গ্যোটেই যখন হাইনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি—চণ্ডীদাসের উপর কার প্রভাব !—তখন সে আশা দুরাশা । তবু একটি কবিতার উল্লেখ করি—

গঙ্গার পার—মধুর গম্ধ গ্রিভূবন

আলো ভরা—

কত না বিরাট বনস্পতিরে ধরে

পুরুষ রমণী সুন্দর আর শান্ত প্রকৃতি-ধরা

নতজান্দ হয়ে শতদলে পূজা করে ।

(লেখকের অনুবাদ)

এক দিক দিয়ে হাইনে গীতিকাব্য রচয়িতা, অন্য দিক দিয়ে তিনি সমস্ত জীবন লড়েছেন জর্মনির সাধারণ জনের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য । সেই ‘দোবে’ তাঁকে যৌবনেই নির্বাসন বরণ করতে হয় । জীবনের বেশীর ভাগ তিনি কাটান প্যারিসে । সেখান থেকে তিনি কী রাজ্যের সম্মান পেয়েছিলেন, সে কথা লিখেছেন ভিক্টর হুগোর গুরু, ফরাসী সাহিত্যের তখনকার দিনের গ্র্যান্ড মাস্টার গ্যোতিয়ের । আর হাইনের সখা ও সহচর ছিলেন সঙ্গীতের গ্র্যান্ড মাস্টার রস্‌সানী । যদিও পরের কথা, তবু এই সুবাদে একটি মধুর গম্ধ মনে পড়ল ।

জীবনের শেষ আট বছর হাইনের কাটে ঐ প্যারিসেই, রোগশয্যায়, অবশ সৈয়দ মজতবা আলী রচনাগুলী (৭ম)—৮

অথর্ব হয়ে—অসহ্য যন্ত্রণায়। কার্ল মার্ক'স্ যখন তাঁকে শ্রম্মা জানাতে আসেন তখন হাইনের চোখের পাতা আঙুল দিয়ে তুলে ধরতে হয়েছিল—যাতে করে তিনি মার্ক'স্কে দেখতে পান। এর কিছু দিন পর হাইনের বাড়িতে আগুন লাগে। বিরাট বপু দরওয়ান রোগজীর্ণ হাইনেকে কোলে করে নিয়ে গেল নিরাপদ জায়গায়। আগুন নেভানোর পর যখন তাঁকে দরওয়ান আবার কোলে তুলে নিয়ে এল তখন হাইনে মৃদু হাসি হেসে তাঁর এক সখাকে বললেন, 'হামবুর্গে' মাকে লিখে দাও, প্যারিসের লোক আমাকে এত ভালোবাসে যে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।'

সেই সরল দরওয়ান কথাটির গভীর অর্থ বুঝেছিল কি না জানি নে। শুনতে পেয়ে সে বলেছিল, 'হ্যাঁ, মসিয়ো, তাই লিখে দিন।'

ঘটনাটির ভিতর অনেকখানি বেদনা লুকনো আছে। নির্বাসিত হাইনে যতদিন পারেন মায়ের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন যে তিনি আর নড়া-চড়া করতে পারেন না।

পাশ্চাত্য কবিরা মায়ের উদ্দেশে বা স্মরণে বড় একটা কবিতা লেখেন না। ইহুদি হাইনের গায়ে প্রাচ্য দেশীয় রক্ত ছিল বলে তিনি ব্যতীয়। অল্প লোকই হাইনের মত মাকে ভালোবেসেছে। প্যারিসে থাকাকালীন মাত্র দু'বার তিনি গোপনে জর্মনি যান। দু'বারই মাকে দেখবার জন্য। আমার নিজের মনে সন্দেহ আছে, পদ্বলিস জানতে পেরেও বোধ হয় সাধারণের কবি হাইনেকে ধরিয়ে দেয় নি। পদ্বলিস কবিতা না লিখতে পারে, কিন্তু পদ্বলিসেরও তো মা থাকে।

মাতার উদ্দেশে লেখা হাইনের কবিতা অধিতীয় বলার সাহস আমি না পেলেও বলবো অতুলনীয়। এবং আশ্চর্য, কবিতাটি করুণ এবং মধুর সুরে বচা নয়। ভাষা অশ্লীল অত্যন্ত সরল, কিন্তু মূল সুরে আছে দার্ঢ্য এবং দম্ভ। কাইজারের সঙ্গে প্রজা-মিত্র হাইনের ছিল কলহ—আমার মনে প্রশ্ন জাগে হাইনের সখা রজকিনী-সাধক চণ্ডীদাসকে কি মদুকুটহীন কাইজার ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয় নি—এবং তাই তিনি কবিতা আরম্ভ করেছেন,

উচ্চাশির উচ্ছে রাখা অভ্যাস আমার
আমরা প্রকৃতি জেনো অতীত কঠোর
রাজারো অবজ্ঞা-দৃষ্টি পারে না তো মোর
দৃষ্টি কভু নত করে। কিন্তু মাগো—

আর তার পর কী আকুলি-বিকুলি! তোমার সামনে, মা, আপনার থেকে মাথা নিচু হয়ে আসে। স্মরণে আসে, কত না অপরাধ করেছি, কত কিছু না করে তোমার পুণ্য হৃদয়কে বেদনা দিয়েছি বার বার। তার স্মৃতি আমাকে যে কী পীড়া দেয়, জানো মা?

সত্যেন দত্তের অনুবাদ তুলে দিতে ইচ্ছে করছে না,—প্রত্যেক অনুভূত জনের মত আমারও মন আঁকুর্বাঁকু করে, হাইনের মাতৃমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমিও আমার মাতৃমন্ত্র উচ্চারণ করে যাই।

কবিতাটির দ্বিতীয় ভাগে অন্য সুর।

তোমাকে ছেড়ে মা, মর্খের মত আমি গিয়েছি পৃথিবীর অন্য প্রান্তে—
ভালোবাসার সন্ধানে। ঘোরে ঘোরে ভিখারির মত ভালোবাসার জন্য করেছি
করাঘাত। আর পেয়েছি শূন্য নিদারুণ ঘণা। তারপর যখন ক্ষত-বিক্ষত
শ্লথ চরণে বাড়ি ফিরেছি তখন দোরের সামনে তুমি মা এগিয়ে এসেছ আমার
দিকে—

হার মানলুম। সত্যের দস্তুর অনুবাদটিই পড়ুন।

আশ্চর্য লাগে, এই হাইনে লোকটি সরল ভাষায় কি করে রুদ্র করুণ উন্ম
রসই তৈরী করতে জানতেন। আর আমার সব চেয়ে ভালো লাগে তাঁর হাসি-
কান্নায় মেলানো লেখাগুলো। তারই হৃদয় একটি শোনাবার জন্য দীর্ঘ এই
ভূমিকা। আমি নিরুপায়। হায়, আমার তো সে শক্তি নেই যার কৃপায় লেখক
মহাস্বাভাবকেও স্বপ্নে প্রকাশ করতে পারে।

সম্রাট ম্যাক্সিমিলীয়নের কাহিনী বলতে গিয়ে হাইনে অনুতাপ করছেন,
যে কাহিনীটি তাঁর ভালো করে মনে নেই—অনেককালের কথা কি না।
আপসোস করে বলছেন, এ সব জিনিস মানুষ সহজেই ভুলে যায়,—বিশেষ
করে যখন তাঁকে প্রতি মাসে প্রফেসরের রোজ্জা মাইনে দেওয়া হয় না, আপন
ক্লাস-লেকচারের নোটবই থেকে মাঝে-মাঝে পড়ে নিয়ে স্মৃতিটা ঝালিয়ে নেবার
জন্য।

ম্যাক্সিমিলীয়ন পাষণ্ড প্রাচীরের কঠিন কারাগারে। তাঁর আমীর-ওমরাহ,
উজীর-নাজীর সবাই তাঁকে বর্জন করেছে। কেউ সামান্যতম চেষ্টা করছে না,
তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করার। কী ঘেন্নায়ই না ম্যাক্সিমিলীয়ন তাঁর
গৌরবান্বিতের সেই পা-চাঁটা দলের কথা মাঝে মাঝে স্মরণ করেছিলেন।

এমন সময় সর্বাস্থ কন্বলে ঢেকে এসে ঢুকলো কারাগারের নির্জন কক্ষ
একটা লোক। কে এ? এক ঝটকায় কন্বল ছুঁড়ে ফেলে দিতেই সম্রাট দেখেন,
এ যে রাজসভার ভাড়ি, সং, বিশ্বাসী কুন্ৎস্ ফন্ ড্যার রোজেন। আশার
বাণী, আত্মবিশ্বাসের মন্ত নিয়ে এল শেষটায় রাজসভার মর্খ—সং কুন্ৎস্!

‘ওঠো, মহারাজ, তোমার শৃংখল ভাঙবার দিন এল। কারামুক্তির সময়
এসেছে। নব-জীবন আরম্ভ হল। অমানিশি অতীত—ঐ হেরো, বাইরে
প্রথম উষার উদয়।’

‘ওরে মর্খ, ওরে আমার হাবা কুন্ৎস্! ভুল করেছিস, রে ভুল করেছিস।
উজ্জ্বল খড়্গ দেখে তুই ভেবেছিস মর্খ, আর যেটাকে তুই উষার লালিমা মনে
করেছিস সে রক্ত।’

‘না, মহারাজ, ওটা সূর্যই বটে, যদিও অসম্ভব সম্ভব হয়েছে—ওটা উদয়
হচ্ছে পশ্চিমাকাশে—ছ’হাজার বছর ধরে মানুষ ওটাকে পূর্ব দিকেই উঠতে
দেখেছে—এখনো কি ওর সময় হয় নি যে একবার রাস্তা বদলে পশ্চিম দিকে
উঠে দেখে কি রকম লাগে!’

‘কুন্ৎস্ ফন্ ড্যার রোজেন, বল দেখি তো হাবা আমার, তোর টুঁপতে যে
ছোট ছোট ঘৃণার বাঁধা থাকতো সেগুলো গেল কোথায়?’

‘দুঃখের কথা তোলেন কেন, মহারাজ ! আপনার দুর্দিনের কথা ভেবে ভেবে মাথা নাড়াতে নাড়াতে ঘুঙুরগুলো খসে গেল ; কিন্তু তাতে টুপির কোনো ক্ষতি হয় নি ।’

‘কুন্ৎস্ ফন্ ড্যার রোজেন, ওরে মর্খ, বল্ তো, রে, বাইরে ও কিসের শব্দ ?’

‘আন্তে, মহারাজ । কামার কারাগারের দরজা ভাঙছে । শীঘ্রই আপনি আবার মুক্ত স্বাধীন হবেন—সন্মাত ।’

‘আমি কি সত্যিই সন্মাত ? হায়, শুধু রাজসভার মর্খের মর্খেই আমি এ-কথা শুনলুম ।’

‘ও রকম করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবেন না প্রভু ! কারাগারের বিষের হাওয়া আপনাকে নিৰ্জীব করে ফেলেছে । আপনি যখন আবার সন্মাত হবেন তখন ধমনীতে ধমনীতে অনুভব করবেন সেই বীর রাজ-রক্ত, আপনি আবার হবেন গর্বিত সন্মাত, দম্ভী সন্মাত । আবার হবেন দাক্ষিণ্যময় এবং আবার করবেন অন্যায় অবিচার, হাসিমুখে, এবং আবার হবেন নৈমকহারাম—রাজাবাদশাদের যা স্বভাব ।’

‘কুন্ৎস্ ফন্ ড্যার রোজেন, বল্ তো হাবা, আমি যখন আবার স্বাধীন হব, তখন তুমি কি করবি ?’

‘আমি আমার টুপিতে ফের ঘুঙুর সেলাই করবো ।’

‘আর তোর বিশ্বস্ততা প্রভুভক্তির বদলে তোকে কি প্রতিদান, কি পুরস্কার দেব ?’

‘আঃ । আমার দিলের বাদশাকে কি বলবো ! দয়া করে আমার ফাঁসির হুকুমটা দেবেন না ।’

এইখানে হাইনে তাঁর গল্পটি শেষ করেছেন ।

আমরা বলি ‘হা, হতোশ্মি, হা হতোশ্মি ! রাজসভার ভাঁড়িই হোক, আর সঙই হোক, গভা-মর্খ হোক আর পুণ্যশ্লোক গর্দভই হোক, কুন্ৎস্ বিলক্ষণ জানতো, রাজারাজড়ার কৃতজ্ঞতাবোধ কতখানি !’

কিন্তু কাহিনীটির তাৎপর্য কি ?

হাইনে সেটি গল্পের মাঝখানেই বন্ধ দিয়েছেন । সে যুগের গল্পে দুটো ক্লাইমেক্স্ চলতো না বলে আমি সেটি শেষের-কবিতা রূপে রেখে দিয়েছি ।

‘হে পিতৃভূমি জর্মনি ! হে আমার প্রিয় জর্মনি জনগণ ! আমি তোমাদের কুন্ৎস্ ফন্ রোজেন । তার একমাত্র ধর্ম ছিল আনন্দ, যার কর্ম ছিল তোমাদের মঙ্গলদিনে তোমাদের আনন্দবর্ধন করা, তোমাদের দুর্দিনে কারা-প্রাচীর উল্লংঘন করে তোমাদের জন্য অভয়বাণী নিয়ে আসা । এই দেখো, আমার দীর্ঘ আচ্ছাদনের ভিতর লুকিয়ে এনেছি তোমার সুদৃঢ় রাজদণ্ড, তোমার সুন্দর রাজমুকুট—আমাকে স্মরণ করতে পারছ না, তুমি মহারাজ ? আমি যদি তোমাকে মুক্ত নাও করতে পারি, সাম্রাজ্য তো অসম্ভব দিতে পারব । অসম্ভব তো তোমার কাছে এমন একজন আপন-জন রইল যে তোমার সঙ্গে

তোমার দুঃখ-বেদনার কথা কইবে ; তোমাকে আশার বাণী শোনাবে ; যে তোমাকে ভালোবাসে ; যার সর্বশেষ রসের কথা সর্বশেষ রক্তবিন্দু তোমারই সেবার জন্য । হে আমার দেশবাসীগণ, তোমরাই তো প্রকৃত সম্রাট, তোমরাই তো দেশের প্রকৃত প্রভু । তোমাদের ইচ্ছা, এমন কি তোমাদের খেয়াল-খুশীই তো দেশের প্রকৃত শক্তি—এ শক্তি ‘বীধি-দন্ত’ ‘রাজদণ্ডকে’ অনায়াসে পদদলিত করে । হতে পারে আজ তোমরা পদশঙ্খলিত, কারাগারে নিক্ষিপ্ত—কিন্তু আর কত দিন ? ঐ হেরো, মৃত্তির নব অরুণোদয় !’

*

*

হে বাঙালী, আজ তুমি দর্দশার চরমে পৌঁছেছো ।

কোথায় তোমার কুন্স্ ফন্ ডার রোজেন ? যে তোমাকে আশার বাণী শোনাবে ? ॥

খোশগল্প

যখন তখন লোকে বলে, ‘গল্প বলো ।’

এ বাবদে স্বর্গত ক্ষিতিমোহন সেনের একাধিক রসাল উত্তর আছে । তিনি বাঙাল উচ্চারণে তখন বলতেন, ‘ঘর লেপ্যা মূছ্যা, আতুড় ঘর বানাইয়া, মা ঘন্টার গেছে বাচ্যা বাচলেই তো আর বাচ্যা পয়দা হয় না । নয় মাস দশ দিন সময় লাগে ।’ অর্থাৎ গল্পের সময় এলে তবে গল্প বেরবে ।

ইহুদিদের গল্প এর চেয়ে একটু ভালো । ফেন, সে-কথা পরে বলছি ।

এক ভালো কথক রাম্বী (ইহুদিদের পণ্ডিত পুরুষ) অনেকখানি হাটার পর অতিথি হয়ে উঠেছেন এক পরিচিত চাষার বাড়িতে । চাষা-বো জানতো, রাম্বী গল্প করতে ভারি ওস্তাদ । পাদ্য-অর্ঘ্য না দিয়েই আরম্ভ কবেছে, ‘গল্প বলুন, গল্প বলুন ।’ ইতিমধ্যে চাষা ভিন গাঁয়ের মেলা থেকে ফিরেছে একটা ছাগী কিনে । চাষা-বো সঙ্গে সঙ্গেই গল্পের বায়না বন্ধ করে দুইতে গেছে ছাগীকে—ইহুদি তো ! এক ফোঁটা দুধ বেরল না দেখে চাষা-বো বেজার মুখে স্বামীকে শূধ্যালো, ‘এ কি ছাগী আনলে গো ?’ বিচক্ষণ চাষা হেসে বললে, ‘ওটা হেঁটে হেঁটে হয়রান হয়ে গিয়েছে । দানাপানি দাও—দুধ ঠিকই দেবে ।’ রাম্বী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, ‘সেই কথাই তো হচ্ছে । দানা-পানি না পেলে আমিই বা গল্প বলি কি করে ?’

ক্ষিতিমোহনবাবু ইহুদি ছিলেন না বলে, নিজের সুবিধেটা উত্তরের মারফতে গুঁছিয়ে নিতে পারেন নি—ইহুদি পারে ।

এ গল্পটা মনে রাখবেন । কাজে লাগবে । অস্ত্র চা-টা পাঁপড়ভাজাটা আসবে নিশ্চয়ই ।

সঙ্গে সঙ্গে ইহুদি, স্কটম্যান সাইকল্ চালাতে আরম্ভ করে দেবেন । সে আবার কি ? এসোসিয়েশন অফ আইডিয়াজ্, অর্থাৎ এক চিন্তার খেই ধরে অন্য চিন্তা,

সেটা থেকে আবার অন্য চিন্তা, এই রকম করে করে মোকামে পেঁছে যাবেন । এখনো বুঝতে পারলেন না ? তবে একটা গল্প দিয়েই বোঝাই ।

সেই যে বাদির ছেলে কিছুতেই শটকে শিখবে না, এ ছেলে তেমন পেটুক—
মা- কিছু শিখতে দেওয়া হয়, পেঁছে যাবেই যাবে মিণ্ট-সন্দেশে । তাকে একৎ দশৎ শিখতে দেওয়া হয়েছে । বলছে,

‘একৎ, দশৎ, শতৎ, সহস্র, অযুত, লক্ষ্মী, সরস্বতী—’

(মন্তব্য : ‘লক্ষ’ না বলে বলে ফেলেছে ‘লক্ষ্মী’ এবং তিনি যখন দেবী তখন তাঁর এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজ থেকে চলে গেছে আরেক দেবী সরস্বতীতে ; তার পর বলছে,)

‘লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক, অগ্রহায়ণ—’

(মন্তব্য : ‘কার্তিক’ মাসও বটে, তাই এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজে চলে গেল অগ্রহায়ণ পোষে)

অগ্রহায়ণ, পোষ, মাগ, ছেলে-পিলে—’

(মন্তব্য : ‘মাঘ’কে আমরা ‘মাগ’ই উচ্চারণ করে থাকি । তার থেকে ‘ছেলে-পিলে’)

‘পিলে, জ্বর, শদী, কাশী—’

(মন্তব্য : তার থেকে যাবতীয় তীর্থ !—)

‘কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, গয়া, পূরী—’

‘পূরী, সন্দেশ, রসগোল্লা, মিহাদানা, বৌদে, খাজা, লেডিকান—’

ব্যাস ! পূরী তো খাদ্য, এবং ভালো খাদ্য । অতএব তার এসোসিয়েশনে বাদবাকি উত্তম উত্তম আহারাতি ! পেঁছে গেল মোকামে !

এই এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজ থেকে গল্পের খেই ধরে নেওয়া যায় ।

ইহুদির কথা যখন উঠেছে তখন ইহুদীর কঙ্গুসী, স্কটম্যানের কঙ্গুসী তাবৎ কঙ্গুসীর গল্প আরম্ভ করে দিতে পারেন ।

এগুলোকে আবার সাইক্লও বলা হয় । এটা হল কঙ্গুসীর সাইক্ল—অর্থাৎ দুনিয়ার যত রকম হাড়কিপটেমির গল্প এই সাইক্ল ঢুকে যাবে । ঠিক সেই রকম আরো গন্ডায় গন্ডায় সাইক্ল আছে । শ্রী কতৃক স্বামীর উপর অত্যাচার, শ্রীকে লুটিকয়ে পরশ্রীর সঙ্গে ফাঁটনিশি, ট্রেন লেটের সাইক্ল, ডেলি পেসেঞ্জারের সাইক্ল, চালাকির সাইক্ল—

চালাকির সাইক্ল এ দেশে গোপালভাঁড় সাইক্লই বলা হয় । অর্থাৎ চালাকির যে কোনো গল্প আপনি গোপালের নামে চালিয়ে যেতে পারেন, কেউ কিছু বলবে না । ইংরেজীতে এটাকে ‘রাস্কেট’ ‘অমনিবাস’ গল্পগুণ্টিও বলা চলে ।

গোপালের অপজিট নাম্বার অর্থাৎ তাঁরই মত চালাক ছোকরা প্রায় সব দেশেই আছে । প্রাচীন অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির রাজদরবারে ছিলেন মিকশ, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর অধিকাংশ গল্পই সমাজে কলেক পায় না, ভিয়েনার ভাষায় গেজেলাফটফেইন নয় (সমাজে অচল) । সেদিক দিয়েও গোপালের সঙ্গে

তারি গলাগলি।

কিন্তু এ সংসারে বুদ্ধিমানের চেয়ে আহাম্মুখের সংখ্যাই বেশী, তাই আহাম্মুখীর সাইক্লই পাবেন দুনিয়ার সবত্র। অধুনা কেন্দ্রের এক প্রাক্তন মন্ত্রীকে কেন্দ্র করে একটি বিরাট সাইক্ল তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে। এ'র জুড়ি ভিয়েনাতে গ্রাফ ফন্ ববে, পশ্চিম ভারতে শেখ চিল্লি (আমার ঠিক মনে নেই, তবে বোধ করি শ্রীযুক্তা সীতা শাস্তার হিন্দুস্থানী উপকথাতে এ'র গল্প আছে), এবং সুইটজারল্যান্ডে পল্ডি।

পল্ডির গল্প অফুরন্ত। আমি গত দশ বছর ধরে একখানা সুইস্ পত্রিকার গ্রাহক। প্রতি সপ্তাহে পল্ডি নিয়ে একটি ব্যঙ্গচিত্র থাকে। চলেছে তো চলেছে। এখনো তার শেষ নেই। কখনো যে হবে মনে হয় না।

কিছুমাত্র না ভেবে গোটা কয়েক বলি :—

বশু : জানো পল্ডি অক্সিজেন ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। ১৭৭০-এ শুটা আবিষ্কৃত হয়।

পল্ডি : তার আগে মানুষ বাঁচতো কি করে ?

কিংবা

পল্ডি : (আমেরিকান টুরিস্টকে এক কাস্‌ল্ দেখিয়ে) ঐ ওখানে আমার জন্ম হয়। আপনার জন্ম হয় কোন্‌খানে ?

টুরিস্ট : হাসপাতালে।

পল্ডি : সর্বনাশ ! কি হয়েছিল আপনার ?

কিংবা

বাড়িউলী : সে কি মিঃ পল্ডি ? দশ টাকার মণিঅর্ডার, আর আপনি দিলেন পাঁচ টাকা বকশিশ !

পল্ডি : হে, হে, ঐ তো বোঝো না আর কিস্টেমি করো। ঘন ঘন আসবে যে !

কিংবা

পল্ডি ঘোড়ার রেসে গিয়ে শ্রদ্ধোচ্চেন : ঘোড়াগুলো এরকম পাগল পারা ছুটছে কেন ?

বশু : কি আশ্চর্য, পল্ডি তাও জানো না ! যেটা ফাস্ট হবে সেটা প্রাইজ পাবে যে।

পল্ডি : তা হলে অন্যগুলো ছুটছে কেন ?

এর থেকে আপনি রেসের গণ্ডের মাধ্যমে কুটি সাইকেল অনায়াসে চলে যেতে পারেন। যেমন,

কুটি রেসে গিয়ে বেট করেছ এক অতি নিকৃষ্ট ঘোড়া। এসেছে সর্বশেষে। তার এক বশু—আরেক কুটি—ঠাট্টা করে বললে, “কি ঘোড়া (উচ্চারণ অবশ্য ‘গোরা’—আমি বোঝার সুবিধের জন্য সেগুলো বাদ দিয়েই লিখছি) লাগাইলায় মিয়া ! আইলো সকলের পিছনে ?”

কুটি দমবার পাত্র নয়। বললে, ‘কন্ কি কস্তা ! দ্যাখলেন না, যেন বাঘের

বাচ্চা—বেবাকগুলিরে খ্যাদাইয়া লইয়া গেল !’

কুটি সম্প্রদায়ের সঙ্গে পূর্ব-পশ্চিম উভয় বাঙলার রসিকমণ্ডলীই একত্রে সুপরিচিত ছিলেন। নবীনদের জানাই, এরা ঢাকা শহরের খানদানী গাড়োয়ান-গোষ্ঠী। মোগল সৈন্যবাহিনীর শেষ ঘোড়সওয়ার বা ক্যাভালারি। রিক্‌শার অভিসম্পাতে এরা অধুনা লুপ্তপ্রায়। বহুদেশ ভ্রমণ করার পর আমি নির্ভয়ে বলতে পারি, অশিক্ষিত জনের ভিতর এদের মত witty (হাজির-জবাব এবং সুরসিক বাক-চতুর) নাগরিক আমি হিল্লী-দিল্লী কলোন-বুলোন কোথাও দেখি নি।

এই নিন একটি ছোট ঘটনা। প্রথম পশ্চিম বাঙলার ‘সংস্করণ’টি দিচ্ছি। এক পয়সার তেল কিনে ঘরে এনে বড়ী দেখে তাতে একটা মরা মাছি। দোকানীকে গিয়ে অনুযোগ জানাতে সে বললে, ‘এক পয়সার তেলে কি তুমি মরা হাতি আশা করেছিলে!’ এর রাশান সংস্করণটি আরো একটু কাঁচা। এক কপেকের (প্রায় এক পয়সা) রুটি কিনে এনে ছিঁড়ে দেখে এক বড়ী তাতে এক টুকরো ন্যাকড়া। দোকানীকে অনুযোগ করতে সে বললে, ‘এক কপেকের রুটির ভিতর কি তুমি আস্ত একখানা হীরের টুকরো আশা করেছিলে?’ এর ইংরেজী ‘সংস্করণে’ আছে, এক ইংরেজ রমণী এক শিলিঙে এক জোড়া মোজা কিনে এনে বাড়িতে দেখেন তাতে একটি ল্যাডার (অর্থাৎ মই—মোজার একটি টানা সূতো ছিঁড়ে গেলে পড়েনের সূতো একটার পর একটা যেন মইয়ের এক একটা ধাপ-কাঠির মত দেখায় বলে ওর নাম ল্যাডার)। দোকানীকে অনুযোগ জানাতে সে বললে, ‘এক শিলিঙের মোজাতে কি আপনি, ম্যাডাম, একখানা রাজকীয় মার্বেল স্টেয়ারকেস্ আশা করেছিলেন!’

এবারে সর্বশেষ শূন্য কুটি সংস্করণ। সে একখানা বুড়ুর বাড়ি ভাড়া দিয়েছে পুন্ড্রিসের এসাইকে। বর্ষাকালে কুটিকে ডেকে নিয়ে তিনি দেখাচ্ছেন, এখানে জল বরছে, ওখানে জল পড়ছে—জল জল সর্বত্র জল পড়ছে। পুন্ড্রিসের লোক বলে কুটি সাহস করে কোনো মন্তব্য বা টিপসনী কাটতে পারছে না যদিও প্রতি মূহুর্তেই মাথায় খেলছে বিস্তর। শেষটায় না থাকতে পেরে বেরবার সময় বললে, ‘ভাড়া তো দ্যান্ কুল্লের পাঁচটি টাকা। পানি পড়বে না তো কি শরবৎ পড়বে?’

কুটি সম্বন্ধে আমি দীর্ঘতর আলোচনা অন্যত্র করেছি—পাঠক সেটি পড়ে দেখতে পারেন। আমার শোক-পরিতাপের অন্ত নেই যে, এ সম্প্রদায় প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চললো। আমি জানি এদের উইট্, এদের রিপোর্ট লেখাতে ও ছাপাতে সঠিক প্রকাশ করা যায় না; কিন্তু তৎসঙ্গেও এ-সম্প্রদায় সম্পূর্ণ লোপ পাওয়ার পূর্বে পূর্ব বাঙলার কোনো দরদীজন যদি এদের গল্পগুলির একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন, তবে তিনি উভয় বাঙলার রসিকমণ্ডলীর ধন্যবাদার্থ হবেন।

*

*

*

পাঠক ভাববেন না, আমি মিস্ট মিস্ট গল্প বলার জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা

করেছি। আরপেই না। তাহলে আমি অনেক উত্তম উত্তম গল্প পেশ করতুম। এখানে গল্পের সাইক্ল ও এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজ, কিংবা বলতে পারেন এসোসিয়েশন অব স্টারিজ বোঝাবার জন্য যে সব গল্পের প্রয়োজন আমি তারই কাঁচা পাকা সব কিছু মিশিয়ে কয়েকটি গল্প নিবেদন করেছি মাত্র। (এবং সত্য বলতে কি, আসলে কোনো গল্পই কাঁচা কিংবা পাকা, নিরেস কিংবা সরেস নয়। মোকা-মারফিক জুংসই করে যদি তাগ-মারফিক গল্প বলতে পারেন, তবে অত্যন্ত কাঁচা গল্পও শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তহরণ করতে সমর্থ হবে, পক্ষান্তরে তথাকথিত শ্রেষ্ঠ গল্পও যদি হঠাৎ বেমজ্জা বলে বসেন, তবে রসিকমণ্ডলী বিরক্ত হয়ে ভুরু কুঁচকাবেন।)

গল্প বলার আর্ট, গল্প লেখার আর্টেই মত বিধিদক প্রতিভা ও সাধনা সহযোগে শিখতে হয়—এবং দুই আর্টই ভিন্ন। অতি সামান্য, সাধারণ গল্পও পূজনীয় স্বর্গত ক্রীতিমোহন অতি সুন্দর রূপ দিয়ে প্রকাশ করতে পারতেন—অথচ তাঁর লেখা রচনায় সে-জিনিসের কোনো আভাসই পাবেন না; পক্ষান্তরে গ্রন্থের স্বর্গত রাজশেখরবাবু লিখে গিয়েছেন বিশ্বসাহিত্যের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ হাসির গল্প, অথচ তিনি বৈঠক-মজলিসে ছিলেন রাশভারী প্রকৃতির। গল্প-বলার সময় কেউ কেউ অভিনয় যোগ করে থাকেন। সুলেখক অবধূত এ বাবদে একটি পয়লা নম্বরী ওস্তাদ। যদি কখনো তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয় তবে চন্দননগর চুঁচড়ো অঞ্চলের বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক কি ভাবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন তার বর্ণনা দিতে বলবেন। কিন্তু এ প্রবন্ধের গোড়াতে যে সাবধান বাণী দিয়ে আরম্ভ করেছি, সেটি ভুলবেন না। বেমজ্জা যখন তখন অনুরোধ করেছেন, কি মরেছেন। অবধূত তেড়ে আসবে। অবধূত কেন, রসিকজন মাত্রই তেড়ে আসে। এই তো সেদিন অবধূত বলছিল, ‘জানেন, মাস কয়েক পূর্বে ১১০ ডিগ্রীর গরমে যখন ঘণ্টাভিনেক আইচাই করার পর সব চোখে অস্পষ্ট একটু তন্দ্রা লেগে আসছে এমন সময় পাড়া সচকিত করে টেলিগ্রাফ পিয়ন ঢঙের সজোরে কড়া নাড়া। দরজা খুলতে দেখি দুই অচেনা ভদ্রলোক। কড়া-রন্দুর, রাস্তার ধূলোমুলোয় জড়িয়ে চেহারা পর্ষণ্ড ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। কি ব্যাপার? ‘আজ্ঞে, আদালতে শুনতে পেলুম, আমাদের মোকদ্দমা উঠতে এখনও ঘণ্টা-দুয়েক বাকি, তাই আপনার সঙ্গে দু’দণ্ড রসালাপ করতে এলুম।’ আমি অবধূতকে শূধোলুম, ‘আপনি কি করলেন?’ অবধূত উদাস নয়নে ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। আমি বেশি ব্যাটালুম না। কারণ মনে পড়ে গেল, মোটামুটি ঐ সময়ে চুঁচড়োর জোড়াঘাটের কাছে, সদর রাস্তার উপর দুটো লাশ পাওয়া যায়। খুনী ফেরার। এখনো ব্যাপারটা হিলো হয় নি।

ভালো করে গল্প বলতে হলে আরো মেলা জিনিস শিখতে হয়—এবং সেগুলো শেখানো যায় না। আমি স্বয়ং তো আদৌ কোনো প্রকারের গল্প বলতে পারি নে। প্রট ভুলে যাই, কি দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম, কি দিয়ে শেষ করবো তার খেঁই হারিয়ে ফেলি, গল্প আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই খিল খিল করে হাসতে আরম্ভ করি, ‘ঐয্যা, কি বলছিলুম’ প্রতি দু’সেকেন্ড অন্তর অন্তর

আসে, ইতিমধ্যে কেউ হাই তুললে তাকে তেড়ে যাই, শেষটায় সভাস্থ কেউ দয়া-পরবশ হয়ে গল্পটা শেষ করে দেন—কারণ যে গল্পটি আমি আরম্ভ করেছিলুম সেটি মজলিসে ইতিপূর্বে, আমারই মূখে, ছেঁড়া-ছেঁড়া ভাবে অন্তত পঞ্চাশ-বার শুনেন, জোড়া-তাড়া দিয়ে খাড়া করতে পেরেছে। তদুপরি আমার জিভে ক্রনিক বাত, আমি তোংলা এবং সামনের দুপাটিতে আর্টটি দাঁত নেই।

তাহলে শুনোবেন, তবে তুমি এ প্রবন্ধ লিখছ কেন? উত্তর অতি সরল। ফেল করা স্টুডেন্ট ভালো প্রাইভেট টুটর হয়। আমি গল্প বলার আর্টটা শেখার বিস্তর কষ্ট করে ফেল মেরেছি বলে এখন এর টুটর লাইনে আমিই সন্মত।

* * *

কিন্তু এ আর্ট এখন মৃতপ্রায়; কারণটা বড়িয়ে বলি।

পূর্বেই নিবেদন করেছি, গল্পের কাঁচা পাকা কিছুই নেই, মোকা-মাফিক বলতে পারা, এবং বলার ধরনের উপর ঐ জিনিস সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

এ তত্ত্বটি সব চেয়ে ভালো করে জানেন, বিশ্ব-গল্পকথক সম্প্রদায় (ওয়াল্ড'স্টারি-টেলারস্ ফেডারেশন)। মার্কিন মূল্যকে প্রতি বৎসর এঁদের অধিবেশন হয় এবং পৃথিবীর সর্বকোণ থেকে ডাঙর ডাঙর সদস্যরা সেখানে জমায়েত হন। এঁরা বিলক্ষণ জানেন, গল্প মোকা-মাফিক এবং কায়দা-মাফিক বলতে হয়। চীনের ম্যান্ডারিন সদস্য যে গল্পটি বলতে যাচ্ছেন সেটি হয়তো সব চেয়ে ভালো বলতে পারেন বঙ্গো-ইন-কঙ্গোর লুসাবুদু। ওঁদিকে পৃথিবীর তাবৎ সরেস গল্পই এঁরা জানেন। কি হবে, চীনার কাঁচা ভাষায় পাকা দাড়িওয়ালারা ঐ গল্প তিনশ তেষটি বারের মত শুনেন। অতএব এঁরা একজোটে বসে পৃথিবীর সব কটি সুন্দর সুন্দর গল্প জড়ো করে তাতে নম্বর বসিয়ে দিয়েছেন। যেমন মনে করুন, কুটির সেই পানি পড়ার বদলে শরৎ পড়ার গল্পটার নম্বর ১৯৮।

এখন সে অধিবেশনে গল্প বলার পরিস্থিতিটা কি রূপ?

যেমন মনে করুন, কথার কথা বলছি, সদস্যরা অধিবেশনের গুরুদ্বার কৰ্মভার সমাধান করে ব্যানকুয়েট খেতে বসেছেন। 'ব্যানকুয়েট' বললুম বটে, আসলে অতি সস্তা লাঞ্চ—'লাঞ্ছনা'ও বলতে পারেন, একদম দাঁঠাকুরের পাইস হোটেল মেলের। এক মেম্বর ডালে পেলেন মরা মাছি। অমনি তাঁর মনে পড়ে গেল, সেই বড়ীর এক পয়সার তেলে মরা মাছি, কিংবা 'পানি' না পড়ে শরৎ পড়বে নাকি' গল্প। তিনি তখন গল্পটি না বলে শূন্য গম্ভীর কণ্ঠে বললেন নম্বর '১৯৮'!

সঙ্গে সঙ্গেই হো হো অটুহাস্য। একজন হাসতে হাসতে কাৎ হয়ে পাশের জনের পাঁজরে খোঁচা দিয়ে বার বার বলছেন, 'শুনলে? শুনলে? কি রকম একথানা খাসগল্প ছাড়লে!' আরেকজনের পেটে খিল ধরে গিয়েছে—তাকে মাসাজ করতে শূন্য করেছেন আরেক সদস্য।

* * *

অতএব নিবেদন, এ সব গল্প শিখে আর লাভ কি? এদেশেও কালে বিশ্ব-গল্পকথক-সম্প্রদায়ের রাগ-আপিস বসবে, সব গল্পের কপালে কপালে নম্বর

পড়বে, আপনি আমি কোনো-কিছুর বলার পুরষেই কেউ না কেউ নম্বর হেঁকে যাবে। তারপর নীলাম। ৯৮ নম্বর বলতে না বলতেই এসোসিয়েশন অব আইডিয়ারাজে কারো মনে পড়ে যাবে অন্য গল্প তিনি হাঁকবেন ২৭২। তারপর ৩১৮—আর সঙ্গে সঙ্গে হাসির হররা, রগড়ের গড়িয়াহাট—আপনি আমি তখন কোথায় ?

হ্যাঁ, অবশ্য, যতদিন না ব্রাণ্ড-আপিস কয়েম হয় ততদিন অবশ্য এইসব টুটা-ফুটা গল্প দিয়ে ট্রি-লেগেড রেস রান করতে পারেন। কিংবা দৃষ্ট ছেলেকে শাসন করার জন্য গুরুদশাই যে রকম বলতেন, ‘যতক্ষণ বেত না আসে ততক্ষণ কানমলা চলুক।’

বাই দি উয়ে—এ গল্পটাও কাজে লাগে। নেমস্তন্ন বাড়িতে চপ কাটলেট না আসা পর্যন্ত লুচি ছোলার ডাল খেতে খেতে বলতে পারেন, ‘যতক্ষণ বেত না আসে ততক্ষণ কানমলা চলুক।’

শের্শে লা ফাম্

(Cherchez la femme)

খুন, রাহাজানি, চুরি, ডাকাতি যাই হোক না কেন, এক ফরাসী হাকিম বিচারের সময় অসহিষ্ণু হয়ে বার বার শব্দধোতেন, ‘মেয়েটা কোথায় ? শের্শে লা ফাম্—মেয়েটাকে খোঁজো !’ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, দুনিয়ার কুলে খুন-খারাবীর পিছনে কোনো না কোনো রমণী ঘাপটি মেরে বসে আছে। আসামী, ফরিয়াদী, সাক্ষী, কোনো না কোনো রূপে তাকে আদালতে সশরীরে উপস্থিত। হাবেয়ান কপদুস) না করা পর্যন্ত মোকদ্দমার কোনো সুরাহা হবে না। অতএব শের্শে লা ফাম্—মেয়েটাকে খোঁজো ! একবার ইনিশিওরেন্স মোকদ্দমা ছিল কোনো চিমনি-পরিদর্শককে নিয়ে। একশ ফুট উঁচু থেকে সে পড়ে যায়। তার খেনারীতি মজুর হয়ে গেলে উকিল শব্দধালেন, ‘কই, হুজুর, এ মোকদ্দমায় আপনার শের্শে লা ফাম্ তো খাটলো না ?’ হুজুর দমবার পাত্র নয়। সোল্লাসে বললেন, ‘খোঁজো, খোঁজো, পাবে।’ হবি তো হ—তাই ! তাল্যাশীতে বেরল, সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় সে হঠাৎ নিচের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছিল এক সুন্দরী রমণীর দিকে—পড়ে মরল পা হড়কে !

*

*

*

আকাশবাণী সম্বন্ধে নানাপ্রকারের ফরিয়াদ প্রায়ই শোনা যায়। আল্লাহ দুনিয়া সম্বন্ধেই যখন হামেহাল নালিশ লেগেই আছে তখন এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

গুণীজ্ঞানীরা বলেন, প্রাচ্যের মানব অন্তর্মুখী—প্রতীচ্যের বহির্মুখী। এত বড় তত্ত্বকথার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো কথা বলার হস্ত আমার নেই। তবে একটা জিনিস আমি স্বচক্ষে লক্ষ্য করেছি—গরমের দেশের লোক বারান্দা রক

ভেঁতুলভলায় দিন কাটায় আর পশ্চিমের লোক বাড়ির ভিতর।

আমরা আপিস-আদালত কলেজ-কারখানা থেকে বেরিয়েই একটুখানি হাওয়া খেয়ে গা-টা জুড়িয়ে নিতে চাই। 'ঈর্ভানং ওয়ক' 'মনিং ওয়ক' সমাস-গুলো ইংরাজী ভাষাতে সত্যই চালু আছে কিনা, কিংবা ইংরেজ এদেশে এসে নির্মাণ করেছে, জানি নে, কিন্তু ও দৃষ্টের রেওয়াজ শীতের দেশে যে বেশী নেই সে-কথা বিলক্ষণ জানি। আমরা তাই ময়দানে, গঙ্গার পারে হাওয়া-টাওয়া খেয়ে বাড়ি ফিরি। নিতান্ত শীতকালের কয়েকটি দিন ছাড়া কখনো ঘরের ভিতর ঢুকতে চাই নে। রকে বসে রাস্তায় লোকজনের আনাগোনা দেখি। পক্ষান্তরে শীতের দেশের লোক ছুটি পাওয়া মাত্রই ছুট দেয় বাড়ির দিকে। আপিসে-দপ্তরে আগুনের ব্যবস্থা উত্তম নয়—ওদিকে গৃহিণী বসবার ঘরে গন-গনে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছেন। পড়িয়ার হয়ে বাড়ি পেঁছেই সে পা দুটি আগুনের দিকে বাড়িয়ে বসে যায় আরাম চেয়ারে, খুলে দেয় রেডিয়ো। আমাদের রকে রেডিয়ো থাকে না, বৈঠকখানাতেও কমই—কারণ বাড়ির মেয়ে-ছেলেরা ওটা নিয়ে হরবকতই নাড়াচাড়া করে। তাই ওটা থাকে অশ্রমহলেই।

আমাদের যাত্রাগান, কবির লড়াই সবই খোলামেলায়। এ যুগের প্রধান আমোদ ফুটবল ও ক্রিকেট খেলাতে। নিতান্ত সিনেমাটা ঘরের ভিতর। কিন্তু সিনেমাও চেষ্টা করে সেটা ভুলিয়ে দিতে। ঘড়ি ঘড়ি মাঠ-ময়দান, নদীপুকুর, পাহাড়-সমুদ্র দেখায় বলে খানিকক্ষণ পরেই ভুলে যাই যে ঘরের ভিতর বসে রয়েছি। তবু পাছে অন্য কোনো খোলামেলার আমাদের সম্বন্ধ পেয়ে আমরা পালিয়ে যাই তাই সিনেমাওলারা ওটাকে এ্যারকশ্যন করে মাঠ-রক-বৈঠক-খানার চেয়েও আরামদায়ক করে রাখে। কারণ ইয়োরোপে যে মুহূর্তে ঘরে বসে টেলিভিশনের সাহায্যে সিনেমায় আনন্দ পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে গাহকের অভাবে আট থেকে দশ আনা পরিমাণ সিনেমা উঠে গেল।

আমাদের দেশের মেয়েরা হুটু করে রাস্তায় বেরতে পারে না, সিনেমা চায়ের দোকানে যেতে পারে না, তাই রেডিয়োটো ওদের কাছে এক বিধিযুক্ত সঙ্গোপাত। কর্তা-বাচ্চারা আপিস ইন্সকুল চলে যাওয়ার পর তারা নেয়ে খেয়ে চুলঝুলিয়ে দিয়ে মূচড়ে ঘেন রেডিয়োর কানটা পাশের বাড়ির রেডিয়োটো যে গাক্‌গাক্‌ করে আপনার বিরক্তির উৎপাদন করে তার প্রধান কারণ ও-বাড়ির বোমা এ-ঘর ও-ঘরে যেখানেই কাজ করুন না কেন সেটা ঘাতে করে সবই শুনতে পান তার জন্য ওটাকে চড়া সুরে বেঁধে রেখেছেন।—মহিলা-মহল তো আছেই, তারপর সিংহল বেতারের বিস্তার ফিল্মী-গানা যেগুলো বউমা, দিদিমণি সিনেমাতে একবার শুনিয়েছিলেন, এখন বার বার শুন শুন কণ্ঠস্থ করতে চান।

পুরুষরা এদেশে যদিও বা বেতার শোনে তবে সেটা খেয়েদেয়ে খবরটা শোনার জন্যে। এবং তার পরই আকাশবাণী আরম্ভ করে দেয় উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় কালোয়াতী সঙ্গীত। ওসবে কার, মশাই, ইনট্রেষ্ট? কিংবা হয়তো তখন ইংরাজীতে টক শুনলেন, মশাই মশাই বক্তৃতা দিচ্ছেন, জাপানের ড্রাই-ফার্মিং কিংবা জ্বালানীর কোপারেটিভ সিস্টেম সম্বন্ধে।

মেয়েরাই যে আকাশবাণীর—অন্তত কলকাতা কেন্দ্র—মালিক সে কথা যদি বিশ্বাস করতে রাজী না হন তবে আমি আর একটি মোক্ষম প্রমাণ কাগজে কলমে পেশ করতে পারি।

‘বেতার-জগৎ’ পার্শ্বিক পত্রিকাখানির বিজ্ঞাপনগুলো মন দিয়ে পড়লে দেখতে পাবেন তাতে আছে, গয়না, প্রসাধন দ্রব্য, ভেঁজটেবল ওয়েল, শাড়ি, কাপড়কাচা সাবান। টাইয়ের বিজ্ঞাপন একটি আছে—সেখানে এক তরুণী টাইটি পরিয়ে দিচ্ছেন তাঁর প্রিয়জনকে, অর্থাৎ বিজ্ঞাপনটি মেয়েদের জন্যই। কিন্তু সব চেয়ে মারাত্মক কথা—বইয়ের বিজ্ঞাপন প্রায় নেই। এবং এই ‘দেশ’ পত্রিকাতে সেই জিনিসেরই ছয়লাপ। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ‘বেতার জগৎ’ মেয়েদের কাগজ, আর ‘দেশ’ প্রধানত পুরুষের কাগজ।

ইয়োরোপের উচ্চতম শিক্ষিত লোকেরা বেতার শোনে এবং তাঁদেরই চাপে বিবিসিকে একটি ‘হাইড্রাও’—উন্নাসিক—থার্ড প্রোগ্রাম আরম্ভ করতে হল। কলকাতা আকাশবাণীর সব চেয়ে পপুলার প্রোগ্রাম—ড্রামা। সে সময় বেতার-যন্ত্রের চতুর্দিকে কারা ভিড় জমায় পাঠক সেটি লক্ষ্য করে দেখবেন। আমার নিজের ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস ‘আকাশবাণী কলকাতা’ যদি প্রতিদিন এক ঘণ্টা ব্যাপী ড্রামা চালায় (এবং তাতে ধরা পরিমিত রোমন, আকোশ, হৃৎকার এবং ন্যাকামি থাকে) তবে লাইসেন্সের সংখ্যা আরো বেড়ে যাবে।

এটা আমি কিছু মস্করা করে বলছি নে। আমার মূল বক্তব্য এই, যখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মেয়েরা কলকাতার রেডিও-কেন্দ্র দখল করে নিয়েছেন (এবং তাঁরা মোটামুটি সন্তুষ্টই আছেন, কারণ খবরের কাগজে কোনো নিশ্বাসচক চিঠি তাঁদের তরফ থেকে আমি বড় একটা দেখি নি) আর পুরুষরা ঐ জিনিসটে অবহেলা করে যাচ্ছেন (যাঁরা ওস্তাদী গাওনা গান, তাঁদের চেলাচামুন্ডা এবং শ্রোতৃসংখ্যা এতই কম যে ‘অনুরোধের আসরে’ ওস্তাদী গান গাইবার অনুরোধ আসে অতিশয়, সাতিশয়, কালেক্সমনে) তখন কেন বৃথা হাবি-জাবি নানা প্রোগ্রাম দিয়ে ‘রুচি মার্জিত করা,’ অধলুপ্ত ধামার ধ্রুপদ পুনর্জীবিত করার চেষ্টা, স্বরাজ লাভের পর জেলে কত গ্রেন কুইনিং দেওয়ার ফলে কত পার্সেন্ট ম্যালেরিয়া রোগী কমলো সেইটি সাড়ম্বরে শোনানো, ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান—কমর্নিটি প্রজেক্ট ড্রাইফর্মিং ইন জনজীবন কিংবা জাপানও হতে পারে—আমার মনে নেই) শোনানো?

তাই বলে কি কলকাতা বেতার কেন্দ্র শ্রদ্ধা রান্নার রেসিপি আর স্যাংসেতে নাটক শোনাবে? আদর্শই না। এবং সেইটে নিবেদন করার জন্যই আমি এতক্ষণ অবতারণা করছিলাম।

এদেশের মেয়েরা শিক্ষায় পুরুষদের বেমানানসই পিছনে। সাহিত্য সঙ্গীত নাট্যে তাঁদের রুচি সম্বন্ধে অনেকেই অনেক রকম অপ্রিয় মন্তব্য করে থাকেন—এমন কি মেয়েরাও। কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করবো না—মেয়েরা আত্মোন্নতি চায় না।

তাই আমার বক্তব্য, ঐ ‘মহিলা মহল’ ব্যাপারটি ব্যাপকতর করুন। বেলাদি

ইন্দিরাদি উত্তম ব্রডকাস্টার, কিন্তু প্ল্যান করুন, কি করে দেশের সব চেয়ে গুণী-জ্ঞানীকে—স্ট্রী এবং পুরুষ দুইই—এ কাজে লাগানো যায়। অবকাশরঞ্জন আনন্দদানকে আস্তে আস্তে উচ্চতর পর্যায়ে তোলা, শিক্ষার প্রসার, সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণ, বৃহত্তর জগতের সঙ্গে পরিচয় দান—ইত্যাদি তাবৎ ব্যাপার, অনেকখানি—সময় নিয়ে—এমন কি বেতারের বারো আনা সময় নিয়ে—ধীরে ধীরে উচ্চতর পর্যায়ে তুলুন, এবং সর্বক্ষণ ঐ মেয়েদের চোখের সামনে রেখে। পাঠক এবং শ্রোতা যোগাড় করা বড় কঠিন। এম্বলে যখন পেয়ে গেছেন তখন এই বেতারের মাধ্যমে দিন না একটা আপ্রাণ চেষ্টা এঁদের আরো আনন্দ দিতে—এঁদের নারীত্ব মনুষ্যত্ব সফলতর পূর্ণতম করতে। জাপানী চাষ শূন্যে পুরুষকে তো পাচ্ছেনই না, শেষটায় মেয়েদের হারাবেন। ইতো লস্ট ততো নষ্ট।

পুরুষদের জন্য অন্য একটা চ্যানেল (ওয়েভ লেনথ) নিয়ে নতুন একটা চেষ্টা দিতে পারেন। ফল অবশ্য কিছদ্ব হবে না। কারণটা গোড়াতেই নিবেদন করেছি।

লেডি চ্যাটারলি

নিমিত্ত মাত্র। আসলে প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে, সাহিত্যে শ্রীল অশ্রীলে কি কোনো পার্থক্য নেই? যদি থাকে তবে তার বিভাগ করবো কোন্ সংজ্ঞা দিয়ে? আর যদি করা যায় তবে পুঁলিসের সাহায্য নিয়ে অশ্রীল জিনিস বন্ধ করবো, না অন্য কোনো পন্থা আছে?

এ প্রশ্ন আজ এই প্রথম ওঠে নি সেকথা সবাই জানেন, এবং এ কথাও নিশ্চয়ই জানি যে, এ প্রশ্নের চূড়ান্ত সমাধান কোনো দিনই হবে না—যতদিন না মানুষ গল্প লিখবে, ছবি আঁকবে, একে অন্যের সঙ্গে কথা কইবে, এমন কি অঙ্গভঙ্গী করবে (অধুনা কলকাতার এক বিখ্যাত হোটেলে কোনো নর্তকীর নৃত্য দেখে পুঁলিস বলে, এগুলো অশ্রীল, নর্তকী ও ম্যানেজার বলেন, ওগুলো উচ্চাঙ্গের নৃত্যকলা, আদালত বলেন, মহিলাটির নৃত্যের পিছনে বহু বৎসরের একনিষ্ঠ কঠোর সাধনা রয়েছে এবং সে নৃত্য কলাসৃষ্টি)।

লেডি চ্যাটারলি খালাস পেলে পর বিলেতে এ নিয়ে প্রচুর তোলপাড় হয়—অবশ্য স্মরণ রাখা ভালো যে, মার্কিন আদালতে লেডি চ্যাটারলির লয়ার ('লাভার' না লিখে আমেরিকা 'লয়ার'—'উকিল' লিখেছিল) পুঁবেই জিতে গিয়েছিলেন, এবং গত ত্রিশ বৎসর বইখানা কন্টিনেন্টের সবত্রই ইংরাজীতেও অনুবাদ পাওয়া যেত। আরো মনে রাখা ভালো যে, এসব বাবদে ইংরেজ সব চেয়ে পদী পিসি মার্ক'স, অর্থাৎ গোঁড়া। একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। লে'ও রুন্স যখন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী তখন তিনি একখানা বই বের করেন, নাম 'মারিয়াজ'—বিবাহ। ভূদেববাবুর 'পারিবারিক প্রবন্ধ' গোছের বই—যদিও

ব্রহ্মের মূল বস্তু ভূদেববাবুর ঠিক উল্টো। নানা কথার ভিতর তাঁর অন্যতম মূল বস্তু ছিল, যুবক-যুবতীরা বিয়ের পূর্বে পরিপূর্ণ যৌন অভিজ্ঞতা করে নিয়ে বিয়ে করলেই ভালো—তা হলে একে অন্যকে বোঝার সুবিধে হয়, বিবাহবিচ্ছেদের আশংকা কমে যায় (১)। ইংরেজ সমালোচক তখন বলেছিলেন যে, ইংল্যান্ডের কোনো প্রধানমন্ত্রী যদি আপন নামে এরকম একখানা বই প্রকাশ করতেন তবে পরের দিনই তাঁকে মস্তিষ্কে ইস্তফা দিতে হত।

তাই চ্যাটার্লি জিতে যাওয়ার পর একাধিক প্রাচীনপন্থী বললেন,

(১) এ বইয়ে যে ‘নৈতিক আদর্শ’ প্রচারিত হয়েছে সেটা ইংরেজের যুগ যুগ সঞ্চিত নৈতিক ঐতিহ্যকে চ্যালেঞ্জ করেছে ও লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ নরনারী এতে করে মর্মান্বিত হবেন।

(২) এ বইয়ের অনুকরণে যদি বিলাতের যুবক-যুবতীরা তাদের যৌন আদর্শ নির্মাণ করে তবে দেশের সর্বনাশ হবে।

(৩) এ বই আইনে জিতে যাওয়ায় এর অনুকরণে—লাই পেয়ে—অশ্লীল তর ও জঘন্যতর বই বাজার ছেয়ে ফেলবে।

(৪) এই বই জিতে যাওয়ার সাহিত্যিক তথা সাধারণ নাগরিক আইন-রাজ্যে অনেকখানি এগিয়ে গেল বটে, কিন্তু নীতির রাজ্যে সে পিছিয়ে গেল। দা-কাটা বাঙলায় ;—আইনের জয়, ধর্মের পরাজয়।

নবীনরা বললেন,

(১) শ্রী-পুরুষের যে সম্পর্ক গোড়া ইংলণ্ড বড় জোর বরদাস্ত করে নিত, লরেন্স যার সত্য মূল্য দেখিয়ে (কোনো কোনো সমালোচক ‘স্পিরিচুয়াল’ পর্যন্ত বলেছেন) সমাজের অশেষ কল্যাণ করেছেন তারই জয় হয়েছে।

(২) বাজারে যখন ভূরি ভূরি অশ্লীল, পাপ, পৈশাচিক উত্তেজনাধারক বই অব্যাহত বিক্রি হচ্ছে তখন লরেন্সের এই উত্তম সাহিত্য নির্বাসিত করা শুদ্ধ যে আহাম্মুকী তা নয়, অন্যায়ও বটে।

(৩) শক্তিশালী সত্যোন্মোচনকারী লেখকদের এখন আর পুঁলিসের ভয়ে বিশেষ বিশেষ বিষয় বর্জন করতে হবে না।

(৪) অশ্লীল কদর্য পুস্তক কামকে কদমের স্তরে টেনে নামিয়ে আনে। লরেন্সের বই তাকে সম্মানের উচ্চাসনে বসিয়েছে।

সংস্কৃত অলংকারে শ্রীল অশ্লীল নিয়ে কিছুটা আলোচনা আছে। কিন্তু আইন করে কোনো বই বন্ধ করে দেবার প্রস্তাব কেউ করেছেন বলে শুনিনি। হয়তো তার প্রধান কারণ এই যে, বুদ্ধের আমলেই সংস্কৃত সাধারণ জনের পক্ষে কঠিন ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে ; সে ভাষা আয়ত্ত করতে করতে মানুষের এতখানি ব্যয় হয় যেত যেত, তখন কি পড়ছে না পড়ছে তার দায়িত্ব তারই হাতে ছেড়ে দেওয়া যেত।

কিন্তু আরবীতে লেখা আরব্যোপন্যাস ? সে তো অল্প আরবী শেখার পরেই পড়া যায়। বাজারে যে আরব্যরজনী ইংরিজী বা বাঙলাতে পাওয়া যায় সেগুলোর কথা হচ্ছে না ; তথাকথিত ‘আপসিভজনক’ অংশগুলো সেগুলোতে

নির্মমভাবে কেটে দেওয়া হয়। বারো না আট ভলুমে বার্ট'নের যে ইংরিজী অনুবাদ আছে তাতেও তিনি হিমিসিম খেয়ে 'আনট্রেন্সলেটেবল' বলে বেশ কিছু বাদ দিয়েছেন। এমন কি বাইরুতে ক্যাথলিক পাদ্রীদের দ্বারা প্রকাশিত আরবী আরব্যরজনীতেও বিস্তর জিনিস বাদ পড়েছে। এবং আরবভূমিতে ছেলেবুড়ো সবাই পড়ে সেই সম্পূর্ণ সংস্করণ—কেউ কিছু বলে না।

ফার্সীতে লেখা জালালউদ্দীন রুমীর মসনবী গ্রন্থের উল্লেখ করতে পেলে আমি বড় আনন্দ বোধ করি। এ বই ইরানের গীতা এবং এতে হেন পাপাচার নাই যার বিশদ বিবরণ নেওয়া হয় নি। ইংরিজীতে অনুবাদ করার সময় অনুবাদক সেসব অংশ লাতিনে অনুবাদ করেছেন। (সংস্কৃত শিখতে শিখতে মানুষ যে রকম হয়ে যায় এবং ধরে নেওয়া হয় তা? শাস্ত্রাধিকার হয়েছে—লাতিনের বেলাও তাই।) অথচ ইরান ভূমিতে আট বছরের ছেলেও যদি মসনবী নিয়ে বসে, পিতা এবং গুরু তাতে আনন্দিত হন।

বাংলা গদ্য আরম্ভ হয় 'পরিষ্কার হাত' নিয়ে এবং উনিশ শতকের শেষের দিকে দেখতে পাই, ভারতচন্দ্র অগ্নীল আখ্যা পাচ্ছেন। ভিক্টোরিয় যুগের ছুঁংবাই তখন আমাদের পেয়ে বসেছে। এরই মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ 'চৌর-পঞ্চাশিকা' গীতিকাব্যের উদ্দেশে গেয়ে উঠলেন,

‘ওগো সুন্দর চোর

বিদ্যা তোমার কোন সখ্যার

কনক-চাঁপার ডোর।’ (১৩০৪ সন) কল্পনা।

ভারতচন্দ্র 'বিদ্যাসুন্দর' রচেন এই চৌরপঞ্চাশিকার প্রট নিয়েই এবং এ কাব্যের বাংলা অনুবাদও করেছেন। এরকম অনবদ্য খণ্ডকাব্য সংস্কৃত সাহিত্য বিরল।

গ্নীল অগ্নীলে নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে। সংসঙ্গ অসংসঙ্গে নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে। এমন কি কাব্য অগ্নীল না হয়েও অনুচিত হতে পারে। অনেকে মনে করেন, স্বয়ং কালিদাস এ পার্থক্য জানতেন না। কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গ সম্বন্ধে কবিরাজ রাজেন্দ্রভূষণ বলেছেন, 'জগন্মাতা ও জগৎপিতার এই সম্ভোগ একটা বিরাট ব্যাপার হইলেও, পড়িতে লজ্জা জন্মে। তাই আলংকারিকগণ এই অষ্টম সর্গের উপর “অত্যন্তমনুচিতম্” বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। তবে চিত্রের জন্য যেমন চিত্র দেখা, তেমনই এই হরপার্বতীর বিহার পাঠ, ইহাতে দেখিবার ও শিখিবার বস্তু প্রচুর। কবির এই আলেখ্য দেখিয়া চমকাইলে, মহামায়ার “বিপরীতরতাতুরাম্” এই ধ্যানাংশেরও পরিহাস করিতে হয় এবং আদিকবি বাস্মিকীকৃত গঙ্গাস্রবের “তুঙ্গস্তনাস্ফালিতম্” প্রভৃতি অংশ বাহ্য দিতে হয়। কাব্য কাব্য, তাহা উপনিষদের চক্ষে দেখিতে যাঁহারা চান বা দেখেন, তাঁহাদের উহা না পড়াই ভালো।’*

* পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, কালিদাসের গ্রন্থাবলী, ২য় ভাগঃ. বসুমতী, পৃ : ১৫৬ পাদটীকা।

কালিদাসের তুলনায় বামন লরেন্স্‌ নাকি কামকে স্বর্গীয় (স্পিরিচুয়াল) স্তরে তুলতে চেয়েছিলেন! তা তিনি চেয়েছিলেন কিনা, পেরেছিলেন কিনা সে কথা আমি জানি না,—তবে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস, কালিদাস চেয়েছিলেন এবং তাই জগন্মাতা ও জগৎপিতার দাম্পত্যপ্রেম বর্ণনা করেছিলেন। কারণ কামকে যদি সত্যই পুতপবিত্র করতে হয়, তবে সর্ব দেশকালপাশ্রে পূজ্য পিতামাতা এবং তাঁদেরও পূজ্য জগন্মাতা ও জগৎপিতার দাম্পত্য প্রেমের চেয়েও উচ্চতর লোক তো আর কোথাও নেই।

স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, কোনো কোনো আলংকারিকের মতে তিনি সক্ষম হন নি, কারণ তাঁরা বলেছেন, কালিদাস ‘অত্যন্ত অনুরূচিত’ কর্ম করেছেন। পড়ার সময় ‘লজ্জাবোধ’ সত্ত্বেও বিদ্যাভূষণ কিস্তু তাঁর নিন্দা করেন নি। পড়ার সময় আমার সন্স্কাচ বোধ হয় নি, কারণ প্রতি ছত্রে আমি পতীক্ষায় ছিলাম, কালিদাস আমাকে তাঁর অভুলনীয় কাব্যসৃষ্টি প্রসাদাৎ সর্বশেষে আমাকে এমন ঘ্যোলোকে উত্তীর্ণমান করে দেবেন যেখানে কামের পার্থিব মলিনতার কথা আমার স্মরণেই থাকবে না। হয়তো আমি অক্ষম, কিংবা কালিদাসের সে শক্তি ছিল না। ব্যাসের যে সে শক্তি ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিস্তু কাম সন্দেহে ব্যাসের মনে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না বলে তিনি নির্দিষ্ট ভাবে তার বর্ণনা দিয়েছেন।

রচনা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। সংক্ষেপে নিবেদন,

ইয়োয়োরোপের অনুরূপে যদি আমরা অত্যধিক শূচিবাদগুপ্ত হয়ে কামকে সাহিত্য থেকে তাড়িয়ে দিই তবে নিছক নিজলা অশ্লীল রচনা উত্তরোত্তর বেড়েই যাবে। আর্টের কাজ তাকে আর পাঁচটা বিষয়বস্তুর মত আপন কাব্যলোকে রসস্বরূপে প্রকাশ করা। কালিদাস করেছেন, চুড় কবি করেছেন, বিদ্যাপতি ভারতচন্দ্র করেছেন।

অশ্লীল সাহিত্য তাড়াবার জন্য পুলিস সেন্সর বোর্ড বিশেষ কিছু করতে পারবে না। মার্কিন মুল্লুকে তারা আপন হার মেনে নিয়েছে। বিশেষত সাহিত্যিকরাই যখন শ্লীল অশ্লীলে ঠিক কোথায় পার্থক্য সে জিনিসটা সংজ্ঞা এবং বর্ণনা দিয়ে ভালো করে বুঝিয়ে বলতে পারেন নি।

সংস্কৃত আরবী ফার্সীতে নিছক অশ্লীল রচনা অতি অস্পষ্ট। তার কারণ গুণগীজ্ঞানীর রূচিবোধ ও সাধারণ জনর শূভবুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান-বোধ (কমন সেন্স)। নির্ভর করতে হবে প্রধানত এই দুটি জিনিসের উপর।

পাঠক হয়তো শূদ্যোবেন, চ্যাটার্জি বইখানা আমি পড়েছি কিনা? পড়েছি। যোবনে প্যারিসে কাফেতে বসে পড়েছি। ভালো লাগে নি। লরেন্স্‌ যা প্রমাণ করতে চেয়েছেন সে অতি সাধারণ জিনিস। এবং ঐ অতি সাধারণ স্বতঃসিদ্ধ জিনিস প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি দেগেছেন বিরাত বিরাত কামান। এবং কামানগুলো পারিস্কার নয়।

ছ'সিয়ার

আমরা মফঃস্বলের লোক । কলকাতা শহরে কি হয়, না হয়, আমাদের পক্ষে খবর রাখা সম্ভবপর নয় । বয়েসও হয়েছে ; ছেলেছোকরাদের মতিগতি, কর্ম-কারবারের সঠিক খবরও কানে এসে পৌঁছোয় না ।

মাস কয়েক পূর্বে পূর্ব-পাকিস্তানে বেড়াতে গিয়েছিলুম । সেখানকার এক কাগজে পড়লুম ইউনেস্কো নাকি কিছুদিন পূর্বে পৃথিবীর বড় বড় শহরে মদ্যপান কোন্ বহরে বাড়ছে, তার একটা জরিপ নেন এবং ফলে একটি মারাত্মক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে । সেটি এই :—পৃথিবীর বড় বড় শহরের যে কটাতে মদ্যপান ভয়ংকররূপে (ইন এ্যান এলার্মিং ডিগ্রী) বেড়ে যাচ্ছে, কলকাতা তার মধ্যে প্রধান স্থান ধরেন !

বাঙালী সব দিক দিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু অন্তত একটা দিকে এগিয়ে যাচ্ছে শুনে আমার উল্লাস বোধ করা উচিত ছিল, কিন্তু বহু চেষ্টা করেও পারলুম না । ঢাকার এক আমগুলোকে যখন বলেছিলুম যে তার আম বড় ‘ছোটো’ ‘ছোটো’, তখন সে এক গালহেসে দেমাক করে বলেছিল, ‘কিন্তু, কস্তা, আডি (আঁঠি) গুলাইন বরো আছে !’ সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে যাবার আম ছোট, আর মদ্যপানের ‘আডিডা’ ‘মোডা’ এ-চিন্তাটা রসাল নয়—কোনো অর্থেই !

ফেরার মূখে কলকাতাতে ডেকে পাঠালুম দ্বিজেনকে । কলেজের ছোকরা—অর্থাৎ কলেজ যাওয়ার নাম করে কপি হোস যায়—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ; শুনেছি এদের মাথায় পেরেক পড়তলে ইঙ্গু হয়ে বেরোয়—মগজে এ্যাসন প্যাঁচ ; তদুপরি আমার শাগরেদ !

তাকে আমার অধুনালম্ব্য মাদকীয় জ্ঞানটুকু জানিয়ে বললুম, ‘আমি তো জানতুম, ইন্ডিয়া শনৈঃ শনৈঃ ড্রাই হয়ে যাচ্ছে—এ আবার কি নতুন কথা শুনি ?’

গুরুকে জ্ঞানদান করতে পারলে শিষ্য মাত্রই পুলকানুভব করে—কাবেল, নাবালক যাই হোক না কেন । ক্ষণতরেও চিন্তা না করে বললে, ‘মদ্যপান কলকাতাতে কারা বাড়ছে জানি নে, তবে একটা কথা ঠিক ঠিক বলতে পারি, কলেজের ছোকরাদের ভিতর ও জিনিসটা ভয়ংকর বেড়ে যাচ্ছে ; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । ‘ভয়ংকর’ ‘ভীষণ’ ‘দারুণ’ কথাগুলো আমরা না ভেবেই

১ এর একটি ইংরিজী পাঠাস্তর আছে । বিখ্যাত ‘রম্য-রচনা (বেল্‌লেংর) লেখক চার্লস ল্যাম্ (এদেশে প্রধানত ‘শেক্সপিয়ারের গল্প’ প্রণেতা রূপে পরিচিত) প্রায়ই দফতরে দেরিতে পৌঁছতেন । একদা বড়বাবু তাঁকে হাতে-নাতে ধরে ফেলে বললেন, ‘মিঃ ল্যাম্, আমার কাছে খবর পৌঁছেছে, আপনি আপিসে দেরিতে আসেন ।’ ল্যাম্ নাকি ঢাকার আমগুলার মতই এক গাল হেসে বলেছিলেন, ‘কিন্তু এ খবর কি পৌঁছেছে যে, আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাই ?’

বলে থাকি, কিন্তু ইউনেস্কো যখন ‘এলার্মিং’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তখন সঠিক ‘ভয়ংকরই’ বলতে চেয়েছেন। দ্বিজন সেটা কনফার্ম করলে। (কলেজের ছোকরারা আমার উপর সদয় থাকুন ; এটা আমার মত নয়, দ্বিজেনের।)’^২

বললে, ‘এবারে যে মধুপদুরে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি নি, তার কারণ আমি আদপেই মধুপদুর যাই নি—যখন শুনলুম, ইয়াররা যাচ্ছেন বিয়ার পার্টি করতে সেখানে। ওদের চাপ ঠেকানো আমার পক্ষে অসম্ভব হত—এদিকে মায়ের পা ছুঁয়ে কিরে কেটেছি মদ খাব না।’

শ্রাম্ধ তাহলে অনেকখানি গড়িয়েছে।

সে সম্ভ্রায় আমাদের বাড়িতে দৌঁখ, মেলাই কলেজের ছেলেমেয়ে এসেছে। আমার ভাতিজীর ইয়ারী-বন্ধিনী, বধুবান্ধব। মাঝে-মধ্যে ওদের সঙ্গে বসলে ওরা খুশী হয়।

ইচ্ছে করেই ফুটি-ফুটি’র দিকে কথার নল চালানুম। চোর ধরা পড়লো। অর্থাৎ মদ্যপানের কথা উঠল।

সেদিন আমার বিস্তর জ্ঞান সঞ্চার হয়েছিল। একের অজ্ঞতা যে অন্যের জ্ঞান সঞ্চারের হেতু হতে পারে, সে-কথা এতদিন জানতুম না।

এক ‘গুণী’ হঠাৎ বলে উঠলো, বিয়ারে আবার নেশা হয় !’

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, ‘বলিস্ কি রে ? ইয়োরোপের শতকরা ৬৫ জন লোক যখন নেশা করতে চায়, তখন তো বিয়ারই খায়। ওয়াইন খায় কটা লোক, স্পিরিট—’

বাধা দিয়ে বললে, ‘বিয়ারও তো ওয়াইন।’

আমি আরো আশ্চর্য হয়ে বললুম, ‘তওবা, তওবা ! শুনলে গুনাহ হয়। ওয়াইনে কত পাসেণ্টেজ এলকহল, আর বিয়ারে কত পাসেণ্ট, স্পিরিটে—’

‘এলকহল ?’

‘বাই উয়েইট অথবা ভলুম। দ্বিশীটা—মানে ভদ্রকার খুড়তুতো ভাই—তার হিসেব আন্ডার প্রুফ, অভার প্রুফে। লিক্যোর —’

‘মানে লিকার ?’

আমি প্রায় বাক্যহার। ‘লিক্যোর তো আবিষ্কার করেছে প্রধানতঃ ক্যাথলিক সাধুসন্ন্যাসীরা (মস্ক)। বোর্নিডিক্টিম—’

‘সাধুসন্তরা আবিষ্কার করলেন মদ !’

পূর্বেই বলেছি, সেদিন আমার বিস্তর জ্ঞানার্জন হয়েছিল। ওদের অজ্ঞতা থেকে।

তারো পূর্বে বলা উচিত ছিল যে, আমি মদ্যপানবিরোধী। তবে সরকার যে পন্থাতিতে এগোচ্ছেন, তার সঙ্গে আমার মতের মিল হল না। সে কথা আরেকদিন হবে।

ঔষধার্থে ডাক্তাররা কখনো কখনো মদ দিয়ে থাকেন। ব্র্যান্ডির চেয়েও শ্যাম্পেন গিলিয়ে দিলে ভিরমি কাটে তাড়াতাড়ি। কিন্তু ব্র্যান্ডির চেয়ে শ্যাম্পেনে খরচ বেশী পড়ে বলে কন্টিনেন্টের ভালো ভালো নার্সিং হোম ছাড়া অন্য কোথাও বড় একটা ব্যবহার করা হয় না। কৃত্রিম ক্ষুধা উদ্দেকের জন্যও শেরি বা পোর্ট ব্যবহৃত হয়। এ সব ব্যাপার সম্বন্ধে আমার হাঁ, না, কিছু বলার নেই। তবে শীতের দেশে ব্র্যান্ডি না খেয়ে গুড়ের সঙ্গে কালো কফি খেলেও শরীর গরম হয়—এবং প্রতিক্রিয়াও কম। বহু ধর্মপ্রাণ হিন্দু এবং মুসলমান কবরেজ-হেঁকিমের আদেশ সশ্বেও সুরাপান করেন নি—ভয়ংকর একটা কিছু ক্ষতি হতেও শুননি নি।

মোন্দা কথায় ফেরা যাক।

বিয়ারে নেশা হয় না, এর মত মারাত্মক ডুল আর কিছুই নেই। পূর্বেই বলেছি, ইয়োরোপে শতকরা ৮৫ জন লোক বিয়ার খেয়েই নেশা করে মাতলামো করে।

‘ওয়াইন’ বলতে যদিও সাধারণতঃ মাদক দ্রব্য বোঝায়, তবু এর আসল অর্থ, আঙুর পচিয়ে যে সুরা প্রস্তুত হয়, তারই নাম ওয়াইন। ‘ট্রান্সাসব’-এর শব্দে শব্দে অনুবাদ (অবশ্য বাজারে যে-সব তথাকথিত ট্রান্সাসব আছে, তার ভিতর কি বস্তু আছে আমার জানা নেই)।

বিয়ারে ৪ থেকে ৬ পারসেন্ট এলকহল থাকে—বাদবাকি প্রায় সবটাই জল। নেশা হয় এই এলকহলেই। ওয়াইনের পাসেন্টেজ দশ থেকে পনেরো। তবু বিয়ার খেয়েই নেশা করে বেশী লোক। ওয়াইন খান গুণগীরা—এবং ওয়াইন মানদুর্ষকে চিন্তাশীলও অপেক্ষাকৃত বিমর্ষ করে তোলে।

পৃথিবীতে সব চেয়ে ভালো ওয়াইন হয় ফ্রান্সে। বোর্দো (Bordeaux) অঞ্চলে তৈরী হালকা লাল রঙের এই ওয়াইনকে ইংরিজীতে বলা হয় ক্ল্যারেট। তাছাড়া আছে বার্গেন্ড এবং শ্যাম্পেন অঞ্চলের বিখ্যাত ওয়াইন। এসব ওয়াইন আঙুর পচিয়ে ফার্মেন্ট করার সময় যদি কার্বন ডায়োক্সাইড বেরিয়ে না যেতে দেওয়া হয়, তবে সেটাকে ‘সফেন’ ওয়াইন (এফারভেসেন্ট) বলা হয়। বোর্দো বার্গেন্ড বৃজবৃজ করে না—শ্যাম্পেন করে। শ্যাম্পেন খোলা মাত্রই তাই তার কক্ লাফ দিয়ে ছাতে ওঠে, এবং তার বৃদ্ধ পেটের ইনটেস্টিনাল ওয়ালে খোঁচা মারে বলে নেশা হয় তাড়াতাড়ি (ভিরমি কাটে তড়িৎ) এবং স্টিল (অর্থাৎ ‘ফেনাহীন’) ওয়াইনের মত কিছুটা বিমর্ষ-বিমর্ষ সে তো করেই না, উটে চিত্তাকাশে উড়ু, উড়ু ভাবটা হয় তাড়াতাড়ি।

জর্মনির বিখ্যাত ওয়াইন রাইন (ইংরিজীতে হক্) ও মোজেল। রাইন ওয়াইনের শ্যাম্পেনও হয়, তবে তাকে বলা হয় জেক্ট। শ্যাম্পেনের তুলনায় জেক্ট নিকৃষ্ট। অথচ এই জেক্ট ফ্রান্সে বেচে হের ফর্নিবেনট্রপ প্রচুর পয়সা কামান। হিটলার নিজে মদ খেতেন না, কিন্তু যখন শুনলেন রিবেনট্রপ শ্যাম্পেনের দেশে ওঁচা জেক্ট বিক্রি করতে পেরেছেন, তখন বিমোহিত হয়ে বললেন, ‘যে ব্যক্তি জেক্টের মত রশ্মি মাল ফ্রান্সে বেচেতে পারে, সে পয়সা নন্দরী সেলসম্যান। একে আমার চাই—এ আমার আইডিয়াজ ইংলণ্ডে বেচেতে

পারবে।' সবাই জানেন, ইনি পরে হিটলারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হয়েছিলেন ও সর্বশেষে ন্যূরনবের্গে ফাঁসীকাঠে ঝুলেছিলেন।

হাস্কেরির বিখ্যাত ওয়াইন টকাই ও ইতালির কিয়ান্তি।

কাশ্মীরের আঙুর দিয়ে ভালো ওয়াইন হওয়ার কথা। তাই তৈরী করে চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকায় চালান দেওয়ার আমি পক্ষপাতী। অবশ্য ওরা যদি কখনো ড্রাই হতে চায়, তবে অন্য কথা।

আপেল ফার্মেণ্ট করে হয় সাইডার, মধু ফার্মেণ্ট করে হয় মীড (সংস্কৃত 'মধু' থেকে মধুরী, গ্রীকে মেথু মানে মদ, জার্মানে মেট্—সব শব্দই সংস্কৃত মধু থেকে)। আমের রস ফার্মেণ্ট করে মদ খেতেন বিখ্যাত কবি গালিব। আনারস ও কালোজাম পচিয়েও নাকি ভালো ওয়াইন হয়। সাঁওতাল, আদিবাসী ও বিশ্বর পার্বত্য জাতি ভাত পচিয়ে বিয়ার বানিয়ে খায় ; কিন্তু ফার্মেণ্ট করার ভালো কায়দা জানে না বলে তিন সাড়ে তিনের চেয়ে বেশী এলকহল পচাইয়ে তুলতে পারে না। এদের সর্বস্ব, এদের জরুর-গোরুর এমন কি এদের মরল আত্মার পর্যন্ত সর্বনাশ করেছে ইংরেজ—চোলাই (ডেসটিলড্) 'ধানোশ্বরী' কালীমাকর্ এদের মধ্যে চালু করে। এই 'ধানোশ্বরী' একেবারে সম্পূর্ণ বন্ধ না করা পর্যন্ত এদের উদ্ধার নেই। আমার কথা বিশ্বাস না হলে উড়িষ্যার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নবকৃষ্ণ চৌধুরীকে শ্রদ্ধোবেন। ইনি আদিবাসীদের জন্য বহু আত্মত্যাগ করেছেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত অনঙ্গদুল আশ্রমে আদিবাসীরাও শিক্ষালাভ করে। ইনিও আদিবাসীদের ড্রাই করতে চান ; কিন্তু সরকার যেভাবে এগোচ্ছেন তার সঙ্গে তাঁর একদম মতের মিল হয় না।

জাপানীদের সাকে মদ ভাতেরই পচাই, চীনাদের পচাই, 'চু'-য়ে কিঞ্চিৎ ভুট্টা মেশানো থাকে।

ভারতবর্ষের তাড়ি (ফার্মেণ্টেড খেজুর কিংবা তালের রস) বস্তুটিকে ওয়াইন পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। পৃথিবীর তাবৎ মাদক দ্রব্যের ভিতর এই বস্তুটিই অনিষ্ট করে সব চেয়ে কম। একমাত্র এই জিনিসটাই সম্পূর্ণ বন্ধ করা উচিত কি না সে বিষয়ে আমার মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। তবে খাঁটি তাড়ি সচরাচর পাওয়া যায় না ; লোভী শর্দূড়িরা তাড়ির সঙ্গে দিশী চোলাই মদ (ধানোশ্বরী) মিশিয়ে তার এলকহল বাড়িয়ে বিক্রি করে। মাতালরাও সচরাচর নির্বোধ হয়।

*

*

*

এতক্ষণ পচাই অর্থাৎ ফার্মেণ্টেড বস্তু সম্বন্ধে বর্ণনা হচ্ছিল। এবারে ডেসটিলড বা চোলাই। চোলাই বস্তুর নাম স্পিরিটস্—যদিও শব্দটি সর্ব-প্রকার মাদক দ্রব্যের জন্যও ব্যবহার হয়।

আঙুর পচিয়ে ওয়াইন বানিয়ে সেটাকে বক যন্ত্র দিয়ে চোলাই করলে হয় ব্র্যান্ড—অর্থাৎ ব্র্যান্ড করা বা পোড়ানো হয়েছে। একমাত্র ফরাসী দেশের ব্র্যান্ডকেই (তাও সব ব্র্যান্ড নয়) বলা হয় কন্যাক্ (Cognac)। মন্ট-বার্লিকে পচিয়ে হয় বিয়ার ; সেটাকে চোলাই করলে হয় হুইস্কি। তাড়ি চোলাই করলে

হয় এরেক (শশট্টা আসলে 'আরক' কিন্তু আরক অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয় বলেই এখানে 'এরেক' প্রয়োগ করা হল)। সেটাকে দু'বার চোলাই করে খেতেন বন্ধু মাতাল বাদশা জাহাঙ্গীর। এরেকের ষাট পাসেট এলকহল হয়—ডবল ডেসটিল করলে আশী পর্যন্ত ওঠার কথা। সেইটে খেতেন নিজ'লা! আখের রস ফামে'ট করার পর চোলাই করলে হয় 'রাম্'। সংস্কৃতে 'গৌড়ী'—গুড় থেকে হয় বলে। জামেকার রাম্ বিশ্ববিখ্যাত। কিন্তু ভারতীয় রাম্ যদি সময়ে তৈরী করে চালান দেওয়া হয়, তবে জামেকাকে ঘায়েল করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। আমি ফরেন এক্সচেঞ্জ বাড়ানোর স্বপ্ন দেখি বলেই এই প্রস্তাবটি পাড়লুম। রামে এত লাভ যে তারই ফলে চিনির কারবারীরা চিনি সস্তা দরে দিতে পারে। জাহার চিনি একদা এই কারণেই সস্তা ছিল। জিন তৈরী হয় শস্য দিয়ে এবং পরে জেনিপার জামের সঙ্গে মেশানো হয়। খুশবাইটা ঐ জেনিপার থেকে আসে।

এসব চোলাই করা স্পিরিটসে ৩৫ থেকে আরম্ভ করে ৮০ ভাগ এলকহল থাকে। হুইস্কি ব্যাণ্ডির চেয়ে রামে এলকহল বেশী, তার চেয়ে বেশী ডবল-চোলাই এরেক এবং সব চেয়ে বেশী আব'স্যাতে! তাই ওটাকে 'সবুজ শয়তান' বলা হয়। শুনছি, ও জিনিস বছর তিনেক নিয়মিত ভাবে খেলে মানুষ হয় পাগল হয়ে যায়, না হয় আত্মহত্যা করে, কিংবা ডেলিরিয়াম ট্রেমেনসে মারা যায়। ইয়োরোপের একাধিক দেশে এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে।^৩

সচরাচর মানুষ এসব স্পিরিটস নিজ'লা খায় না। হুইস্কিতে যে পরিমাণ সোডা বা জল মেশানো হয় তাতে করে তার এলকহল ডাইলুটেড হয়ে শক্তি কমে যায়। ফলে এক গেলাস হুইস্কি-সোডাতে যতখানি নেশা হয়, দু' গেলাস বিয়ারে তাই হয়। অবশ্য নিজ'লা হুইস্কি যতখানি খেয়ে স্বাস্থ্যের সর্বনাশ করা যায়, বিয়ারে প্রচুর জল আছে বলে ততখানি পেটে ধরে না বলে খাওয়া যায় না। তবে অবশ্য কেউ যদি অতি ধীরে ধীরে হুইস্কি খায় এবং অনাজন সাততাড়া-তাড়ি বিয়ার খায় তবে দ্বিতীয় জনেরই নেশা হবে আগে।

অতএব বিয়ারে নেশা হয় না, এ বড় মারাত্মক ভুল ধারণা। ভূবনবিখ্যাত মর্ডানিক-বিয়ারে তো আছে কুলে তিন, সাড়ে তিন পারসেট এলকহল। যারা রাস্তায় মাতলামো করে, তারা তো ঐ খেয়েই করে।

এদেশে আরেকটা বিপদ আছে। আঙুর সহজে পাওয়া যায় না বলে আমাদের অনেক ব্যাণ্ডিতেই আছে ডাইলুটেড এলকহল এবং তার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্যাণ্ডির সিনার্থেটিক সেস্ট—অর্থাৎ আঙুরের রস এতে নেই। অনেক সরল লোক ফু-সর্দি সারাবার জন্য, কিংবা দু'ব'ল রোগীর ক্ষুধা বাড়াবার জন্য

৩ আব'স্যাতের গোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে একটি ফরাসী গল্পের অনুবাদ করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরে, নাম 'সবুজ শয়তান'। বসুমতী গ্রন্থাবলী।

৪ আশ্চর্যের বিষয়, ইয়োরোপের সব শহরের মধ্যে মর্ডানিকই সব চেয়ে বেশী দুধ খায়। আমাদের গডাডরের মত।

এই 'থ্র্যাণ্ড' খাইয়ে রোগীর ইস্টের পরিবর্তে অনিষ্ট ডেকে আনেন। এ-বিষয়ে সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত—বিশেষ করে যে সব লোক নিজে নিজের বা আত্মীয়জনের ডাক্তারী করেন।

ফ্রান্সে অত্যধিক মদ্যপান এমনি সমস্যাতে এসে দাঁড়িয়েছে যে, তার একটা প্রতিবিধান করা বড়ই প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। কিন্তু কেউই সাহস করে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারছেন না। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাদেজ-ফ্রাঁস চেষ্টা করেছিলেন; অনেকে বলেন প্রধানমন্ত্রিস্ব হারান তিনি প্রধানত এবং গৃহ্যত এই কারণে। আমেরিকা ও নরওয়েও চেষ্টা করেছিল, সফল হয় নি। রাজা যদিও আইনের বাইরে তবু নরওয়ের রাজা একদিন দৃষ্ট করে বলেছিলেন, 'দেখা যাচ্ছে, মদ না-খাওয়ার আইন একমাত্র আমিই মানি—আর সবাই তো শুনি বে-আইনি খেয়ে যাচ্ছে।'।

বেদিক, বৌদ্ধ ও গুপ্ত যুগে মাদকদ্রব্য সেবন করা হত ও জুয়াখেলার রেওয়াজ ছিল। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস শংকরাচার্য যে নব হিন্দু ধর্ম প্রচার করলেন সেই সময় থেকেই জনসাধারণে মদ্যপান ও জুয়াখেলা প্রায় বন্ধ হয়ে যায় (অবশ্য মুনিস্বায়রা মাদক দ্রব্য ও বাসন বারণ করেছিলেন খৃষ্টের পূর্বেই) এবং পাঠান-মোগল যুগে রাজা রাজড়া এবং উজীর-বাদশারাও প্রধানত মাদক দ্রব্য সেবন করেছেন। 'চরমে চরম মিশে' বলেই বোধ হয় অন্তর্মত সম্প্রদায় ও আদিবাসীরাও খেয়েছে। ভারতবর্ষ কোন অবিবাস্য অলৌকিক পদ্ধতিতে এদেশে একদা মদ জুয়া প্রায় নিমূল করতে সক্ষম হয়েছিল সেটা আমি আবিষ্কার করতে পারি নি। পারলে আজ কাজে লাগানো যেত। ইংরেজ আমলে মদ্যপানের কিছুটা প্রচার হয়—মাইকেল ও শিশির ভাদুড়ী নীলকণ্ঠ হতে পারলে ভালো হত। ঐ সময় ব্রাহ্মসমাজ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী যে জীবন ও আদর্শ সামনে ধরেন তার ফলে মদ্যপান প্রসার লাভ করতে পারে নি। শুনলুম, এখন নাকি কোনো কোনো তরুণ 'রাঁবো-রাঁবো ভেরেরেন-ভেরেরেন' করে এবং ওদের মত উত্তম (?) কবিতা না লিখে অন্য জিনিসটার সাধনায় সুখ পায় বেশী। ইতিমধ্যে কলকারখানা হওয়ার দরুন চা-বাগানে জুট মিলে মদ ভর্য'কর-মূর্তিতে দেখা দিল। মাঝিমাঝারি অর্থাৎ সেলাররা মাতলামোর জন্য বিখ্যাত—কিন্তু আশ্চর্য, ভারতীয় ও পার্শ্বাঞ্চলীয় খালাসীরা মদ খায় না। আমাদের সৈন্যবাহিনীতে যেটুকু মদ্যপান হয় তাও তুচ্ছ। কলকাতার শিখের দেখে কেউ যেন না ভাবেন যে, দিল্লী-অমৃতসরের সম্ভ্রান্ত শিখরা মদ খান। ধর্মপ্রাণ শিখ মদ্যপানকে মুসলমানের চেয়েও বেশী ঘৃণা করেন ও বলেন, ইংরেজ শিখকে পল্টনে ঢুকিয়ে মদ খেতে শেখায়।

হিন্দু বৌদ্ধ জৈন ধর্ম ও ইসলামে মদ্যপান নিষিদ্ধ—ইহুদী খৃষ্টান ও জরথুষ্ট্রী ধর্মে পরিমিত মদ্যপানকে বরদাস্ত করা হয়েছে। এবং ঐ সব ধর্মের বহু প্রগতিশীল গুরু-জ্ঞানীরা অধুনা মদ্যপানবিরোধী।

মদ্যপান এখনো এদেশে কালমূর্তিতে দেখা দেয় নি, কিন্তু আগের থেকে সাবধান হওয়া ভালো। কিন্তু—পূর্বেই বলেছি—সরকার যে ভাবে এগোচ্ছেন

তার সঙ্গে আমার মত মেলে না। একটা উদাহরণ দি। কয়েক বৎসর পূর্বে দিল্লী শহরে পার্লিক ড্রিংকিং অর্থাৎ বাররেস্তোরাতে মদ খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হল। হুকুম হল, যারা থাকে তারা মদের দোকান থেকে পুরো বোতল কিনে নিয়ে অন্যত্র থাকে। অন্যত্র মানে কোথায়? স্পষ্টতঃ বোঝা গেল বাড়িতে। কারণ পার্কে বা গাছতলায় বসে খাওয়াও বারণ। আমার প্রশ্ন, এটা কি ভালো হল? একদম বন্ধ করে দাও, সে কথা বর্জ্য; কিন্তু যে দেশে মদ খাওয়াটা নিশ্চিন্দনীয় বলে ধরা হয়—বিশেষতঃ মা-বোনেরা এর পাপস্পর্শের চিন্তাতেও শিউরে উঠেন—সেখানে ঐ জিনিস বাড়ির ভিতর প্রবর্তন কি উত্তম প্রস্তাব? শুনছি দিল্লীতে একাধিক পরিবারে এই নিয়ে দাম্পত্য কলহ হয়েছে। খুবই সম্ভাব্য। এতদিন স্বামী বাইরে বাইরে খেয়ে বাড়ি ফিরতেন। ছেলেমেয়েরা অধিকাংশ স্থলেই কিছু জানতো না। এখন দাঁড়ালো অন্য পরিস্থিতি। ওদিকে ব্যাচেলরদের বৈঠকখানাতে যে হটগোল আরম্ভ হল তার প্রতিবাদ করতে প্রতি-বাসীরা সাহস পেলেন অস্পষ্ট—মাতালকে ঘ্যাঁটানো চাটুখানি কথা নয়।

দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি বারে ঢুকে সামান্য একটু খেয়ে স্ফুটন দূর করে বাড়িতে এসে খেয়েদেয়ে শূন্যে পড়তো, তাকে এখন কিনতে হল পুরো বোতল। প্রলোভনে পড়ে তার মাত্রা বেড়ে গিয়ে শেষটায় তার পক্ষে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাওয়াটা অসম্ভব নয়।

তৃতীয়ত—এবং এইটাই সব চেয়ে মারাত্মক—বাড়িতে বাপের মদ্যপান ছেলে-মেয়েরা দেখবেই। অনুকরণটাও অসম্ভাব্য নয়। অর্থাৎ নতুন কনভার্ট করার ব্যবস্থা করলুম।

শুনলুম, হালে নার্কি কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের উপর চাপ দিয়েছেন যে পাবলিক ড্রিংকিং বন্ধ করো। উত্তরে নার্কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার উপরের কয়েকটি যুক্তি ব্যবহার করে আপত্তি জানিয়েছেন। ফলে হবে বলে মনে হয় না, কারণ পূর্বেই বলেছি, কেন্দ্রীয় সরকারকে একাধিকবার এ-সব যুক্তি শোনানো হয়েছে।

*

*

*

মোশদা কথা এই :—

যে দেশে মদ্যপান নিশ্চিন্দনীয়, যে দেশে মদ্যপান জনসাধারণে ব্যাপকভাবে প্রচলিত নয়, সেখানে মদ্যপান একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে, যদি—

যদি নতুন কনভার্ট না হয়, অর্থাৎ তরুণদের যদি মদ্যপানের কোনো সুযোগ, কুযোগ কোনো যোগাযোগ না দেওয়া হয়।

আমাদের সর্বপ্রচেষ্টা ঐ দিকে নিয়োজিত করা উচিত।

পৌষ মেলা

হয়তো মেলাতে বসেই আপনি এ-লেখাটি পড়ছেন। না-হলে মেলাতে আসার সময় এখনো আছে। মোটরে আসতে পারেন, অবশ্য যদি পশ্চিমবঙ্গী দুর্গাপুর থেকে শান্তিনিকেতন মোটরে এসে থাকেন। তাঁর আসার সঙ্গে আপনার মোটরে আসার একটা অদৃশ্য সংস্করণ কাষ'কারণ সম্পর্ক' আছে। তিনি মোটরে এলে অজয় নদের উপরে কজওয়াটি তৈরী হবে, বিক্রেণে তিনি যদি হেলিকপ্টারে আসেন—এখানকার ফার্মে কালের দোকানে সেই গুজোরব—তবে উড়িয়া ভাষায় 'আপনারো কপালো ভাঙিলো।' সাথে কি আর মাইকেল গেয়েছেন, 'রাজেন্দ্রসঙ্গমে দীন যথা দূর তীর্থ দরশনে'—সে ব্যবস্থার পরিবর্তন এখনো হয় নি।

এসে কিন্তু কোনো লাভ নেই। কারণ 'জেলা বীরভূমের অস্ত্রপাতী ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্টারী বীরভূম সবরেজিস্টারী বোলপুর পরগণে সেনভূম তালুকসুপারের অস্ত্রগত হুদা বোলপুরে পত্তনীর ডোল খারিজান মোজো ভুবননগর ইন্সপেক্টর' ভাববেন না, আমি সুকুমার রায়ের 'কাকালত নামা' থেকে চুরি করছি, ইটি পাবেন শান্তিনিকেতন ট্রস্টভাইডের পয়লা পাতায়, সেকথা পরে হবে—সিকিটি ফেলবার জায়গা নেই। কারো না কারো মাথায় আটকে যাবে, কিংবা শ্রী-পুরুষের পদত্যাগে যে পুঞ্জীভূত ধূলিস্তর আকাশে-বাতাসে জমে উঠেছে, তারই একটিতে। অন্য মেলার তুলনায় এখানে মেয়েদের সংখ্যা কিছু নগণ্য নয়, অথচ ভাবতে অবাক লাগে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আশ্রমের মাস্টারদের গৃহিণী-কন্যারা যখন মেলা দেখার প্রথম অনুমতি পেলেন—খ্রীসদনের কম্পনাও তখন কেউ করতে পারেন নি—তখন তাঁদের আনা হয়েছিল গোরুর গাড়িতে করে এবং তাঁরা মেলার প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে, গাড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেলা দেখেছিলেন।

এই মেলাটি বিশ্বভারতীর চেয়ে বয়সে বড়। এ কথা বলতে হল বিশেষ করে, তার কারণ, যে-বেদীর উপর বসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপাসনা করতেন, সে-বেদীর পাশ দিয়ে যাবার সময় গেল মেলার সময় শ্রুতি, এক গুণী আরেক গুণীকে বৃষ্টিয়ে ধলছেন, এই বেদীর নিচে রবীন্দ্রনাথের পুঁত-অস্থি প্রোথিত আছে! আশ্চর্য চিহ্ন দিল্লুম এহেন তত্ত্ব নিতান্তই আমার কম্পনার বাইরে বলে, কিন্তু আসলে আমার আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়। আমাদের কেন্দ্রের এক মন্ত্রী বোম্বাই না কোথায় যেন রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উৎসবকে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রথম ইংরাজীতে রচনা লিখে বৃষ্টিতে পারলেন, মাতৃভাষা বাংলাতেই ফিরে যাওয়া উচিত।' গীতাজলি অনুবাদ করার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজীতে বিশেষ কিছু লিখেছেন বলে জানতুম না, পরে চিন্তা করে বৃষ্টিলাম, মন্ত্রীর মাইকেল এবং রবীন্দ্রনাথ গুবলেট করে ফেলেছেন! (এবারে আশ্চর্য চিহ্ন যে ভাগ মারফক লেগেছে সে-কথা হর ব্যাকরণবাগীশই কবুল করবেন।) 'শতবার্ষিকী' 'শত বার সিকি' ভেবে এঁরা যদি এখন পশ্চিম টাকা খর্চা করেন তবে আমি আর বিস্মিত হব না। 'পান্টা' আমার নয়—এটা স্বয়ং করিবাদ করে গেছেন।

তা সে-কথা এখন থাক। যে গুণী শাস্তিনিকেতন ছাতিমতলার অভিনব ব্যাখ্যা দিচ্ছিল তাকে শুধু মনে মনে বলেছিলুম, ‘সাবধানে থাকিস, বাপ! তোকে না শেষটায় কেশেদ্রের মশ্ত্রী বানিয়ে দেয়।’

অতএব অতি সংক্ষেপে মেলাটির ইতিহাস বলি। এতে কোনো গবেষণা নেই।

১২৬৮ সালে মহর্ষি দেবেশ্বরনাথ ঠাকুর পরবর্তী-যুগের বিখ্যাত লর্ড সিন্‌হা অব্ রায়পুর পরিবারে নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন। রাইপুর জায়গাটি বোলপুর টেশনের কাছেই। মহর্ষি দেব একাধিকবার এই রাইপুরে আসা-যাওয়া করেন এবং গমনাগমনের সময় এ অঞ্চলের উঁচু-নিচু খোয়াই-ডাঙার দিগন্ত-বিস্তৃত অর্ধ-মরুভূমিসদৃশ নিজের ভূমির গাভীষ’ তাকে আকৃষ্ট করে। আশ্রম স্থাপনের আদিযুগের ঐতিহাসিক ও প্রথম ‘আশ্রমধারী’ স্বর্গত অঘোর চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘রায়পুর যাতায়াত করিবার সময় এই দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তরের অপূর্ব গাভীষে মহর্ষির চিত্ত আকৃষ্ট হয়। এই বিশাল প্রান্তরে দৃষ্টি অব্যাহত, অনন্ত আকাশ ব্যতীত দিগলয়ে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। অনন্তস্বরূপের এই উদ্যত সৌন্দর্যে তাহার হৃদয়মন প্রাবীত হইল, উন্মত্ত আকাশতলে এই নিজের প্রান্তর তপস্যার একান্ত অনুকূল বলিয়া তাহার ধারণা হইল।’ (শাস্তিনিকেতন আশ্রম, ১৩৩৫-১৩১৬, পৃ. ১১)

চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমি যখন এখানে আসি তখনও ঐ দৃশ্য ছিল। এখন এত বেশী গাছপালা বাড়িঘর বাধ-বন লাগানো হয়েছে যে সে-দৃশ্যের কল্পনা করা কঠিন। তবে ‘হে ভৈরব হে রত্ন বৈশাখ’ ইত্যাদি কবিতায় ও গ্রীষ্ম-বর্ষার বহুদূত গানে রবীন্দ্রনাথ সে যুগের শাস্তিনিকেতনের বর্ণনা রেখে গেছেন। আর প্রাচীনতম যুগের বর্ণনা আছে ‘জীবনস্মৃতি’তে।

১০ই ফাল্গুন, ১২৬৯ সনে মহর্ষি বর্তমানে যেখানে লাইব্রেরি, ‘শাস্তিনিকেতন বাড়ি,’ মন্দির (গ্রাম্য লোকের কাছে এখনও এ-জায়গা ‘কাঁচা বাংলা’ নামে পরিচিত) এই জায়গাটি, মোট কুড়ি বিঘা জমি বার্ষিক পাঁচ টাকা খাজনায় (!) মোরসী পাট্টা নেন। ধ্যান-ধারণার জন্য মহর্ষি সর্বপ্রথম এখানে যে বাড়িটি তৈরী করেন সেটি মন্দিরের মূখোর্ম্মি এবং ‘শাস্তিনিকেতন বাড়ি’ নামে পরিচিত।

১২৯০ সনের পর মহর্ষি দেব আর কখনও শাস্তিনিকেতনে আসেন নি।

২৬শে ফাল্গুন, ১২৯৪ সনে মহর্ষি শাস্তিনিকেতনের বাড়ি-বাগান জমিজমা ধর্মচর্চা, বিদ্যালয় স্থাপন ও বাৎসরিক মেলা প্রবর্তনের জন্য ট্রাস্টভীড করে সর্বসাধারণের উদ্দেশে উৎসর্গ করেন।

ঊষা কীর্তক, শুক্লাব্দ, ১২৯৫, অপরাহ্নে আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর্ব সমাধান হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্গত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় আচার্যের কর্ম করেন।

৯ই কীর্তক ১২৯৫ বৃদ্ধবারে এখনও প্রচলিত প্রতি বৃদ্ধবারের প্রথম উপাসনা করেন প্রথম আশ্রমধারী অঘোর চট্টোপাধ্যায়।

২২শে অগ্রহায়ণ ১২৯৭ সনে 'মন্দির'ের ভিত্তিস্থাপনা করেন মহর্ষিদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বাশীর্ষিকপ্রবর স্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। উপাসনা করেছিলেন তিনি, তাঁর মধ্যম ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ বক্তৃতা করেন এবং সঙ্গীত করেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। একটি তাম্রফলকে তারিখ প্রভৃতি খোদিত ছিল। সেই ফলক, সেইদিনের 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা, সেই মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', পশ্চরত্ন ও প্রচলিত মদ্রা ভিত্তিমূলে প্রেথিত হয়। তাম্রফলকে ছিল,

'ও' তৎসং। ঠাকুর বংশাবতংসেন পরমমহর্ষিণা শ্রীমতা দেবেন্দ্রনাথ শর্মণা ধর্মোপচারাৎ শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠাপিতমিদং ব্রহ্মমন্দিরং। শ্রুতম্ ১৮১২ শক, ১৯৫৮ সম্বৎ, ৪৯৯১ কলাশ্দ অগ্রহায়ণ ২২, রবিবাসর।' (পূর্বোক্তিত পুস্তকে জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৯০)

এই পৌষ ১২৯৮ তারিখে স্বিজেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠ করে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করেন।

তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে দরিদ্রদের অন্নদান।

চতুর্থ বার্ষিক উৎসবে সর্বপ্রথম আতশবাজি গোড়ানো হয়।

পঞ্চম বার্ষিক উৎসবে সর্বপ্রথম মেলা ও যাত্রাগানের ব্যবস্থা হয়।

অতএব ১৩০৩ সালে পৌষ-মেলার আরম্ভ।

১৩০৯ সালে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বা স্কুল স্থাপনা। ১৩২৫ সালে কলেজ বা বিশ্ব-ভারতীর প্তন। ১৩২৬ সালে গ্রীষ্মাবকাশের পর অধ্যাপনা আরম্ভ হয়। ১৩২৮/১৯২১-এ বিশ্বভারতীর (য়ুনিভার্সিটি রূপে) উদ্বোধন।

পূর্বে মহর্ষিদেবের যে ট্রাস্টবীডের উল্লেখ করেছি তাতে আছে :—

'ধর্ম'ভাব উদ্দীপনের জন্য ট্রাস্টীগণ বর্ষে বর্ষে একটি মেলা বসাইবার উদ্যোগ করিবেন। এই মেলাতে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের সাধুপুরুষেরা আসিয়া ধর্মবিচার ও ধর্মালোচনা করিতে পারিবেন। এই মেলার উৎসবে কোন প্রকার পৌত্তলিক আরাধনা হইবে না ও কুৎসিত আমোদ-উল্লাস হইতে পারিবে না, মদ্য মাংস ব্যতীত এই মেলায় সর্বপ্রকার দ্রব্যাদি খরিদ-বিক্রয় হইতে পারিবে।'

আমার মনে হয় এই মেলার সময় যদি দেশ-বিদেশের সর্ব ধর্মের গুণী-জ্ঞানী সাধক-পণ্ডিত সম্প্রদায়কে আমন্ত্রণ করে তিনদিনব্যাপী ধর্মালোচনা ধর্মসভার প্তন (কংগ্রেস অব অল ফেৎস) হয়, তবে আমরা শ্রুগধর্ম অনুসরণ করে মহর্ষিদেবের শ্রুভেচ্ছা সফলতর করতে পারব।

পঞ্চতত্ত্ব

মাভেঃ !

বাঙালী সব দিক দ্বিয়েই পিছিয়ে যাচ্ছে, এরকম একটা কথা প্রায়ই শ্রুনেতে পাওয়া যায়। কথাটা ঠিক কিনা, হলপ খেয়ে বলা কঠিন, কারণ দেশ-বিভাগের ফলে তার যে খানিকটে শক্তিক্ষয় হয়েছে সে বিষয়ে তো কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। পার্লামেন্টে যদি আপনার সদস্য সংখ্যা কমে যায় তবে সব-কিছুই কাটতে হয় ধার দিয়ে—ভার দিয়ে কাটার সুযোগ আর মোটেই

জোটে না ।

দিল্লীতে থাকাকালীন আমি একটি বিষয় নিয়ে কিঞ্চিৎ চিন্তা করেছিলুম । কেন্দ্রে অর্থাৎ ইউ পি এস সি-তে বাঙালী যথেষ্ট চাকরি পাচ্ছে কি না ? ঐ অনুষ্ঠানের সদস্য না হয়েও যারা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁদের বিশ্বাস, বাঙালীর এতে যতখানি কৃতকার্য হওয়া উচিত ততখানি সে হচ্ছে না । একদা বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমাকেও সেখানে ডাকা হয়েছিল ; আমি তখন চোখকান খোলা এবং খাড়া রেখে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করেছিলুম ।

দিল্লীতে এখন যারা বসবাস করেন তাঁরা বিলিতি কিংবা বিলিতি ঘাষা পোশাক পরেন ছুরিকীটা দিয়ে খাওয়া প্রচুর বাড়িতে চালু হয়েছে, ইংরিজী আদব-কায়দা, বিশেষ করে ইংরিজী এটিকেট এঁদের কাছে আর সম্পূর্ণ অজানা নয় ।

ইউ পি এস সি-র তাবৎ মেম্বারই সায়েবীয়ানা পছন্দ করেন, এ-কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু যেখানে যে-আবহাওয়া বিদ্যমান, মানুষ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় তার থেকেই প্রাণবায়ু গ্রহণ করে । তাই যদি বাঙালী ছেলের পোশাক ছিমছাম না হয়, চেয়ার টেনে বসার সময় সে যদি শব্দ করে, মোকামাফিক পার্ভান, থ্যাঙ্কু না বলতে পারে এবং সর্বক্ষণ ঘন ঘন পা দোলায় তবে সদস্যরা আপন অজান্তেই যে তার প্রতি কিঞ্চিৎ বিমুগ্ধ হয়ে ওঠেন সেটা কিছু আশ্চর্যজনক বস্তু নয় ।

কিন্তু আসল বিপদ অন্যত্র । বাঙালী উমেদার ইংরিজীতে ভাব প্রকাশ করতে পারে না । পাজাবী, হিন্দীভাষী কিংবা মারাঠী যে ইংরিজী বলে সেটা কিছু ‘আমরি’ ‘আমরি’ করবার মত নয়,—বিশেষত পাজাবী, হিন্দীভাষী ও সিন্ধীদের ইংরিজীজ্ঞান ‘শিলিং-শকার’ ও ‘পেনি-হরার’ থেকেই আহরিত । তা হোক । কিন্তু এসব বদুবে-না-বদুবেই যারা বেশী পড়ে তাদের কথা বলার অভ্যাস হয়ে যায় বেশী, অন্তত ‘থ্যাঙ্কু’ ‘পার্ড’ন’, ‘আই এম অ্যাফ্রেড’ তারা তাগমাফিক লাগিয়ে দিতে কসদুর করে না ।

এ স্থলে ইতিহাসের দিকে এক নজর তাকাতে হয় ।

মুসলমান আগমনের পর থেকে ১৮৪০-১৮৫২ পর্যন্ত বাঙলা দেশের ব্রাহ্মণ তথা বৈদ্য সম্প্রদায়ের বিস্তার লোক সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেন, এবং মুসলমান ও কায়স্থরা ফারসী (এবং কিঞ্চিৎ আরবী), চর্চা করেন । এদেশের বড় বড় সরকারী চাকরি, যেমন সরকার (চীফ সেক্রেটারী), কানুনগো (লিগেল রিমেম্ব্রেন্সার), বখশী (একাউন্টেন্ট জেনারেল—পে-মাস্টার) অর্থাৎ এডমিনিস্ট্রেটিভ তাবৎ ডাঙর ডাঙর নোকরীই করেন কায়স্থরা ; ইংরেজের আদেশে এঁরাই কলকাতাতে প্রথম ইংরিজী শিখতে আরম্ভ করেন—বস্তুত ফারসী তাঁদের মাতৃভাষা ছিল না বলে তাঁরা সেটা অনায়াসে ত্যাগ করে ইংরিজী আরম্ভ করে দিয়েছিলেন—এবং ফলে হাইকোর্টটি তাঁদের হাতে চলে যায় । ব্রাহ্মণরা আসেন পরে ; তাই তাঁরা পেলেন বিশ্ববিদ্যালয় । মুসলমান আসেন সর্বশেষে, তাঁদের কপালে কিছুই জোটে নি ।

তা সে যাই হোক, আমরা বাঙালী প্রথমেই সাততাড়াতাড়ি ইংরিজী শিখে-ছিলুম বলে বেহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এতক সিম্বুদেশ পর্যন্ত আমরা ছড়িয়ে পড়ি।

এর পর অন্যান্য প্রদেশেও বিস্তর লোক ইংরিজী শিখতে আরম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে আমাদের চাহিদা ও কদর কমেতে লাগল, এসব কথা সকলেই জানেন, কিন্তু এর সঙ্গে আরেকটি তত্ত্ব বিশেষভাবে বিজড়িত এবং সেই তত্ত্বটির প্রতি আমি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

যে দুটি জাতীয় সঙ্গীত ভারতের সর্বত্র সম্মানিত সে দুটিই বাঙলা দেশেই রচিত হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম সর্বপ্রথম আরম্ভ হয় বাঙলা দেশেই। এটা কিছুর আকস্মিক যোগাযোগ নয়। এর কারণ বাঙালী আপন দেশ ভালোবাসে এবং সে বিদ্রোহী। দেশকে ভালোবাসলে মানুষ তার ভাষাকেও ভালোবাসতে শেখে।

আশ্চর্য, ইংরিজী ভালো করে আসন জমাবার পূর্বেই বাঙলা দেশে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। (ঠিক সেই রকম ফার্সী যখন একদা আসন জমাতে যায়, তখন কবি সৈয়দ সুলতান আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন,

‘আল্লায় বলিছে “মুই যে-দেশে যে-ভাষা,

সে দেশে সে-ভাবে করলুম রসুল প্রকাশ।’

যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন।

সেই ভাষা তাহার অমূল্য সেই ধন ॥’)

এবং আরো আশ্চর্যের বিষয়, সে বিদ্রোহের কাণ্ডারী ছিলেন সে যুগের সবচেয়ে বড় ইংরিজী (ফারাসী, লাতিন, গ্রীক) ভাষার সুপার্নাডত মাইকেল। কাজেই যদিও সে উইলসেন, কেশবসেন ও ইস্টসেন এই তিন সেনের কাছে জাত দিয়ে ছুরি কাটা ধরতে শিখল (আজ যা দিল্লীতে বড়ই কদর পাচ্ছে) তবু সঙ্গে সঙ্গে ওর বিনাশের চারাকে জল দিয়ে বাঁচাতে আরম্ভ করলো। এটাকে বাঙালীর স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। এ সময় সে গাছেরও খেয়েছে, তলারও কুড়িয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ই চোখে পড়ল, বাঙালী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরিজী বইয়ের আমদানী বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যে রকম কাতর হয়ে পড়েছিল এবারে সে সে-রকম হাঁসফাঁস করলো না। স্বরাজ লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, বাঙালী ইংরিজী ভাষা, আচার-ব্যবহার, কায়দা-কোষা থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছে এবং ফলে দিল্লীতে আর কতক, সিরি, সার্ভিসেট—পায় না।

১ ‘বিদ্রোহী’ আমি কথার কথারূপে বলছি না। বস্তুত বাঙালী যে বিদ্রোহী তার ইতিহাস এখনো লেখা হয় নি। (ক) দোয়ারের রক্ষাধর্ম তাকে অভিভূত করতে পারে নি, ফলে সে সংস্কৃত উচ্চারণ গ্রহণ করে নি, (খ) বৌদ্ধ জৈনের নিরামিষ সে গ্রহণ করে নি, (গ) মুসলমান আমলে বাঙলা দেশই সব চেয়ে বেশী লড়াই দিয়েছে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ইত্যাদি বিস্তর বিষয়-বস্তু নিয়ে সে ইতিহাস লিখতে হবে।

তর্ক করে, দলীল-দস্তাবেজ দিয়ে সপ্রমাণ করতে হলে ভূরি ভূরি লিখতে হবে। তা না হয় লিখলুম, কিন্তু পড়বে কে? তাই সংক্ষেপে বলি,

পৃথিবীর সভ্যসভ্য কোনো দেশই বিদেশী ভাষা দিয়ে বেশী দিন কারবার চালায় না। আজকের দিনে তো নয়ই। ফার্সি এদেশে ছ'শ বছর ধরে রাষ্ট্র-ভাষা ছিল—আমরা একে চিরন্তনী ভাষা বলে গ্রহণ করি নি।

তাই হিন্দী, গুজরাতী মারাঠী ওলারাও একদিন ইংরেজী বর্জন করে আপন আপন মাতৃভাষায় কাজকারবার করতে গিয়ে দেখবেন, আমরা বাঙালীরা অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছি, মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গিয়েছে—কারণ আমরা অনেক পূর্বে আরম্ভ করেছিলাম। তখন যখন কেন্দ্রে আপন আপন মাতৃভাষায় পরীক্ষা দিতে হবে তখন আবার আমরা সেই যুগে ফিরে যাব, যখন একমাত্র বাঙালীই ইংরেজী জানত। হিন্দী কখনো ব্যাপকভাবে বাধ্যতামূলক হবে না, আর হলেও বাঙালীকে যেমন মাতৃভাষার উপর হিন্দীতে পরীক্ষা দিতে হবে, হিন্দীওলাকে হিন্দী ভিন্ন অন্য একটি ভাষায় পরীক্ষা দিতে হবে। অমাতৃভাষা অমাতৃভাষায় কাটাকুটি গিয়ে রইবে বাঙলা বনাম হিন্দী। তাই অবস্থা একই দাঁড়াবে—আমরা এগিয়ে যাব।

তাই মা ভেঃ ॥

দেছি দেছি

কিছুদিন পূর্বে আমার এক আত্মজন এসে, আমাকে শৃংখল, ‘আপনার কি অত্যন্ত অর্থাভাব হয়েছে?’

আমি ইহুদীদের মত পাগটা প্রশ্ন শৃংখলুম, ‘কেন, তোমার কি অর্থ-প্রাচুর্য হয়েছে? ধার দেবে?’ সে ধনী, আমি জার্নি।

বললে, ‘সিনেমার কাগজে যে লিখেছেন!’

আমি বললাম, ‘আমার যতদূর জানা আছে, একমাত্র এই বাঙলা দেশেই বহু সিনেমার কাগজ সাহিত্যিকদের কাছে লেখা চায়, এবং এমন কোনো শর্তও করে না যে সিনেমা সম্বন্ধেই লিখতে হবে। অন্যান্য দেশে সিনেমার কাগজ সাহিত্যের তোয়াক্কা তো করেই না, উষ্টে ভালো ভালো সাহিত্যের কাগজ সিনেমা সম্বন্ধে লেখে। এ সম্মানটা আমাদের যতদিন দেখাচ্ছে ততদিন সেটা নেব না কেন?’

বিত্তীয়তঃ এই ধরো তোমার মনিহারী দোকানে আমরা পাঁচজন যাই, দর কষাকষি করি নে। ঐ সময়ে গায়ের খন্দেরও ভয়ে বেশী দরদস্তুর করে না। ফলে তোমার দোকানের টোন অন্য দোকানের চেয়ে ভালো হয় নি—বুকে হাত দিয়ে কও! অন্য দোকানে এখনো মেছে-হাটার দরদারি—ভুল বললাম—মেছো হাটেও এখন দর-কষাকষি বিস্তর কমে গেছে, যবে থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী চাকর না পাঠিয়ে নিজেরা বাজার যেতে আরম্ভ করেছে। ভালো সাহিত্যিকরা—আমার কথা বাদ দাও—যতদিন ‘জলদা’তে লিখবে ততদিন তো সে কুরচির প্রণয় দিতে পারবে না।

তৃতীয়তঃ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ‘কুস্তলীন’ তেলের পদ্রুপকার পাবার জন্য সেখানে কম্পীট করেছিলেন। তেলের ব্যবসার দোকান ও ফিল্মের কাগজে তফাৎটা কি?’

বাঁকটা বলার পদবেই বাবাজী শূদ্রালেন, ‘আপনি কি রবীন্দ্রনাথ?’

আমি তৈরী ছিলাম। বললাম, ‘এর উত্তর আমি জানি, বাঙলা দেশ জানে—তুমি বুঝি জানো না—?’

সেই যে গল্প আছে;—দুই বর্ষ রাস্তা দিয়ে যাবার সময় কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দে একজন ভয় পাওয়াতে অন্যজন সাহস দিয়ে বললে, ‘ইংরাজী প্রবাদ জানিস,—‘বাকিং ডগ ডাজ নট বাইট’—যে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে সে কামড়ায় না।’ দ্বিতীয় জন বললে, ‘প্রবাদটা তুই জানিস, আমিও জানি। কিন্তু কুকুরটা কি জানে?’ আমি রবীন্দ্রনাথ নই সে কথা আমি জানি, আমার পাঠক সম্প্রদায়ও জানে—এখন প্রশ্ন তুমি জানো কি না?’

বাধা দিয়ে বললে, ‘কিন্তু—?’

আমি বললাম, ‘মেলা বেউঘেউ ক’রো না। শোনো।

চতুর্থতঃ তুমি ফিল্ম দেখতে যাও, আর আমি ফিল্মের কাগজে লিখতে পারবো না?’

পঞ্চমতঃ তুমি জানলে কি করে আমি ‘জলসা’য় লিখেছি? লোকমুখে?’

ছেলেটি সত্যবাদী। বললে, ‘না, নিজে পড়েছি।’

আমি বললাম, ‘লাও! তুমি যে কাগজ পড় আমি সেটাতে লিখব না? তবে কি তুমি ‘জলসা’তে অশ্লীল লেখার সম্বন্ধে গিয়ে আমার লেখা পড়ে হতাশ হয়েছে? তবে কি ফিল্মের কাগজে শ্লীল লেখা, তথাকথিত উচ্চাঙ্গ গবেষণা-মূলক (কিংবা মডার্ণ কবিতার উন্নাসিক) পত্রিকায় অশ্লীল লেখার চেয়ে ভালো?’

‘আপনি তো প্যারাডক্সে ফেললেন। সেই যে সোক্রাতিসের গল্প—’

আমি বললাম, ‘কোনটা?’

এক গাল হেসে বললে, ‘কেন? আপনারই কাছ থেকে শোনো। নিরপরাধ সোক্রাতিসকে যখন বিষ খাইয়ে মারার সরকারী হুকুম হল তখন তার স্ত্রী স্কাপ্তোপে কেঁদে বলেছিলেন, ‘তুমি কোনো অপরাধ করো নি আর তোমার হল প্রাণদণ্ড।’ সোক্রাতিস বললেন, ‘তবে কি আমি অপরাধ করে মৃত্যুদণ্ড পেলে এর চেয়ে ভালো হত?’

(পাঠক সম্প্রদায় আমার সুক্ষ্ম হাত-সাফাইটি লক্ষ্য করলেন কি? ইদানীং আমার বদনাম হয়েছে যে, আমি একই কথা বার বার বলি। সেইটে পরের মুখে বলিয়ে অথচ নিজে শাবাশীটি কি কায়দায় নিলাম!)

তারপর বললাম, ‘ষষ্ঠতঃ—থাক্ গে। প্রথম কারণটাই যথেষ্ট। ন্যায়শাস্ত্রও তাই বলে, ‘প্রথম কারণ যথেষ্ট হলে অন্য কারণে যাবে না।’ সেই ইরানী গল্পটি শোনো নি?’

অনেক কালের কথা। ইরানে তখন ইংরেজের এমনই আধিপত্য যে, হুকুম ছিল ইরানের বৃহত্তর বন্দরেও যদি ইংরেজের ক্ষুদ্রতম মালজাহাজ পৌঁছয়

তবে তার সম্মানে কামান দাগতে হবে। এখন হয়েছে কি, ঘটনাক্রমে একটি ইরানী ছোকরা ফরাসী দেশে লেখাপড়া সেরে এসে আপন দেশে ছোট্ট একটি বন্দরে প্রধান আপিসারের কর্ম পেয়েছে। ফরাসী দেশে সে আবার শিখে ফেলেছে মেলা বড় বড় কথা, ‘সাম্য’ ‘মৈত্রী’ ‘স্বাধীনতা’, আরো বিস্তর যা তা। মাথা গরম।

প্রথম দিনেই সেই বন্দরে এসেছে এক বিরাট মানওয়ারী জাহাজ—ব্যাটল-শিপ না কি যেন কয়! ছোকরা কামান দাগলে না, পাড়ে গিয়ে জাহাজের অভ্যর্থনা জানালে না।

আধঘণ্টা যেতে না যেতেই তার দফতরে দুম দুম করে ঢুকলেন জাহাজের এ্যাডমিরাল না কি যেন চাই আপিসার। মৃদু লাল, গোঁফ লাল, দাঁত পর্যন্ত লাল।

ইরানী ইয়াংম্যান। অতএব অতিশয় ভদ্র। দাঁড়িয়ে উঠে বিস্তর ‘ব’ জুঁর’, ইত্যাদি জানালে। ইংরেজ শুধু চেঁচাচ্ছে “কামান দাগলে না কেন, ইউ ইউ—ইত্যাদি।”

ছোকরা বললে, “স্যার, ইয়োর অনার, একসেলেন্সি, শাস্ত হয়ে বসুন। কামান না দাগার বাইশটি কারণ ছিল। না বসলে বালি কি করে?”

ইংরেজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের কামান দাগার মত চেঁচিয়ে বললে, “বলে যাও বাইশটা কারণ।”

ছোকরা বললে, “প্রথম কারণঃ বারুদ ছিল না।”

ইংরেজ ঝুপ করে চেয়ারে বসে পড়ে বললে, “বাস্! আর একুশটা কারণ বলতে হবে না। একটাই যথেষ্ট। বারুদ ছিল না, কামান দাগবে কি করে!”

তারপর বললুম, ‘গল্পটা মনে রেখো। কাজে লাগবে। বিশেষ করে যখন তোমার হাতে থাকবে মাত্র একটি কারণ—বাইশটে নেই। সদৃশ গল্পটি বলে এমন ভাবে তাকাবে যেন তোমার হাতে আরো পঞ্চাশত তকবাগ ছিল।’

বাবাজী গলায় এক ঢোক চা ফেলে এমন ভাবে কৌৎস করে গিললে যে, মনে হল আমার উপদেশটি ট্যাবলেটের মত সঙ্গে সঙ্গে পেট-তল করলে। তারপর শুধালে, ‘আপনি ফিল্মী কাগজে লেখেন অথচ ফিল্ম দেখতে যান না, তার কারণটা কি?’

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে ভাবলুম। এ বিষয় নিয়ে এই যে আমি প্রথম ভাবলুম তা নয়। এবং এটা শুধুমাত্র একলা আমারই ভাবনা, তাও নয়।

বাবাজী ফের বললে, ‘দিশী ফিল্মের স্ট্যান্ডার্ড বিদেশীর মত নয় বলে?’

এটার উত্তর আমি জানি। বললুম, ‘কে বললে তোমায় বিদেশী ছবির মান উঁচু? বিদেশী ছবির ভালোগুলো আসে এ দেশে। ওদেশের নিজের কনজম্পশনের ছবি তো তুমি দেখ নি। সেগুলো যে কী রশ্মি তা তো তুমি জানো না। আর ওরা ভাবে আমাদের সব ছবিই সত্যজিৎ রায়ের তৈরী।’

‘তা হলে?’

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললুম, ‘এ এক বিরাট সমস্যা। তার পুরো

‘আইন করে বন্ধ করে দেয় না কেন?’

ফলে ধাঁড়িয়েছে এই যে, আজ আমেরিকাতে অঙ্গীল সাহিত্য বা ছবির বিরুদ্ধে কার্যত কোনো আইনই নেই। তাই সেদিন আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন কয়েকটি অতি-আধুনিক ছাত্র (এদের বলা হয় ‘পোস্ট-হাইব্রাণ্ড’) একখানি অঙ্গীল মাসিক বের করলে—অবশ্য তাদের মতে নয়, ভাইস চ্যান্সেলারের মতে—তখন তিনি কিছু না করতে পেয়ে ডাক বিভাগের শরণাপন্ন হলেন ; তাদের পুরোনো ধাঁপিতে একটি অতিপ্রাচীন রক্ষাকবচ আছে—‘ডাক বিভাগ যদি মনে করেন কোনো চিঠি বা প্যাকেটে অঙ্গীল বস্তু আছে তবে তাঁরা সেটি গ্রহণ করবেন না।’ এই করে অন্তত কাগজটার প্রসার ঠেকানো গেল,

সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী (৭ম)—১০

প্রচার বন্ধ হল না।

‘সর্বনাশ! তা হলে উপায়? এদেশেও তাই হবে নাকি?’

‘তুমি ভবিষ্যতের ভয় পাচ্ছে, এদিকে অনেকেই যে মনে করেন আমাদের দিশী ছবি মথেষ্ট—অথবা যথা-অনিষ্ট—অশ্লীল হয়ে বসে আছে তাদের কথা ভাবছো না কেন? আমি আদর্শেই অস্বীকার করছি নে যে আমাদের অনেক ছবিতে অশ্লীলতার ইঙ্গিত থাকে। কিন্তু আমাদের মডার্ন কবিতায় কোনো কোনো কবি যে ‘আর্টের’ নামে অশ্লীলতার চরমে পৌঁছন তার বেলা কি? তোমার যদি মনে হয়, ফিল্ম ভেবেচিন্তে বান্দর গড়ছে, গড়ুক। তোমার দেখবার ইচ্ছে নেই, না দেখলেই হল। কিন্তু কবিরা যে শিব গড়তে বান্দর গড়েছেন সেখানে তুমি শিব দর্শনে গিয়ে পেলো বান্দর—তার কি? তার তো কোনো সেনসর বোর্ড নেই। অথচ এরা তো রবীন্দ্র, রাজশেখর, সুকুমার রায়কে হটিয়ে দিতে পারেন নি; ‘মনমোহন সিরীজে’র বিক্রী বেশী, না তারাশ’করের বেশী? আসনে শ্লীল হক অশ্লীল হক, যে বস্তু মৃত্যুর সের (আর্টের) পর্যায়ে ওঠে না সেটা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সংস্কৃত সাহিত্যে নিশ্চয়ই বিস্তর অশ্লীল বস্তু লেখা হয়েছিল—না হলে শ্লীল-অশ্লীল নিয়ে আলোকাকরিতা আলোচনা করলেন কেন? তাই আজ আশ্চর্য হই, সে সব অশ্লীল বই টিকে রইল না কেন?’

তার অর্থ এই নয়, অশ্লীলতার বিরুদ্ধে আপত্তি করার কোনো প্রয়োজন নেই—অবশ্য তোমার যদি মনে হয় ফিল্মগুলোর অনেকটাই অশ্লীল। আমি অন্য কথাগুলো বললুম, যাতে করে তুমি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ না হও। গণতন্ত্র যখন বয়েছে তখন ‘গণ-কলচর’, ‘গণ-সাহিত্য’, ‘গণ-ফিল্ম’ হবেই হবে। তার জন্য তৈরী থাকা উচিত। কিন্তু গণতন্ত্রের তুমি আমি দুজনেই যখন ‘গণ’, তখন আমারও আমাদের রুচি অনুযায়ী আমাদের যেখানে যেখানে বাধে সেখানে আপত্তি জানিয়ে যাব। আর সত্যজিৎ রায় তো আছেনই। তাঁর নীরব আপত্তিই তো সবচেয়ে জোরালো আপত্তি। আবার তিনিও যদি প্যারিস-টানজমের চড়াপে পৌঁছে শূচিবাসীরা হত হয়ে মানুষের অন্যতম ক্ষুধা—যে ক্ষুধাকে কবিরা যুগ যুগ ধরে সুন্দর মধুর রূপে প্রকাশ করেছেন—উপেক্ষা করেন, তবে তিনিও উপেক্ষিত হবেন। তার কারণ মানুষ অশ্লীলতা চায়, সে নয়। তার কারণ, কোনো জিনিসের চরমে পৌঁছলে সে জিনিস দিয়ে আর্ট হয় না।

তাই এক ফাসী আলোকাকরিতা আর্টের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অন্যান্য নানা মূল্যবান কথার ভিতর বলেছেন,—আর্ট = ‘সনাখতন-ই-হদ-ই-হর চীজ’। এর সব কটি কথাই বাঙলায় চলে। সনাখতন = সনাক্ত করা, চেনা, জানা, হদ = হৃদ, সীমা; হর = প্রত্যেক, চীজ = বস্তু, চীজ। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর সীমা কোন জায়গায় সেইটে বন্ধে লেখাই আর্ট-সৃষ্টি করা।’

বাবাজী চলে যাওয়ার পর অলস কোতুহলে একখানা ফরাসী মাসিক হাতে তুললুম। নাম 'প্রভ' অর্থাৎ 'প্রমাণ'—বাঙলায় এ মাসিক বের করতে হলে নাম হবে 'প্রামাণিক'। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ইয়োরোপে যে 'কংগ্রেস ফর দি লিবার্টি অব্ কালচার' 'সংস্কৃতি স্বাধীনতা সম্বন্ধ' প্রতিষ্ঠিত হয়, তার দশম অধিবেশন হয় বার্লিনে, এই জুলাই মাসে। যে অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ দেন বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক, সমাজতত্ত্ববিদ বেনিস দ্য রুজমৌ—'প্রভের' আগষ্ট সংখ্যায় সেটি ছাপা হয়েছে। স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব্যাখ্যান দিতে গিয়ে দ্য রুজমৌ বলেছেন :

এই যে আমরা প্রত্যেক জিনিসের 'চরমতম' চূড়ান্তে পৌঁছে গিয়ে এক জিনিস থেকে অন্য জিনিস আহাস্মুকের মত আলাদা আলাদা করে রাখছি—একদিকে আটের সৌন্দর্যচর্চা অন্যদিকে দৈনন্দিন জীবনের শ্রীহীন আয়ত্নক্ষয়, একদিকে ঐতিহ্য পরিশ্রম অন্যদিকে গভীর মানসিক চর্চা, একদিকে বিমূর্ত সূক্ষ্ম জ্ঞানান্বেষণ অন্য দিকে টেকনিক্যাল ফলিত কর্ম,—এরা যে প্রতিদিন একে অন্যের দিকে তাকিয়ে বিকৃত মুখভঙ্গী করছে, এর অবসান হোক।

এর প্রয়োজন পশ্চিম মহাদেশেই বেশী। কিন্তু এখন সর্ব মহাদেশকে একত্র হয়ে তাদের আপন আপন সমুদয় বিশ্ববাসীর উপকারের জন্য তুলে ধরতে হবে :—

ইয়োরোপের চিন্তাবৃত্তিজাত ফল (যার থেকে টেকনিক্যাল কর্মবৃদ্ধি বেরিয়েছে),

আফ্রিকার প্রাণশক্তি (যা সে বাঁচিয়ে রেখেছে, আর সকলের চেয়ে ভালো, তার সঙ্গীত, নৃত্য, ছন্দ, অনুভূতির কল্যাণে),

ভারতের আত্মা—যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত তার ঐতিহ্যগত সম্পদ।

আমার মস্তকে বজ্রাঘাত ! ওদিক ইয়োরোপ হাত পেতেছে আমাদের দিকে সর্বোত্তম সম্পদের জন্য—কে না জানে সর্বোত্তম সম্পদ আত্মার উপলব্ধি—আর এদিকে আমি মরিছি আমেরিকার ভয়ে !!

নিরলঙ্কার

একটি লোকের কাছে আমি নানা দিক দিয়ে কৃতজ্ঞ ছিলাম। মাসাধিককাল আমি যখন টাইফয়েডে অজ্ঞান, সে তখন আমার সেবা করে বাঁচিয়ে তোলে। ভালো করেছে, কি মন্দ করেছে, সে অবশ্য অন্য কথা। আর শুধু আমিই না, আমাদের পার্ক সার্কাস পাড়ার বিস্তর লোক তার কাছে নানান দিক দিয়ে ঋণী। মাঝারি রকমের পাস-টাস দিয়েছে—পরীক্ষার ঠিক আগে তার জোর চাহিবা। বেশ দু' পয়সা কামায়—ধার চাইতে হলে ও-ই ফাস্ট চইস। আর বললুম তো, রুগীর সেবায় ঝান্দু নাস'কে হার মানায়।

তার যে কেন হঠাৎ শখ গেল সাহিত্যিক হবার বোঝা কঠিন।

একটা ফার্স লিখেছে। তার বিষয়বস্তু : ধনী ব্যবসায়ী তাঁর ম্যানেজারের উপর ভার দিয়েছেন, কলেজ-পাস মেয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে ইন্টারভ্যু নিয়ে বর বাছাই করতে। নাটকের আরম্ভ ইন্টারভ্যু দিয়ে। কেউ কবি, কেউ গবিতা লিখে গবি, কেউ ফিল্ম স্টার—আরো কত কি।

পড়ে আমার কান্না পেল। দুই কারণে। অত্যন্ত প্রিয়জনের নিষ্ফল প্রচেষ্টা দেখলে যে রকম কান্না পায়, এবং দ্বিতীয়ত ঐ কথাটি ওকে বলি কি প্রকারে? ওটা কিছুই হয় নি, ওকে বলতে গেলে আমার মাথা কাটা যাবে। শেষটায় মাথা নিচু করে, ঘাড় চুলকে বললুম, ‘বুঝলে, মামা, আমি ফার্স-টাস’ বিশেষ পড়ি নি, দেখি নি আদপেই অথচ এ-সব জিনিস স্টেজে দেখার এবং শোনার।’

মামা সদানন্দ পুরুষ। একগাল হেসে বললে, ‘যা বলছি। আমিও ঠিক তাই ভাবছিলাম।’

সোয়ান্তির নিবাস ফেললুম।

ওমা, কোথায় কি। হঠাৎ পাড়ার চায়ের দোকানে শূনি মামার, ফার্স ট্যাংরা না বেনে-পুরুরে কোথায় যেন রিহাসেস্‌ল হচ্ছে। সর্বনাশ। বলি, ‘ও চাটুয্যে, এখন উপায়?’

সোমেন যদিও নিকমি, তবু কথা কয় কলকাতার খাস বাসিন্দা বনেদি সোনার বেনেদের মত। অর্থাৎ আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারে ‘হুতোম’ ‘আলাল’কে আড়াই লেন্থ পিছনে ফেলে। দাঁতের মাড়ি পর্যন্ত বের করে বললে, ‘উপায় নদার।’ দেখি নসিবে কি কি গাদ্‌শ আছে?’

তারপর মামা একদিন ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে ফার্স-অভিনয়ের লগ্ন রাঁধে ভু বাঙলে গেলেন। ট্যাংরা, গোবরায় নয়! রাজাবাজারের কোন এক গলির ভিতরে।

চাটুয্যের বাড়ি মসজিদ বাড়ি স্ট্রীটে। ওখানে কখনো যাই নি। ভাবলুম, সেদিন ওখানেই আশ্রয় নেব। মামা সময় পেলেও আমাকে খুঁজে পাবে না।

চাটুয্যে তো আমাকে দেখে অবাক। ব্যাপার শুনলে বললে, ‘তা আপনি চা পাপড় খান আমাকে তো যেতেই হবে।’ চাটুয্যে চাণক্যের সেই আইডিয়াল বাশ্বব—রাজদ্বারে শ্মশানে ইত্যাদি। আর এটা যে মামার ফ্যুন্‌রেল সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না।

ঘণ্টা দুই দাঁত কিড়মিড়ি দিয়ে বার বার রাজাবাজারের দৃশ্যটা মনশ্চক্ৰ থেকে তাড়াবার চেষ্টা করলুম। কিছতেই কিছ হলে না। কোথাকার কে এক কবি বলেছে, সদ্য লালিত জন যে রকম বার বার চেষ্টা করেও অপমানের কটুবাক্য মনে থেকে সরাতে পারে না।

এমন সময় চাটুয্যে এক টাউস প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে উপস্থিত। তার সর্বাত্মক থেকে উত্তেজনা ঠিকরে পড়ছে। মুখে শুধু ‘এলাহি ব্যাপার, পেলায় কান্ড।’ বুঝলুম, মামাকে উদ্ধারের সংকল্পে, কিংবা নিমন্তলার সংকল্পে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু চাটুয্যে টাউস গাড়ি পেল কোথায়—পায় তো কুল্লো পণ্ডাশ টাকা, খাদি প্রতিষ্ঠানে।

গলির বাইরে থেকে শুনতে পেলুম তুমুল অট্টরব। বদ্বল্লম, গর্দিশ পেলায়।

ওমা, এ কি? কোথায় না দেখব, মামা লিন্‌চুট্‌ হচ্ছে—দেখি, হাজার দুই লোক হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে, হেথা হোথা কেউ কেউ পেটে খিল ধরেছে বলে ডান দিক চেপে ধরে কাতরাচ্ছে, আরেক দঙ্গল লোক হাসতে হাসতে মৃদু বিকৃত করে কাঁদছে। সে এক ম্যাস্‌ হিশ্টিরিয়ার হামির শেয়ার-বাজার কিংবা এবং রেসের মাঠ। ইন্সেক্‌ চাটুষ্যে হে'ড়ে গলায় চে'চাচ্ছে, 'চাক্‌ মারছে, চাক্‌ মাইরা দিছে।'।

ইতিমধ্যে ফার্স্‌ শেষ হয়েছে। মামাকে স্টেজে দাঁড় করানো হয়েছে। মামা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'এ সম্মান সম্পূর্ণ আমার প্রাপ্য নয়। বশুতঃ সবটাই পাবেন, সুসাহিত্যিক আকাদেমি কর্তৃক সম্মানিত গ্রীষ্মত গজেন্দ্রশঙ্কর সান্যাল। একমাত্র তাঁরই পরামর্শে আমি এটা স্টেজ করি। পাড়ার আর সবাই বলেছিল, এটা সাপ ব্যাঙ কিছুই হয় নি।'।

বদ্বতেই পারছেন, আমার নাম গজা সান্যাল। তখন আরেক ধুন্দুয়ার। আমার গলা জিরাফের মত হলেও অত মালার স্থান হত না। নিতান্ত রঙ্গদর্শী গৌরকিশোর সেখানে সেদিন উপস্থিত বদ্বিধ খাটিয়ে আমাকে সময়মত না সরালে, বঙ্গীয় পাঠক-মণ্ডলী উল্লিখিত 'কলকাতার কাছেই কবিবর মহাপ্রস্থান' বই থেকে বর্ণিত হত।

বাড়ি ফেরার পরও আমার মাথা তর্জ্জম মার্জ্জম করছিল। নল ছেড়ে দিয়ে তলায় মাথা রেখে মনে মনে বললুম, 'অয়ি বাগেশ্বরী, তোমার সৃষ্টিরহস্য আমাকে একটু বদ্বিয়ে বেলো তো। মামার ঐ ফার্স্‌ পড়ে এ-পাড়ার সঙ্কলের তো কন্না পেয়েছিল। তবে কি পাড়ার মেধো ও-পাড়ার মধুসূদন?'।

বিস্তর অলংকারশাস্ত্র পড়ে আমার মনে একটা আত্মস্মিততা হয়েছিল, আমি বলতে পারি কোন্‌ রচনা রসোত্তীর্ণ হয়েছে, কোন্‌টা হয় নি। এখন দেখি ভুল।

ভামহ, বামন, ক্রোচে, বেগ'সোঁ, তাহা হোসেন, আবু সঈদ আইয়ুব সবাইকে পরের দিন বস্তা বে'ধে শিশি-বোতলওয়ার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলুম।

আমি জানি, আমার পাঠকমণ্ডলী অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, 'তোমার যেমন বদ্বিধ! পাক' সাক'সের রশ্মি বই পেল রাজাবাজারের সম্মান। আর তুমি তাই করলে বামন ভামহকে প্রত্যাখান! জৈসন'কে তৈসন' শূর্টকিসে বেগন—যার সঙ্গে যার মেলে—শূর্টকির সঙ্গে বেগুনই তো চলে। রাজাবাজার পাক' সাক'সে গলাগলি হবে না?'।

কথাটা ঠিক। ফার্স'ীতেও বলে,

স্বজাতির সনে স্বজাতি উড়িবে মিলিত হয়ে

পায়রার সাথে পায়রা শিকরে শিকরে লয়ে!

The same with same shall take its flight,

The dove with dove and kite with kite.

কুন' হম-জিন'স্‌ ব্‌ হম'-জিন'স্‌ পরওয়াজ

কব্দত'র ব্‌ কব্দত'র বাজ্‌ ব্‌ বাজ্‌।

এসব অতিশয় খাঁটি কথা। কিন্তু প্রশ্ন, শেকসপীয়র মল্লিরের জনসাধারণের—রাজা-উজির গৃহীজ্ঞানীর কথা হচ্ছে না—চিন্ত জয় করেছিলেন যে রস দিয়ে সেটি খুব উচ্চাঙ্গের রস? মাঝে মাঝে তো রীতিমত অশ্লীল। এবং শেকসপীয়র যে আজও খ্যাতির পাচ্ছেন তার কারণ জনসাধারণ তিনশ বছর ও'র নাটক দেখতে চেয়ে চেয়ে ওগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছিল বলে। শুধুমাত্র গৃহীজ্ঞানীর কদর পেলে ও'র নাট্য আজ পাওয়া যেত লাইব্রেরির টপ শেলফে—সেটা উচ্চাঙ্গ হলেও অপ্রয়োজনীয় বই-ই রাখা হয় সেখানে।

আরেকটা উদাহরণ দিঃ ওস্তাদ মরহুম ফৈয়াজ খানের শিষ্য শ্রীমান সন্তোষ রায়ের কাছে শোনা। রাস্তায় এক ভিখিরির গাইয়া গান শুনে ফৈয়াজ তাকে আদরঘর করে বাড়ি নিয়ে গিয়ে, তার সেই গাইয়া গানের এক অংশ শিখে নিয়ে, তাকে 'গুরুদক্ষিণা' দিয়ে বিদায় দিলেন। কয়েক দিন পরে সেই টুকরোটি তাঁর অতিশয় উচ্চাঙ্গ ওস্তাদী গানে বেমালুম জুড়ে দিয়ে বড় বড় ওস্তাদের কাছে শাবাশী পেলেন—ওরকম ভয়ঙ্কর অরিজিনাল অলংকার কেউ কখনো শোনে ন।

আরেকটি নিবেদন বরিঃ মোজর জেনরল শ্রীমান গেল শতাব্দীর গোড়ার দিকে এক রাত্রি কাটান দিল্লী থেকে মাইল দশেক দূরের এক গ্রামে। রাত্রে শোনে ই'দারা থেকে বলদ দিয়ে জল তোলার সময় এক চাষা অন্য চাষাকে মিষ্টি টানা সুরে 'হুঁশিয়ার', 'খবরদার', 'সবুর' বলছে। পরদিন সেকথা এক ভারতীয় কম'চারীর সামনে উল্লেখ করতে সে বলল, 'তানসেন মাঝে মাঝে এখানে এসে এসব সুর শিখে নিয়ে আপন সৃষ্টিতে জুড়ে দিতেন।'

মামার ফাসটা চেয়ে নিয়ে আবার নতুন করে পড়লুম। নাঃ! আমি ফৈয়াজ নই, তানসেনও নই। আর কোন বস্তুই আমার কোনো কাজে লাগে না। মামাকে দোষ দেওয়া বৃথা।

সমস্তটা ডাহা অন'রিয়েল, কোনো প্রকারের বাস্তবতা নেই কোনোখানে।

তখন মনে পড়লো ওয়াইল্ডের একটি গল্প। তিনি সেটি তাঁর সখা এবং শিষ্য আন্দ্রে জিঙ্কে বলেছিলেন। তিনি সেটি ওয়াইল্ড সম্বন্ধে লেখা তাঁর 'ইন মেমোরিয়াম (স্মৃতিস্মরণ)' পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। নিজের ভাষায় গল্পটা বলি—ও বই পাই কোথায়?

গ্রামের চাষাভুষোরা এক কবিকে খাওয়ানো পরাতো। কবির একমাত্র কাজ ছিল সন্ধ্যার পর আন্ডাতে বসে গল্প বলা। চাষারা শুধুতো, 'কবি আজ কি দেখলে?' আর কবি সুন্দর সুন্দর গল্প শোনাতো। রোজ একই প্রশ্ন। একদিন যখন ঐ শুধোলে, তখন কবি বললে, 'আজ যা দেখেছি তা অপূর্ব। ঐ পাশের বনটাতে গিয়েছিলুম বেড়াতে। বেজায় গরম। গাছতলায় যখন জিরোচ্ছি তখন, ওমা, কোথাও বিছা নেই, হঠাৎ দেখি, একটা গাছের ফোকর থেকে বেরিয়ে এল এক পরী। তারপর আরেকটি, তারপর আরেকটি, ক'রে ক'রে সাতটি। আর সবশেষে বেরলেন রানী। মাথায় হীরের ফুলে তৈরী মুকুট, পাখনা দুটি চরকা-কাটা-বড়ীর সূতো দিয়ে তৈরী। হাতে সোনার বাঁশী। সাতটি পরীর চক্করের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাজাতে লাগল সেই সোনার বাঁশী।

তারপর নাচতে নাচতে তারা এগিয়ে চলল সাগরের দিকে। আমিও ঘাপটি মেরে পিছনে পিছনে। সেখানে গিয়ে এরা গান গেয়ে বাঁশী বাজিয়ে কাদের যেন ডাকলে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে এল সমুদ্রকন্যা। সবুজ তাদের চুল—তাই আঁচড়াচ্ছে সোনার চিরুনি দিয়ে। সন্ধ্যা অবাধ, ভাই, তাদের গান শুনলুম, নাচ দেখলুম—তারপর তারা চাঁদের আলোয় মিলিয়ে গেল।’

সবাই বললে, ‘তোফা খাসা, বেড়ে।’

কবি রোজই এ রকম গল্প বলে।

একদিন হয়েছে কি, কবি গিয়েছে ঐ বনে, আর সত্য সত্যই একটা গাছের ফোকর থেকে বেরলো সাতটি পরী, তারা নাচতে নাচতে গেল সমুদ্রপারে, সেখানে জঃ থেকে বেরিয়ে এল সমুদ্রকন্যা। কবি একদৃষ্টে দেখলে।

সেদিন সন্ধ্যায় চাষারা নিত্যকার মতো শূঁধোলে, ‘কবি আজ কি দেখলে বলো।’

কবি গম্ভীর কণ্ঠে বললে, ‘কিছুই দেখি নি।’

অর্থ সরল। যে বস্তু মূগ্ধ রূপে চোখের সামনে ধরা দিল, সেটাকে নিয়ে কবি করবে কি? কবির ভুবন তো চিন্ময়, কল্পনার রাজ্য। বাস্তবে যে জিনিস দেখা হয়ে গেল তার ঠাই কল্পনা রাজ্যে, কাব্যের জগতে আর কোথায়। চার চক্ষু মিলনের পর বধূকে তো আর কল্পনা কল্পনায় তিলোত্তমা বানিয়ে বেহস্তের হরীপরীর শামিল করা যায় না।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে ওয়াইল্ডের আরেকটি ফিরিয়াদ, সৃষ্টিতে আছে শুধু এক-ঘেমি। প্রকৃতি বিস্তার মেহমৎ করে যদি একটি ফুল ফোটায় (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে/ধরণীর তলে/ফুটিয়াছে এ মাধবী/), তবে বার বার তারই পুনরাবৃত্তি করে, অপিত কবির সৃষ্টি নিরঙ্কুশ একক, সৃষ্টিকর্তারই মত একমেবাদ্বিতীয়ম্, এক জিনিস সে দ্বার করে না, অন্যের নকল তো করেই না, নিজেরও কার্বনকপি হতে চায় না।

ওয়াইল্ডের বহুপূর্বে জন্ম কবি শিলার বলেছিলেন, ‘প্রকৃতি প্রবেশ করা মাত্র কবি অন্তর্ধান করেন।’

আর রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে কি বলেছেন, সেকথা অন্যত্র বলার সুযোগ আমার হয়েছে। পুনরাবৃত্তির ভয় বাধ্য হয়ে বর্জন করে বলছি, তিনি প্রকৃতির সওয়াৎ কদম ফুল দেখে বলেছেন, ওটা স্বতুহায়ী, আর আমার সৃষ্টি অজরামর,

আজ এনে দিলে হয়তো দেবে না কাল

রিস্ত হবে যে তোমার ফুলের ডাল

এ গান আমার শ্রাবণে শ্রাবণে

তব বিস্মৃতি স্রোতের প্রাবনে

ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে তরণী

বহি তব সম্মান।

এ আবার কি রকমের সম্মান হল!

প্রকৃতিকে সব কবি হেনস্তা করার বর্ণনা দেবার পর, আবার ক্ষণতরে ওয়াই-

লুডে ফিরে যাই।

আচ্ছা, মনে করুন, ওয়াইল্ডের সেই গ্রাম্য কবি যদি চাষাদের একদিন বলতো, ‘আজ ভাই, আবার সেই বনে গিয়েছিলুম। দেখি, গাছতলায় বসে এক পখিক তার সঙ্গীকে বলছে, সে তার পুরনো চাকরকে নিয়ে তীর্থ করতে যায়, সেখানে চাকরটা মারা যায় ; তাই নিয়ে সে বিশ্বর আপসা-আপসি করছিল।’

চাষারা নিশ্চয়ই ঠোঁট বেঁকিয়ে বলতো, ‘এতে আবার বলার মত কি আছে—এতো আকছারই হচ্ছে।’

কিন্তু মনে করুন তখন যদি কবি, ‘পুরাতন ভূত্য’ কবিতাটি আবৃত্তি করতো? বিষয়বস্তু উভয় ক্ষেত্রে একই।

কবিতাটিতে যে অতি উত্তম রসসৃষ্টি হয়েছে সে সম্বন্ধে এ-যাবৎ কেউ কখনো সম্বন্ধ করে নি।

অথচ ওয়াইল্ড বর্ণিত কবির ‘পরী-সিন্দুবালা’ অবাস্তব, ‘পুরাতন ভূত্য’র বিষয়বস্তু অতিশয় বাস্তব। ‘পুরাতন ভূত্য’ মনে না ধরলে ‘দেবতার গ্রাস’ নিন। সেটা তো অতিশয় বাস্তব—আইন করে বন্ধ করতে হয়েছিল, পরীর নাচ বন্ধ করার জন্য আইন তৈরী হয় না।

তা হলে দাঁড়ালো এই, বাস্তব হোক, কাব্যপনিক হোক—প্রাকৃত হোক, অতি-প্রাকৃত হোক—যে কোনো বিষয়বস্তু রসোত্তীর্ণ হতে পারে যদি—

এইখানেই আলংকারিকদের ওয়াটারলু। কি সে জিনিস, কি সে যাদুর কাঠি, কি সে ভানুমতীর মন্ত্র যার পরশ পেয়ে পুরাতন ভূত্য আর বনের পরী কাব্যরসাসনে একই তালে, একই লয়ে চটুল নৃত্য আরম্ভ করে? কিংবা বাস্তবে না নেচেও কাব্যোতে নাচা হয়ে যায়? যথা—

জোন বললে,—‘চ্যাটার্জি, এই আনন্দের দিনে তুমি অমন গ্রাম হয়ে বাঁসে থেকে না, আমাদের নাচে যোগ দাও।’

বললুম,—‘মাদার লক্ষ্মী, আমার কোমরে বাত। নাচতে কবিরাজের বারণ আছে।’

(শুনুন কথা! পৃথিবীর উপরে—হাউ অন্ আর্থ—কবিরাজ কি করে কম্পনা করতে পারে যে, ষাট বছরের বৃদ্ধা গাইয়া চাটুয্যের বলড্যান্সের অভ্যাস আছে; আগে ভাগে বারণ করে দিতে হবে!)

‘ভানুমতী’ বলে ভালোই করেছি। ম্যাজিকের জোরেই শরৎকালে আম ফলানো যায়। দীপক গেয়ে আগুন ধরানো যায়, মল্লার গেয়ে বৃষ্টি নামানো যায়। কিন্তু সত্য সঙ্গীতজ্ঞ নাকি তাতে কণামাত্র বিচলিত না হয়ে বলেন, ‘এর চেয়ে ঢের বেশী সার্থক হবে সঙ্গীত যদি সদা-বিধবাকে সান্ত্বনা দিতে পারে, স্বাধিকারপ্রমত্তকে শাস্ত করতে পারে।’ এবং কিছ্ না করেও যে সার্থক সঙ্গীত হতে পারে সে তো জানা কথা।

১ ধর্মজগতেও এই ম্যাজিকের বড় সম্মান। সাধু সম্বন্ধে যদি গ্রামে রটে তিনি লোহাকে সোনা করতে পারেন, তবে এ বিষয়ে নিলোভজনও তার

আর্টে এই ম্যাজিক জিনিসটির সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ :—

গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা
ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি,
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর
সাতটি যেন পোষা পাখি ।
শাণিত তরবারি গলাটি যেন,
নাচিয়া ফিরে দশদিকে,
কখন কোথা যায় না পাই দিশা,
বিজুলি হেন ঝিকমিকে ।
আপনি গড়ি তোলে বিপদজাল
আপনি কাটি দেয় তাহা ।
সভার লোকে শূনে অবাক মানে,
সঘনে বলে, বাহা বাহা ॥

এখানে বিশেষ করে লক্ষ্য করবার জিনিস, সভার লোকে ‘বাহা বাহা’ বলছে, কেউ কিন্তু ‘আহা আহা’ বলে নি ।

পার্থক্যটা কোথায় ?

দড়ির উপর নাচ দেখে বলি ‘বাঃ’, যাদুকের যখন চিরতনের টেঙ্কাকে ইস্কাপনের দড়ি বানায় তখন বলি ‘বা রে—’ কাশীনাথ যখন গানের টেকনিক্যাল স্কিল (ম্যাজিক) দেখায় তখন বলি, ‘বাঃ’, কিন্তু যখন কবি গান,
‘তোমার চরণে আমার পরানে,
লাগিল প্রেমের ফাঁসি—’

তখন মনে হয়, যেন আমারই বিরহতপস্যা শ্রান্ত ভালে প্রিয়া তাঁর আপন কণ্ঠের যুথীরমালাে আমার সব ‘দহনদাহ ঘুচিয়ে দিলেন । চরম পরিতৃপ্তিতে হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে বেরিয়ে আসে, ‘আ—আ—হ !’

আশ্চর্য হলে বলি ‘বাঃ’, পরিতৃপ্ত হলে বলি ‘আহ’ । ম্যাজিক ‘বাম্বা-

কাছে ধর্মোপদেশ চায়—যেন যে ম্যাজিক দেখায়, সে বুদ্ধি ধর্মও বোঝে । রাজা রামমোহনের সঙ্গে খৃষ্টানদের ঐ নিয়ে বেধেছিল । তিনি খৃষ্টের অলৌকিক কর্মে (জলকে মদে পরিবর্তন করা ইত্যাদি) বিশ্বাস করতেন না । মুসলমানদের ভিতর দুই দল আছেন । একদল বলেন, হজরৎ মুহম্মদ অলৌকিক কর্ম দেখাতে রাজ্যী হতেন না, বলতেন, ‘আমি যা বলেছি সেইটা সত্য না মিথ্যা যাচাই করে নাও ।’ কোনো এক সাধু নাকি ত্রিশ বৎসর সাধনার পর পায়ে হেঁটে নদী পেরোতে পারতেন । তাই শূনে কবীর বলেছিলেন, ‘এক পয়সা দিয়ে যখন খেয়া পার হওয়া যায়, তখন ঐ মূর্খের ত্রিশ বৎসরের সাধনার ঘাম তো এক পয়সা !’

রস বিচারেও বলা যেতে পারে, একটি কাঠি দিয়েই যখন সব কটা প্রদীপ জ্বালানো যায়, তখন ওর জন্যে সঙ্গীতে ত্রিশ বৎসর সাধনা করার কি প্রয়োজন ?

বাম্বা', আটে 'আহা হা !'

'হা'-কে 'না' করা, 'না'-কে 'হা' করা কঠিন নয়, কিন্তু উভয়কে মধুরতর করাই আর্ট, সেইটে কঠিন, ঐটেই আলংকারিকদের ওয়াটারলু। এবং সব চেয়ে কঠিন, মধুরকে মধুরতর করা। ফুল তো সুন্দর, তাকে সুন্দরতর করা যায় কি করে? স্বয়ং খৃষ্ট বলেছেন, লিলিফুলকে তুলি দিয়ে রঙ মাখায় কে?'

অথচ জাপানী শ্রমণ রিয়োকোয়ান রচলেন—

কি মধুর দেখি রেশমের গাছে
ফুটিয়াছে ফুলগুলি
কোমল পেলব করিল তাদের
ভোরের কুয়াশা তুলি।

কি সে ভোরের কুয়াশা তুলি যা সব-কিছুকে মধুর মেদুর, কোমল পেলব করে দেয়?

দৃষ্টান্ত দেই :—

প্রাচ্য ভূখণ্ড হইতে পবন আসিয়া আমাকে দোদুল্যমান করাতে আমি মদু হইয়া 'আ মরি, আ মরি' বলিতেছি—

কবির তুলির পরশ পেয়ে হয়ে যায়; 'পূব হাওয়াতে দেয় দোলা মরি মরি'—
আমি বললুম, সব বনে ছায়া ক্রমে ক্রমে ঘন হইতে ঘনতর হইতেছে—
কবির তুলি লাগাতে হল, 'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে।'

কিংবা আমি বললুম, শত্ৰুপক্ষের পঞ্চদশী রাতে পথ দিয়া যাইবার সময় যখন চন্দ্রোদয় হইয়াছে, তখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তাহাকে কি শূভলগ্ন বলিব, জানি না।

যেতে যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে
চাঁদ উঠেছিল গগনে।

দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে
কী জানি কী মহা লগনে।'

পাঠক হয় তো বলবেন, 'তুমি বলেছ গদ্যে,—সে যেন পায়ে চলা; আর কবি বলেছেন ছন্দে—সে যেন নাচা।'

উত্তম প্রস্তাব। ছন্দে বলি,

পৃথিমধ্যে তোমার সঙ্গে
পূর্ণিমাতে দেখা
বলবো একে মহা লগন
ছিল ভালে লেখা।

কবিতা হল, কিন্তু রসসৃষ্টি হল না।

আর নিখুঁত, নিটোল ছন্দ মিল হলেই যদি কবিতা হয় তবে নিচের কবিতা-
টির নোবেল প্রাইজ পাওয়ার কথা :—

হর প্রতি প্রিয় ভাষে কন হৈমবতী
বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি ।
কোন গ্রহ রাজা হৈল কেবা মন্দিবর
প্রকাশ করিয়া তাহা কহ দিগম্বর !

অলংকারের দিক দিয়ে কবিতাটি দিগম্বরই বটে ।

এই যে তুলি সব-কিছু মধুময় করে তোলে, কি দিয়ে এ বস্তু তৈরী, কি করে এর ব্যবহার শিখতে হয় ? এ কি সম্পূর্ণ বিধিযুক্ত না পরিশ্রম করে এর খানিকটে আয়ত্ত করা যায় ?

ঘটিতে টোল দেখলে চট করে টের পাই, কিন্তু নিটোল ঘটি বানাই কি করে ?

আর এই তো সেই তুলি সে যখন আপন মনে চলে তখন সে গীতিকাব্য — লিরিক — ‘মেঘদূত’ । যখন ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত, চরিত্রের ক্রমবিকাশের উপর এর ছোঁয়া লাগে সে তখন কাব্য — ‘রঘুবংশ’ । যখন ধর্মকে ছুঁয়ে যায় সে তখন ‘গীতা’, ‘কুরান’, ‘বাইবেল’ ।

আচার্য তেজেশচন্দ্র সেন

রবীন্দ্রনাথ গত হলে বোম্বাইয়ে তাঁর স্মরণে সম্মিলিত এক শোকসভায় শুনতে পাই, ‘আসুন আমরা রবীন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুতে—’

সেই সব-ব্যাপী শোকের মাঝখানে ঐ ‘অকালমৃত্যু’ কথাটি শুনলে কারো কারো অধরপ্রান্তে ম্লান হাসির সামান্যতম রেখাটি ফুটে উঠেছিল । সকলেই বোধ হয় ভেবেছিলেন, আশীতে পরলোকগমন ঠিক অকালমৃত্যু নয় !

আমি কিন্তু সচেতন হলাম—সত্যি তো, যদিও মহিলাটি হয়তো চিন্তা করে অকালমৃত্যু বাক্যটি ব্যবহার করেন নি, কথাটি অতিশয় সত্য । যে-কবি প্রতিদিন নিত্য নবীনের সম্মুখে তরুণের ন্যায় উদ্‌গীর, তাকে নব নব রূপে-রসে পরিবেশন করার সময় যার লেখনীতে নবীন অভিজ্ঞতা ও প্রাচীন প্রকাশ-দক্ষতা সমন্বিত হয়, চৈতন্যহীন হওয়ার কয়েক দণ্ড পূর্বেও ঐ যিনি অধ্যাত্মলোকে এক নবীন জ্যোতির সম্মুখে পেয়ে সে-জ্যোতি কখনো ছন্দ মেনে, কখনো মিল না মেনে তারই উপযোগী ভাষায় প্রকাশ করার সময় কঠিন রোগপীড়ন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন, যিনি আরো দীর্ঘ-সুদীর্ঘকাল অবধি আরো নবীন নবীন অভিজ্ঞতার জন্যে প্রস্তুত—আশী কেন দুই শতেও তাঁর লেখনী শুষ্ক হলে সে মৃত্যু অকালমৃত্যু । পক্ষান্তরে নাহিত্যের ইতিহাসে এমন বহু কবির উল্লেখ পাই, যাদের সৃষ্টিসত্তার মৃত্যু হয়েছে চল্লিশে—দেহত্যাগ যদিও তাঁরা করেছেন নবদ্বীপে ।

আচার্য তেজেশচন্দ্রের দেহত্যাগ একান্তরে হয়েও সেটা অকাল দেহত্যাগ । তিনি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বিধিযুক্ত অশ্রুত অশ্রুত ক্ষমতা নিয়ে জন্মান নি, কিন্তু

এ কথা কেউ অস্বীকার করবেন না, সৃষ্টিকর্তা এই সংসার রঙ্গমঞ্চে যে পাটে তাকে পাঠিয়েছিলেন, সেটি তিনি প্রতিদিন অভিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্‌যাপন করার পর প্রতি রাতে প্রস্তুত হতেন আগামী প্রাতে সেই অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য।

তেজেশচন্দ্রের সহকর্মী মোলানা জিয়াউদ্দিনের স্মরণে উভয়ের গদ্য রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,—

কারো কবিত্ব, কারো বীরত্ব,
কারো অর্থের খ্যাতি—
কেহ-বা প্রজার সুস্থল্ সহায়
কেহ-বা রাজার জ্ঞাতি—

এবং তার পর সামান্য একটু পরিবর্তন করে কবির ভাষাতেই তেজেশচন্দ্রের উদ্দেশ্যে বলি,—

তুমি আপনার শিষ্যজনের
প্রশ্নেতে দিতে সাড়া,
ফুরাতে ফুরাতে রবে তবু তাহা
সকল খ্যাতির বাড়া।

বাস্তবিক এই একটি লোক তেজেশচন্দ্র, যাকে স্বভাব-কবির মত স্বভাব-গদ্য বা জন্ম-গদ্য বলা যেতে পারে। সন্তরেও তাঁর মৃত্যু অকালমৃত্যু।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ষোল-সতের বৎসর বয়সে তিনি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে আসেন। আশ্রম-স্ববিররা কেউই ঠিক বলতে পারেন না, তিনি এখানে গদ্যরূপে না শিষ্যরূপে এসেছিলেন। তবে একথা সত্য, অষ্টদিনের ভিতরই তিনি শিক্ষকতা আরম্ভ করে দেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ষোল বৎসরের বালক জানেই বা কি—কটা পাস দিয়েছে, সেটা না-হয় বাধাই দেওয়া গেল—পড়াবেই বা কি?

এ-প্রথা এদেশে অপ্রচলিত নয়। গদ্যগৃহে বিদ্যাসম্ভার করার সময় কনিষ্ঠকে বিদ্যাদান করার প্রথা এদেশে আবহমানকাল থেকে চলে আসছে। গ্রামের পাঠশালাতে এখনো ‘সর্দার পড়ুয়া’ নিচের শ্রেণীতে পড়ায়।

তারপর তিনি দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করেছেন। এত দীর্ঘ-কাল ব্যাপী অধ্যাপনা নাকি পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

শুনছি, শান্তিনিকেতন বিহঙ্গশাবক যখন একদিন পক্ষবিস্তার করে মহানগরীর আকাশের দিকে তাকালে—অর্থাৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে চাইলে—তখন তেজেশচন্দ্র নাকি কুণ্ঠিত স্বরে রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, ‘আমি তাহলে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে পাসটাসগুলো করি।’ রবীন্দ্রনাথ নাকি হেসে বলেছিলেন, ‘ওসব তোমাকে করতে হবে না!’

কিন্তু এই পঞ্চাশ বৎসরের স্বাধ্যায়লব্ধ বিষয়বস্তু কি?

সঙ্গীতে তার বিধিদত্ত প্রতিভা ছিল। তিনি বেহালা বাজাতে পারতেন। ওদিকে শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ বিলাতি বাদ্যযন্ত্র বর্জন করেছিলেন। একমাত্র

তেজেশচন্দ্রকেই দেখেছি রবীন্দ্রনাথের সামনে যখন দিনেন্দ্রনাথ বর্ষামঙ্গল বসন্তোৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের সমবেত সঙ্গীত পরিচালনা করতেন, তখন তেজেশচন্দ্র বেহালা বাজাতেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরলিপি, গায়নপদ্ধতি গায়কী ঘরানা নিয়ে কিছুদিন ধরে যে ভূতের নৃত্য আরম্ভ হয়েছে, তার ভিতরে তিনিই ছিলেন বিজ্ঞ রবীন্দ্র-সঙ্গীতসুরজ্ঞ। তাঁর নাম কেউ করেন নি—তিনিও তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বেঁচেছিলেন।

সাহিত্যে তাঁর প্রচুর রসবোধ ছিল। ১৯১৯/২০ সালে যখন শান্তিনিকেতনে ফরাসী ভাষা শিক্ষার সূত্রপাত হয় তখন তিনি অগ্রণী হয়ে, ফরাসী শিখে আনাতোল ফ্রাঁসের রচনা বাঙলার অনুবাদ করেন ও তখনকার ‘শান্তিনিকেতন’ মাসিক পত্রিকায় পর পর প্রবন্ধ লেখেন। সুন্দর গ্রীষ্মে বসে সেগলো পড়ে আমি বড়ই উপকৃত হই। এই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম চিন্ময় এবং বাগ্ময় পরিচয়।

শান্তিনিকেতন প্রধানত সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলার পীঠভূমি। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে একাধিকবার ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন যে তিনি অর্থাভাবে এখানে সামান্যতম লেবরেটরি নির্মাণ করে বিজ্ঞান-চর্চার কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন নি। তাঁর সে শোক কথিঞ্চৎ প্রশমিত করেছিলেন, জগদানন্দ রায় ও তেজেশচন্দ্র সেন। বিজ্ঞানাগার ছাড়াও কোনো কোনো বিজ্ঞান অন্তত কিছুটা শেখা যায়। উদ্ভিদবিদ্যা ও বিহঙ্গজ্ঞান। আরও একাধিক সম্পূর্ণ বিজ্ঞান তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, কিন্তু এসব বিষয়ে আমার কণামাত্র স্পর্শ নেই বলে, তেজেশচন্দ্রের প্রতি আবিচার করার ভয়ে নিরস্ত হতে হল।

এই সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করার সময় তেজেশচন্দ্রের সম্মুখে অহরহ থাকতো তাঁর ছাত্রসমাজ। সাধক মাঠই চারুসর্বাঙ্গ অমূল্য জ্ঞানের সম্ভান করেন—তেজেশচন্দ্রও তাই করতেন—কিন্তু তিনি বার বার সেই ছাত্রসমাজকে স্মরণ করে তাদের যা দরকার, তার বাইরে সহজে যেতে চাইতেন না। তিনি তাঁর জীবনসাধনা দিয়ে প্রমাণ করেছেন, মানুষের শক্তি অসীম নয়, ছাত্রসেবাই যদি করতে হয়, তবে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে অন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করবে।

তাঁর বহু শিষ্যই জানতো, তিনি বিজ্ঞানের গভীর থেকে মৃত্যু আহরণ করে তাদের সামনে ধরেছেন—পরবর্তীকালে ভালো ভালো বিজ্ঞানাগার থেকে এম. এস. সি. পাস করার পর অনেকেই সেটা আরো পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছে। এদের কেউ কেউ যখন সাংবাদিক-জগতে প্রবেশ করল, তখন তাদের অনুরোধের তাড়নায় তিনি সেগলি প্রবন্ধাকারে লিখে দেন। ‘আনন্দবাজারে’ ‘দেশে’ তাঁর প্রচুর লেখা বেরিয়েছে। এইতো সোদিন মাত্র কলকাতা থেকে আমার উপর তর্জিঘ এল, তেজেশবাবুর পিছনে লেগে থাকো, যতক্ষণ না তাঁর লেখাটি শেষ হয়।

ছেলেবেলায় আমরা এই শান্তিনিকেতনে দেখেছি ছাতিমফুল, শালফুল আর বকুল। খোয়াইভাঙাতে আনন্দ। তাই এই তিনটি প্রথমোক্ত কবিজনবল্লভ পদ্য-বন্দনা যখন নিতাস্তই শেষ হয়ে গেল, তখন রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

‘যেদিন প্রথম কবি-গান
বসন্তের জাগাল আহবান
ছন্দে উৎসব সভাতলে,
সেদিন মালতী যুগ্মী জাতি
কোঁতুহলে উঠেছিল মাতি
ছুটে এসেছিল দলে দলে ।
আসিল মল্লিকা চম্পা কুরুবক
কাণ্ডন করবী
সুরের বরণমাল্যে সবাস্তে
বরিয়া নিল কবি ।
কী সংকোচে এলে না যে,
সভার দুয়ার হল বন্ধ
সব পিছে রহিল আবদ্ধ ।

মোটামুটি ঐ সময়ে হঠাৎ দেখা গেল, তেজেশচন্দ্র সেন মাথায় সাঁওতালি টোকা, হাতে নিড়েন নিয়ে ১১৪ ডিগ্রী গরমে আশ্রমের সর্বত্র খোঁচাখুঁচি আরম্ভ করেছেন । কি ব্যাপার ? তিনি তাঁর ষোল বৎসরের সঞ্চিত উদ্ভিদবিদ্যা কাজে লাগিয়ে হাতে-নিড়েনে দেখিয়ে দেবেন, এই কাকর-বালি-উই-পাথর, ক্ষণে জলা-ভাব ক্ষণে অতিবৃষ্টির খোয়াইভাঙাতেও মরসুমী ফুল ফোটানো যায় । বাধা হয়ে ‘আকস্মে’ যাবার প্রয়োজন নেই ।

আজকের লোক এ সব সহজে বিশ্বাস করবেন না । এখানে এখন ভারতের সব ফুল তো ফোটেই, তার ওপর ফোটে নানা বিদেশী ফুল, এমন কি অযত্নে আগাছার মত - রবীন্দ্রনাথের বহু বিদেশী শিষ্য-সখা এগুলো নানা দেশ থেকে তেজেশচন্দ্রের কৃতকার্যতার পর এখানে পাঠাতে আরম্ভ করেন । রবীন্দ্রনাথের ‘বনবাণী’তে তার অনেকখানি ইতিহাস আছে । আজ যে ‘উত্তরায়ণে’ এত ফুলের বাহার, সেটা সম্ভব হল তেজেশচন্দ্রের পরীক্ষা সফল হল বলে ।

বোধ হয় এই সফলতা জানিয়েই তিনি রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন । প্রভাত মূখোপাধ্যায় রবীন্দ্র-জীবনীতে লিখেছেন, “ভিরেনা প্রবাসকালে কবিকে শান্তি-নিকেতন হইতে তথাকার পুরাতন শিক্ষক তেজেশচন্দ্র সেন গাছপালা সম্বন্ধে কতকগুলি রচনা পাঠাইয়া দেন । তাহার উত্তরে (২৩ শে অক্টোবর, ১৯২৬) কবি লিখিতেছেন, “তোমার লেখাগুলির মধ্যে শান্তিনিকেতনের গাছপালাগুলি মর্মরধর্শন কর’রে উঠচে ! তাতেই আমার মন পুঙ্কিত করে দিল ।” পরবর্তী কালে তাঁর উদ্দেশ্যে আবার লিখেছেন,

‘একথা কারো মনে রবে কি কালি,
মাটির পরে গেলে স্বপ্ন ঢালি ।’

কার্তিকের বউ কলাগাছ । অকৃতকার্য তেজেশচন্দ্র বরণ করেছিলেন একটি তালগাছকে । আমার মনে হয় শান্তিনিকেতনের প্রতীক সম্পূর্ণগণী না হয়ে তাল-গাছ হওয়া উচিত । এখানকার আদিম ছাতিম গাছটি খুঁজে বের করতে হয় ।

অথচ এখানে পৌঁছবার বহু পূর্বেই দূর থেকে দেখা যায়, আশ্রমের এদিক-ওদিক সারি সারি তালগাছ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে দিগন্তের পানে তাকিয়ে আছে অপ্রত্যাশিত মিত্রের আগমন আশংকায়। তালগাছগুলি যে যুগের, তখন বীরভূমে ডাকাতের অনটন ছিল না। স্বিজেন্দ্রনাথকে বলতে শুনেনি (১৯২৫) তিনি যখন চল্লিশ বৎসর পূর্বে এদেশে প্রথম আসেন, তখনো ঐ তালগাছ-গুলোর ঐ উচ্চতাই ছিল।

শান্তিনিকেতনে বোধ হয় এমন কেউ আসেন নি যিনি, একটি তালগাছকে ঘিরে গোল একখানা কুটির দেখেন নি। মন্দিরে উত্তর-পূর্ব কোণে, ডাকঘরের প্রায়-মুখোমুখি। এটি তেজেশচন্দ্রের নীড়।

রবীন্দ্রনাথের ‘বনবাণী’তে একটি কবিতা আছে ‘কুটিরবাসী’। কবিতাটির ভূমিকা-স্বরূপ তিনি লেখেন,

তরুবিলাসী আমাদের এক তরুণ বংশু এই আশ্রমের কোণে পথের ধারে এক খানি গোলাকার কুটির রচনা (এখানে লক্ষণীয় নির্মাণ নয়—‘রচনা’) করেছেন। সেটি আছে একটি পুরাতন তালগাছের চরণ বেগুন করে। তাই তার নাম হয়েছে তালধবজ। এটি যেন মোচাকের মতো নিভৃতবাসের মধু দিয়ে ভরা। লোভনীয় বলেই মনে করি, সেই সঙ্গে এও মনে হয়, বাসস্থান সম্বন্ধে অধিকার-ভেদ আছে : যেখানে আশ্রয় নেবার ইচ্ছা থাকে সেখানে হয়তো আশ্রয় নেবার যোগ্যতা থাকে না।’

তেজেশ-শিষ্যমণ্ডলীর কাছে ‘কুটিরবাসী’ কবিতাটি সুপরিচিত। এর দুটি পাঠ আছে। পাঠকমাত্রকেই এ-দুটি মমস্পর্শী কবিতাটি পড়তে অনুরোধ করি। আমি মাত্র কয়েকটি ছত্র তুলে দিচ্ছি—

‘তোমারি মত তব
কুটিরখানি,
শিশু ছায়া তার
বলে না বাণী।

তাহার শিয়রেতে তালের গাছে
বিরল পাতা ক’টি আলোয় নাচে,
সম্মুখে খোলা মাঠ
করিছে ধু-ধু
দাঁড়ারে দূরে দূরে
খেজুর শুধু।

কীর্তিভালে ঘেরা আমি তো ভাবি
তোমার ঘরে ছিল আমারো দাবি ;
হারায় ফেলেছি সে
ঘর্গিবায়ে,
অনেক কাজে আর,
অনেক দায়ে।’

যাঁর সরল, নিষ্কাম জীবন দেখে বিশ্বকবি পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে আপন মনে নিজের সম্বন্ধে জমা-খরচ নিতে গিয়ে ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, তাঁর সম্বন্ধে আমাদের আর বেশী কিছু বলার কি থাকতে পারে ?

শুধু এইটুকু বলি—তেজেশচন্দ্র নিজের লোকচক্ষুর অগোচরে থাকতে ভালো-বাসতেন। তাই যাবার সময়ও তিনি সকলের অগোচরে চলে গেলেন। ভোর-বেলা জাগতে গিয়ে দেখা গেল, লোকচক্ষুর অগোচরে তিনি চলে গিয়েছেন।

নাট্যচর্চাশিক্ষা

এদেশে ছেলেদের প্রায় সবাই ম্যাট্রিক পাসের পর কলেজ পানে ধাওয়া করে। তার কারণ কি এদেশের গুণীজ্ঞানীরা ‘উচ্চশিক্ষা চাই’ ‘উচ্চশিক্ষা চাই’ বলে বহুবেশী চেচামেচি করেছেন বলে ! তাঁরা তো আরো বেশী হট্টগোল করে বলেন, ‘সিনেমা ফুটবলে অত বেশী হাস নি’, ‘রকবাজি কমা’, ‘পরীক্ষার হলে আসবাব পত্র ভাঙিস নি’, কই, কেউ তো শোনে না। উচ্চশিক্ষার বেলাতেই হঠাৎ তাদের অত্যধিক মদ্রুবদী-মহবৎ বেড়ে যাবে এ-কথা তো চট করে বিশ্বাস করা যায় না। আসলে তারা কলেজ পানে ধাওয়া করে দুই কারণে,

(ক) ম্যাট্রিক পাস করার পর অন্য কিছু করার নেই বলে, এবং

(খ) চাকরি পেতে হলে বি এ-টা অন্তত থাকা চাইই।

এ অবস্থাটা আমাদের দেশের একচেটে নয়। অন্যান্য দেশেও এটা মধ্যে মধ্যে হয়ে থাকে। একটা উদাহরণ দিই।

আশা করি, একথা কেউ বলবেন না, জার্মানি অশিক্ষিত দেশ। সেখানে আমি যখন ১৯২৯ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকি, তখন দেখি দুই পিরিয়ডের মধ্যে করিডরে করিডরে এত ভিড় যে চলা-ফেরা করা রীতিমত কষ্টের ব্যাপার।

আমি আশ্চর্য হই নি। ভেবেছিলাম, জার্মানি উচ্চশিক্ষিতদের দেশ, ভিড় হবে না কেন ? কিছুদিন পরে কিন্তু আমার ভুল ভাঙলো, যখন শুনলাম, এক অধ্যাপক দৃষ্ট করে বলছেন, ‘এত বেশী ছেলেমেয়ে এসে ভিড় জমিয়েছে যে পড়াই কি করে ?’ আমি তাঁকে জিজ্ঞেসবাদ করে জানতে পারলাম, জার্মানিতে ছেলে-মেয়েরা ১৭।১৮।১৯ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ে বা পাস করে সচরাচর কাজকর্ম চাকরি-বাকরিতে ঢুকে যায় ; মাত্র কিছু সংখ্যক (ক) মেধাবী ছেলে-মেয়ে—উচ্চশিক্ষার প্রতি যাদের একটা প্রাণের টান আছে—তারা, (খ) যে সব অধ্যাপক, জজ, ব্যারিস্টারের পরিবারে অনেক পুরুষ ধরে উচ্চশিক্ষার ঐতিহ্য আছে তাদের ছেলেমেয়ে (কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেধাবী না হয়েও) এবং (গ) উচ্চশিক্ষার পালিশ-লোভী হঠাৎ-নবাবদের দ্বা একটা ছেলেমেয়ে—এই তিন শ্রেণীর ছাত্রই পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতো (মেধাবী ছেলেদের প্রায় সবাই স্কলারশিপ পায় এবং আর গাধাঘের উঁচু মাইনে দিতে হয় নাকের ভিতর

দিয়ে,) এবং অধিকাংশই সেই কারণে উচ্চশিক্ষার জন্য উৎসুক এবং শাস্ত্রাধিকারী। এখন অর্থাৎ ১৯২৯ সালে বেকারের সংখ্যা এত অসম্ভব রকমে বেড়ে গিয়েছে যে ছেলেছোকরারা, এমন কি মেয়েরাও কাজকর্মে চাকরি-বাকরিতে কোনো রকম ওপনিং না পেয়ে বেনো জলের মত বিস্ববিদ্যালয়ে ঢুকছে।

এই তো গেল ১৯২৯-এর কথা। ৩০।৩১।৩২ ক্রমাগত এদের সংখ্যা বেড়েই চললো। ১৯৩৩-এ হিটলার জর্মনির চ্যানসেলর হলেন। আমি য়েণে ফিরে-ছিলুম ৩২-এ।

১৯৩৪ ফের জর্মনি বেড়াতে গিয়ে আমার এক বৃদ্ধ অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করতে যাই বিস্ববিদ্যালয়ে। প্রথমটায় ভেবেছিলুম, ছুটি দিন বৃদ্ধি, না হলে করিডরগুলি অত ফাঁকা কেন? অধ্যাপক বৃদ্ধিয়ে বললেন, বিস্ববিদ্যালয়টাই ফাঁকা; হিটলার বেকার সমস্যা সমাধান করে দেওয়াতে ছেলেরা এখন ম্যাট্রিক পাস না-পাস করেই কাজে ঢুকে যায়, পয়সা কামাচ্ছে বলে বিয়ে করছে, তাই মেয়েরাও কলেজে আসছে না, এমন কি মেধাবী ছেলেদের অনেকেই বলে, ৬।৭ বছর ঘণ্টে ঘণ্টে পাস করে তখন কাজে ঢুকবো তখন দেখবো যারা ৬।৭ বছর আগে ঢুকেছিল তারা কামাচ্ছে বেশী। লাভ? বেনোজল এখন ভাঁটার টানে খাবার জলও টেনে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

আমার আশ্চর্য বোধ হল। আমার বিশ্বাস ছিল ধনী দেশে (যেখানে বেকার নেই) বৃদ্ধি উচ্চশিক্ষার তৃষ্ণা বেশী, গরীব দেশে কম। এখন দেখি উল্টো!

এ বিষয় নিয়ে আমি অনেক চিন্তা করেছি। ফলস্বরূপ আমার যে ধারণা হয়েছে সেটা যে আমি সপ্রমাণ করতে পারবো তা নয়। তবে আপনারা চিন্তা করে দেখতে পারেন।

মানুষ যা চায় পারতপক্ষে সেই দিকেই ধায়। ১৮।১৯।২০ বৎসরে মানুষ আপন হাতে কিছু করতে চায়, গড়তে চায়, ঐ সময়ে তার স্বাধীনতা প্রবৃত্তিটা প্রখরতর হয় বলে কিছু-একটা অর্থকরী করতে চায়, এবং তৃতীয়ত সে তখন সঙ্গিনী খুঁজতে আগ্রহ করে। মোক্ষা কথা, সে তখন আপন বাড়ি বেঁধে, বউ এনে পয়সাকড়ি কামিয়ে ছা-পোষা গেরস্ত হতে চায়।

প্রাচীন ভারতে কি ব্যবস্থা ছিল?—ধরে নিচ্ছি আমরা তখন এতখানি বেকার গরীব ছিলুম না। গুণীজ্ঞানীরা আমাকে বললেন, 'ঐ ১৭।১৮।১৯-এ গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য সমাপন—অর্থাৎ লেখাপড়া শেষ করে—গৃহস্থায়ী হতে ঢুকতো, অর্থাৎ বিয়ে-শাদী করে টাকা পয়সা কামিয়ে সংসার চালাতো। তবে হ্যাঁ, দীর্ঘতর ব্রহ্মচর্যের ব্যবস্থাও ছিল; ২৬।২৮।৩০-এ সংসারধর্মে প্রবেশ করছে, এ-ও হয়।' বৃদ্ধলুম, এই শেষের দল, আমাদের আজকের দিনের বিএ, এম. এ, পি এচ. ডি. কিংবা আরো সুপার পি. এচ. ডি.'র দল।

লেখাপড়া করাটা কি খুব স্বাভাবিক, না সকলের পক্ষে আনন্দের বিষয়? দিনের পর দিন ৩০।৪০।৫০ বছর পর্যন্ত একটা লোক বইয়ের ভিতর মূগ্ধ গর্ভে স্নেহ মজতবা আলী রচনাবলী (৭ম)—১১

বসে আছে, মাঝে মাঝে কাগজে খসখস করছে এইটে স্বাভাবিক, না ফসল ফলানো, খাল কাটা, এমারং তোলা, দোকানপাট চালানো, এসব কর্মে দৌড়-ঝাপ করা, শরীরের অবাধ চলাচল চালু রাখা—এসব স্বাভাবিক? অবশ্য ভাববেন না, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বড়ি সংসারে ঢুকে সব রকম লেখাপড়া একদম বন্ধ করে দেয়। অবসর সময় যার যে রকম রুচি সে রকম করে। বস্তুত ইয়োরোপে প্রায়ই দেখতে পাবেন, ম্যাট্রিক পাস পাত্রী (পরে কিছু ধর্মশিক্ষা করেছে মাত্র) অবসর সময়ই অধ্যয়নের ফলে ভূতঙ্ক, পুরাতত্ত্ব নাম করেছে,— টমাস মানের মত প্রচুর সাহিত্যিক আছেন যারা কখনো কলেজ যান নি। আর লেখালেখি করে নাম করাটাই তো সব চেয়ে বড় কথা নয়। কাজ-কর্মে, লোকসেবার মাধ্যমে, পরিবার পালন করে, অবসর সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনার ভিতর দিয়ে মানুষ জীবনকে যতখানি সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারে, কর্ম-অভিজ্ঞতা-জ্ঞান দিয়ে জীবনকে যতখানি মধুময় এবং ঐশ্বর্যশালী করতে পারে সেইটাই তো বড় কথা। পক্ষান্তরে পণ্ডিত্যে যাদের স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগ তারা উচ্চশিক্ষা লাভ করে ঐ কর্মে লিপ্ত হবে।

অবশ্য মনে রাখতে হবে কন্টিনেন্টে ১৭১৮-এর পূর্বে কেউ ম্যাট্রিক পাস করে না। এবং তাদের ঐ সময়ের ভিতর এমনই নিবিড় (intense) শিক্ষা দেওয়া হয় যে ওরই কলাগে পরবর্তী জীবনে সে অনেক কিছু আপনচেষ্টাতেই শিখতে পারে, রস নিতে পারে।

এদেশে ছেলেমেয়েকে ১৭১৮ অবধি ইস্কুলে রাখুন আর নাই রাখুন, উত্তম পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করুন আর নাই করুন, প্রশ্ন এই তারা বেরিয়ে এসে করবে কি? কৃষি, বাণিজ্য, কলকজরা বানানো, ম্যাট্রিকে তাকে যাই শেখান না কেন, বাইরে এসে তার ওপনিং কোথায়? যত ভালো কৃষি সে শিখুক না কেন, গ্রামে যেটুকু জমি সে যোগাড় করতে পারবে তাতে সে জাপানের ড্রাই-ফার্মিংই করুক আর আইরল্যান্ডের কো-অপারেটিভই করুক, ঐ দিয়ে আঙা-বাচ্চা পুষতে পারবে? আমি সাধারণ প্রতিভাবান ছেলেকে তিন বছরে তিনটে বিদেশী ভাষা শিখিয়ে দিতে পারি, যার জোরে সে ইয়োরোপে ভাল কাজ পাবে। এখানে?

কাজেই বাইরের অনকূল পরিস্থিতি, আবহাওয়া, ওপনিংও সৃষ্টি করতে হবে।

তা সে দেশকে ইনডাস্ট্রিয়ালাইজ বা এগ্রিকালচারাইজ বা অন্যান্য যা-কিছু হোক সে সব 'আইজ' করে, কিংবা অন্য কিছু করে। সেটা কি করে করতে হয় আমি জানি নে।

ততদিন কলেজে কলেজে ভিড়। অনিচ্ছুক লেখাপড়া করবে—আখেরে যার কোনো মূল্যও নেই। দেশের অর্থক্ষয়, শক্তিক্ষয়। সব্ব অপচয়।

কথায় বলে, 'ওরে পাগল, কাপড় পরিস নে কেন?' পাগল বললে, 'পাড় পছন্দ হয় না।' আমাদের হয়েছে উল্টোটা। ভাবছি, 'উচ্চশিক্ষার' যত বস্তু বাস্তব কাপড় ছেলের ঘাড় পিঠে বাঁধবো ততই সে সুবেশ নটবর হবে ॥

বাঙলা দেশ

ইংরেজের সূন্যাম, সে স্বদেশপ্রেমী। বিদেশে প্রত্যেক ইংরেজকেই তাই তার দেশের 'বেসরকারী' রাজদূত বলা হয়। মুসলমান মাত্রই মিশনারী। বিধর্মীকে ইসলামে টেনে আনার মত পুণ্য তার কাছে কমই আছে। এবং সে পুণ্যের বিনিময়ে অর্থগ্রহণ মহাপাপ। ইসলামে তাই মাইনে দিয়ে বা অন্য কোনো প্রকারের অর্থসাহায্য করে মিশনারী সম্প্রদায় গড়া হয় না। প্রত্যেক মুসলিম ব্যবসায়ীই তার ধর্মের মিশনারী। আফ্রিকায় এখনও মুসলমান হাতির দাঁতের কারবারী অনারারি মিশনারী পাল্লা দেয় মাইনে-খোর খুঁটান মিশনারীর সঙ্গে। মাইনে নেওয়ার অসুবিধা এই যে বিধর্মী স্বভাবতই সন্দেহ করে যে মিশনারী তার ধর্মপ্রচার করছে সে শুধু নিজের পেট পোষবার জন্য।

আরব বাণিকরা সমুদ্রপথে চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসে বেকার হিন্দু মাঝিমাল্লাকে আহ্বান জানালে, 'এগো আমাদের নৌকায় করে—দেশ-দেশান্তরে ব্যবসা-বাণিজ্য করবে, মাঝিমাল্লার কাজ করবে, তোমার শ্রীবিশ্ব হবে। তুমি সমাজচ্যুত হবে? আমি তোমাকে আমার সমাজে গ্রহণ করবো। সে সমাজ ক্ষুদ্র নয়। তুমি লাভবান হবে। আর আমার সমাজে নবদীক্ষিতের সম্মান সর্বোচ্চ এবং আমার সমাজে জাতিভেদ নেই।'

মুসলমানদের সুবিধা এই ছিল যে তাদের পূর্বে যারা এসেছিল তারা আপন ধর্মে অন্য লোককে দীক্ষিত করতো না, এবং আরব মুসলিমদের ভিতর যে সাম্যবাদ অত্যন্ত প্রখর সে কথা সবাই জানে।

আমার বিশ্বাস এই করে ইসলাম পূর্ব বাঙলায় প্রচারিত হয় ৭৮১৯ শতাব্দীতে।

হিন্দুসমাজের আরেকটা বিপদ যে মানুস সেখানে অনিচ্ছায় জাতিচ্যুত হতে পারে। কোনো হিন্দু যদি ভালোবাসা বশত ধর্মান্তরিত তার ভাই মুসলমান বা খৃষ্টানকে তার বাড়িতে তার সঙ্গে খেতে বসতে দেয় তবে সমাজসে হিন্দুকে বর্জন করে। মুসলমান যদি তার খৃষ্টান ভাইকে বাড়িতে থাকতে দেয় তবে সমাজচ্যুত হয় না। তাকে পরিষ্কার বলতে হয়, সে ইসলামে বিশ্বাস করে না, তবে সে সমাজচ্যুত হবে। হিন্দু তার ধর্মে বিশ্বাস রেখেও সমাজচ্যুত হতে পারে। রামমোহন, আদী ব্রাহ্মসমাজের কথা স্মরণ করিলেই কথাটা সুস্পষ্ট হয়।

কাজেই কোন মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত নাবিক তার হিন্দু চাষা ভাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় পেলে তারও জাত যেত। সবাই যে আশ্রয় দিয়েছে তা নয়, কিন্তু যারা দিয়েছে তারা শেষ পর্যন্ত ইচ্ছা-অনিচ্ছায় মুসলমানই হয়ে গিয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এতটা ছড়ালো কি করে? তার একটি তুলনা দিতে পারি। প্যালাস্টাইন থেকে প্রথম প্রথম যে সব খৃষ্টানদের রোমে ক্রীতদাসরূপে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাদের কি ভাবে সিংহের মধ্যে ফেলে দেওয়া হত সে ছবি অনেকেই নিশ্চয় সিনেমায় দেখেছেন—কুণ্ড ভাঙিস, পুস্তক কিংবা ছবি এদেশেও অপরিচিত নয়। অথচ এদেরই সংখ্যা একদিন এমনই বেড়ে গেল যে

সে দেশের সীজারকেও শেষটায় খণ্ডন হতে হল। এবং আশ্চর্য, রোমের পোপকে আজকেও রোমান সম্প্রদায়ের লোক হতে হয়। এরও জন্য উদাহরণ আছে। ইসলামের শেষের দিকের খলীফারা তুর্ক। আরব রক্ত এদের গায়ে একেবারেই নেই।

এবং খিলজীর বঙ্গাগমনের পূর্বেই বণিকদের কাছে খবর পেয়ে আস্তে আস্তে ধর্মশাস্ত্রে সুপাণ্ডিত (বণিকরা মিশনারী বটেন, কিন্তু সব সময় শাস্ত্রী হন না) সদাচারী মদসলমান সাধুসন্ত পূর্ববঙ্গে আসতে আরম্ভ করেন। এঁদের নাতি-বিস্তৃত খবর এবং আমাদের মূল বক্তব্য নিয়ে আলোচনা পাঠক পাবেন উষ্টর মহম্মদ এনামুল হকের বই ‘পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম’ পুস্তিকায়। আমাদের এই নিয়ে অনেক মতভেদ আছে সত্য কিন্তু আমাদের মূল সিদ্ধান্ত একই—সমুদ্রপথেই ইসলাম পূর্ব বাঙলায় আসে! মমাগ্রজ সৈয়দ মরতুজা আলী সাহেবের চট্টগ্রাম ও গ্রীহট্ট সম্বন্ধে লিখিত একাধিক প্রবন্ধে পাঠক আরো খবর পাবেন।

এই সাধু-সন্তরা ইসলাম প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন সন্দেহ নেই এবং হিন্দু রাজা তথা জনসাধারণ বিধর্মী সাধু-সন্তদের প্রতিও আকৃষ্ট হন এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু মূল ভ্রম এই যে বণিকরা কতকগুলো কেন্দ্র নির্মাণ না করে থাকলে এঁরা অতখানি করতে পারতেন না। একটি উদাহরণ নিবেদন করি : ভারতবর্ষের সর্বত্র সুপরিচিত পাঁচজন চিশতী সম্প্রদায়ের সন্তদের মধ্যে তিনজনের কর্মভূমি ও সমাধি দিল্লীতে। কুৎবউদ্দীন বখাতিয়ার কাকী (এঁর কবর কুৎবুদ্দিনারের কাছে), নিজামউদ্দীন (এঁকে নিয়েই দিল্লী দুর অসংগত), এবং নাসিরউদ্দীন চিরাগ দিল্লী বহু শিষ্য পেয়েছিলেন কিন্তু এঁরা ধর্ম পরিবর্তন করেন নি, দিল্লীতে এখনো তাঁদের উস-পর্বে হিন্দু এবং শিখ ভক্ত অধিকতর এবং সর্বপ্রধান কথা—দিল্লী কখনো মদসলমান প্রধান হয় নি।

মদসলমান বাদশারা কতখানি সাহায্য করেছিলেন? আমার বিশ্বাস, অতপই। যেখানে শত্ৰুমাগ্ন অস্ত্রবলে বিধর্মী এসে রাজ্য স্থাপন করে—পূর্বে যেখানে বিজয়ীর আপন ধর্মীয় কেউ ছিল না—সে সেখানে যদি প্রজার ধর্মে হস্তক্ষেপ করে তবে তাকে বেশী দিন রাজত্ব করতে হয় না। পূর্ব বাঙলায় পরিদৃষ্ট অন্য রকম ছিল। রাজারা পূর্ব দীক্ষিত মদসলমানদের সদ্ধ-সুবিধা দিয়ে প্রতিবেশী হিন্দুকে আকৃষ্ট করতে পারতেন।

কু দ্বা পালে (রাজপ্রাসাদে হঠাৎ রাজাকে সরানো), কু দেতা (দেশে হঠাৎ সশস্ত্র বা বেআইনী রাষ্ট্র পরিবর্তন) এ ফরাসী কথাগুলো আমাদের কাছে এখন সুপরিচিত। বিশেষ করে সুয়েজ থেকে আরম্ভ করে চীন পর্যন্ত এ ঘটনা এখন নিত্য নিত্য হচ্ছে।

১ খলীফা হারুন অর রাশীদের ৭৮৮ খৃ.মুদ্রিত একটি মদ্রা পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসস্থলপে আবিষ্কৃত হয়েছে। এ আবিষ্কারের মূল্য আমি খুব বেশী দিই না—হক সাহেব যেন।

বখতিয়ার খিলজী অষ্টাদশ অশ্বারোহী নিয়ে করেছিলেন, কু দ্য পালে ।
সেসেটা কিছু অসম্ভব নয় । কিন্তু প্রশ্ন, পরদিনই রাজার সৈন্যরা এসে লড়াই
দিল না কেন ?

তবে কি জনসাধারণ, সৈন্যদল রাজার আচরণে অসন্তুষ্ট ছিল ? কোনো
কোনো ঐতিহাসিক সে ইঙ্গিত দিয়েছেন । এর দৃষ্টান্তও আছে । আরবের
মুদ্বিষ্টময় প্রথম সৈন্যবাহিনী যখন মরুভূমি অতিক্রম করে মহাপরাক্রান্ত ইরান
রাজ্যকে আক্রমণ করলো তখন সেই বিরাট শক্তিশালী রাজবাহিনী অতিশয়
অনিচ্ছায় যুদ্ধে নামল । আরবরা বিজয়ী হল । ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিকরা
বলছেন, ইরানে তার পূর্বেই খবর রটে গিয়েছে, হজরৎ মুহাম্মদ নামীয় এক
আরব মহাপুরুষ হ্যাডনট, নিঃস্বদের জন্য নতুন আশার বাণী নিয়ে এসেছেন ।
এরা সে ধর্মে বিশ্বাসী ।

আমার প্রশ্ন, তবে কি পূর্ব বাঙলার মুসলমান তখন অসন্তুষ্ট জনসাধারণের
মধ্যে হজরতের বাণী হোক আর নাই হোক খিলজীকে পরিগ্রাণ কর্তারূপে,
কিংবা যে কোনো মুসলমান অভিযানকারীকে ঐ রূপে আঁকত করে এমনই
আবহাওয়ার সৃষ্টি করে রেখেছিল যে খিলজী তার কু দ্য পালেকে পরে কু
দেতাতে পরিবর্তিত করতে পেরেছিলেন ? ॥

গেজেটেড অফিসার কবি

এ সংসারে ধীনবন্ধুর বড়ই অভাব । তবে জগবন্ধুর কল্যাণে এ অধর্মের দৃ-
একজন আছেন । তাঁরা মাঝে-মধ্যে দয়া করে আমাকে দু'একখানা অতিশয়
উচ্চাঙ্গের, সাতিশয়, 'হাইব্রাও'—'উল্গাসিক' মাসিক পাঠান । আগের দিন হলে
আমার আর কোনো দৃষ্টি রহিত না । এসব মাসিক থেকে চুরি করে হস্তার পর
হস্তা দিব্য অরিজিনাল লেখা লিখে দেশে নাম করে ফেলতুম, কারণ এদেশে কটা
গোটে আছেন যে আমার লেখা পড়ে বলবেন, 'মহাশয়, আপনার লেখাতে
অনেক অরিজিনাল এবং অনেক সুন্দর কথা আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যেগুলো
অরিজিনাল সেগুলো সুন্দর নয়, আর যেগুলো সুন্দর সেগুলো অরিজিনাল
নয় ।' চুরি করতে এখন অসুবিধাটা কি ? সব চেয়ে বড় অসুবিধা, ত্রিশ বৎসর
আগেও আমি এসব লেখা পড়ে বেশ বৃত্তে পারতুম, এখন আর পারি নে ।
তার কারণ, ইয়োরোপীয় লেখকের অধিকাংশই, ইংরিজীতে যাকে বলে বিউইল-
ডার্ড—হতভম্ব দিক্‌ভ্রান্ত, মাথা গুলেলেট—যা খুঁশি বলতে পারেন । নিজের
কৃষ্টি-কলচর সম্বন্ধে এদের মনে বিশ্বাস, হৃদয়-বিশ্বাস অস্ত নেই ; শ্রীল-অশ্রীল
বিবেচনা করতে গিয়ে লেডি চ্যাটার্লি'র মত সাধারণ বই এঁদের ভালদু-মন্দ-ক-
কুস্তি দেশে হালের চ্যাটার্লি সাইক্লোন তোলে ; এক দেশের বড় পাদ্রী অন্য
দেশের বড় পাদ্রীর সঙ্গে সামান্য লৌকিকতার দেখা করতে গেলে তারা হুঁররা
রব ছেড়ে বলে, এবারে তাবৎ মর্শিকল আসান, ঘড়ি ঘড়ি কলচরল কনফারেনস্,

তড়িঘাড়ি ফের নেশার অবসাদ, পুনরায় খোঁসারি—

আর সর্বক্ষণ আতঁরব ! ঐ এল রে, ঐ খেল রে ! কে ? কম্যুনিষ্ট !

এঁরা এই একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করে ফেলেছেন যে, কম্যুনিষ্ট এলে এঁদের আর কোনো গতি নেই। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিলকুল বরবাদ হবে। সারি বেঁধে সবাই সাইবোরিয়া।

ওদিকে কম্যুনিষ্টরা অভয় দিয়ে বলছে, আমরা এলেই তো তোমাদের পরিচাণ। ধনপতির অত্যাচারে খেতে পারছো না, পরতে পাও না, রাষ্ট্র তোমাদের জন্য কড়ে আঙ্গুলটি তোলে না, বস্তা-পচা ধর্মের আফিও পর্যন্ত এখন যে তোমাদের নেশায় বঁধ করে রাখবে তারও উপায় নেই, ইত্যাদি অনেক মূল্যবান কথা।

পশ্চিম ইয়োরোপের লেখকরা কম্যুনিষ্টদের এই অভয়বাণী, যে তাঁরা এলে পর ক্যাপিটালিস্ট দেশের লেখকরা অন্ততপক্ষে খেয়ে পরে বাঁচবে, কতখানি মনে মনে বিশ্বাস করেন সে-কথা বলা-কঠিন, কিন্তু তাঁরা কম্যুনিষ্টদের এই অভয়বাণীর পরিপূর্ণ স্বেচছা নিচ্ছেন।

সেইটে ইদানীং একটি পত্রিকাতে সরল ভাষায় আলোচিত হয়েছে। ঐটেই নিবেদন করি। বাকি—ঐ যে বললুম—বিউইলডার্ড জিনিস, সে তো আর চুরি করা যায় না, খালি-পকেট মারা যায় না, কিংবা বলতে পারেন, হাওয়ার কোমরে রশি বাঁধা যায় না।

সুইডেন থেকে জনৈক সুইস সংবাদদাতা তাঁর দেশের খবরের কাগজে সংবাদ পাঠিয়েছেন যে, দেশের লেখকরা তাঁদের মূল্য বৃদ্ধির জন্য সরকারকে উদ্ব্যস্ত করে তুলেছেন (এস্থলে আমার মন্তব্য, ভাবটা এই, কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে লেখক কত সুখে আছে, এদিকে তোমার তথাকথিত জনকল্যাণ রাষ্ট্রে আমাদের জন্য কিছুই করছে না, অনেকটা 'পাশের বাড়ির চাটুজো তার গিন্নীকে কি রকম গয়না দিয়েছে দ্যাখো গে' গোছ)। পরললেখক সুইডেনের লেখক সম্প্রদায় সরকার থেকে যে সব অর্থসাহায্য পান তার যে সর্বসত্ত্ব নিষ্পত্তি দিয়েছেন তার থেকে মাত্র একটি আমি তুলে দিচ্ছি—এ দেশে চালালে মন্দ হয় না—সাধারণ পাঠাগার থেকে যে পাঠক ধার নিয়ে বই পড়ে তার প্রত্যেক বারের জন্য সরকার—পাঠক নয়—লেখককে কিস্তি দক্ষিণা দেন। সেটা সামান্যই, কিন্তু জনপ্রিয় লেখকের কাছে সেটা কিছু সামান্য নয়।

হালে তাই ডেনমার্ক, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড এবং সুইডেনের লেখক সম্প্রদায়ের মর্দুস্বারা সমবেত হয়ে রেডিও টেলিভিশনে তাঁদের ফরিয়াদ ক্রন্দন শুনিয়েছেন ও দেখিয়েছেন। হোলসিৎক শহরের তালকিসং বললেন, 'সরকার লেখকদের বই কিনে পাঠাগারে পাঠাগারে ফ্রী বিতরণ করে লেখককে বদলে দেন করদ্বার। মন্টিভিস্কা (উপরে যেটা উল্লেখ করেছি)। অপিচ, পশ্য পশ্য, ঐ লেখক নামক জীবটি না থাকলে তামাম বইয়ের ব্যবসা লাটে উঠতো। প্রকাশক, মদ্রাকর, দপ্তরী, পুস্তক বিক্রেতা, এমন কি পুস্তক সমালোচকের পর্যন্ত পাকা-পোক্ত আমদানি আছে, নেই কেবল লেখকের, তাকে সর্বক্ষণ কাঁপতে হয় অনিশ্চয়তার

ভয়ে ভয়ে। সুইডিশ লেখক-সম্প্রদায়ের প্রধান মদ্রুশ্বী বললেন, ‘পূর্বে’ লেখক ছিল গরীবদের মধ্যে একজন গরীব; আজ সে-ই একমাত্র গরীব।’ যখন অকরণ ইঙ্গিত করা হল, আজকের দিনে লেখকদেরও বহু বেশী ছড়াছড়ি, তখন তিনি বললেন, ‘হিমালয়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য’ শব্দ পাহাড়ের চুড়ো দিয়ে নির্মিত হয় না।’

শেষ পর্যন্ত এঁরা দাবী জানিয়েছেন, সরকারকে ওরকম ভিক্ষে দিলে চলবে না (বর্তমান লেখকের মন্তব্যঃ ব্যক্তিগতভাবে আমার কণা পরিমাণ ভিক্ষা নিতে কণামাত্র আপত্তি নেই); দিতে হবে পাকা-পোক্ত মাইনে। তবেই সে নিশ্চিন্ত মনে, পূর্ণ স্বাধীনতায় আপন সৃষ্টিকার্য করে যেতে পারবে, এবং তার জন্য সে সরকারের কাছে বাধাবাধক হবে না (রাশার প্রতি ইঙ্গিত নাকি?)। এঁদের মতে সরকার এবং ফ্রী পাঠাগার থেকে লেখকরা বর্তমানে যা পান সেটাকে দশগুণ বাড়িয়ে দিলেও তাঁরা সে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য পাবেন না, যার কৃপায়, অন্য চাকরি না করে তারা দারাপুত্র পোষণ করে আপন কার্যে মন দিতে পারবেন।

তারপর ইংরেজ, যুগোস্লাভ সুইডিশ ও জার্মান লেখকরা আপন আপন দেশ থেকেই টেলিফোন যোগে আপন আপন মন্তব্য সুইডেনে পাঠালেন ও সেখানকার বেতার কেন্দ্র থেকে বেগদুলো বিশ্ব-সংসারের জন্য বেতারিত হল।

জার্মানির হাইনরিশ বোল বললেন, ‘ঈশ্বর রক্ষতু (ফর হেভেনস্ সেক, উম্ হিল্ফমল্স্ বিলেন্) !’ সর্বনাশ হবে—লেখক যদি সরকারের মাইনে-খোর হয়। সে সৃষ্টির কাজ করে যাবে নিছক সৃষ্টিরই জন্যে। এই আমাদের জার্মানিতে পঁয়ত্রিশ হাজার লেখক আছেন (সর্বনাশ! এঁই সোনার বাঙলায় পঁয়ত্রিশ হাজার ক্রেতা নেই)। কে এমন মাপকাঠি বের করবে যা দিয়ে স্থির করা হবে, কোন্ লেখক কত পাবেন? কৃতকার্য লেখকই যে মূল্যবান লেখক এ কথা বলে কে (সাক্সেস এবং কোয়ালিটি সমার্থসূচক নয়)।’

লন্ডন থেকে রবার্ট গ্রেভসেরও বিচলিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ‘আমার আর্টটি সন্তান। সত্য বলতে কি, এদের পালা-পোষা আমার পক্ষে সব সময় সহজ হয় নি। তাই বলে যে-কাজ আমি এখনো আদর্শেই করি নি তার জন্য আগেভাগেই পরিসা নিয়ে বসবো? ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে, “হি হু পেজ দি পাইপার কমান্ড দি টুন—যে কাড়ি ফেলে সে-ই হুকুমদেয় কোন্ সুদর গাইতে হবে।” আমি আমার ইচ্ছেমত যে সুদর খুঁশী গাইব।’

আর বেলগ্রেভ থেকে উজ্জিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল ডুসান ম্যাটিকের,—‘না, দয়া করে চাকুরে কবি তৈরী করতে যাবেন না। আমরা কারো চাকরি করি নে। কবিতা রচনা করা আর ফর্ম ফিল্ আপ করা এক কাজ নয়। মানুষকে লেখক হবার জন্য জোর করা যায় না, কবিতা রচনা করার সময় কোনো কবি কর্তব্য বোধ থেকে তা করে না, বরং সে রচে যখন ভিতরকার তাড়না সে আর থামিয়ে রাখতে পারে না। কি করে মানুষ যে কবিকে সরকারী চাকুরে বানাবে তা তো আমার বুদ্ধির অগম্য……।’

এসব নিদারুণ মন্তব্য শোনার পরও কিন্তু সুইডেনের ঔপন্যাসিক ফল্কে ইসাকসন তাঁর সুইডিস নৌকার হাল ছাড়লেন না, অর্থাৎ সরকারী সাহায্যের প্রস্তাবটা। বললেন, ‘কত ভালো লেখক দৈনন্দিন জীবনধারণ সমস্যায় এমনই ভারগ্রস্ত যে, লেখার কাজ করে উঠতে পারেন না। সরকারের কিছু একটা করা উচিত...।’ তার মানে এই নয়, সুইডেনের সব লেখকই এই মত পোষণ করেন। জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক আকে ভার্সিং বলেছেন, ‘প্রচুর, প্রচুর আমি শিখেছি মানব-চরিত্রের, গড়ে তুলেছি আমার জীবনদর্শন, আমার জীবনের পেশা থেকে।’ এঁর পেশা দারোগানী। অর্থাৎ বাড়ির দরওয়ান। পত্রলেখক জালংনার চিঠি শেষ করেছেন এই মন্তব্য করে, ‘বাড়ির দরওয়ানই যদি এত ভালো লেখে তবে চিন্তা করো তো হোটেলের পোর্টার (দরওয়ানই তো) আরো কত শতগুণে ভালো লিখবে!’ অর্থাৎ কাকতালীয়!

* * *

লেখাটি পড়ে শোনাতে আমার একজন প্রিয় লেখক-বন্ধু আশ্চর্য হয়ে শূধোলেন, ‘বলেন কি মশাই! ওসব দেশে পাঠক যখন প্রতিবার লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে যায় তার জন্য লেখককে পয়সা দেয়। আর এদেশের লাইব্রেরি আমার কাছ থেকে স্বাধীন বই চায়! বইটার দাম পর্যন্ত দিতে চায় না।’

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললুম, ‘গরীব দেশ!’ তারপর বললুম, ‘কিন্তু ভেবে দেখুন, না চাইলে কি আরো ভালো হত? একদম পড়তেই চায় না, সেটা কি আরো ভালো হত? প্রিয়ার বিরহ বেদনা পীড়াদায়ক; কিন্তু যার একদম কোনো প্রিয়াই নেই?’

বন্ধু অশ্চর্য হয়ে শূধোলেন, ‘তোমার কাছে চাইলে তুমি কি করতে?’

আমার চিন্তে সহসা কবিত্বের উদয় হল। বাইরের দিকে তাকিয়ে উদাস নয়নে প্রকৃতির সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে লাগলুম।

বাহুভাই গুরু

বরোদা-আহমদাবাদ-বোম্বাই করছি, আর বার বার মনে পড়ছে, স্বর্গত বাহুভাই শূক্রেণ কথ্য। ইনি রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন।

১৯২১ বিশ্বভারতীর কলেজ-(উস্তর)-বিভাগ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সেই সুন্দর সৌরাষ্ট্র থেকে এসে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের পদপ্রান্তে আসন নেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে যে দুজন বিশ্বভারতীর শেষ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে উপাধি লাভ করেন, ইনি তাঁদেরই একজন। বিশ্বভারতীর সর্বপ্রথম সমাবর্তন উৎসব হয় ১৯২৭। বাহুভাই রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে তাঁর উপাধি-পত্র গ্রহণ করেন। শূনেছি, স্বয়ং নন্দলাল সে উপাধি-পত্রের পরিকল্পনা ও চিত্রণকর্ম করেছিলেন। পরবর্তী যুগে তিনি গুজরাভী ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদকরূপে খ্যাতি লাভ করেন।

দাঁড়িগোঁফ গজাবার চিকুমাত্র নেই—সেই সদৃশ কাঠিয়াওয়াড় থেকে এসে ছোকরাটি সীট পেল সভ্য-কুটিরে। কয়েক দিন যেতে না যেতে তার হল টাই-ফয়েড। বাসুদেব বিশ্বনাথ গোথলে ও আমি তাকে আমাদের কামরায় নিয়ে এলাম। সেই তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯২১ সালে। তারপর ১৯২৭ সালে তাঁর অকালমৃত্যুর দিন পর্যন্ত আমাদের যোগসূত্র কখনো ছিন্ন হয় নি।

তাঁর গুরু ছিলেন মার্ক কলিন্স্। তাঁর কাছে বাচুভাই উপাধি লাভ করার পরও দীর্ঘ সাত বৎসর তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। আমিও কলিন্সের শিষ্য। তাই তাঁর কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই। ইনি জাতে আইরিশ, শিক্ষালাভ করেন অক্সফোর্ড জর্মনির লাইপ্‌ৎসিগে। এই বছর দুই পূর্বে লাইপ্‌ৎসিগ বিশ্ববিদ্যালয় তার কোনো পরব উপলক্ষে মালমশলা যোগাড় করতে গিয়ে বিশ্বভারতীকে প্রদ্বন্দ্ব করে পাঠায়, কলিন্স্ এখানে কি কি কাজ করে গেছেন? অর্থাৎ ছাত্র হিসেবেই তিনি সেখানে এত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন যে পরবর্তী যুগের অধ্যাপকেরা তাঁর কীর্তি-কলাপের স্থানে এদেশেও তাঁর খবর নিতে উদগ্রীব হয়েছিলেন। কেউ দশটা ভাষা জানে, কেউ বিশটা জানে একথা শুনলে আমি বণামাত্র বিচলিত হই নে। কারণ মাসেই, পোর্ট সেন্ট, সিঙ্গাপুরের দ্বালাল দোভাষীরাও দশভাষী, বিশভাষী। কিন্তু কলিন্স্ ছিলেন সভ্যকার ভাষার জহুরী। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, তিনি আমাকে তুর্কী ভাষার বাবুরের আত্মজীবনী অনুবাদ করে করে শুনিয়েছেন, শেলির প্রিমিথিয়ুস্ আন-বাউন্ড পড়বার সময় ইংলিসের গ্রীক প্রিমিথিয়ুস্ থেকে মুখস্থ বলে গছেন, আমি তাঁকে একখানা আরবী স্থাপত্যের বই দেখাতে তিনি তার ছবি কুক্ষী-আরবীতে লেখা ইনস্ক্রিপশন অনুবাদ করে করে শুনিয়েছিলেন। তার সঙ্গে মাত্র এইটুকু যোগ করি আমার জীবনের সেই তিন বৎসরে আমি কখনো গুরু কলিন্স্কে কোনো প্রাচীন-অর্বাচীন চেনা-অচেনা ভাষার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে শুনিনি, ‘আমি তো এ ভাষা জানি নে’—অবশ্য সে-সব ভাষারই কথা হচ্ছে যার যে কোনো একটা অন্তত একজন লোকও পড়তে পারে।

বাচুভাই ছিলেই তাঁরই পুত্রপ্ৰতিম প্রিয় শিষ্য। কিন্তু বাচুভাই জানতেন, এ দেশে বিস্তর ভাষা শেখার মত মাল-মশলা নেই, তাই তিনি বিস্তারে না গিয়ে গিয়েছিলেন গভীরে। বস্তুত তিনি শাস্তিনিকেতনে শিখেছিলেন মাত্র একটি জিনিস—ভাষাতত্ত্ব। নিজের চেষ্টায় শিখেছিলেন সংস্কৃত। আমরা যেরকম খাবলে খাবলে—অর্থাৎ শিকপ করে করে—রাবিশ বাঙলা উপন্যাস পড়ি (সব বাঙলা উপন্যাস রাবিশ বলছি নে), বাচুভাই ঠিক তেমনি সংস্কৃত পড়তে পারতেন।

বোম্বাইয়ে ফিরে গিয়ে তিনি সর্বপ্রথম লেখেন একখানি অতি উপাদেয় গুজরাতী ব্যাকরণ। ভারতীয় অর্বাচীন ভাষাদের মধ্যে এই ব্যাকরণই যে সর্বোত্তম সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা সচরাচর বাঙলা ব্যাকরণের নাম দিয়ে লিখে থাকি সংস্কৃত ব্যাকরণ। ভারতের অন্যান্য অর্বাচীন ভাষাগুলিতেও তাই। গুজরাতী একমাত্র ব্যত্যয়—বাচুভাইয়ের কল্যাণে।

বরোদায় গাইকোন্নাড় সীরিজে এটি প্রকাশিত হয়।

এই সময়ে তিনি অন্য লোকের সহযোগিতায় বোম্বাইয়ে একটি ইন্সকুল খোলেন। সাধারণ ইন্সকুল, কিন্তু অনেকখানি শাস্তিনিকেতন ইন্সকুল প্যাটার্নের। অন্যান্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে শেখানো হত রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রবীন্দ্র নৃত্য-নাট্য। বাধ্য হয়ে তাঁকে তখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের গুজরাতী অনুবাদ করতে হয়, এবং শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তথা বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে গুজরাতী রসিক সম্প্রদায়ের পরিচয় করিয়ে দেওয়াই তাঁর জীবনের চরম রত হয়ে দাঁড়ায়। বোম্বাইয়ে শাস্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ তিনিই প্রতিষ্ঠিত করেন। সেখানকার টেগোর সোসাইটির তিনিই অন্যতম উদ্যোক্তা।

বিয়ার্লিংগের আন্দোলন আরম্ভ করার প্রাক্কালে মহাত্মাজী গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের শেষ অনুরোধ, এন্ড্রুজ মেমোরিয়াল ফাণ্ডের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে বোম্বাইয়ে আসেন। এসেই খবর দেন বাচুভাইকে, তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনবেন। বাচুভাই তাঁর ইন্সকুলের গুজরাতী ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাঁকে শুনিয়ে এলেন—বিশ্বাস করবেন না—বাঙলা ভাষাতেই রবীন্দ্রসঙ্গীত। ‘জীবন যখন শূন্য হয়ে যায়,’ যদি তোর ভাক শূনে কেউ না আসে এবং আরো অনেক গান। রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাচুভাইয়ের অসাধারণ পার্শ্বভূমি ছিল—তিনি জানতেন, মহাত্মাজী যখন শাস্তিনিকেতন ইন্সকুলে অধ্যাপক ছিলেন, ঠিক সেই সময় রবীন্দ্রনাথ কোন্ কোন্ গান রচাছিলেন এবং স্বভাবতই সেগুলোই মহাত্মাজীর বিশেষ করে জানানুর কথা। গান্ধীজীর ফরমায়েশমত বাচুভাই সেদিন তাঁকে সব গানই শোনাতে পেয়েছিলেন। সেদিন আজো, ক’জন বাঙালী পারে?

রবীন্দ্রনাথের তাবৎ নৃত্য-নাট্য তিনি অনুবাদ করেছেন। ‘গোরা’, ‘নৌকাডুবি’র মত বৃহৎ বৃহৎ উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ সর্বাঙ্গসুন্দর অনুবাদ করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের আরো কত রচনা, কত গান, কত কবিতা, কত ছোট গল্প যে অতিশয় সাধুতার সঙ্গে অনুবাদ করেছেন তার সম্পূর্ণ ফিরাঁস্ত দেওয়া আমার ক্ষমতার বাইরে—যদিও ঐ সময়ে আমি গুজরাতেরই ছিলাম এবং সাহিত্যজগতে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে সানন্দে সোৎসাহে লক্ষ্য করেছি। এই সাধুতা আকাশক ঘটনা নয়। বাচুভাই তাঁর ‘অরিজিনাল’ আইডিয়া রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের ভিতর দিয়ে পাচার করতে চান নি—সাধারণ অনুবাদকরা যা আকছারই করে থাকেন। কারণ তাঁর নিজের মৌলিক উপন্যাস এবং নাট্য গুজরাতী সাহিত্যে বছরের সেরা বইরূপে সম্মানিত হয়েছে।

নাট্যে এবং নৃত্য-নাট্যে, ফিল্ম এবং রঙ্গমঞ্চে বাচুভাইয়ের কৃতিত্বখ্যাতি গুজরাতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। ফলে আকাশবাণী তাঁকে দিল্লিতে বড় চাকরি দিয়ে নিয়ে যান—তাঁর কাজ ছিল সর্বভারতের তাবৎ রেডিওস্ট্রামার মূল্য বিচার করে সেই অনুযায়ী আকাশবাণীকে নির্দেশ দেওয়া। কিন্তু ঐ সময়ও তিনি সমস্ত অবকাশ ব্যয় করেছেন রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প গুজরাতীতে অনুবাদ করতে—সাহিত্য আকার্দের অনুবাদে। এ কাজটি তিনি সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন।

পঞ্চাশ পেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই গুজরাতী সাহিত্যের এই প্রতিভাবান লেখক সে সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি করে ইহলোক ত্যাগ করেন।

আমাদের শোক, বাঙলা সাহিত্যের গুজরাতী এবেসেডার প্লেনিপটেনশিয়ারি অকালে তাঁর কাজ পূর্ণ করে, কিন্তু আমাদের কাজ অসম্পূর্ণ রেখে চলে গেলেন। আমার ব্যক্তিগত শোকের কথা বলবো না। তাঁর একমাত্র বিশোর পুত্রকে কাছে এনে আমাবেই দৃঃসংবাদ দিতে হয়েছিল, তার পিতা ইহলোক ত্যাগ করেছেন ॥

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী

টমাস মান্ সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন ; পক্ষান্তরে হিটলার বিশ্বাস করতেন হটেনটট এবং ফরাসী-জার্মান ইংরেজ বরাবর নয় ; অতএব পৃথিবীটাকে যদি ভালো করেই চালাতে হয়, তবে সে-কাজটা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতের উপরই ছেড়ে দেওয়া সমীচীন। হিটলার মান্কে ডেকে পাঠালেন তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে। মান্ নারাজ হলেন। হিটলার চটে গিয়ে বন্ বিশ্ববিদ্যালয়কে হুকুম দিলেন, মান্কে যে অনারারি ডক্টরেট দেওয়া হয়েছিল সেটা যেন প্রত্যাহার করা হয়। উত্তরে মান্ এই সর্বপ্রথম নার্গিস ‘জীবনদর্শন’ সম্পর্কে আপন মত প্রকাশ করলেন। অতুলনীয় সে পত্র বিশ্বসাহিত্যে—রাজনীতিতে তার মূল্য কি আছে ঐ বাবদে গুণীরা তা বলতে পারবেন। আমি বলতে পারি, সে-পত্র আমার মনে মিলটনের এরিয়োপেজিটিকার চেয়েও গভীরতর রেখা কেটে গেছে।

ডক্টরেট হারানোতে মান্ আদৌ মনঃক্ষুণ্ণ হন নি। স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে বলছি, মান্ তাঁর খোলা চিঠি আরম্ভ করেছিলেন এইভাবে—‘আজ আমি ডাক খোলার সঙ্গে সঙ্গে বন্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাচার পেলাম, আমাকে একদা যে অনারারি ডক্টরেট দেওয়া হয়েছিল, সেটা প্রত্যাহার করা হয়েছে। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি কখনো বিদ্যাভ্যাস করি নি বলে সঠিক জানি নে এ সংবাদটি কি ভাবে সর্বসাধারণকে অবগত করানো হয়। অনুমান করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে সেটা সে’টে দেওয়া হয়। আমার অনুমান যদি সত্য হয়, তবে অনুরোধ করি, ঐ নোটিশের পাশে আরেকটি নোটিশও যেন সে’টে দেওয়া হয়—বনের চিঠির সঙ্গে সঙ্গে একই ডাকে হার্ভার্ড (কিংবা অন্য কোনো মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়, আমার ঠিক মনে নেই—সে-মু-আ) আমাকে জানিয়েছেন যে, তাঁরা আমাকে অনারারি ডক্টরেট দিয়েছেন। এই সুবাদে এটাও বলে রাখি, বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট আমি কখনো আমার নামের সঙ্গে জুড়ি নি কিংবা অন্য কোনো প্রকারে কাজে লাগাই নি ; হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেটও কাজে লাগালুম এই প্রথম এবং এই শেষবারের মত। কিন্তু কেন—?’

এই বলে মান্ জার্মানির সংস্কৃতি ঐতিহ্য তথা আদৌ ইরোরোপীয় সভ্যতা

বৈদ্য বলতে কি বোঝায়, নাৎসি 'জীবনদর্শন' কিংবা বলি 'অদূরদর্শন' কি সেই সম্বন্ধে শাস্ত্র, বজ্রদণ্ড কণ্ঠে প্রকাশ করেছেন আপন অতিশয় সূচিস্থিত যুক্তি-তর্ক-অভিজ্ঞতা-প্রসূত অভিমত। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, গভীর দরদ দিয়ে। সেই যে জাপানী যক্ষ্মারোগী চিত্রকর, যে তার বৃদ্ধ কেটে তার থেকে তুলি দিয়ে রক্ত তুলে তুলে নিয়ে ছবি এঁকেছিল, ঠিক সেই রকম।

তারপর মান্ নীরব হলেন। কারণ তিনি রাজনৈতিক নন।

তারপর প্রায় সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাণ্ডবনৃত্য নেচে নিয়ে চলে গেল। কে তখন স্মরণ করে মানের ক্ষীণ কার্কিল? তারপর তথাকথিত শান্তি। মনের বাসনা গেল আপন মাতৃভূমি পুনর্দর্শন করার। পশ্চিম জर्मানে তিনি এলেন। শেকস্পীরর আজ ইংলণ্ডে ফিরে এলে এর সিকি সম্মানে তুষ্ট হতেন।

মান্ কম্যুনিজম পছন্দ করতেন না, তবে কতখানি অপছন্দ করতেন সেটা আমার পক্ষে বলা অসম্ভব, কারণ তাঁর তাবৎ লেখা এ-দেশে পাবার যো নেই। তাই এক জর্মানে তাঁকে ভীষণ কণ্ঠে শ্রুধোলেন, 'আপনি কি পূর্ব জর্মানেও (কম্যুনিষ্ট জর্মানে) যাবেন?'

মান্ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'জর্মানে ভাষা যেখানে পূজা পায় সে ভূমিই আমার মাতৃভূমি।'

এত দীর্ঘ অবতরণিকা দেবার কারণ, অনেকেই মনে করেন মান্ এসকপিষ্ট ছিলেন—এই সুবাদে ঘটনাটির উল্লেখ করার সুযোগ হ'ল।

শিলঙ, কটক, পাটনা—এই তিন জায়গায় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের তিনটি বড় কেন্দ্র আছে। এ-তিনটির সঙ্গে আমি সুপরিচিত। ভাগলপুর, এলাহাবাদ, জম্মলপুর এবং আরো নানা জায়গায়ও আছে কিন্তু তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় ক্ষীণ।^১

এদের নানারকম সমস্যা আছে। তার চরম নিদর্শন তো হালে আসামের সর্বত্র হয়ে গেল।

১ নেতিবাচক বাক্য বলা বড় কঠিন; অস্তিত্বাচক বাক্য বলা সহজ। দৃষ্টান্ত : আমাকে যদি কেউ শ্রুধায়, 'ঘোড়া' শব্দ বাঙলাতে আছে কিনা; আমি অতি অবশ্য বলব 'নিশ্চয়ই', কারণ এ শব্দ আমি বাঙলা পুস্তকে শতাধিকবার পেয়েছি, কিন্তু কেউ যদি শ্রুধায়, 'কটক' শব্দ বাঙলা শব্দ কি না, তবে আমি কি উত্তর দিই? এমাবৎ চোখে পড়ে নি, তাই বলে কি বলবো, বাঙলা শব্দ নয়—কারণ আমি তো তাবৎ বাঙলা বই, পুঁথি, পান্ডুলিপি পড়ি নি যে, হালফ করে বলবো, এটা বাঙলা শব্দ নয়।

২ ভাগলপুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; আমার অগ্রজপ্রতিম জনৈক বন্ধু 'ভাগলপুরের বাঙলা ও বাঙালী' এই বিষয়ে একখানি প্রামাণিক পুস্তিকা লিখেছেন। সেটির দিকে এই বেলায়ই আমার পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে রাখছি।

প্রধান সমস্যা এই : মনে করুন আমি পটনার ডাক্তারি করি। আমার ঠাকুরদা সেখানে গিয়ে প্রথম বসবাস করেন। আদি নিবাস বিক্রমপুরের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র এখন সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আগে রাষ্ট্রভাষা ইংরিজী ছিল বলে আমি শিখেছিলুম বাঙলা এবং ইংরিজী। হিন্দীর বিশেষ প্রয়োজন হত না বলে ওটা আমি মেহনৎ করে শিখি নি। খাই-আম্রাদের কাছ থেকে রাস্তাঘাটে ওটা আমি ‘পক্ অপ’ করে নিয়েছিলুম।

এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। হিন্দী রাষ্ট্রভাষা। আমার ছেলে যদি বিহারীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে চায় তবে তাকে অত্যন্ত হিন্দী শিখতে হবে। সে যখন কথা বলবে তখন যেন কেউ ঘৃণাক্ষরেও না বুঝতে পারে যে হিন্দী তার মাতৃভাষা নয় ; আর উচ্চারণ তার কখন-শৈলী নিয়ে যেন কোনো হিন্দী-ভাষা টিটকারি না দিতে পারে।

এতখানি হিন্দী তাকে শেখানো যদি আমার আদর্শ হয় তবে তাকে অতি ছেলেবেলা থেকেই পাঠাতে হবে হিন্দী পাঠশালায়। শূধু তাই নয়, যেহেতু বাড়িতে সে বাঙলা বলে, সে হ্যাণ্ডিক্যাপ কার্টিয়ে ওঠবার জন্য তার জন্য আমার ফালতো ব্যবস্থাও করতে হবে। এসব তাবৎ ব্যবস্থা যদি করি তবে সে উত্তম হিন্দী শিখবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে যদি হরিনাথ দের মতন ভাষাবাদে সবাশাচী না হয়—এবং সে সম্ভাবনাই বেশী—তবে তার বাঙলা থেকে যাবে কাঁচা।

অথচ দেখুন, ভদ্রসন্তানই তার পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করে। ভদ্রসন্তানই পুত্রকে শিক্ষা দেয়, পিতাকে মাতাকে পিতৃপুত্র্যকে শ্রদ্ধা জানাতে। তার সরল অর্থ, পরিবারগত জাতিগত ঐতিহ্যকে সম্মান জানাতে। এর সব-কিছই করতে হয় মাতৃভাষার মারফতে। ছেলেবেলা থেকে হিন্দী শেখার ফলে মাতৃভাষা হবেন অবহেলিত। এবং তারই শেষ ফল :—পাটনার সর্বত্র সে সম্মান পাবে তার হিন্দীর জোরে, কিন্তু আপন বাড়িতে সে পরদেশী, আপন ঐতিহ্য তার ধমনীতে প্রবেশ করতে পারলো না,—সে ববর। এবং তার জন্য দায়ী আমি।

বোম্বাইয়ের বাঙালী ইন্সকুলের ছেলেমেয়েরা ম্যাট্রিক পাস করে বাঙলা মাতৃভাষা নিয়ে। এরা বড় সুন্দর বাঙলা লেখে। এ কথা আমি জানি ; তার কারণ স্বর্গত শ্যামাপ্রসাদবাবুর কল্যাণে (ভুল হলে কেউ শূধরে দেবেন) যখন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলাকে অন্যতম পরীক্ষার ভাষারূপে স্বীকার করে নিলেন তখন আমি হলাম তাদের এগজামিনার। তেরো বৎসর পরে আবার সে ইন্সকুল দেখতে গিয়েছিলুম। বড় আনন্দ হল। সে যুগের দৃঢ়চারিটি শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর পরিচিতি স্মিতহাস্য বয়ানও দেখতে পেলুম।

এঁরা বোম্বাইয়ে বাঙলা ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমার অনুরোধ, ইন্সকুলের ছেলেমেয়েরা যেন মারাঠী ভাষা অবহেলা না করে ॥

রবীন্দ্র রসের ফিফ্টিফোর্থ

অনেকেই হয়তো মনে করতে পারেন মর্দনকষিঘের মত পরিবর্তন হয় না ; আজীবন একই বাণী প্রচার করে যান । আমি এ মত পোষণ করি নে । আমরা বিশ্বাস করি তাঁদেরও পরিবর্তন হয়, তবে আমার আরেকটি অশ্ব-বিশ্বাস,— মত পরিবর্তন সম্বন্ধেও তাঁদের একটি মূল সূত্র বরাবরই বজায় থাকে ।

রবীন্দ্র বাথ যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপনা করেন তখন এটাকে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বা ব্রহ্মবিদ্যালয় বলা হত । ছেলেরা জুতো পরতো না, নিরামিষ খেত, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণতরের জন্য পৃথক পৃথক পঙক্তি ছিল ; এমন কি প্রশ্ন উঠেছিল, ব্রাহ্মণ ছাত্র কায়স্থ গুরুতর পদধূলি নেবে কি না ।

সেই শান্তিনিকেতনেই, রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায়ই, পৃথক পৃথক পঙক্তি উঠে গেল, আমিষ প্রচলিত হল, গ্রামোফোন বাজলো, ফিফ্টিফোর্থ দেখানো হল । রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পূর্বেই শান্তিনিকেতন সত্যার্থে বিশ্বভারতী বা ইন্টার-ন্যাশনাল মর্দনভার্সিটি রূপে পরিচিত হল । বস্তুতঃ এরকম উদার সর্বজনীন বাসস্থল পৃথিবীতে কোথাও নেই ।

*

*

*

একদিকে তিনি যেমন চাইতেন আমাদের চাষবাসের ট্রাক্টর এবং অন্যান্য কলকজা প্রচলিত হয়ে আমাদের ফসলোৎপাদন বৃদ্ধি করুক, অন্যদিকে ঠিক তেমনি ইয়োরোপের মানুস কি ভাবে অত্যধিক যন্ত্রপাতির নিপীড়নে তার মনুষ্যত্ব হারাচ্ছে সে সম্বন্ধে তাঁর তাঁর মন্তব্য বিশ্বজনকে জানিয়ে গিয়েছেন । এ বিষয়ে তাঁর জীবনদর্শন কি ছিল তার আলোচনা কঠিন এবং দীর্ঘ, আমাদের সামনে প্রশ্ন—আজ যে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প, উপন্যাস, নাট্য, নৃত্যনাট্য ফিফ্টিফোর্থ আত্মপ্রকাশ করছে সেটা কি ভাবে করলে তিনি আনন্দিত হতেন ?

এ-কথা সত্য, প্রথম যৌবনে তিনি গ্রামোফোনের প্রতি বিরূপ ছিলেন এবং পরবর্তী কালে তিনি তার জন্য গিয়েছেন । পিয়ানোঘোষে তাঁর একাধিক নাট্য মগ্ধ হয়েছে অথচ তিনি হারমোনিয়াম পছন্দ করতেন না । ফিফ্টিফোর্থ প্রতি তাঁর অবজ্ঞা ছিল না ; এমন কি শুনেছি তাঁর ‘প্রাণ চায় চন্দ্র না চায়’ গানটিতে তিনি যে সুর দিয়েছেন তাতে কিছটা ফিফ্টিফোর্থ রস দেবার চেষ্টা করেছিলেন । এবং ‘আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী’ জাতীয় একাধিক গানে যে বিলিতি সুর আছে সে তো জানা কথা ।

প্রথম নিন রেডিওর কথা ।

আমার বিশ্ময় বোধ হয়, কোন সাহসে রেডিও নাট্যে প্রভুসার রবীন্দ্রনাটকের কাটছাঁট করেন !

গান, কবিতা, ছোট গল্প, উপন্যাস প্রত্যেক রসবস্তুরই একটা নির্দিষ্ট আয়তন আছে এবং সেটি ধরা পড়ে রসবস্তুটি সর্বাত্মক সম্পূর্ণ হয়ে আত্মপ্রকাশ করার পর । ‘আগুনের পরশমণি’কে তিন ঘণ্টা ধরে পালা কীর্তনের মত করে গাইলে তার রস বাড়ে না, আবার কোনো মার্কিন কোটিপতির আদেশে তাজ-

মহলকে কাটছাঁট করে তার জাহাজে করে নিয়ে যাবার মত সাইজ-সই করে দেবার চেষ্টাও বাতুলতা ।

এই কিছুদিন পূর্বে বেতারে রবীন্দ্রনাথের একটি নাটক শুনছিলাম । এক ঘণ্টাতে সেটাকে ফিট করার জন্য তার উপর যে কী নির্মম কাঁচি চালানো হয়েছিল সেটা সর্বকঠিন প্রতিবাদেরও বাইরে চলে যায় । শব্দে শব্দে ছত্রে ছত্রে, প্রশ্ন উত্তরে, ঘটনা ঘটনায় যতখানি সময় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি তুলে ধরলেন তাতে কাঁচি-ছাঁচি করলে যে কী রসভঙ্গ হয় সে শুধু এই সব দাঙ্গিকেরা বোঝে না । আমার মনে হয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও যদি অতি অনিচ্ছায় কোনো কারণে রাজী হতেন ওটাকে ছোট করতে, তবে তাঁকেও বিষম বিপাকে পড়তে হত । স্থাপত্যের বেলা জিনিসটা আরো সহজে স্বয়ংসম হয় । আজ যদি পুরাতত্ত্ব বিভাগ তদারকির খরচ কমাবার জন্য তাজমহলটাকে আকারে ক্ষুদ্রতর করার চেষ্টা করেন তবে কি অবস্থা হয় চিন্তা করুন তো । কিংবা ফিল্মেরই উদাহরণ নিন । বছর পাঁচেক পূর্বে আমি একটা নামকরা বিদেশী ফিল্ম দেখে অবাক হয়ে বললাম, প্রত্যেক অংশই সুন্দর কিন্তু তবু রস জমলো না । তখন খবর নিয়ে জানা গেল, ফিল্ম বোর্ডের উপর এমনি নির্মম কাঁচিচালায়েছেন যে তার একটা বিপুল ভাগ কাটা পড়েছে । যেমন মনে করুন তাজের গম্বুজ এবং দুটি মিনারিকা কেটে নেওয়া হলে পর তার যে রকম চেহারা দাঁড়াবে !

আমার প্রশ্ন, কি ধরকার ? দুনিয়ায় এতশত জিনিস যখন রয়েছে যেগুলো বেতারের সময় অনুযায়ী পরিবেশন করা যায় তখন কী প্রয়োজন সর্বাঙ্গসুন্দর জিনিস বিকলাঙ্গ করার ? হনুমান হনুমানই সই, কিন্তু শিব কেটে ঠুটো জগন্নাথ করার কি প্রয়োজন ?

দুই নম্বর : রবীন্দ্রনাথের নাট্যের শব্দ পরিবর্তন । কিছুদিন পূর্বে একটি নাটো এ রকম পরিবর্তন শুনে কান যখন ঝালাপালা—বস্তুত কিছুক্ষণ শোনার পরই আমার মনে হল, এ ভাষা রবীন্দ্রনাথের হতেই পারে না এবং তাই বইখানি চোখের সামনে খুলে ধরে নাট্যটি শুনছিলাম—তখন এক জায়গায় দেখি ছাপাতে আছে ‘কে তুমি’ ? এবং নাটো বলা হল ‘তুমি কে’ ?

এ দুটোর তফাত তো ইন্সকুল-বয়ও জানে ।

নাট্যমঞ্চে হলে তবুও না হয় ভাবতুম, হয়তো নট ভালো করে মৃৎস্থ করেনি, কিন্তু এ তো বেতারের ব্যাপার—ছাপা বই তো সামনে রয়েছে ।

পুনরায় প্রশ্ন করি, কী প্রয়োজন, কী প্রয়োজন ? জানি, পনেরো আনা প্রোতা ভাষা সম্বন্ধে অত সচেতন নয়, কিন্তু যেখানে কোনো প্রয়োজন নেই সেখানে এক আনা লোককেই বা কেন পীড়া দেওয়া ?

তিন নম্বর—এবং সেইটেই সব চেয়ে মারাত্মক !

রবীন্দ্রনাথের একটি গল্পকে নাটক করা হয়েছে । গল্পটি গত শতকের শেষের কিংবা এই শতকের গোড়ার পটভূমিতে আঁকা এবং নিম্ন মধ্যবর্তী শ্রেণী নিয়ে লেখা । বাপ-মায়েতে ঠিক হয়েছে অম্বকের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে দেওয়া হবে । তখন বাপ তাঁর স্ত্রীকে শূন্যোচ্চেন, ‘তোমার মেয়ে কি বলে ?’ মা যে

কী ন্যাকরার সূরে বললে সে অবর্ণনীয়—‘ওকে জিজ্ঞেস করবে কি ? সে তো সকাল-বিকাল ওরই ঘরে ঘর করছে।’ সন্তলের পয়লা কথা, সে যুগে মেয়েকে বিয়ের পূর্বে ওরকম জিজ্ঞেস করা হত না, সে কাকে বিয়ে করতে চায়, দ্বিতীয়ত মেয়ের প্রেমে পড়া নিয়ে সে যুগে বাপে-মায়ে এরকম ‘ন্যাকরা’ করে কথা বলা হত না।

আমার কাছে এমনি বৈখ্যাপা লাগলো যে, আমি কিছতেই বুঝতে পারলুম না রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ জিনিস কি প্রকারে সম্ভব ! তখন উঠে বই খুলে পড়ে দেখি, মেয়ের মতামত জানবার জন্য বাপ-মায়েতে এই কথোপকথন গল্পটিতে আদৌ নেই !

সস্তা, কুরুচিপূর্ণ, ন্যাকারজনক বাজে নাটক শূনে শূনে আমাদের রুচি এমনিই বিগড়ে গিয়েছে যে, প্রভুসার মনে করেন যে প্রচুর পরিমাণে ন্যাকামোর লঙ্কাফোড়ন না দিলে আমরা আর কোনো জিনিসই সুস্বাদু বলে গ্রহণ করতে পারবো না ! দোষ শুধু প্রভুসারের নয়—আমাদেরও।

তবে প্রশ্ন উঠতে পারে : স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই অনেক কিছুর করেছেন।

যেমন মনে করুন ‘শ্যামা’ নাট্য তাঁর ‘পরিশোধ’ কবিতার উপর গড়া। আবার ‘পরিশোধ’র প্রটটি জাতক থেকে নেওয়া। তাতেও আবার রবীন্দ্রনাথ মূল প্রটকে শেষের দিকে খানিকটা বদলে দিয়েছেন। এস্থলে বক্তব্য, জাতকের গল্পেপটে থাকে শুধু প্রটই। সেখানে অন্য কোন রসের পরিবেশ থাকে না বলে সেই প্রট নিয়ে কৃতকর্মী রসনির্মাতা গল্প উপন্যাস নাট্য নির্মাণ করতে পারেন। অর্থাৎ দেবীর কাঠামোর উপর মাটি-কাঁচা-রঙ লাগিয়ে প্রতিমা নির্মাণ করা এক কথা—সেটা সহজও, যে যার খুশীমত করে তাকে সুন্দর করতে পারলেই হল—কিন্তু প্রস্তুত প্রতিমার উপর আরো মাটি লাগিয়ে হাত দুটিকে আরো লম্বা করা, কিংবা দশ হাতের উপর আরো দুটি চড়িয়ে দেওয়া, সে সম্পূর্ণ অন্য কথা। দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘পরিশোধ’কে ‘শ্যামা’তে পরিবর্তিত করতে পারেন তাঁর সে শক্তি আছে। সে রকম শক্তিমান আমাদের ভিতর কই ? এবং আমার মনে হয় সে রকম শক্তিমান ফিল্ম-ডিরেক্টর রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে টানাচড়া না করেও এমন প্রট অন্যত্র পাবে যেখানে সে তার জিনিয়াস, তার সৃজনশীলতা আরো সহজে, আরো সুন্দর করে দেখাতে পারবে।

জাতক পড়ুন, জাতক পড়ুন জাতক পড়ুন। ওর মত ভান্ডার কোনো ভাষাতেই নেই।

এবং রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে জাতকের প্রট নিয়ে কবিতা এবং নাট্য করতেন সেই টেকনিকটি রপ্ত করে নিন ॥

সম্পাদক লেখক পাঠক

শ্রীযুত জলসা সম্পাদক মহাশয় সমীপে,

মহাশয়,

সচরাচর আমি পাঠকদের জন্যই আপনার কাগজে লিখে থাকি (এবং আপনার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি যে প্রতি সংখ্যায়ই কিছু লেখা দেব)। আপনার পড়ার জন্য নয়। কারণ আমি নিঃস্বার্থের মধ্যে শুনিছি, সম্পাদকেরা এত কামেলার ভিতর পটিকা প্রকাশ করেন যে তারপর প্রবন্ধগুলো পড়ার মত মধ্যে আর তাঁদের লালসা থাকে না। কথাটা হয়তো একেবারে মিথ্যা নয়। কারণ

তিস্ত্রি পলায় লংকা লয়ে সযতনে

উচ্ছে আর ইক্ষুগুড় করি বিভ্রম্বিত

প্রপঞ্চ ফোড়ন লয়ে

যেদিন আমি রত্ন-কর্ম সমাধান করি, সেদিন আমারও ক্ষিধে সম্পূর্ণ লোপ পায়। কাজেই আপনার বিরুদ্ধে যে প্রিমা ফাশি কেন্স একেবারেই নেই, সে-কথা বলতে পারবেন না। অস্তত আমার লেখা যে আপনি একেবারেই পড়েন না, সে বিষয়ে আমি সন্নিহিত—কারণ পড়া থাকলে দ্বিতীয়বারের জন্য লেখা চাইতেন না। ন্যাড়া একাধিকবার যেতে পারে বেলতলা—নিমতলা কিন্তু যায় একবারই।

ইতিমধ্যে আমি কথা দিয়েও কথা রাখতে পারি নি। অতঃপর দোষটা পড়েছে নিশ্চয়ই আপনার ঘাড়ে। বাঙলাতে বলে,

খেলেন দই রমাকান্ত

বিকারের বেলা গোবন্দন!

অর্থাৎ জ্বান খেলাপ করলুম আমি, বিকারটা হল আপনার।

‘অয়, অয়, জানাতি পারো না’—আকছারই হয়। তার কারণটাও সরল। যে-দোষ আপনি করেছেন, তার গালমন্দ আপনিই খাবেন, এ তো হক্ কথা, এ তো আপনার ন্যায্য প্রাপ্য। তাই তাতে আপনার স্কেভ থাকাটা অশোভন, কিন্তু সংসারটাতো ন্যায্যের উপর চলে না, সে কথা তো আপনি বিলক্ষণ জানেন—তাই মাঝে মাঝে অন্যায় অপব্যবহার সহ্যে হয়। আপনারই কাগজে দেখলুম, এক পাঠক আপনাদের টাইট দিয়েছেন, রাবিশ লেখা ছাপেন কেন? উত্তরদাতা বেচারী মূখ শুকনো করে (আমি হরফগুলোর মারফতেই তাঁর চোখরাটি স্পষ্ট দেখতে পেলুম) বলছেন, নাচার, নাচার স্যর! নামকরা লেখক। অনুরোধ জানিয়েছিলুম, একটি লেখা দিতে—অজানা জনকে তো আর অনুরোধ করতে পারি নে, বর্জিতে ভেজার ভয়ে পুরুরে তো আর ডুব মারতে পারি নে—তারপর এসে উপস্থিত এই খাজা মাল। না ছাপিয়ে করি কি?’

বিলকুল সচ্চরিত্র বাৎ (আপনার কাগজে হিন্দী উর্দু শব্দের বগহোর দিতে আমার বাধে না, কারণ আপনার পাঠক সম্প্রদায় পাইকির দরে হিন্দী ফিল্ম সৈয়দ মজতবা আলী রচনাবলী (৭ম)—১২

দেখে দেখে দিব্য হিন্দী বুদ্ধিতে পারেন) ! কারণ ফ্রান্স-জার্মানিতেও বলে, বরুণ রশ্মি মাল খেয়ে পেটের অসুখ করবো, তবু শা—হোটেলগুলোকে ফেরৎ দেব না, পয়সা যখন দিতেই হবে,—পাছে অন্য খন্ডেরকে বিক্রি করে ভবল পয়সা কামায় !’ অতএব আমার মতে ছাপিয়ে দেওয়াটাই সুবুদ্ধিমানের কর্ম ।

এ হেন অবস্থায় একটা মাস যে মিস্ গেছে, সেটা কি খুব খারাপ হল ? বুদ্ধলেন না ? তাহলে একটি সত্য ঘটনা বলি :

ফিল্মাকাশের পূর্ণচন্দ্র গ্রীষ্মে দেবকী বসু আমার বন্ধু । দিল্লীতে যখন তাঁর ‘রত্নদীপে’র হিন্দী কার্ভন কপি দেখানো হয়, তখন দিল্লীর ফিল্ম সম্প্রদায় তাঁকে সেখানে নিমন্ত্রণ করে অভ্যর্থনা জানায় । স্বাগতভিভাষণটি বলবার অনুরোধ আমাকেই করা হয়েছিল । কেন, তা জানি নে । এই তো ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো নয় । দেবকীবাবু যদি চটকদার রাবিশ ফিল্ম বানাতেন, তবে আমি ডাক পেলে আশ্চর্য হতুম না । তখন বুদ্ধলুম, ‘মুক্তো ফেলতে ডুবুরী’ অর্থাৎ জুইরী, সে সত্যই মুক্তোর মতো জানে, সে জলে নামে না—নামে মুক্তো বাবু আনাড়ি ডুবুরী । কারণ আমি ফিল্ম দেখতে যাই নে—এরকম একটা বদনাম তরুণদের মধ্যে আমার আছে । বৃন্দেরা অবশ্য খুশী হয়ে বলবেন, ‘বা, বা, বেড়ে ছেলে, খাসা ছেলে ।’ আমি কিন্তু বৃন্দের প্রশংসার চেয়ে তরুণের নিন্দাই কামনা করি । সংস্কৃতেও বলে বৃন্দার আলিঙ্গনের চিয়ে তরুণীর পদাঘাত শ্রেয় ।’

যাক সেকথা । সেই সূত্রে দেবকীবাবুর পুত্র দিলীপের সঙ্গেও পরিচয় হয় । তন্দ্রাভেই সে আমার ন্যাওটা হয়ে যায় । খাসা ছেলে । ফিল্ম দেখেও বেড়ে ছেলে—তরুণ বৃন্দ এক সুরেই বলবেন ।

সে ডাক্তারি প্র্যাকটিসে নামার কয়েক বৎসর পর—আমি তখন ঘরের ছেলে কলকাতায় ফিরে এসেছি—দেবকীবাবু আমাকে একদিন শ্রদ্ধোলেন, ‘দিলীপ কি রকম ডাক্তার !’

মিত্রপুত্রের প্রশংসা করতে সবাই আনন্দ পায় ; একগাল হেসে বললুম, ‘চৌকশ, তালেবর ।’

‘মানে ?’

‘অতি সরল । এই দেখুন না, মাস ছয় আগে আমার হল দারুণ আর্ত-রাইটিস—আর্তরব ছেড়ে ডাকলুম ডাকসাইটে অমুক ডাক্তারকে । তিনি ওষুধ দেওয়ার পর আমার এমনি অবস্থা যে আর্তরব মার্তরব কোন রবই আর ছাড়িতে পারি নে । তখন এলেন আরেক বাঘা ডাক্তার । তিনি নাকি মড়াকে জ্যান্ত করতে পারেন । আমার বেলা হয় উঠোটা ; জ্যান্তকে মরা করতে লাগলেন । যাই যাই । সেই যে—

এক দুই তিন,
নাড়ি বড় ক্ষীণ ।
চার পাঁচ ছয়,
কি হয় না হয় ।

সাত আট নয়,
মরিবে নিশ্চয় ।
দশ এগারো বারো,
খাট যোগাড় করো ।
আঠারো উনিশ কুড়ি
বল্ “হরি হরি ।”

কী আর করি ? মরি তো মরি, মরবো না হয় দিলীপেরই হাতে । আর যা হোক হোক, আমাকে মানে । ভোতা নীডল দিয়ে শেষ ইন্জেকশনটা দেবে না ।’

আমি থামলুম । দেবকীবাবু রুদ্ধশ্বাসে, শক্ত কণ্ঠে শূদ্বোলেন, ‘তার-পর কি হল ? আপনি বেঁচে উঠেছিলেন কি ?’

আমি বললুম, ‘দিলীপ বাড়িতে ছিল না, তাই আসতে পারল না । আমি সেরে উঠলুম ।’

তবেই দেখুন, সে ভালো ডাক্তার কি না ।’

সম্পাদক মশাই, আপনাদেরও কি সেই অবস্থা নয় ? ডাকসাইটে অমূলক লেখকের লেখা ছাপালেন । কাগজ নাবলো নিচে । বাঁচতে গিয়ে ডেকে পাঠালেন আর এক বাঘা লেখককে । আপনাদের অবস্থা হল আরো খারাপ ! তখন আমি দিলীপ—কাঁচা লেখক—চাইলেন আমার লেখা । আমি বরদায় । লেখা পাঠাতে পারলুম না । হুশ করে আপনার কাগজের মান উঁচু হয়ে গেল । বিশ্বাস না হয়, আপনার সোলস্ ডিপার্টমেন্টে খবর নিন—যে সংখ্যায় আমার লেখা ছিল না সেটি শূদ্ব ইন্ডো-পাকিস্তান ক্রিকেট টিকিটের মত বিক্রী হয় নি, ডাকে বিস্তরে বিস্তর খোঁয়া যায় নি, হয়তো বা আপনার অজানতে কালোবাজারও হয়েছে । বলতে কি, ঐ সংখ্যাটি আমারও বহু ভালো লেগেছে । বিশেষ করে রঞ্জনের লেখাটি এবং ভোম্বে থেকে বৌমিকের ‘প্রশ্নবান’ । বস্তুত, আমি আজ ঠিক করেছিলাম এ সংখ্যাটি নিয়েই আলোচনা করবো কিংতু উপস্থিত মাত্র দু’ একটি মন্তব্য করে সে-আলোচনা মূলত্বাি রাখি ।

যেমন মনে করুন, রঞ্জন লিখেছেন, ‘বম্বের চিত্রনির্মাতা ঠিকই ধরেছেন যে অধিকাংশ দর্শক আড়াই ঘণ্টার জন্য (যখন ছবি ওই সময়ে শেষ হয়) আপন আসন্ন পরিবেশ থেকে অব্যাহতি পেতে চায় ।’ সত্যি কি তাই ? তবে আমার প্রশ্ন, বম্বের আসন্ন পরিবেশ মৃত্যুর । এবং মৃত্যুভয় সব চেয়ে বড় ভয় । তবে বম্বেরা সিনেমা দেখতে যায় না কেন ? আবার দেখুন, লড়াই যখন চলতে থাকে তখন ছুটি-ফেরা জোয়ান সেপাই জোর সিনেমা যায় । চল্লিশ এবং পঞ্চাশের মাঝামাঝি সময়েই এদেশের পরিবেশ সর্বাপেক্ষা নিরানন্দময় । ছেলে-বের পড়াবার পয়সা নেই, মেয়েরা বড় হয়েছে অথচ বর জুটছে না, চাকরিতে আর যে একটা মহৎ পদোন্নতি হবে সে সম্ভাবনাও আর নেই—তবুও ঐ বয়সের

লোক সিনেমায় যায় কম। অথচ তার কলেজী ছেলে—যার ঘাড়ে এখনো সংসারের চাপ পড়ে নি, খেলাধুলো সে করতে পারে, রকবাজিও তোফা জিনিস, তার আসন্ন পরিবেশ প্রোট বা বৃষ্টির তুলনায় অনেক কম ভয়াবহ—সেই বা ড্যাং ড্যাং করে সিনেমায় যায় কেন? না আমার মন সাড়া দিচ্ছে না।

মঞ্জু বসু আমাদের ভৌমিক সায়েবকে শ্রদ্ধা দিয়েছেন, ‘বারাঙ্গনার বীরাঙ্গনাতে রূপান্তরিতের একটি উদাহরণ দিন।’ ভৌমিক ঠিক উত্তরই দিয়েছেন—‘বাজি-রাও প্রেমিকা মস্তানা বেগম।’

আমি উইশটোটার বিস্তারিত উদাহরণ দিতে পারি। বীরাঙ্গনা কি করে বারাঙ্গনা হয়। যে কোনো খবরের কাগজে যে কোনো দিন দেখতে পাবেন। আমি তো প্রথম দিনে হকচকিয়ে উঠেছিলাম। এক বিখ্যাত বাঙলা দৈনিকের প্রথম পাতার এক কোণে দেখি, একটি সৌম্যদর্শন মহিলার ফটোগ্রাফ এবং নিচে লেখা ‘বারাঙ্গনা—অমরক’। এদের কি মাথা খারাপ, না এরা পাগল যে বারাঙ্গনার ছবি কাগজের পয়লা পাতায় ঘটা করে ছাপায়। তলায় আবার পরিচয়—‘মহিলাটি ব’টি হাতে একা একটা ডাকাতকে ঘায়েল করে প্রাণ হারান।’ তখন আমার কানে জল গেল। বাঙলা হরফের উপরের ও নীচের দিকের অংশ প্রায়ই ভেঙে যায়। ‘বী’ দীর্ঘস্বরের উপরের লুপটি ভেঙে যাওয়াতে ‘বী’ বদলে হয়ে গিয়েছে ‘বা’। এটা এক দিনের নয়। উপরের লুপ, (‘বিশ্ব’ শব্দের উপরের হুক ভেঙে গেলে অবস্থা আরো মারাত্মক), নিচের হ্রস্বউকার গুণ্ডায় গুণ্ডায় নিত্য নিত্য ভাঙে। আমরা অভ্যাসবশে পড়ে যাই বলে লক্ষ্য করি নে। যদি ঠিক যে-রকম ছাপাটি হয়েছে—ভাঙাচোরার পর—সে-রকমটি পড়েন তবে দেখবেন বিস্তারিত বীরাঙ্গনা বারাঙ্গনা হচ্ছেন, এবং আরো অনেক সরেস উদাহরণ পাবেন যেগুলো স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে ছাপলে আমি সমাজে মদ্য দেখাতে পারতুম না। আপনাকে বলে রাখি, এখনো পারি নে—তবে সেটা পাওনাদারের ভয়ে।

অরুণ গুহ শ্রদ্ধা দিয়েছেন, ‘এমন একটি আশ্চর্য জিনিসের নাম বলুন, যা আজ আছে কিন্তু ত্রিশ বৎসর আগে ছিল না।’ ভৌমিক উত্তর দিয়েছেন, ‘শচীন ভৌমিক।’ সরেস উত্তর।

তারপর অরুণ গুহ ফের শ্রদ্ধা দিয়েছেন, ‘এমন একটি জিনিসের নাম বলুন যা না থাকলে বিশ্বের কোন ক্ষতি হত না।’ ভৌমিক উত্তর দিয়েছেন, ‘অরুণ গুহ।’ আমি ‘শচীন ভৌমিক’ বলে লিখতুম, ‘শচীন ভৌমিক’—এবারেও। কারণটা বুঝিয়ে বলি।

রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী চলেছে, সেই সূবাদ নিয়েই বলছি—

বিলাতের বিখ্যাত স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন একবার পৃথিবী সেরা সেরা গুণী-জ্ঞানীদের প্রশ্ন শোধান,

১। আপনার সব চেয়ে প্রিয় পাপমতি কি (হোয়াট ইজ ইয়োর বেশ্ট ফেভারিট ভাইস)?

২। আপনার সব চেয়ে প্রিয় পদ্যমতী কি (হোয়াট ইজ ইয়োর মোস্ট ফেভারিট ভার্চু)?

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

১। ইন্কনসিস্টেন্সি (অর্থাৎ কোনো জিনিসে অবিচল থাকতে পারি নে—অর্থাৎ মত বদলাই)।

২। ইন্কনসিস্টেন্সি (অর্থাৎ কোনো জিনিসে অবিচল থাকতে পারি নে—অর্থাৎ মত বদলাই)।

একবার চিন্তা করলেই দেখবেন, ইন্কনসিস্টেন্সি জিনিসটা পাপ বটে, পুণ্যও বটে।

যখন আমি স্বার্থের অংশ কিংবা শত্রুভয়ে কাপুরুষের মতন আপন সত্য মত বদলাই (কুলোকে বলে এ ব্যামোটা রাজনৈতিকদের ভিতরই বেশী—‘টার্গ-কোট’ এর নাম) তখন আমার ইন্কনসিস্টেন্সি পাপ। আবার যখন বদ্বতে পারি আমার পূর্বমত ভুল ছিল, তখন লোক-লজ্জাকে ড্যাম-কেয়ার করে, এমন কি প্রয়োজন হলে স্বার্থত্যাগ করেও যখন মত বদলাই তখন আমার ইন্কন-সিস্টেন্সি সাতিশয় পুণ্যকর্ম।

ঠিক সেইরকম ভৌমিক সায়েব যখন বলেন তিনি ত্রিশ বৎসরের আশ্চর্য জিনিস, আমরা সানশ্বে সায় দিই। কারণ তিনি সদ্‌শ্বর সদ্‌শ্বর এবং চোখা-চোখা, মৌলিক এবং চিন্তাশীল উত্তর দিতে পারেন। কখনো আনন্দিত হয়ে বলি ‘বাঃ’, কখনো মার খেয়ে বলি ‘আঃ’।

আর তিনি না থাকলেও কোনো ক্ষতি হত না। ইংরিজীতে বলে, ‘যা তোমার অজানা সে তোমাকে বেদনা দিতে পারে না।’ কিংবা বলবো, ‘আমরা জানিলাম না, আমরা কি হারাইতেছি।’

একটু চিন্তা করে দেখুন, কথটা শুধু ভৌমিক সাহেব না, টেলশ্চয় কালিদাস, আপনি আমি সকলের বেলাই খাটে কিনা।

*

*

*

রবীন্দ্রনাথ ও ইন্কনসিস্টেন্সির সুবাসে আমাদের দুটি নিবেদন আছে।
গেল মাসে মিস গেছে তার জন্যই আমি সম্পূর্ণ দায়ী নই। বড় লেখক হলে আমি অনায়াসে বলতে পারতুম, ‘মশাই, ইন্স্পিরেশন আসে নি—আমি কি দীর্জ না ছুতোর অর্ডার-মাফিক মাল দেব?’ তা নয়। আমি সাধারণ লেখক। আমি আজ পর্যন্ত ইন্সপারাদ হয়ে লিখি নি। আমি লিখি পেটের ধান্দায়। পুর্বেই বলেছি, চতুর্দিকে আমার পাওনাদার। কে বলে আমি টাকার মূল্য বঝি নে? যতবার ফুরিয়ে গিয়েছে ততবারই হাড়ে হাড়ে বদ্বোছি। একটু বেশী ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে, তবু না বলে উপায় নেই, আপনি হয়তো লক্ষ্য করেন নি, আমি চাকরিতে থাকাকালীন কোনো প্রকারের ‘সাহিত্যসৃষ্টি’ করি নে—চাকরিতে থাকাকালীন আমার কোন বই বেরয় নি। তখন তো পকেট গরম, লিখতে যাবে কোন মূর্থ! অতএব ইন্স্পিরেশনের দোহাই কাড়লে অধর্ম হবে।

আমি গিয়েছিলুম বরদা। সেখানে আমি মধ্য যৌবনে আট বছর কাজ করি। ১৯৪৭-এ বরদা ছাড়ি। সেখানে রবি শতবার্ষিকী উদ্‌যোজন করতে

আমাকে আহ্বান জানানো হয়, পূরনো চেনা লোক বলে, অন্য কোন কারণে নয়। না গেলে নেমক-হারামী হত। ট্রেনে লেখা যেত না? না। আপনি যদি গবেষণামূলক উচ্চাঙ্গ উন্নাসিক গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ চাইতেন সে আমি গন্ডায় গন্ডায় ট্রেনে-বাসে, ভেস্টিবুলে-তরুমূলে যেখানে সেখানে বসে—না বসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও লিখে দিতে পারি। কিন্তু একটুখানি রসের ভিয়েন দিতে গেলেই চিন্তিত। তার জন্য ইন্সপিরেশন্ না হোক, অবকাশটি চাই। সাধে কি আর জি. কে চেস্টারটন বলেছিলেন, ‘টাইম্‌স্ কাগজের গুরুগম্ভীর সম্পদকীয় কলাম আমি দিনের পর দিন আধ ঘণ্টার ভিতর লিখে দিতে পারি, কিন্তু ঐ যে ট্রাম-বাসের কাগজ ‘টট্ বিটস্’—তার পয়লা পাতার বিশটি রসিকতার চুটকিলা গল্প একসঙ্গে আমি কখনো রচনা করে উঠতে পারবো না।’ অথচ কে না জানে, চেস্টারটন ছিলেন সে যুগের সুরসিক লেখক। আর আমি? থাক গে।

দ্বিতীয়ত ঐ ইন্কন্সিস্টেন্সির কথা। ওটার বাড়াবাড়ি করলে লোকে ভাববে পাগল। গল্পটা তাই নিয়ে।

ট্রেনে ফেরার মুখে এক ভুল্ললোকের কাছ থেকে শোনা। ওটা উনি কোন ছাপা বই থেকে পড়ে বলেছেন কি না হলপ করে বলতে পারবো না, তবে এই-টুকু বলতে পারি সেই থেকে যাকে বলেছি, তিনি উত্তরে বলেছেন, এটা তিনি আগে কখনো শোনেন নি। আজ দোলপূর্ণিমায়ে চন্দ্রগ্রহণ ছিল—তার সঙ্গেও এর কিঞ্চিৎ যোগ (অর্থাৎ এশোসিয়েশন অব্ আইডিয়াজ) রয়েছে।

ক্লাস-টীচার বললেন, ‘গত শতাব্দীর সুবগ্রহণ সংখ্যা থেকে চন্দ্রগ্রহণ সংখ্যা বিয়োগ করে, তোমার কলারের সাইজের সঙ্গে এ বাড়ির থামের সংখ্যা যোগ দিয়ে, পদার্থীপিসির নামকে ক্যান্ডমাসির নাম দিয়ে ভাগ করে বল দিকি আমি আমার বয়স কত?’

ছেলেরা তো অবাক! এ কখনো হয়!

একটি চালাক ছোকরা হাত তুলে বললে, ‘আমি পারি, স্যার।’

টীচার বললেন, ‘বল।’

‘চ্যার্লিশ।’

টীচার ভারী খুশী হয়ে বললেন, ঠিক বলেছিস। কিন্তু স্টেপগুলো বাংলা তো, কি করে তুই সঠিক রেজাল্টে পে’ছিলি।’

ছেলেটি তিন গাল হেসে বললে, ‘মাত্র তিনটি স্টেপ, স্যার। অতি সোজা :—
আমাদের বাড়িতে একটা আধ-পাগলা আছে ;

তার বয়স বাইশ ;

অতএব আপনার বয়স চ্যার্লিশ ॥’

রবীন্দ্র রচনাবলী

রবীন্দ্র রচনাবলী/জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ/বিশ্বভারতীর সৌজনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে শিক্ষাসচিব শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন কর্তৃক প্রকাশিত/২৫ বৈশাখ ১৩৬৮/বিশ্বভারতীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে গ্রন্থ সম্পাদনের সহায়তা করেছেন শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, শ্রীবিজয়বিহারী ভট্টাচার্য, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীঅমিয়কুমার সেন ।

রবীন্দ্র রচনাবলী সদ্য প্রকাশিত এই দুই খণ্ড যে আমার এবং আমার মত রবীন্দ্রানুরাগী বহু সহস্র পাঠকের মনে কি গভীর পরিতৃপ্তি সৃষ্টি করেছে সেটি এই অবকাশেই প্রকাশ না করলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা বাঙালী জনমতের প্রতি বিলক্ষণ অবিচার করা হবে । উভয়েরই কৃতিত্ব সমান । রবীন্দ্রশতাব্দী উপলক্ষে সুলভ রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশিত হোক, এই ঐকান্তিক ও ঐক্যবদ্ধ কামনা দেশের কাগজে কাগজে প্রকাশিত হয়েছে ; আমরা, যাদের কথার কোনো মূল্যই নেই, যতদূর সম্ভব অনুন্নয়-বিনয় করেছি কর্তৃপক্ষের কাছে, উৎসাহ দিয়েছি যারা বাঙালীর হয়ে তাঁদের কামনাটি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জানিয়েছেন । অবশ্য বলে রাখা উচিত, এই উভয় কর্তৃপক্ষের ভিতর বিশ্বের রবীন্দ্রানুরাগীও আছেন যারা এই সুলভ রচনাবলী প্রকাশের জন্য জনমত তৈরী হওয়ার পূর্বেই এ ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন । বলা বাহুল্য, এঁদের সকলেই বিশ্বের বিরুদ্ধাচরণ অতিক্রম করে আজ সাফল্যের দ্বারে এসে পৌঁছেছেন । বলা আরো বাহুল্য বিরুদ্ধাচারিগণ যে রবীন্দ্র-ভক্তি নন এ কথা বললে অন্যায় বলা হবে । কি কারণে তাঁরা এ প্রস্তাব অনুমোদন করেন নি সে প্রশ্ন এস্থলে নিঃপ্রয়োজন ।

এই দুই খণ্ড যে ছাপা, বাঁধাই, কাগজ, ছবি, কবির হস্তলিপি ইত্যাদি নিয়ে অনবদ্য সে-বিষয়ে কোনো তর্কের অবকাশ নেই ।

কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা, প্রথম আড়াই বা তিন খণ্ডই আমরা কবির তাবৎ কবিতা ও প্রচুর গান একসঙ্গে পেয়ে যাচ্ছি । যারা প্রাচীন রচনাবলী নিয়ে কাজ করতেন তাঁরাই জানেন রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা বের করতে আমাদের কী বেগই না পেতে হত । কোনো বিশেষ ছোট গল্প, নাট্য বা প্রবন্ধ নিয়ে প্রায় ঐ এবই অসুবিধায় পড়তে হত । এই দ্বিতীয় অসুবিধাটিও বর্তমান রচনাবলী দূর করে দেবে—কারণ এতে প্রাচীন রচনাবলীর মত চার রকমের জিনিসের (১. কবিতা ও গান, ২. নাটক ও প্রহসন, ৩. উপন্যাস ও গল্প ও প্রবন্ধ) পাঁচমেশালি থাকবে না ।

আমি রবীন্দ্রসৃষ্টির বিশেষজ্ঞ নই, কিন্তু আরো বহু বঙ্গসন্তানের মত রবীন্দ্রনাথের কোনো বিশেষ কবিতা পাঠ করে ভাবোদয় হলে সেটা তাদেরই মত প্রকাশ করতে চেয়েছি । এযাবৎ সেটাও করতে পারি নি তার কারণ ঐ ছাংশি খণ্ড নিয়ে রেফারেন্স খুঁজে বেড়ানো আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল । আমার শোক—নবীন রচনাবলীখানা কুড়ি বৎসর পূর্বে পেলো হয়তো

এই নিয়ে কোনো বৃহৎ কাজে হাত দিতে পারতুম। বস্তব্য একটু ব্যক্তিগত হয়ে গেল, কিন্তু আমার একাধিক অনুরাগী পাঠক এই নিয়ে ফরিয়াদ করেছেন বলেই এই সাফাইটি গাইতে হল। আমি কিন্তু প্রাচীন রচনাবলীর নিষ্পা করার উদ্দেশ্য নিয়ে এ প্রবন্ধিকা লিখতে বসি নি—যাঁরা চার রকমের লেখা পাঁচমেশালী করেছিলেন তাঁদের উদ্দেশ্য শূভই ছিল, সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই।

এখন প্রশ্ন, নবীন রচনাবলীর সম্পাদনা কি রকমে হয়েছে।

আমি বলবো উত্তম, অতি উত্তম। কিন্তু সর্বঙ্গ-সুন্দর সম্পাদনা হতে এখনো একশ' কিংবা দুশ' বছর লাগবে। কারণ এ কাজ দশজন পণ্ডিতকে দশ বছর খাটিয়ে নিলেই হয় না।

প্রথমত, কবির তাবৎ প্রকাশিত রচনাবলীর প্রথম প্রকাশের ফোটোস্টাট, তাঁর জীবিতাবস্থায় তিনি যে-সব পরিবর্তন করেছিলেন সে সব এবং তাঁর পাণ্ডুলিপি (এগুলো সংগ্রহ করতে কতদিন লাগবে, কেউ বলতে পারে না) যেমন যেমন পাওয়া যাবে তারও ফোটোস্টাট (অন্য একটা নতুন সস্তা পদ্ধতিও হালে বেরিয়েছে) বের করতে হবে। তাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে কবির বেহ-ত্যাগের পর যে-সব পুনর্মুদ্রণ এবং নতুন সংস্করণ বেরিয়েছে তাতে যে সব পরিবর্তন করা হয়েছে সেগুলি পাণ্ডুলিপি-সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত হয়েছে কিনা। এখন এ কাজ সম্ভব নয়। ত্রিশ বৎসর পর যখন এ সব পুস্তকের উপর কারো কোনো কপিরাইট থাকবে না, তখনই উৎসাহী, অগ্রণী নানা প্রকারের প্রকাশক নানা রকম জিনিস প্রকাশ করে পণ্ডিতদের সামনে তুলে ধরবেন। তাঁরা বাঙলার ভিতরে বাইরে বসে বসে যে-সব গবেষণা প্রকাশ করলেন যে সমস্ত যাচাই বাছাই করে ধীরে ধীরে তৈরী হবে প্রামাণিক সংস্করণ। একটি তুলনা দিই; জার্মান কবি হাইনরিশ হাইনের মৃত্যু-শতাব্দী উদ্‌যাপিত হয়েছে বছর পাঁচেক পূর্বে (আমরা রবীন্দ্রনাথের জন্ম শত-বার্ষিকী করছি এখন) এবং আজও তাঁর চিঠিপত্র মূদ্রিতাকারে প্রকাশিত হচ্ছে! কবে শেষ হবে, অনুমান করা কঠিন।

নবীন রচনাবলীর সম্পাদকগণ এ ধরনের কাজে হাত না দিয়ে যে প্রাচীন রচনাবলী যেভাবে ছাপা হয়েছিল মোটামুটি সেভাবেই ছেপেছেন সেইটেই করেছেন ভালো। 'মোটামুটি' কথাটা বোঝাবার জন্য একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ দিই; প্রাচীন রচনাবলীর একাদশ খণ্ডে, গীতাজলি পুস্তকে আছে—

কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাই
দুরকে করিলে নিকট, বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।

গীতিবিতানেও তাই। কিন্তু বৃক্ষসঙ্গীতে 'নিকটে'র পর কমা নেই। অর্থাৎ 'নিকট-বন্ধু'রূপে পড়া যেতে পারে। আমরাও ছেলেবেলায় ঐ অর্থে পড়েছি—'বন্ধুকে' ভকেটিভ কেসে নিই নি। জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণের (২য় খণ্ড,

২১৬ পৃষ্ঠায়) পাচ্ছি ‘নিকট বন্ধু,’—মাঝখানে কমা নেই। অর্থাৎ বন্ধ-সঙ্গীতেও আমরা ছেলেবেলায় যেটি শুনছি সেই পাঠ। কবিতাটির পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রসদনে নেই। ওদিকে ঐ সদনের জনৈক দায়িত্বশীল কর্মচারী আমাকে বলেছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের আপন হাতে অটোগ্রাফ বইয়ে লেখা এই কবিতা-টিতে ‘নিকট’ ও ‘বন্ধু’ মাঝখানে কমা পেয়েছেন।

নবীন সংস্করণের সম্পাদকগণ কমা না দিয়ে ভালো করেছেন না ভুল করেছেন সেটা পরবর্তীকালে হয়তো স্থির হবে। উপস্থিত এই পাঠটি দেওয়াতে, আমাদের ভিতর যে আলোচনা হত সেটি সজীব রইল, এবং আরো পাঁচজনের সামনেও প্রকাশ পেল।

প্রাচীন সংস্করণ কপি করাতে নবীন সংস্করণে আরো কিছু কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে সন্দেহ নেই, কিন্তু পূর্বেই বলেছি গতাস্বর ছিল না। যেমন প্রাচীন রচনাবলী পুরবী পুস্তকের ‘দুঃখ-সম্পদ’ কবিতাটি শেষ হয়েছে, ‘তখন বন্ধিতে পারি আপনার মাঝে। আপন অমরাবতী চিরদিন গোপনে বিরাজে।’ কিন্তু রবীন্দ্র সদনে সুরক্ষিত ঐ পুস্তকের পাণ্ডুলিপিতে এর পর আরো ছয়টি ছত্র আছে—

যখনি কঁড়ির বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেয় তাপে,

তখনি ত জানি, ফুল চিরদিন ছিল ভাপে।

দুঃখ চেয়ে আরো বড় না থাকিতে কিছু

জীবনের প্রতিদিন হ’ত মাথা নীচু

তবে জীবনের অবসান

মৃত্যুর বিদ্রূপ হাস্যে আনিত চরম অসম্মান।

দু’একটি শব্দের তফাৎ নয় বলে এ কয়টি লাইনের বিশেষ মূল্য আছে ও প্রাচীন রচনাবলীর গ্রন্থ-পরিচয়ে দেওয়া আছে। যদিও বাজারে প্রচলিত ভার ১৩৬৩ পুনর্মুদ্রণের ‘পুরবী’তে নেই।

*

*

*

ঠিক সেই রকম বানান, সমাসবন্ধ শব্দ লেখার পদ্ধতি নিয়েও নানা কথা উঠবে, নানা আলোচনা হবে। কিন্তু বর্তমান সম্পাদকগণ সেদিকে না গিয়ে ভালোই করেছেন। প্রাচীন রচনাবলী নানা প্রতিকূল অবস্থার মাঝখানে সম্পাদিত ও মূদ্রিত হয়েছিল। তাতে অনেক বিষয়ে অনেকের মতাস্তর থাকবে। আমরা চেয়েছিলাম, সেই প্রাচীন সংস্করণেরই একটি সুদৃঢ়, কবিতা গঠন ইত্যাদি আলাদা আলাদা করা হ্যাঁড় সংস্করণ। তাই পেয়েছি ॥

বাঙলা দেশ

কতকগুলো প্রশ্ন আমাকে ছেলেবেলা থেকেই চিন্তাম্বিত করেছে এগুলোর সদৃশ্য আমি বহু জায়গায় অনুসন্ধান করে কয়েকটি মীমাংসায় পৌঁচেছি বটে কিন্তু যতখানি দলিল-দস্তাবেজ থাকলে এগুলো প্রমাণ রূপে পেশ করা যান ততখানি

করে উঠতে পারি নি। তার প্রধান কারণ আমার আলসেমি নয়—দস্তাবেজের অপ্রাচুর্যই তার আসল কারণ। অনেকদিন ধরে তাই ভেবেছি, আমার যা বলবার তা বলে ফেলি—দলিল থাক আর নাই থাক—যারা এসব লাইনে কাজ করেন, হয়তো তাঁদের উপকারে লেগে যেতে পারে। ‘দেশ’ সম্পাদকও এই মন্তব্য পোষণ করেন—বস্তুত তাঁরই অনুরোধে আমি আমার সমস্যা ও মীমাংসাগুলি পাঠকদের সামনে পেশ করছি, কিন্তু আবার সাবধান করে দিচ্ছি, যথেষ্ট প্রমাণপঞ্জি আমার হাতে নেই।

আমার প্রথম প্রশ্ন, দিল্লী আগ্রা পাঠান-মুগলদের রাজধানী ছিল। সেখানে মুসলমানের সংখ্যা অত কম কেন? যুক্তপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিম বাঙলার দিকে যতই এগোই, ততই দোঁখ মুসলমানের সংখ্যা কমে আসছে—সেইটাই স্বাভাবিক—কিন্তু হঠাৎ পূর্ব বাঙলায় এসে এদের সংখ্যাধিক্য কেন? দিল্লীর বাদশা দিল্লী, এলাহাবাদ ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ পূর্ব বাঙলায়ই তলোয়ার চালিয়ে জনসাধারণকে মুসলমান করলেন কেন? উত্তরে কেউ কেউ বলেন, দিল্লীর বাদশারা তলোয়ার চালান নি, চালিয়েছিল বাঙলার স্বাধীন পাঠান বাদশারা। তাই যদি হবে, তবে যে যুগে বেহার, বিজাপুর আহমদাবাদেও স্বাধীন পাঠান রাজারা ছিলেন। তাঁরাই বা তলোয়ার চালালেন না কেন? কেউ কেউ বলেন, বাঙলা দেশ বৌদ্ধ-প্রধান স্থান ছিল—তারা ভালো করে পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরে যাবার পূর্বেই মুসলমান ধর্ম বাঙলা দেশে আসে বলে এদের অনেকেই মুসলমান হয়ে যায়। এর উত্তরে আমার নিবেদন,—রাজাগর, বুদ্ধগয়া, পার্শ্বপুত্র, নালন্দা, বিক্রমশিলা সবই বিহার প্রদেশে—সে তো আরো বৌদ্ধ-প্রধান ছিল। তবে তাঁরাই বা মুসলমান হল না কেন?

সর্বশেষে আরো সামান্য একটি বস্তুব্য আছে। বহুকাল পূর্বে (শ্রাবণ, ১৩৫৮, ‘বসুমতী’) আমি স্বামী বিবেকানন্দের একটি উদ্ঘৃতিতে পড়ি,

“ভারতবর্ষের দরিদ্রগণের মধ্যে মুসলমান এত সংখ্যাধিক্য কেন? এ কথা বলা মর্খ্য তা যে তরবারির সাহায্যে তাহাদিগকে ধর্মাস্ত্র গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছিল।……বস্তুত জমিদার ও পুরুতবর্গের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য ইহারা ধর্মাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। আর সেইজন্য বাঙলা দেশে যেখানে জমিদারের বিশেষ সংখ্যাধিক্য সেখানে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বেশী।”

আমার মূল বক্তব্যের সঙ্গে স্বামীজীর কথা কিছুটা মিলে। পরে তার দীর্ঘ-তর আলোচনা হবে। উপস্থিত তরবারির সাহায্যে যে ব্যাপক ভাবে ধর্ম প্রচার করা যায় না, সেই সিদ্ধান্তটি মেনে নিয়ে এগোছি।

আরবভূমি যদিও মরুময়, তবু তার তিন দিকে সমুদ্র। নৌযাণ্ডায় আরবরা

১ এ উদ্ঘৃতিতে যে কয়েকটি ফুটকি আছে, সেগুলো প্রবন্ধের সম্পর্কিত কতটাই দিরাইছিলেন। মূল সম্পূর্ণ লেখাটি পেলে আমাদের আলোচনার সুবিধে হয়।

তাই কখনো পরাম্ভু ছিল না। বিশেষত হজরৎ মহম্মদের সময় তারা ঐক্য-বদ্ধ হয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নৌপথে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়ে দুখানা উত্তম গ্রন্থ এলাহাবাদ একাডেমি থেকে উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে—আরবোঁকী জাহাজরাণী (আরব নৌবিদ্যা) ও হিন্দু ও আরবকী তাল্লুকুৎ (ভারত ও আরবের যোগসূত্র)। অতদূর না গিয়ে যারা আরব্যোপন্যাসের সিদ্ধ-বাদকে শ্রমণে আনতে পারবেন তাঁরাই বলতে পারবেন এক বিশেষ যুগে আরবজাতি কী দুর্দান্ত সমুদ্রাভিযানই করেছে।^১ ওরাই মোসুমী (শব্দটি আসলে আরবী ও ইংরাজী মনসুনও তার থেকে) বাতাস আবিষ্কার করে ও ফলে উপকূল ধরে ধরে না এসে এডেন-সোকোত্রা থেকে সোজা সিংহল-ভারত আসা সুগম ও দ্রুততর হয়ে যায়।

স্থলপথে আরবরা, ইরান আফগানিস্থান জয় করে। জলপথে সিদ্ধদেশ।

এ ছাড়া সমুদ্রপথে যারা বাণিজ্য করতে ছড়িয়ে পড়ল তাদের নিয়েই আজ আমার আলোচনা। এরা প্রথমে সোকোত্রা (সংস্কৃত, 'দ্বীপ সুখদ্বার'—এডেনের কাছেই,) তার পর মালদ্বীপ লাক্ষাদ্বীপে ইসলাম প্রচার করে। দক্ষিণ ভারতে পারে নি, (পূর্ব বাঙলার কথা পরে হবে), বর্মায় পারে নি, মালয় ও ইন্দোনেশিয়ায় পেরেছিল।

হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রা কেন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল আমি ঠিক জানি নে, তবে যারা বৌদ্ধদের পরাস্ত করে হিন্দুধর্ম পুনর্জীবিত করেছিলেন তাঁরা হয়তো চান নি যে সাগর-পারের বৌদ্ধদের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগসূত্র থাকে—যার ফলে আবার একদিন বৌদ্ধধর্ম মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

তা সে যাই হোক, অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে পূর্ব বাঙলার মাল্লা-মাঝি, আমদানী-রপ্তানি ব্যবসায়ীদের দুরবস্থা চরমে। আজো যে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, সিলেটের মাঝি-মাল্লারা দুনিয়ার সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় (আজ তারা আবার ইংলণ্ডে বসতি স্থাপন করতে আরম্ভ করেছে, প্লেন চাটার করে পূর্ব বাঙলায় বেড়াতে আসে) এটা কিছু নতুন নয়। হিন্দু বৌদ্ধ যুগে এরাই বাঙলার তাবৎ এবং পূর্ব ভারতের প্রচুর মাল আমদানি-রপ্তানি করেছে, নৌ-নির্মাণ ও নৌবহর চালিয়েছিল বটেই।

সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হওয়ায় ফলে প্রধানত এরাই হল অম্বহীন।

আরব ভৌগোলিক (ও ঐতিহাসিকরা) বলেন, অষ্টম ও নবম শতাব্দীতেই (অর্থাৎ বখতিয়ার খিলজীর বহু পূর্বেই) আরবরা চট্টগ্রামে উপনিবেশ স্থাপন করেছে ও এ বন্দরেই সব কিছু সংগ্রহ করে (হিন্দুরা তো যাবে না) দক্ষিণ-পূর্বেও ছড়িয়ে পড়ত।

আরবী ভাষাতে 'চ' ও 'গ' অক্ষর নেই। 'ট' 'ত'-তেও পার্থক্য নেই। সেই হয়েছে বিপদ। তদুপরি নকলবিষাদের ভুল-ত্রুটি তো আছেই। কাজেই যদি

২ আরব্যোপন্যাসের প্রথম গল্পটি জাতক থেকে নেওয়া। সতীদাহ ও কোনাক' মন্দিরের 'প্রতিচ্ছবি'ও ঐ পুস্তকে পাওয়া যায়।

বা চট্টগ্রাম শব্দটি বোঝা যায়, তব্দ পরবর্তী যুগে এরা, 'সপ্তগ্রাম' ও 'সোনার গাঁ'-র সঙ্গেও এটা ঘড়ুলিয়ে দিয়েছে। তারো পরবর্তী যুগের পতুর্গীজরা তাই চট্টগ্রামের উল্লেখ করতো পোর্টে গ্রাণ্ডে (বড় বন্দর) ও সপ্তগ্রামকে পোর্টে পিক্কোনে (ছোট বন্দর) বলে।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে বর্তমান ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের সমুদ্র তটেই আরবরা বসতি স্থাপন করে—সিলেটের সঙ্গে জলপথে যাতায়াত আরও সহজ ছিল। এরাই মিশনারি এবং বণিক—একাধারে। এরাই অষ্টম নবম শতাব্দীতে, একদা যারা মাঝি-মাল্লা ছিল, সেই সব হিন্দুদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করতে আরম্ভ করে। এ তথ্যটা মেনে নিলে 'অষ্টাদশ অম্বারোহী কতৃক বঙ্গ জয়' অন্য দৃষ্টিতে দেখা যায়। কিন্তু তার জন্য নতুন অধ্যায় প্রয়োজন ॥

ভবঘুরে

ছমছাড়া, গৃহ হারা, বাউন্ডুলে, ভবঘুরে, যাযাবর—কত হরেক রকম রঙবেরঙের শব্দই না আছে বাঙলাতে ভ্যাগাবন্ড বোঝাবার জন্য। কিন্তু তব্দ সত্যকার বাউন্ডুলিপনা করতে হলে সব চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা—গেরুয়াধারণ। ইরান-তুরান-আরবিস্থানে দরবেশ সাজা। ইয়োরোপে এই ঐতিহ্যমূলক পরিপাটি ব্যবস্থা না থাকলেও অন্যান্য মন্দিরযোগ আছে যার কৃপায় মোটামুটি কাজ চলে যায়। সেগুলোর কথা পরে হবে।

তবে এই সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করার আগে একটুখানি ভেবে-চিন্তে নেওয়া দরকার। একটি ছোট উদাহরণ দেই।

আমি তখন বরদায়। বহু বৎসর আগেকার কথা। হঠাৎ সেখানে এক বঙ্গ সন্তানের উদয়। ছোকরা এম. এ. পাস করে কি করে সেখানে একটা চাকুরি জুটিয়ে বসেছে—মাইনে সামান্যই, কন্টে-প্রেক্টে দিন কেটে যায়।

ছোকরা আমাদের সঙ্গে মেলেমেশে বটে কিন্তু শনির সন্ধ্যা থেকে সোমের সকাল পর্যন্ত তার পাক্তা পাওয়া যায় না—অথচ ঐ সময়টাতেই তো চাকুরীদের দহরম-মহরম, গাল-গল্প করা, বিশেষ করে যখন বিনয়তোষের বাড়িতে রবির দৃপদুরে ভুরি-ভোজনের জন্য তাবৎ বাঙালীর ঢালাও নেমস্তম্ভ। অনুস্থান না করেই জানা গেল বাড়িুষ্যে ছোকরার দৃ-পায়ে দৃখানা গ্র্যাম্বড়া বড়া বড়া চক্কর। শনির দৃপদুরে আপিস ছুটি হতে না হ'তেই সে ছুট দেয় ইন্টিশান পানে। সেখানে কোন একটা গাড়ি পেলেই হল। টিকিট মিন্-টিকিটে চললো সে ইঞ্জিনের এক চোখা দৃষ্টিতে সে যোঁদিকে ধায়।

পূর্বেই বলেছি, এহেন সৃষ্টি-ছাড়া কর্মের জন্য সন্ন্যাসী-বেশ প্রশস্ততম। হিন্দু-মুসলমান টিকিট-চেকারের কথা বাদ দিন, সে যুগের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান দৃবে চেকার পর্যন্ত মিন্-টিকিটের গেরুয়াকে ট্রেন থেকে নামাতো না—বিড়বিড় করতে করতে আমিই একাধিক বার শুনছি, 'গড্ ড্যাম হোলি ম্যান—নাথিং

ছুইং।’ অর্থাৎ ওটা খোদার খাসী, কিছ্ছুটি করার ঘো নেই।’

আমাদের বাড়িঘরে ছোকরাটি অতিশয় চৌকশ তালেবর। দ্ব’টি উইক-এন্ডের বাউন্ডলিপনা করতে না করতেই আবিষ্কার করে ফেললে এই স্বল্প-রঞ্জন তথ্যটি—সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ের চক্করদ্ব’টি টাইমপীসের ছেঁড়া স্প্রিং-এর মত ছিটকে তার পা দ্ব’টিকেও ছাড়িয়ে গেল। বিশেষ করে বেদিন খবর পেল, সোঁরাশ্বেঁর বীরমগাম ওয়াচওয়ান থেকে আরম্ভ করে ভাওনগর দ্বারকাভীর্থ অবধি বহু ট্রেনে একটি ইম্পিশেল কামরা থাকে যার নাম ‘মেশিকেষ্ট কম্পার্টমেন্ট’; গেরদুয়া পরা থাকলেই সে কামরায় মিন্ টিকিটে উঠতে দেয়। সেখানে নাকি সাধু-সন্ন্যাসীরা আপোসে নির্বিঘ্নে আত্মচিন্তা-ধর্মচিন্তা পররঞ্জে মনোনিবেশ করতে পারেন। তবে নেহাত বেলেল্লা নাস্তিকদের মত্থে শূন্যেই সেখানে নাকি বিশেষ এক ধর্ম্মার গন্ধ এমনই প্রচণ্ড যে কাগে বগে সেখান থেকে বাপ-বাপ করে পালায়—দ্ব’শ্বেঁর আরো বাকী হাসিহেসে বলে, আসলে নিরীহ প্যামেঞ্জারদের ঐ কৈবল্য ধর্ম্মের উৎপাত থেকে বাঁচানোর জন্য ঐ খয়রাতী মেশিকেষ্ট কম্পার্টমেন্টের উৎপত্তি। কিন্তু আমাদের বাড়িঘরে তার খোড়াই পরোয়া করে—আসলে সে খাস দর্জিপাড়ার ছেলে, বাবা,—ছোকরা বয়েস থেকে বিস্তর ইটালিয়ান (অর্থাৎ ই’টের উপর বসে) ছিলিমফাটানো দেখেছে, দ্ব’চার কাচ্চা যে নাকে ঢোকে নি সে-কথাও কসম খেয়ে অস্বীকার করতে সে নারাজ। দ্ব’আ ভুআ না করে বাড়িঘরে তদ্দেই ধর্ম্মিখানি গেরদুয়া রঙে ছুপিয়ে মাদ্রাজী প্যাটোনে লুঙ্গিপানা করে পরলো, বাসন্তী রঙ করাতে গিয়ে গেরদুয়াতে জাতান্তরিত তার একখানি উড়ুনি আগের থেকেই ছিল। ‘ব্যোম ভোলানাথ’ বলতে বলতে বাড়িঘরে চাপলো ‘মেশিকেষ্ট কম্পার্টমেন্ট’। বাবাজী চলেছেন সোমনাথ দর্শনে।

আমাদের বাড়িঘরে কিপটে নয়। মিন্ টিকিটে চড়ার পরও তার ট’গকে ছুঁচোর নেত্য। তাই আহাঙ্গাদিতেও তাকে হাত টেনে হাত বাড়াতে হত পয়সা দিতে। তাই ঐ ব্যাপারে রিট্রেন্সমেন্ট করতে গিয়ে সে আবিষ্কার করলো আরেকটি তথ্য—পূরী তরকারি, দহিবড়া-শিঙাড়ার চেয়ে শিককাবাব ঢের সস্তা, পোষ্টাইও বটে। এক পেট পরোটা-শিককাবাব খেয়ে নিলে শূবো-শামি ঘিষামা-যামিনী নিশ্চিন্তি।

‘গোস্ত-রোটা কাবাব-রোটা’ যেই না ফেরিওয়ালা দিয়েছে হাঁক অমনি বাড়িঘরে তিন লক্ষের দরজার কাছে এসে তাকে দিল ডাক। লোকটা প্রথমে কেমন যেন হকচাকিয়ে গেল।—আসতে চাইল না। বাড়িঘরে ঘন ঘন ডাকে, ‘আরে দেখতে নাহি পারতা হয়, হাম তুমকো ডাকতে ডাকতে গলা ফাটাতা হয়—’ সে-হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা না বলে ‘লোষ্ট্রভাষা’ বলাই উচিত। এক-একটি লবজো যেন ই’টের থান।

ফেরিওয়ালা কাছে এসে কাঁচুমাচু হয়ে হিন্দী-গুজরাভীতে বদিয়ে বললে, ‘সাধুজী এ তোমার খাওয়ার জিনিস নয়। বাড়িঘরে গেল চটে। সে কি এতই অগা যে জানে না, শিককাবাব কোন্ অখাদ্য চাতুষ্পদ থেকে তৈরী হয়! তেড়ে বললে, ‘হাম ক্যা খাতা হয়, নাহী খাতা হয়, তোমার ক্যা ভেটকি-লোচন?’

ফেরিওলা তর্ক না করে,—‘পশট বোঝা গেল অনিচ্ছায়—কাবাব রুটি দিয়ে পয়সাগুলো না গুনেই ধামাতে ফেলে চলে গেল।

ট্রেন ছেড়েছে। বাঁড়ুঘ্যে কাবাব রুটি মুখে দিতে গিয়েছে—লক্ষ্য করে নি, কামরার থমথমে ভাবটা। এমন সময় দশটা হেড়ে গলায় একসঙ্গে হুংকার উঠলো, ‘এই শালা, ক্যা খাতা হৈ?’

প্রথমটায় বাঁড়ুঘ্যে বন্ধুতে পারে নি। আস্তে আস্তে তার চৈতন্যোদয় হতে লাগল—সম্ম্যাসীদের প্রাণঘাতী চিংকারের ফলে। ‘শালা পাষন্ড, নাস্তিক। অখাদ্য খায়, ওদিকে ধরেছে গেরুয়া। চোর ডাকাত কিংবা খুনীও হতে পারে। ফেরার হয়ে ধরেছে ভেক। এই করতে তো সাধু-সম্ম্যাসীদের বদনাম হয়েছে, যে তাদের কেউ কেউ আসলে ফেরারী আসামী।’

বাঁড়ুঘ্যে কি করে বলে সে জানতো না, ওটা অখাদ্য। একে মাংস, তায়—। ওদিকে ওরা ফেরিওলাতে বাঁড়ুঘ্যেতে যে কথা-কাটাকাটি হয়েছে সেটা যে ভালো করেই শুনছে, তাও ওদের কথা থেকে পারিষ্কার বোঝা গেল।

ওদিকে সম্ম্যাসীরা এক বাক্য স্থির করে ফেলেছে, এই নরপশুকে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দিয়ে এর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করানো হোক। দু’ একটা ষণ্ডা তার দিকে তখন এগিয়ে আসছে।

বাঁড়ুঘ্যের মনের অবস্থা কল্পনা করুন। চেন টানার ব্যবস্থা থাকলেও—সেদিকেও দৃশমনদের ভিড়। সে বিকল অবশ। এরকম অবশ্য-মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে কটা লোক?

একজন তার দু’ বাহুতে হাত দিয়ে ধরতেই কম্পার্টমেন্টের এক কোণ থেকে হুংকার এল, ‘ঠহরো।’ সবাই সেদিকে তাকালে। এক অতি বৃদ্ধ সম্ম্যাসী উপরের দিকে হাত তুলেছেন। ইনি এতক্ষণ এদের আলোচনায় যোগ দেন নি।

বললেন, ‘সাধুরা সব শোনো। এ’র গায়ে হাত তুলো না। ইনি কি ধরনের সম্ম্যাসী তোমরা জান না। উনি যে দেশ থেকে এসেছেন সে দেশের এক জাতের সম্ম্যাসীকে সব-কিছু খেতে হয়, লজ্জা ঘৃণা ভয় ও’দের ত্যাগ করতে হয়। শৃঙ্খল ত্যাগ নয় সানন্দে গ্রহণ করতে হয়। ইনি সেই শ্রেণীর সম্ম্যাসী। তোমরা তো জানো না সম্ম্যাসের গুরু বৃদ্ধদেব শ্রমোরেণ মাংস খেয়ে নিবর্ণ লাভ করেছিলেন। এ’কে একদিন ঐ পর্যায় উঠতে হবে। মৃত্যুভয় এ’র নেই। দেখলে না উনি এখনো পর্যন্ত একটি শব্দ, মাগ্ন করেন নি। ঘৃণা এবং ভয় থেকে উনি মুক্ত হয়েছেন। বোধ হয় একমাত্র লজ্জা-জয়িটি এখনো তাঁর হয় নি। তাই এখনো পরনে লজ্জাবরণ। সেও তিনি একদিন জয় করবেন।

তোমরা ও’র গায়ে হাত দিয়ে না।’

কতখানি বৃদ্ধ সম্ম্যাসীর যুক্তিবাদের ফলে, কতখানি তার সৌম্যদর্শন শাস্ত বচনের ফলে মারমুখো সম্ম্যাসীরা ঠাণ্ডা হল বলা কঠিন।

বাঁড়ুঘ্যে সেষাগ্রায় বেঁচে গেল।

দু-তিন স্টেশন পরই সব সম্ম্যাসী নেমে গেল ঐ বৃদ্ধ ছাড়া।

তখন তিনি বাঁড়ুঘ্যেকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, ‘বাবুজী

এখানায় ভগবানের দয়ায় বেঁচে গেছে, ভবিষ্যতে সাবধান হলো ।’

সেই থেকে ঐ বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সন্ধান আমি প্রতি তীর্থেরই করি। উনি যদি একবার আমার গৃহিণীকে বুদ্ধিয়ে দেন, আমিও একটা অবধূত-টবধূত তাহলে ওর খাই-বয়নাক্কা-নখ ঝামটা থেকে নিষ্কৃতি পাই। দশটা মারমুখো সন্ন্যাসীকে ঠান্ডা করতে পারলেন আর ওকে পারবেন না? কি জানি!

ভবঘুরে সব দেশেই আছে কিন্তু শীত এলেই ইয়োরোপের ভবঘুরেদের সর্বনাশ। ঐ জমাট বরফের শীতে বাইরে শোওয়া অসম্ভব। যদি বা কেউ পারকের বেণ্ডের উপরে খবরের কাগজ পেতে (এই খবরের কাগজ সত্যি শরীরটাকে খুব গরম করে রাখে; হিমালয়ের চটিতে যদি দু’খানা কম্বলেও শীত না ভাঙে তবে কম্বলের উপর পা থেকে মাথা পর্যন্ত কয়েকখানা খবরের কাগজের শীট সস্তপর্ণে বিছিয়ে নেবেন। আমি কোন কোন খানদানী ট্র্যাম্পকে বৃকে-পিঠে খবরের কাগজ জড়িয়ে তার উপর ছেঁড়া শাট পরতে দেখেছি) শোবার চেষ্টা করে তবে বেদরদ পদলিস এসে লাগায় হুনো। প্যারিসে তখন কেউ কেউ আশ্রয় নেয় নদীর কোনো একটা রিজের তলায় শুকনো ডাঙায়। সেখানেও সকালবেলা পদলিস আবিষ্কার করে শীতে জমে গিয়ে মরা ট্র্যাম্প। পাশে দু’একটা মরা চড়ুইও! গরমের আশায় মানুষের শরীরের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। গর্কি না কার যেন লেখাতে পড়েছি, এক ট্র্যাম্প ছোকরাকে সমস্ত রাত জড়িয়ে ধরে একটি ট্র্যাম্প মেয়ে সমস্ত রাত কাটিয়ে যেবার পথে—কিংবা বিপথেও বলতে পারেন—চলে গেল। (এদেশে বর্ষাকাল তাই বৃদ্ধদেবও সন্ন্যাসীর সংঘে আশ্রয় নিতে আদেশ দিয়ে গেছেন।)

এই বিপথে কথাটার উপর আমি জোর দিতে চাই। গ্লোব-ট্রটার জীবটি আদপেই ভবঘুরে নয়—যদিও একটা শব্দ যেন আরেকটা শব্দের অনুবাদ। গ্লোবট্রটার সমুখপানে এগিয়ে চলে, তার নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল আছে। ভবঘুরে যেখানে খুশী দু’চারদিন এমন কি দু’চার মাসও স্বচ্ছন্দে কাটায়, এমন কি কোনো দয়া শীলের আশ্রয়ে সুখেও কাটায়। কিন্তু হঠাৎ একদিন বলা-নেই কওয়া-নেই, হুট করে নেবে যায় রাস্তায়। কেন? কেউ জানে না। ওরা নিজেরাই জানে না। শুধু এইটুকু বলা যায়, সুখের নীড় তাদের বেশীদিন নয় না—নামে দুঃখের পথে; আবার দুঃখের পথে চলতে চলতে সন্ধান করে একটু সুখের আশ্রয়। দুটোই তার চাই, আর কোনটাই তার চাই নে। এ বড় সৃষ্টিছাড়া স্ব স্ব সৃষ্টিছাড়াদের।

যাদের ভিতরে গোপনে চুরি করার রোগ ঘাপটি মেরে বসে আছে—ওটাকে সত্যি দৈহিক রোগের মত মানসিক রোগ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে বলে এটার নাম ক্লেটোমেনিয়া—তাদের জন্য আমাদের শাস্ত্রকাররা বৎসরে একদিন চুরি করার—তাও ফলমূল মাত্র—অনুমতি দিয়েছেন। ওটা যেন একজন্ট পাইপ। টিক তেমনি হোলির দিন একুখানি বেএজেরার হওয়ার অনুমতি কর্তারা

আমাদের দিয়েছেন। এটাও অন্য আরেক ধরনের একজন্ট পাইপ।

জর্মন জাতটা একটু চিন্তাশীল। তারা স্থির করলে এই বাড়ি-ডুলেপনা যাদের রক্তে ঘাপটি মেরে বসে আছে—এদের নাম ভান্ডার-ফ্যাগোল অর্থাৎ ওয়াডারিং বার্ডজ্জ অর্থাৎ উড়ুঙ্কু পাখী—তাদের জন্য জায়গায় জায়গায় অতিশয় সস্তায় রেন্ট হাউস করে দাও, যেখানে তারা নিজে বেঁধে খেতে পারবে, যদি অতি সস্তায় তৈয়ারী খানা খায় তবে বাসন বতর্নমেজে দিতে হবে, যদি স্বাী বালিশের ওয়াড় বিছানার চাদর চায় তবে সেগুলো কিংবা আগের রাত্রের জন্য কারোর ব্যবহার-করা বাসি ওয়াড়-চাদর কেচে দিতে হবে যাতে করে, ইচ্ছে করলে, সে অতি ভোরেই ফের রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে পারে। ওদের রান্নাঘরে নিজের আলু-মালু স্বেদ্য করে খেলে আর চাদর ওয়াড় না চাইলে রাত্রি-বাস একদম স্বাী।

উড়ুঙ্কু পাখীরা অনেক সময় দল বেঁধে বেরোয়; সঙ্গে রান্নাবান্নার জিনিস এবং বিশেষ করে বাজনার যন্ত্র—ৎসী হারমোনিকা (হাত অর্গন) ব্যাজো, মাণ্ডলিন। ঐ সব রেন্ট হাউসের কমন রুমে তারা গাওনা-বাজনা নাচানাচি করে সমস্ত রাত কাটাতো। অনেকেই শনির দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোমের সকালে বাড়ি ফিরত। কেউ-কেউ পুরো গরমের ছুটি, কেউ-কেউ দীর্ঘ-তর অনির্দিষ্টকাল।

এ-সব আমার শোনা কথা।

রাস্তার ট্রাম্পকে অনেকেই লিফট দেয়। জোড়া পাখী যদি হয় তবে লিফট পাওয়া আরো সোজা, একটু কৌশল করলেই। ছেলেটা দাঁড়ায় গাছের আড়ালে। মেয়েটা ফ্রক হাটু পর্যন্ত তুলে গাটার ফিট করার ভান করে সুডৌল পা-টি দেখায়। রসিক নটবর গাড়ি থামিয়ে মধুর হেসে দরজা খোলেন। ছোকরা তখন আড়াল থেকে আস্তে আস্তে এসে পিছনে দাঁড়ায়, নটবর তখন ব্যাক-আউট করেন কি করে? করলেও দৈবাৎ। যে উড়ুঙ্কু পক্ষিনী আমাকে গল্পটি বলিছিল তার পা-টি ছিল সতাই সুন্দর। তা সে যাক গে।

অনেকেই আবার লিফট দিতে ডরায়। তাদের বিরুদ্ধে নিন্মের গল্পটি প্রচলিত :—

কুখ্যাত ডার্টমের জেলের সামনে সদ্য খালাসপ্রাপ্ত দুজন কয়েদী লিফটের জন্য হাত তুলছে। যে ভদ্রলোক মোটর দাঁড় করালেন তিনি কাছে এসে যখন বন্ধুতে পারলেন এরা কয়েদী তখন গড়িমসি করতে লাগলেন। তারা অনেক কাকুতি-মিনতি করে বোঝালে তাঁরা সামান্য চোর—খুনীটুনি নয়। সামনের টাউনে পৌঁছে দিলেই বাস ধরে রাতারাতি বাড়ি পৌঁছতে পারবে। ভদ্রলোক অনেকটা অনিচ্ছায়ই রাজী হলেন। পরের টাউনে ভদ্রলোকের ও বাড়ি। পরের টাউনে পৌঁছতেই লাইটিং টাহম হয়ে গিয়েছে। ওদিকে ও'র হেডলাইট ছিল খারাপ। পড়লেন ধরা। পদলিশ ফুটবোর্ডে পা রেখে নম্বর টুকে হিপ পকেটে নোটবুক-খানা রেখে দিয়ে চলে গেল। ভদ্রলোক আপসোস করে বললেন, তোমাদের সঙ্গে কথা কইতে যে তিন মিনিট বাজে খর্চা হল সেটা না করলে এতক্ষণ আমি বাড়ি পৌঁছে যেতুম। এখন পদলিশ কোর্টে আমার জেরবার হয়ে যাবে। লোকে কি

আর সাথে বলে কারো উপকার করতে নেই ! দুই খালাস পাওয়া কয়েদী হাসতে হাসতে গাড়ি থেকে নামার সময় বললে, ‘আপনার কিছ্‌ ভয় নেই, হুজুর, আপনার নামে কোনো সমন আসবে না । এই নিন সেই পুলিসের নোটবুন্ধ— যাতে আপনার গাড়ীর নম্বর টোকা ছিল । আমরা পুলিসের পকেট তখনই পিক করেছি । আসলে পকেট মেরেই ধরা পড়াতে আমাদের জেল হয়েছিল । আপনি আমাদের উপকার করতে গিয়ে বিপদে পড়বেন, এটা আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি কি প্রকারে বলুন !

আমি নিজে কখনো খানদানী বাড়ি-ভুলে ব’নে বাড়ি থেকে বেরোই নি ; তবে হে’টে সাইক্লো, আধা-বোটে—অর্থাৎ কোনো প্রকারের রাহা খরচা না করে হাই-কিং করেছি বিস্তর ।

আমি তখন রাইন নদীর পারে বন্ শহরে বাস করি । রাইনের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার জন্য পৃথিবীর লোক সেখানে প্লেজার স্টীমারে করে উজান-ভাটা করে । আমিও একবার করার পর আমার মনে বাসনা জাগলো ঐ অঞ্চলেই হাইক্‌ করে রাইন তো দেখবো দেখবোই, সঙ্গে সঙ্গে ঐ এলাকার গিরি-পর্বত, উপত্যকার ক্ষেতখামার, গ্রামাঞ্চলের বাড়ি ঘরদোর, নিরিবিাল গ্রাম্যজীবন সব কিছুই দেখে নেব । আর যদি রাইন অঞ্চল ভালো না লাগে তবে চলে যাব যৌদিক খুশী ।

আমার ল্যান্ড-লেডিই আমাকে রাস্তা-দুরন্ত করে দিলে । মাথায় প্রকাণ্ড ঘেরের ছাতা-হ্যাট । পশমের পুরু শার্টের উপর চামড়ার কোট । চামড়ার শার্ট । সাইক্লোমোজা । ভারী বটু জুতো ।

শম্বাথে’ আন্টপ্‌ন্টে বাঁধা একটি হেভার-স্যাঁক । তার ভিতরে রাস্তার সরঞ্জাম, অর্থাৎ অতি, অতি হাতকা এবং পাতলা কিন্তু বেশ শক্ত এলুমিনিয়ামের সসপেন জাতীয় বস্তু, প্লেট, চামচে—ছুরি-কাটা নিই নি—স্পির্টিং স্টোভ এবং অত্যন্ত ছোট সাইজের বলে দ্বার মাগ হাঁড়ি চড়ানো যায়—কয়েক গোলা চাঁব, কিণ্ডিং মাখন, নুন-লংকা আর একটি রবারের বালিশ—ফু’ দিয়ে ফোলান যায় ।

আর বিশেষ কিছ্‌ ছিল বলে মনে পড়ছে না । এসবে আমার খচ’া হয়েছিল অতি সামান্যই, কারণ বাড়ির একাধিক লোক এসব বস্তু একাধিক বার ব্যবহার করেছেন । এস্টেক কোট পাতলদুনে একাধিক তালি ! ল্যান্ড-লেডি বদ্বিয়ে বললে, উকীলের গাড়নের মত এ-সব বস্তু যত পুরোন হয় ততই সে খানদানী ট্র্যাপ !

পকেটে হাইনের ‘বুথ ড়ার লীডার’—কবিতার বই । কবি হাইনে বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় এ বইয়ের কবিতাগুলো লিখেছিলেন । এতে রাইন নদী বার বার আত্মপ্রকাশ করেছেন ।

রবির অতি ভোরে গির্জার প্রথম ম্যাসে হাজিরা দিয়ে রাস্তায় নামলুম ।

একটা কোঁকা ছাড়া হাইকিঙে বেরোতে নেই। অবশ্য সর্বক্ষণ সদর রাস্তার উপর দিয়ে চললে তার বড় প্রয়োজন হয় না, কিন্তু সদর রাস্তার দু'পাশে আলুক্ষেত, আপেল বাগান থাকে না, লোকজন যারা থাকে তারাও ট্রাম্প ভিখিরি পছন্দ করে না। পিঠের ব্যাগটা খালি হয়ে গেলে সেটা বিন-খর্চায় ভরে নিতে হলে অজ পাড়াগাই প্রশস্ততম।

কিন্তু যত প্রচণ্ড শিক্ষিত দেশই হোক না কেন পাড়াগায়ে দু' একটা বদ-মেজাজী কুকুর থাকবেই। এবং তারা পয়লা নম্বরের শব্দ। ছিঁমছিম ফিটফিট সড়ট পরে গটগট করে চলে যান—কিচ্ছুটি বলবে না। কিন্তু আপনি বেরিয়েছেন হাইকিঙে—যতই ফিটফিট হয়ে বাড়ি থেকে বেরোন না কেন, লজ্জা কাক বক তাড়ানোর স্কয়ার-ক্রো বনে যেতে আপনার দু'দিনও লাগবে না। দু'দিন কেন, গাছতলায় এক রাত কাটানোর পর সকালবেলাই সড়টমুটের যা চেহারা হয় তার মিল অনেকটা ভ্যাগাবন্ড চার্লিরই মত, এবং ঐ শব্দ কুকুরগুলো তখন ভাবে, আপনাকে ভগবান নির্মাণ করেছেন নিছক তাদের ডিনার লাগের মাংস যোগাবার জন্য—সিঙিকে যেমন হরিণ দিয়েছেন, বাঘকে যে রকম শূয়ার দিয়েছেন। পেছন থেকে হঠাৎ কামড় মেরে আপনার পায়ের ডিম কি করে সরানো যায় সেই তাদের একমাত্র উচ্চাভিলাষ। ওটাতে আপনারও যে কোনো প্রকারের প্রয়োজন থাকতে পারে সে বিষয়ে ওরা সম্পূর্ণ উদাসীন।

আমার ল্যান্ড-লোড হাতে লাঠি তুলে দিতে দিতে বললে, এক জার্মান গিয়েছে ঘোর শীতকালে স্পেনে। স্পেনের গ্রামাঞ্চল যে বিশ্ব-সারময়ের ইউনাইটেড নেশন সেটা ভদ্রলোক জানতেন না। তারই গন্ডা তিনেক তাঁকে দিয়েছে হুড়ো। ভদ্রলোক আর কিছু না পেয়ে রাস্তা থেকে পাথর কুড়োতে গিয়ে দেখেন সেগুলো জমিতে জোর সেঁটে রয়েছে—আসলে হয়েছে কি শীতে জল জমে বরফের ভিতর সেগুলো মোক্ষম আটকে গেছে। ভদ্রলোক খাঁটি গ্লোব-ট্রটারের মত আত্মচিন্তা করলেন, 'অভূত দেশ! কুকুরগুলোকে এরা রাস্তায় ছেড়ে দেয়, আর পাথরগুলোকে চেন দিয়ে বেঁধে রাখে।'।

ল্যান্ড-লোডকে বলতে হল না—আমি বিলক্ষণ জানতুম, তদুপরি আমার শ্যামমনোহর বর্ণটি অষ্টাবক্র স্বক্ধ-কটি—ভদ্রাভদ্র যে কোনো সারময়ে সন্তানই এই ভিনদেশী চীজটিকে তাড়া লাগানো একাধারে কতব্যকর্ম সম্পাদন এবং আয়বর্ধন রূপে ধরে নেবে—লক্ষ্য করেন নি চীনেম্যান আমাদের গায়ে ঢুকলে কি হয়!

কোঁকাটা ঠুকতে ঠুকতে শহর ছেড়ে মেঠো পথে নামলুম।

খুঁটান দেশে রববারে ক্ষেতখামারের কাজও ক্ষান্ত থাকে। পথের দু'ধারের ফসল ক্ষেতে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। রাস্তায়ও মাত্র দু'একটি লোকের সঙ্গে অনেকক্ষণ চলার পর দেখা হয়। তারাও গ্রামের লোক বলে হ্যাট তুলে গুটেন-টাথ বা গুটেন মর্গেন (শুভদিন বা শুভ দিবস) বলে আমাদের অভিবাদন

জানায়। বিহার মধ্য-প্রদেশের গ্রামাঞ্চলেও ঠিক এই রকম অপরিচিত জনকেও ‘রাম রাম’ বলে অভিবাচন করার পদ্ধতি আছে। কাবুলে তারও বাড়ী। একবার আমি শহরের বাইরের উপত্যকায় বেড়াতে গিয়েছিলুম। রাস্তা প্রায় জনমানবহীন। বিরাট শিলওয়ার এবং বিরাটতর পাগড়ী পরা মাত্র একটি কাবুলী ধীরে মন্থরে চলেছে—গ্রামের লোক শহুরেদের তুলনায় হাঁটে অতি মন্থর গমনে এবং তারো চেয়ে মন্দ গতিতে চলে যারা একদম পাহাড়ের উপর থাকে। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি তাকে ধরে ফেললুম। ঘাড় ফিরিয়ে অলস কৌতুহলে আমার দিকে তাকিয়ে, ‘ভালো তো? কুশল তো?’ শুধিয়েই আমার দিকে এক গুচ্ছ স্যালাড পাতা এগিয়ে দিলে। এখানে এটিকেট কি বলে জামি নে—আমি একটি পাতা তুলে নিলুম। তখন এগিয়ে দিলে বাঁ হাতের পাতার ঠোঙাটি। সেটাতে দেখি হলদে-লালচে রঙের ঘন কি একটা পদার্থ। আমি বোকার মত তাকিয়ে আছি দেখে সে নিজে একখানা স্যালাড পাতা নিয়ে ঐ তরল পদার্থে গুত্তা মেরে মুখে পুরে চিবোতে লাগল। আমিও করলুম। দেখি, জিনিসটা মধু এবং অভ্যস্তম মধু। ঐ প্রথম শিখলুম, কাবুলীরা তেল-নুন-সিরকা দিয়ে স্যালাড পাতা খায় না, খায় মধু দিয়ে। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়, মোস্তাফা কথা দেহাতী কাবুলী যদি কিছু খেতে খেতে রাস্তা দিয়ে চলে তবে পরিচিত অপরিচিত সবাইকে তার হিস্যা এগিয়ে দেবেই দেবে। এবং স্ট্রিক্টলি ব্রাদারলি ডিভিজন—অর্থাৎ আমার একখানা পাতা চিবানো শেষ না হতে হতেই আরেকখানা পাতা এবং ‘মধুভাণ্ড’ এগিয়ে দেয়। পরে গ্রামে ঢোকা মাত্রই সে আমাকে এক চায়ের দোকানে টেনে নিয়ে যায় এবং দাম দেবার জন্য আথেরে বিস্তর ধস্তাধিস্তি করে। কিন্তু থাক সে কথা—এটা আছে ‘কাবুলে ভবঘুরেমি’ অনুচ্ছেদে।

এখানে স্থির করলুম, অপরিচিতকেও নমস্কার জানানো যখন এ-দেশে রেওয়াজ তবে এবার থেকে আমিই করবো।

আধঘণ্টাটক পরে দেখি এগিয়ে আসছে একজন। বয়সে আমার চেয়ে বড়ও বটে। ও মোকা পাবার পূর্বেই আমি বেশ চেঁচিয়ে বললুম, ‘গ্র্যুস গট্!’

এখানে নব জন্ম শিষ্কারীদের বলে রাখি, জন্মভাষী জন্ম এবং সুইস সচরাচর ‘গুটেনাখ গুড্ ডে’, শুধুভাষী ইত্যাদি বলে থাকে, কারণ এরা বহু সেকুলারাইজড (ধর্মনিরপেক্ষ) হয়ে গিয়েছে। পক্ষান্তরে অষ্ট্রিয়াবাসী জন্মভাষীগণের অনেকেই এখনো ‘গ্র্যুস গট্’—‘ভগবানের আশীর্বাদ’ বলে থাকে। এদেশের মুসলমানরা আল্লাকে স্মরণ করেই ‘সালাম’ বলেন, হিন্দুরা ‘রাম রাম’ এবং বিদ্যায় নেবার বেলা গুজরাতে ‘জয় জয়! জয় শিব, জয় শংকর।’

স্পষ্ট বোঝা গেল লোকটা ‘গ্র্যুস গট্’র জন্য আদর্শেই তৈরী ছিল না। ‘গুটেনাখ, গুটেনাখ’ বলে শেষটায় বার কয়েক ‘গ্র্যুস গট্’, বলে সমানে দাঁড়াল। শুধালে, ‘কোথায় যাচ্ছ?’

ইংলণ্ডে গ্রামাঞ্চলের এটিকেট জানি নে। সেখানেও বোধ হয় শহুরেদের কড়াকড়ি নেই।

বললুম, ‘বিশেষ কোথাও যাচ্ছি নে। ঐ সামনের গ্রামটায় দুপুরবেলা একটু জিরোবো। রাতটা কাটাবো, তারপরের কোনো একটা গ্রামে, কিংবা গাছ-তলায়।’

বললে, ‘আমি যাচ্ছি শহরে।’ তার পর বললে, ‘চলো না, ঐ গাছতলায় একটু জিরোনো যাক।’ আমি বললুম, ‘বিলক্ষণ।’ ভবঘুরেমির ঐ একটা ডাঙর সন্নিবেশে। না হয় কেটেই গেল ঐ গাছতলাটায় ঘণ্টা কয়েক—যদিও ওটা তেঁতুল গাছ নয় এবং ন’জন সৃজন তো এখনো দেখতে পাচ্ছি নে।

চতুর্দিক নির্জন নিস্তব্ধ। ইয়োরোপেও মধ্যদিন আসন্ন হলে পাখী গান বন্ধ করে। শূন্য দূর অতি দূর থেকে গির্জায় ঘণ্টা অনেকক্ষণ ধরে বেজে যাচ্ছে। রবির দুপুরের ঐ শেষ আরতি—হাই ম্যাস—তাই অনেকক্ষণ ধরে ঘণ্টা বেজেই চলেছে দূর-দূরান্তে—ঐ বহুদূরে যেখানে দেখা যাচ্ছে ভিনাস পাহাড়ের চূড়ার উপর গাছের ডগাগুলো।

বললে, ‘আসলে পাইপটা অনেকক্ষণ টানি নি; তাই এই জিরোনো।’ তারপর শুধালে, ‘তোমার দেশ কোথায়?’ আমি বললুম, ‘আমি ইন্ডার (ভারতীয়)।’ এমনি চমক খেল যে তার হ্যাটটা তিন ইঞ্চি কাণ হয়ে গেল। তাৎলালে, ‘ইন্ডিয়ানার?’

‘ইন্ডার’ অর্থাৎ ‘ইন্ডিয়ান’, আর ‘ইন্ডিয়ানার’ অর্থ ‘রেড্‌ ইন্ডিয়ান।’ দেহাতীত্বের কথা বাদ দিল, শহরে অর্ধ-শিক্ষিতেরাও এ দুটোতে আকছারই ঘুলিয়ে ফেলে। অনেক রকম করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, আমি কোন দেশের লোক। শেষ পর্যন্ত সে বুঝতে পেরেছিল কি না জানি নে তবে তার বিস্ময় যে চরমে পৌঁছেছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আর বার বার শুধু মাথা নাড়ে আর বলে, ‘বিপদে ফেললে, বড় বিপদে ফেললে!’

আমি শুধালুম ‘কিসের বিপদ?’

‘কত ভবঘুরে, বাউঁড়ুলে কত দেশ-দেশান্তরে যাচ্ছে—আমার তাতে কি! কিন্তু তুমি অত দূর দেশের লোক, আমার গাঁয়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছ, আমার সঙ্গে আলাপ হল আর তোমাকে আমার বাড়ি নিয়ে যেতে পারলুম না—এতে দুঃখ হয় না আমার?’

তারপর মরীয়া হয়ে বললে, ‘আসলে কি জানো, আমার স্ত্রী একটা জাঁতকল? দুনিয়ার লোকের হাড় গর্দিয়ে দেওয়াই ও’র স্বভাব। না হলে তোমাকে বলতুম, আমার বাড়িতে বিকেল অবধি জিরিয়ে নিতে—আমিও ফিরে আসতুম।’ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, ‘কত লোক ইয়ার-দোস্তকে দাওয়া করে খাওয়ায়, গাল-গল্প করে, আমার কপালে সেটি নেই।’

আমি তাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, তার সহৃদয়তাই আমাকে যথেষ্ট মন্থ করেছে, যদি সম্ভব হয় তবে ফেরার মত্থে তার খবর নেব।

পুনরায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, ‘কিছু মনে করো না, কিন্তু ভবঘুরেদের কি আর কথা রাখবার উপায় আছে? আমার নামটা কিন্তু মনে রেখো—টেরমের।’

আমি বললুম, ‘সে কি ! আমি তো ফের বন্ শহরে ফিরে যাবো । এই নাও আমার ঠিকানা । সেখানে আমার খবর নিয়ো । দৃজনাতে ফুর্তি করা যাবে ।’

খুশী হয়ে উঠলো । বললে, ‘বুড়ই জরুরী কাজ তাই । উকিল বসে আছে, এই রববারেও, আমার জন্যে । টাকাটা না দিলে সোমবার দিন কিস্তি খেলাপ হবে ।’

আমি বললুম, ‘ভগবান্ তোমার সঙ্গে থাকুন ।’ বললে, ‘যতদিন না আবার দেখা হয় ।’

দশ পা এগিয়েছি কি না, এমন সময় শূর্নি পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলছে, ‘ঐ সামনের মোড় নিতেই দেখতে পাবে ডানদিকে এক-পাল তেড়া চরছে । ওখানে কিস্তি দাঁড়িয়ে না । ভেড়াগুলোকে সামলায় এক দজাল আলসেশিয়ান কুকুর । ওর মনে যদি সন্দেহ হয় তোমার কোনো কুমৎলব আছে, তবে বড় বিপদ হবে ।’

কথাটা আমার জানা ছিল, কিস্তি শ্মরণ ছিল না । বললুম, ‘অনেক ধন্যবাদ ।’

॥ ৪ ॥

ইউরোপ তখনো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধকল কাটিয়ে উঠতে পারে নি । এর বর্ণনা সে মহাদেশের কবি, চিত্রকার, বস্তুত চিন্তাশীল তথা দরদী ব্যক্তি মাগ্রেই দেওয়া সম্বন্ধেও বলতে হয়, না দেখলে তার আংশিক জ্ঞানও হয় না । তুলনা দিয়ে এদেশের ভাষায় বলা যেতে পারে, বন্যা ও ভূমিকম্পের মার যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন এর জের দেশকে কতদিন ধরে টানতে হয় ।

মোড় নিতেই দেখি, বাঁ দিকের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে নাসপাতি-ভর্তি ঠেলা গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে রাজ-আল ধরে আসছে একটি বয়স্ক লোক । সব প্রথমই চোখে পড়ল, তার ডান হাতখানা কনুই অবধি নেই । হাতের আঙ্গিন ভাঁজ করে ঘাড়ের সঙ্গে পিন করা । বড় রাস্তায় সে উঠলো ঠিক আমি যেখানে পেঁচিছি সেখানেই । আমি প্রথমটায় ‘গ্যুন্স্ গট্’ বলে তার অনুমতির অপেক্ষা না করেই গাড়িটায় এক হাত দিয়ে ঠেলতে লাগলুম । এ অভিবাদনে লোকটি প্রথম চাষার মত মোটেই হকচকালো না, এবং প্রত্যুত্তরে ‘গ্যুন্স্ গট্’ বলে আর পাঁচজনেরই মত ‘গুটেনটাখ’—‘সুদ্বিবস’ জানালে । তারপর বলল, ‘ও গাড়ি আমি একাই ঠেলতে পারি । নাসপাতিগুলোর প্রতি তোমার যদি লোভ হয়ে থাকে তবে অত হ্যাঙ্গামা পোহাতে হবে না—যত ইচ্ছে তুলে নাও ।’ আমি এই অন্যায় অপবাদে চটি নি—পেল্লুম গভীর লজ্জা । কী যে বলল ঠিক করার পূর্বেই সে বললে, ‘হাত না দিলেও দিতুম ।’

আমি তখন মোকা পেয়ে বললুম, ‘নাসপাতি খেতে আমি ভালোবাসি

নিশ্চয়ই, এবং তোমারগুলো যে অসাধারণ সরেস সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু ঠেলা দেবার সময় আমার মনে কোনো মতলব ছিল না, এবং তুমিও যে স্বচ্ছন্দে ছোট রাস্তা থেকে বড় রাস্তার উঁচুতে গাড়টাকে ঠেলে তুললে সেও আমি লক্ষ্য করেছি। আমি হাত দিয়েছিলুম এমনি। পাশাপাশি যাক্, কথা বলতে বলতে যাবো, তখন দুজনাই যে একই কাজ করতে করতে যাবো সেই তো স্বাভাবিক—এতে সাহায্য লোভ কোনো কিছুরই কথা ওঠে না।’

চাষা হেসে বললে, ‘তোমার রসবোধ নেই। আর তুমি জানো না, এবারে নাসপাতি এত অজস্র একই সঙ্গে পেকেছে যে এখন বাজারে এর দর অতি অল্পই। এই সামনের গ্রামগুলোর ভিতর দিয়ে যখন যাবে তখন দেখতে পাবে গাছতলায় নাসপাতি পড়ে আছে—কুড়িয়ে নিয়ে যাবার লোক নেই। যত ইচ্ছে খাও, কেউ কিছু বলবে না।’

আমি বললুম, ‘আমাদের দেশেও এই রেওয়াজ।’

কোথায়, কোন দেশ, ইন্ডিয়ান আর রেড-ইন্ডিয়ানে পুনরায় সেই গুবলেট, আরপর আশ-কথা পাশ-কথা সেরে সর্বশেষে নিজেই বললে, তার হাতখানা গেছে গত যুদ্ধে। হেসে বললে, ‘লোকে বলে, তারা কর্ণার পাত্র হতে চায় না; আমার কিন্তু তাতে কোনো আপত্তি নেই। হাত গিয়ে কত সুবিধে হয়েছে বলবো! গেরস্তালীর কোনো কিছু করতে গেলে বউ বেটি হা হা করে ঠেকায়, যদিও আমি এক হাত দিয়েই দুনিয়ার চোন্দ আনা কাজ করতে পারি। চাষবাস, ফলের ব্যবসা, বাড়ি মেরামতী সবই তো করে যাক্—যদিও মেয়ে-জামাই ঠাকাবার চেষ্টা করেছিল এবং শেষটায় করতে দিলে, হয়তো এই ভেবে যে কিছু না করতে পেলে আমি হন্যে হয়ে যাব।’

আমি বললুম, ‘তোমরা তো খৃষ্টান; তোমাদের না রববারে কাজ করা মানা।’

লোকটা উত্তর না দিয়ে হকচাকিয়ে শূদ্বালে, ‘তুমি খৃষ্টান নও?’

‘না।’

‘তবে কি?’

‘হীদেন।’

আমি জানতুম, পৃথিবীর খৃষ্টানদের নিরানুস্বই নয়। পয়সা বিশ্বাস করে, অখৃষ্টান মাত্রই হীদেন। ‘তা সে মুসলমান হোক আর বণ্টুই হোক। নিতান্ত ইহুদীদের বেলা হয়তো কিঞ্চৎ ব্যত্যয়, অবশ্য সেটা পূর্বেই নেয় তাদের বেধড়ক ঠেঙিয়ে। তাই ইচ্ছে করেই বললুম, হীদেন।’

লোকটা অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করে বললে, ‘আমি গত যুদ্ধে ঈশ্বরকে হারিয়েছি। তবে কি আমিও হীদেন?’ নিজের মনে যেন নিজেকেই শূদ্বালে।

আমি বললুম, ‘আমি তো পরমেশ্বরে বিশ্বাস করি।’

এবারে সে স্তম্ভিত। এবং শব্দার্থে। কারণ গাড়ি ঠেলা বন্ধ করে আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালে। শেষটায় বললে, ‘এটা কিন্তু আমাকে সোজা করে দিতে হবে। আমাদের পাদ্রী তো বলে, তোমরা নাকি গাছ, জল এই সব

পূজো করো, পাথরের সামনে মানুস বলি দাও ।’

আমি বললুম, ‘কোনো কোনো হীদেন দেয়, আমরা দিই নে । আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বরকে ভক্তি দিলেই যথেষ্ট ।’

বোকার মত তাকিয়ে বললে, ‘তবে তো তুমি খৃষ্টান ! আমাকে সব-কিছু বুঝিয়ে বলো ।’

আমি বললুম, ‘থাক । ফেরার সময় দেখা হলে হবে ।’

তাড়াতাড়ি বললে, ‘সরি, সরি । তুমি বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ । ঐ তো সামনে গ্রাম । আমার বাড়িতে একটু জিরিয়ে যাবে ?’

আমি টেরমেরের স্মরণে শূধালুম, ‘তোমার বউ বুঝি টেরমেরের বউয়ের মত খাণ্ডার নয় ?’

সে তো অবাক । শূধালে ‘ওকে তুমি চিনলে কি করে ?’ সব কিছুর খুঁলে বললুম । ভারী ফুর্তি অনুভব করে বলল, ‘টেরমের একটু দিলদরিয়া গোছ লোক আর তার বউ একটু হিসেবী—এই যা । আর এ-সব ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করলেই চিন্তা বাড়ে । যুদ্ধের সময়, আমার এক জর্ম’নের সঙ্গে আলাপ হয়—সে বুলগেরিয়াতে বিয়ে করে বসবাস করছিল । তিন বছর সুখে কাটাবার পর একদিন তার স্ত্রীর এক বাণ্ধবী তাকে নিজ’নে পেয়ে শূধালে, “তুমি তোমার বউকে ভালোবাসো না কেন—অমন লক্ষ্মী মেয়ে ।” সে তো অবাক ! শূধালে “কে বললে ? কি করে জানলে ?” বাণ্ধবী বললে “তোমার বউ বলেছে, তুমি তাকে তিন বছরের ভিতর একদিনও ঠ্যাঙাও নি !” শোনো কথা !’

আমি অবাক হয়ে শূধালুম, ‘আমি তো বুঝতে পারছি নে ।’

সে বললে, ‘আমিও বুঝতে পারি নি, প্রথমটায় ঐ জর্ম’ন স্বামীও বুঝতে পারে নি । পরে জানা গেল, মেয়েটা বলতে চায়, এই তিন বছর নিশ্চয়ই সে কোনো না কোনো পর-পুরুষের সঙ্গে দু’একটি হাসিঠাট্টা করেছে, স্বামী দেখেছে, কিন্তু পরে ঠ্যাঙায় নি । তার অর্থ, স্বামী তাকে কোনো মূল্যই দেয় না । সে যদি কাল কোনো পর-পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যায়, তবে স্বামী কোনো শোক করবে না, নিশ্চিন্ত মনে আরেকটা নয়া শাদী করবে । ভালবাসলে ওকে হারাবার ভয়ে নিশ্চয়ই ওকে ঠেঙিয়ে সোজা রাখতো ।’

আমি বললুম, ‘এ তো বড় অশুভ যুক্তি !’

‘আমিও তাই বলি । কিন্তু ঐ করে বুলগেরিয়া চলছে । আর এদেশের বউকে কড়া কথা বলেছি কি সে চললো ডিভোসের জন্য । তাই তো তোমায় বললুম, ওসব নিয়ে বস্ত্র বেশী ভাবতে নেই । লড়াইয়ে বহু দেশের জাত-বেজাতের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে । অনেক দেখছি । অনেক শিখছি ।’

আমার মনে পড়ল ওরই দেশবাসী রেমাকের ‘পশ্চিম রণাঙ্গন নিশ্চূপ’ বই-খানার কথা । সেখানে তো সব কটা সেপাই বাড়ি ফিরেছিল—অর্থাৎ যে কটা আদর্শেই ফিরেছিল—সর্বসত্তা তত্ত্বতায় নিমজ্জিত করে । আদর্শবাদ গেছে, ন্যায়-অন্যায়-বোধ গেছে ; যেটুকু আছে সে শূধু যাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অহরহ মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে তাদের জন্য । দেশের জন্যে আত্মদান, জাতির

উন্নতির জন্য সর্বস্ব ত্যাগ, ফ্রান্সকে পরাজিত করার জন্য জীবন-দান—এসব বললে মারমুখে হয়ে বেআইনী পিস্তল নিয়ে তাড়া লাগায়।

নাসপাতিওলাকে শূদ্রোতে সে বললে সে বইটাই পড়ে না। খবরের কাগজ পড়ে বাজার দর জানবার জন্য, আর নিতান্তই যদি কোনো রগরগে খুন কিংবা কেলেকারি কেছার বয়ান থাকে। তবে হ্যাঁ, ওর মনে পড়ছে ফিল্মটা নার্কি জর্মানেতে বারগ করে দেওয়া হয়েছিল—ওর মেয়ের মুখে শোনা। আমি শূদ্রালুম, ‘ছবিটা দেখে ছেলেছোকরাদের লড়াইয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা হবে বলে?’ বললে, ‘না, ওতে নার্কি জর্মনদের বড় বর্বররূপে দেখানো হয়েছে বলে।’ তখন আমার মনে পড়ল, ফ্রান্সেও দেখাবার সময় যে অংশে ফরাসী নারীরা ক্ষুধার তাড়ায় জর্মন সেপাইদের কাছে রুটির জন্য দেহ বিক্রয় করার ইঙ্গিত আছে সেটা কেটে দেওয়া হয়।

অনেকক্ষণ দুজনাই চুপচাপ। নাসপাতিওলা ভাবছে। হঠাৎ বললে, ‘পিছন পানে তাকিয়ে আর লাভ কি? যারা মরেছে তারা গেছে। যারা পাগল হয়ে গিয়েছে, যাদের মূখ এমনই বিকৃত হয়েছে যে দেখলে মানুষ ভয় পায়, যাদের হাত পা গিয়ে অচল হয়ে আছে নিছক মাংসপিণ্ডবৎ, তাদের বড় বড় হাসপাতালে লুটকিয়ে রাখা হয়েছে; আর আত্মীয়স্বজনদের বলা হয়েছে তারা মারা গিয়েছে—এরাও নার্কি ফিরে যেতে চায় না। আর আমার হাল তো দেখছই।’

আমাদের গ্রামের সব কিছু থিতুয়ে যাওয়ার পর একটা ট্রাজেডির দিকে সঙ্কলেরই নজর গেল। একটা ছেলে গ্রাম থেকে ফিরে এসে শোনে, তার অবত-মানে তার বাগদস্তা মেয়েটি পরপুরুষের সঙ্গে প্রণয় করেছিল। এতে আর নতুন কি? লড়াইয়ের সময় সব দেশেই হয়েছে এবং হবে। মেয়েটা তবু পদে আছে—জারজ সন্তান জন্মায় নি। আর সেই দু’দিনের প্রেমিক কবে কোথায় চলে গেছে কে জানে!

এ অবস্থায় আর পাঁচটা ছেলে অন্য মেয়ে নেয়, কিংবা ক্ষেমাঘোষা করে আগের-টাকেই বিয়ে করে। এ হয়ে গেল মনমরা। সমস্ত দিন ছন্দের মত ঘুরে বেড়ায়, কারো সঙ্গে কথাবার্তা কয় না, আমাদের পীড়াপীড়িতেও বিয়ার খেতে আসে না। মেয়েটা নার্কি একাধিকবার তার পায়ে ধরে কেঁদেছে। সে কিছু বললে না।

ছোট গাঁ, বোঝা অবস্থাটা। গির্জায়, রাস্তায়, মন্দির দোকানে প্রতিদিন আমাদের একে অন্যের সঙ্গে যে কতবার কথা হয় ঠিকঠিকানা নেই। মেয়েটা করুণ নয়নে তাকায়, ছেলেটা ঘাড় ফিরিয়ে নেয়। আমরা যারা তখন সামনে পড়ি, বোঝা আমাদের অবস্থাটা। ছেলেটা সামনে পড়লে আমাদের মুখ গম্ভীর, মেয়েটা সামনে পড়লে অন্যদিকে তাকাই, আর দুজনা সামনে পড়লে তো চরম। ছেলেটা যখন মদ্রুস্বা, পুরুনো দিনের ইয়ার-বন্দী ইস্তেক পান্নী সায়েব কারো কথায় কান দিলে না, তখন মেয়েটাকে বলা হল সে যেন অন্য একটা বেছে নেয়। যদিও বরের অভাব তবু সৃশ্বর এবং পয়সাওয়ালার মেয়ে বলে

পেয়েও যেতে পারে। দেখা গেল, সেও নারাজ।

নাসপাতিওলা রাস্তায় থেমে বলল, 'এই যে বাড়ি পেঁছে গিয়েছি। চলো ভিতরে।'

আমি বললুম, 'না ভাই, মাফ করো।'

'তবে ফেরার সময় খবর নিয়ো। বাড়ি চেনা রইল।'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়। কিন্তু ওদের কি হল?'

'কাদের? হ্যাঁ, ঐ দুটোর। একদিন ঐ হোথাকার (আঙ্গুল তুলে দেখালে) হুডাবায় পাওয়া গেল লাশ।'

আমি শুধালুম, 'ছেলেটার?'

'না মেয়েটার।'

'আর ছেলেটা?'

'এখনো ছন্দের মত ঘুরে বেড়ায়। একদিন আসবে। থাকো না—আলাপ করিয়ে দেব।' আমি পা চালিয়ে মনে মনে বললুম, এ গ্রাম বিষবৎ পরিত্যজ্য।

॥ ৫ ॥

সিনেমার কল্যাণে আজকাল বহু নৈসর্গিক দৃশ্য, শহর-বাড়ি, পশুপক্ষী বিনা মেহনতে দেখা যায়। এমন কি বাস্তবের চেয়েও অনেক সময় সিনেমা ভালো। বাস্তবে বেল্‌কনি থেকে রানীকে আর কতখানি দেখতে পেলুম? সিনেমায় তাঁর আঁটি, জুতোর বকলস, হ্যাটের সিল্কটি পর্যন্ত বাদ গেল না। আলীপুরে গিয়ে বাঘ-সিঙ না দেখে সিনেমাতে দেখাই ভালো—ক্যামেরামেন যতখানি প্রাণ হাতে করে ক্লোজ-আপ নেয় অতখানি ঝুঁকি নিতে আপনি আমি নারাজ।

বিলিতি ছবির মারফতে তাই ওদের শহর, বারু, রেগুটরেন্ট, নাচ, রাস্তা-বাড়ি, দালান-কোঠা আমাদের বিস্তর দেখা হয়ে গিয়েছে কিন্তু গ্রামের ছবি এরা দেখায় অতপই। গ্রামে বৈচিত্র্যই বা কি, সেখানে রোমান্সই বা কোথায়? অন্তত সিনেমাওলাদের চোখে সেটা ধরা পড়ে না—ধরা পড়ে এখনো আর্টিস্টদের কাছে। ইউরোপীয় গ্রাম্যজীবনের ছবি এখনো তাঁরা একে যাচ্ছেন আর পুরনো দিনের মিলে, ভান গগের তো কথাই নেই।

আমাদের গ্রামে সাধারণত সদর রাস্তা থাকে না। প্রত্যেক চাষা আপন ঝড়ের ঘরের তুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে আম-কাঁঠাল-সদপুরি-জাম গাছ দিয়ে—কিছুটা অবশ্য ঝড় থেকে কুঁড়েগুলোকে বাঁচবার জন্য। এখানে সে ভাবনা নেই বলে গ্রামে সদর রাস্তা থাকে, তার দুধিকে চাষাভুষো, মদুদী, দর্জি, কসাই, জুতোওলা সবাই বাড়ি বেঁধেছে। আর আছে ইস্কুল, গির্জা আর পাব—জম'নে 'লোকাল' (অর্থাৎ 'স্থানীয় মিলনভূমি')। এইটেকেই গ্রামের কেন্দ্র বললে ভুল বলা হয় না।

রাস্তাটা যে খুব বাহারে তা বলা যায় না। শীতকালে অনেক সময় এত

বরফ জমে ওঠে যে চলাফেরাও কয়েকদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যেতে পারে—
আমাদের দেশে বর্ষাকালে যে রকম হয়। শূদ্ধ বাচ্চাদেরই দেখতে পাওয়া যায়
তারই উপর লাফালাফি করছে, পেঁজা বরফের গুঁড়ো দিয়ে বল বানিয়ে একে
অন্যকে ছুঁড়ে মারছে।

অনেক কটর প্রোটেষ্টান্ট দেশে—স্কটল্যান্ড না কোথায় যেন—রববার দিন
কাচ্চাবাচ্চাদেরও খেলতে দেওয়া হয় না! এখানে দেখি, ছেলে এবং মেয়েরাও
রাস্তার উপর একটা নিম-চুবসে-যাওয়া ফুটবলে ধপাধপ কিক্ লাগাচ্ছে। এদের
একটা মস্ত সুবিধে যে জাতিভেদ এদের মধ্যে নেই। দজীর ছেলে মদ্রির মেয়েকে
বিয়ে করতে পারে, ইস্কুল মাস্টারের মেয়ে শর্দিড়র ছেলেকেও পারে। পাদ্রির
ছেলেকেও পারতো—কিন্তু ক্যাথলিক পাদ্রির বিয়ে বারণ। আফগানিস্থানে যে-
রকম মেয়েদের মোল্লা হওয়া বারণ—দাড়ি নেই বলে।

একে ট্রাম্প তায় বিদেশী, খেলা বন্ধ করে আমার দিকে যে প্যাট প্যাট করে
তাকাবে তাতে আর আশ্চর্য কি! এমন কি ওদের মা-বাপরাও। ওদের
অনেকেই রবির সকালটা কাটায় জানলার উপর কুশন রেখে তাতে দুই কনুইয়ে
ভর দিয়ে, বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। প্রথম প্রথম আমার অস্বস্তি বোধ
হত, শেষটায় অভ্যাস হয়ে গেল। সেটা অবশ্য পরের কথা।

ছবিতে দেখেছিলুম ছোঁড়াদের একজন চার্লির পিছন থেকে এসে একটানে
তার ছোঁড়া শার্ট ফর-ফর করে একদম দু-টুকরো করে দিলে—সেটা অবশ্য
শহরে। এবং আমার শার্টটা শক্ত চামড়ার তৈরী, ওটা ছোঁড়া ছোঁড়াদের কর্ম-
নয়! কিন্তু তবু দেখি গোটাপিঁচেক ছেলেমেয়ে এক জায়গায় জটলা পাঁকিয়ে
আমার দিকে তাকাচ্ছে আর ফিস্-ফিস্কির আঁটছে। একটি দশ-বারো বছরের
মেয়েই দেখলুম ওদের হস্টরওয়ালী, ফিয়ারলেন নাভিয়া, মিস্ ফ্রাণ্টয়ার মেল,
ডাকুকাঁ দিল্লুদা, জম্বুকাঁ বেটী যা খুশী বলতে পারেন। হঠাৎ বলা নেই,
কওয়া নেই সে দল ছেড়ে গট-গট করে এসে প্রায় আমার রাস্তা বন্ধ করে মধুর
হাসি হেসে বললে, 'সুপ্রভাত।' সঙ্গে সঙ্গে একটি মোলায়েম কার্টসিও করলে—
অর্থাৎ বাঁ পা-টি সোজা সটান পেছিয়ে দিয়ে, ডান হাঁটু ইণ্ডি তিনেক নিচু করে
দু হাতে দু পাশের স্কার্ট আলতো ভাবে একটু উপরের দিকে তুলে নিয়ে বাও
করলে। এই কার্টসিও করাটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শহরে লোপ পেয়েছে
গ্রামাঞ্চলে তখনো ছিল, এখনো বোধ করি আছে।

এরা 'গ্রুন্স গট' হয়তো জীবনে কখনো শোনেই নি। এদের জন্ম প্রথম বিশ্ব-
যুদ্ধের পর। তাই 'গুটেন্ মার্গেন' বলার পূর্বে প্রথম ছাড়লুম একখানা মধুর
হাস্য—একান ওকান ছোঁয়া। আমার মধুখানাও বোম্বাই সাইজের। কলাটা
আড়াআড়ি খেতে পারি। স্যান্ডউইচ খাবার সময় রুটির মাখম আকছারই দু'
ক্যানের ডালায় লেগে যায়।

ইতিমধ্যে মেয়েটি অতিশয় বিশুদ্ধ ব্যাকরণে আমাকে যা শুনালো তার যদি
শব্দে শব্দে অনুবাদ করা হয় তবে সেটা বাইবেলের ভাষার মতই শোনাবে।
'আপনি ইচ্ছে করলে বললে হয়তো বলতেও পারেন এখন কটা বেজেছে।''

পশ্চিম ইউরোপীয় ভাষাগুলোকে সৰ্বজনস্টিভ মৃদু তথা কম্পিশনাল প্রচুরতম মেকদারে লাগালে প্রভূততম ভদ্রতা দেখানো হয়। বাঙলায় আমরা অতীত কাল লাগিয়ে ভদ্রতা দেখাই। 'স্বধূরমশাই যখন শূধোন, 'বাবাজী তাহলে আবার কবে আসছ ?' আমরা বলি, 'আজ্ঞে, আমি তো ভেবেছিলুম—' অর্থাৎ আমি যা ভেবেছিলুম কথাটা আপনার সম্মতি পাবে না বলে প্রায় নাকচ করে বসে আছি। তবু আপনি নিতান্ত জিজ্ঞেস করলেন বলে বললুম।

তা সে যাক্ গে। মেয়েটি তো দু'নিয়ার কুলে সৰ্বজনস্টিভ একেবারে কর্প বুক স্টাইলে, ক্লাস-টীচারকে খুশী করার মত ডবল হেল্পিং দিয়ে প্রশ্নটি শূধোলে। আমিও কটা সৰ্বজনস্টিভ লাগাবো মনে মনে যখন চিন্তা করেছি এমন সময় গির্জার ঘড়িতে ৫৭ করে বাজল একটা। আমার মাথায় দৃষ্টবুদ্ধি খেলল। কোনো কথা না বলে ডান হাত কানের পেছনে রেখে ঘোঁড়ক থেকে শব্দ আসছিল সেই দিকে কান পাতলুম।

ইতিমধ্যে দু'চারটে ছোঁড়া রাস্তা ক্রস্ করে মেয়েটার চতুর্দিকে দাঁড়িয়েছে। সে আশ্বে আশ্বে ফিসফিস করে ওদের বললে, 'বোধ হয় জর্ম'ন বোঝেন, কিন্তু বলতে পারেন না।'

আমি বললুম, 'বোধ হয় তুমি জর্ম'ন বলতে পারো, কিন্তু শুনতে পাও না।' অবাক হয়ে শূধোলে, 'কি রকম ?'

আমি বললুম, 'গির্জার ঘড়িতে ৫৭ করে বাজল একটা—বশ্ কালো শুনতে পায়। আর তুমি আমার শূধোলে, কটা বেজেছে। গির্জার ঘণ্টা যে শুনতে পায় না, সে আমার গলা শুনতে পাবে কি করে? তাই তো উত্তর দিই নি।' তারপর ছোঁড়াগুলোর দিকে তাকিয়ে বললুম, 'কি বলো ভাইরা সব।' ও নিশ্চয়ই লড়াইয়ে গিয়েছিল। সেখানে শেল্শকে কালো হয়ে গিয়েছে—আহা বেচারী!'

সবাই তো হেসে লুটোপুটি। ইস্তেক মেয়েটি নিজে। একাধিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল : 'মেয়েছেলে আবার লড়াইয়ে যায় নাকি? তা-ও এইটুকু মেয়ে!'' আমি গোবেচারীর মত মূখ করে বললুম, 'তা কি করে জানবো ভাই। আমি তো বিদেশী। কোন দেশে কি কায়দা, কি করে জানবো, বলো। এই তো তোমরা যখন ঠাঠর করতে চাইলে, আমি জর্ম'ন জানি কি না, তখন পাঠালে মেয়েটাকে। আমাদের দেশ হলে মেয়েটা বুদ্ধি যোগাতো, কোনো একটা ছেলে ঠেলা সামলাবার জন্য এগাতো।'

একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন, 'আপনার দেশ কোথায়? যাবেন কোথায়?' ইত্যাদি।

আমার মাথায় তখন কলি ঢুকেছে। সংস্কৃতে বললুম, 'অহং বৈদেশিকঃ! মম কোর্হপি নিবাসো নাস্তি। সর্বদা পরিভ্রমণমেব করোমি।'

কী উল্লাস! কী আনন্দ তাদের।

আমি ইন্ডিয়ান, আমি রেড্ ইন্ডিয়ান, আমি চীনেম্যান এমন কি আমি নিগ্গো ইস্তেক। যে যার মত বলে গেল একই সঙ্গে চীৎকার করে।

আমি আশ্চর্য হলুম, কেউ একবারের তরে শূধোলে না, আমি কোন ভাষায়

কি বললুম সেটা অনুবাদ করে দিতে। তখন মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তাঁর বাল্য বয়সে শিশুসাহিত্য নামক কোনো জিনিস প্রায় ছিল না বলে তিনি বয়স্কদের জন্য লেখা বই পড়ে যেতেন এবং বলেছেন, তাতে সব-কিছু যে বদ্ব্যভূত পারতেন তা নয়, কিন্তু নিতান্ত আবছায়া-গোছের কি একটা মনের মধ্যে তৈরী করে সেই আপন মনের নানা রঙের ছিন্ন সূত্রে গ্রহিৎ বেঁধে তাতে ছবি-গেঁথোছিলেন—বইখানাতে অনেকগুলো ছবি ছিল বলে তিনি নিজেই না বোঝার অভাবটা পূরণে নিয়োছিলেন। কথাটা খুবই খাঁটি। বাচ্চারা যে কতখানি কল্পনাসক্তি দিয়ে না-বোঝার ফাঁকা অংশগুলো ভরে নিতে জানে, তা যাঁরা বাচ্চাদের পড়িয়েছেন তাঁদের কাছেই সন্দেহপূর্ণ। অনেক স্থলেই হয়তো ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছয় কিন্তু তাতে কি এসে যায়। আমি চীনেম্যান না নিগ্রো তাতে কার ক্ষতি-বৃদ্ধি! তারা বিদেশী, অজানা নতুন কিছু একটা পেয়েই খুশি। আর আমি খুশী যে বিনা মেহমৎ বিনা কসরৎ আমি এতগুলো বাচ্চাকে খুশী করতে পেরেছি—কারণ আমি বিলক্ষণ জানি, আমি সোনার মোহরটি নই যে দেখা মাত্রই সবাই উত্থাহ হয়ে উল্লাসে উল্লসফন দেবে।

তা সে মাই হোক, শেষ পর্যন্ত স্থির হল আমি রেড ইন্ডিয়ান। তার কারণটা একটু পরেই আমার কাছে পরিষ্কার হল। এরা কয়েকদিন পর ইস্কুলের শো-তে একটা রেড-ইন্ডিয়ান নাচ, তীর ছোঁড়া এবং ‘শান্তির পাইপ খাবার’ অভিনয় করবে—আমি যখন স্বয়ং রেড ইন্ডিয়ান উপস্থিত, তখন আমি রিহার্সে-লটি তদারক করে দিলে পাশের গ্রামের ছেলেমেয়েরা একেবারে থ মেরে যাবে। ওঃ! তাদের কী সৌভাগ্য!

আমি নৃত্বের কিছুই জানি নে। রেড ইন্ডিয়ানদের সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নির্জলা নিল। তাদের ‘শান্তির পাইপ’ কি, সে সম্বন্ধে আমার কণামাত্র জ্ঞান নেই। বৃশ-মেনের বেশ-পোশাক আর রেড-ইন্ডিয়ানের ঐ বস্ত্রতে কি তফাত তাও বলতে পারবো না।

অথচ ওদের নিরাশ করি কি প্রকারে?

যাক্। দেখেই নি ওরা কতদূর এগিয়েছে।

তখন দেখি, ইয়াল্লা, এরা জানে আমার চেয়েও কম! ছোট্ট ইস্কুল-বাড়ির একটা ঘর থেকে বোঁগ ডেস্ক সরিয়ে সেখানে রিহার্সেল আরম্ভ হল। রেড-ইন্ডিয়ান মাথায় পালক দিয়েছে বটে কিন্তু বাদ্যবাকি তার সাকুল্য পোশাক কাণবয়দের মত। আরো যে কত ‘অনাচ্ছিষ্ট’ সে বলে শেষ করা যায় না।

তখন আবার বদ্ব্যভূত রবীন্দ্রনাথের সেই কথাই আগুবাক্য। অল্পবয়স্করা কল্পনা দিয়েই সব-কিছু পূরণে নেয়। তদুপরি এদের প্রাণশক্তি অফুরন্ত। এরা পেট ভরে খেতে পায়। জামা-কাপড়ে এদের মধ্যেও কিছু কিছু দামী সস্তা ছিল বটে কিন্তু ছোঁড়া জামা-জুতো কারোরই নয়। আট বছর হতে-না-হতে এরা ক্ষেতখামারের কাজে ঢোকে না। কোথায় এদের গ্রামের কাচ্চা-বাচ্চারা আর কোথায় আমার গ্রামের কাচ্চা-বাচ্চারা! এই বাচ্চাদের হাসিখুশী দেখে এদের যে কোন একটির মাথায় হাত রেখে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা যায়;—

তুমি একটি ফুলের মত মণি
এমনই মিষ্টি এমনই সুন্দর
মুখের পানে তাকাই যখন
ব্যথায় কেন কাঁদায় অন্তর !

শিরে তোমার হস্ত দুটি রাখি
পড়ি এই আশিস মন্তর,
বিধি তোরে রাখুন চিরকাল
এমনই মিষ্টি এমনই সুন্দর !

ডু বিস্ট্ ভী আইনে ব্লুমে
জো হোল্ট, উন্ট্ শ্যোন উন্ট্ রাইন.;
ইষ শাও' ডিস আন, উন্ট্ ভেমুট
গ্লাইস্ট্ মীর ইন্স হেৎস্ হিনাইন ।

মীর ইস্ট্ আল্‌স্ অপ ইষ ডি হ্যান্ডে
আউফ্‌স্ হাউস্ট্ ডীর লেগেন জলট্,
বেটেস্‌ড, ডাস্ গট্ ডীর এরহাল্টে
জো রাইন উন্ট্ শ্যোন উন্ট্ হোল্ট্ ।

এই গ্রামের পাশে বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হাইনরিশ হাইনে যার ছোট কবিতার বইটি, 'বুখ ড্যার লীডার' পকেটে নিয়ে বন্ থেকে বেরিয়েছি এই কবিতাটি তার থেকে নেওয়া ।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পরম বিস্ময়বোধ হয় এই কথা স্মরণ করে যে তিনিই প্রথম বাঙলাতে অনুবাদ করেন—এবং খুব সম্ভব ভারতের সব ভাষা নিলে বাঙলাতেই প্রথম—হাইনের কবিতা । এবং তাও হাইনের মৃত্যুর পর চল্লিশ বছর যেতে না যেতেই ! এবং মূল জर्म'ন থেকে—ইংরিজী অনুবাদ মারফতে নয় ! পরবর্তী কবিদের অধিকাংশই অনুবাদ করেছেন ইংরিজী থেকে । মাত্র সত্যেন দত্ত ও যতীন্দ্র বাগচীরই অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের অনুবাদেদের কিছুটা কাছে আসতে পারে । রবীন্দ্রনাথই যে প্রথম হাইনের বাঙলা অনুবাদ করেছিলেন সেদিকে হালে শ্রীযুক্ত অরুণ সরকার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন, কারণ রবীন্দ্রনাথের চলিত অর্চালিত কোনো রচনাবলীতেই এ অনুবাদেদের উল্লেখ পর্যন্ত নেই ।

হাইনের সঙ্গে চণ্ডীদাসের তুলনা করা যায় । দুজনাই হৃদয়বেদনা নিবেদন করেছেন অতি সরল ভাষায় । দরদী বাঙালী তাই সহজেই এর সঙ্গে একাত্ম অনুভব করে ।

গ্যোটে যে সংস্কৃতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার অন্যতম কারণ সংস্কৃত এবং গ্যোটের দেশ ও জাতির ভাষা দুটোই আর্য ভাষা । কিন্তু হাইনে জাতি

ইহুদী। আর্থ-সভ্যতা এবং ইহুদীদের সেমিতি সভ্যতা আলাদা। তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন নিছক ভারতবর্ষের নৈসর্গিক দৃশ্যের বর্ণনা পড়ে এবং শুনে।

তার যে গুরু ফন্টেলগেল তার মাথায় সর্বপ্রথম কবির মকুট পরিণে দেন যিনি তিনি ছিলেন বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতির অধ্যাপক।

॥ ৬ ॥

গেরো বাঁধলো ‘শান্তির পাইপ খাওয়া’ নিয়ে। এটা বোধ হয় ড্রেস রিহাসেল। তাই এই প্রথম সত্যকার পাইপে করে সত্যকার তামাক খাওয়া হবে। যে ছেলোটো রেড-ইন্ডিয়ানদের দলপতি সে বোধ হয় একটু অতিরিক্ত মাত্রায় গোবেচারী—নিভান্ত দিক-ধেড়েঙ্গে ঢ্যাঙা বলে তাকে দলপতি বানানো হয়েছে এবং জীবনে কখনো রান্নাঘরের পিছনে, ওদের ভাষায় চিলেকোঠায় (এ্যাটিকে) কিংবা খড় রাখার ঘরে গোপনে আধ-পোড়া সিগারেটও টেনে দেখে নি। না হলে আগেভাগেই জানা থাকতো ভস্‌ভস্‌ করে পাইপ ফোঁকা চাটুখানি কথা নয়।

দিয়েছে আবার ব্রস্ক টান! মাটির ছিলিম হলে ফাটার কথা!

ভিরমি খায়-যায়। হৈহৈ রৈরৈ কান্ড। একটা ছোট ছেলে তো ভাঁকি করে কেঁদেই ফেললে। ওদিকে আমিই ওদের মধ্যে মদ্রুশ্বী। আমাকে কিছ্র একটা করতে হয়। একজনকে ছুটে গিয়ে মিনরেল-ওয়াটার আনতে বললুম—ও জিনিস এ-সমলে পাওয়া যায় সহজেই—টাই-কালার খুলে। দিয়ে শির-দাঁড়া ঘষতে লাগলুম। এসব মর্দুটিযোগে কিছ্র হয় কি না জানি নে—শুনোছি মৃত্যুর দূর একদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথের হিষ্কা থামাবার জন্য ময়ূরের পালক-পোড়া না কি ঘেন খাওয়ানো হয়েছিল—তবে সাইকলজিকাল কিছ্র একটা হবে নিশ্চয়ই। আমি যখন রেড-ইন্ডিয়ান তখন ওদের পাইপের পাপ কি করে ঠেকাতে হয় আমারই জানার কথা।

ফাড়া কেটে যাওয়ার পর দূর্ভাবনা জাগলো, শোর দিনে পাইপ টানা হবে কি প্রকারে? হায়, হায়, এত সব বখেড়া পোওয়াবার পর, এমন কি জলজ্যাক্স রেড-ইন্ডিয়ান পাওয়ার পর তীরে এসে ভরাডুবি!

আমি বললুম, ‘কুচ পরোয়া নেই। সব ঠিক হো যাবেগা। কয়েক ফোঁটা ইউকেলিপটাস তেল নিয়ে এস’—অজ পাড়ার্গা হলে কি হয়, এ যে জর্মনি।

তারই কয়েক ফোঁটা তামাকে ফেলে আগুন ধরতেই প্রথমটায় দপ্ করে জ্বলে উঠলো। সেটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ফের ধরালুম। তারপর ভস্‌ ভস্‌ করে কয়েক টান দিয়ে বললুম, ‘এইবারে তোমরা খাও। কাশি, নাকের জল, বমি কিছ্রই হবে না।’ কেউ সাহস করে না। শেষটায় ঐ মারিয়ানা, ফিয়ারলেস্‌ নাদিয়াই দিলে দম! সঙ্গে সঙ্গে খুশীতে মূখচোখ ভরে নিয়ে বললে, ‘খাসা! হচ্ছে ইউকেলিপটাসের ধূয়োয় নাক-গলা ভর্তি হয়ে গিয়েছে।’ কিছ্র কেমন

যেন শূকনো শূকনো ।’

আমি বললুম, ‘মাদাম ক্যুরিকে হার মানালি। ধরেছিস ঠিকই। শূকনো শূকনো ভাব বলেই খুব ভিজ়ে সিঁদ’ হলে ডাক্তাররা এই প্রক্রিয়ায় ইউকেলিপটাস ব্যবহার করতে বলে ।’

শূধালে, ‘আর তামাকের কি হল ? তার স্বাদ তো আদপেই পাচ্ছি নে ।’

সাক্ষাৎ মা দুর্গা ! দশ হাতে একসঙ্গে পাঁচ ছিলিম গাঁজা সেজে—কুলোকে বলে নিতান্ত ঐ গাঁজার স্টেটিড সাপ্লাইয়ের জন্যই শিব দশভুজাকে বিয়ে করে-ছিলেন—বাবার হাতে তুলে দেবার পূর্বে মা নিশ্চয়ই তাঁর বখরার পূর্বে-প্রসাদ নিয়ে নিতেন। এ মেয়ে শিব পাবার পূর্বেই নেশাটা মক্সো করে রেখেছে—বেঁচে থাকলে শিবতুল্য বর হবে।

আমি বললুম, ‘তামাক কপূর—মায় নিকোটিন ।’

এমন সময় স্পষ্ট শোনা গেল গিজার ঘড়িতে টং টং করে বাজলো দুটো। সঙ্গে সঙ্গে এদের সঙ্কলের মূখ গেল শূকিয়ে। কি ব্যাপার ? দুটোর সময় সম্বাইয়ের বাড়ি ফেরার হুকুম। মধ্যাহ্ন-ভোজন।

জার্মানি কড়া আইন, ডিসিপ্লিনের দেশ। বাচ্চাদের ডিসিপ্লিন আরম্ভ হয়, জন্মের প্রথম দিন থেকেই—সে কথা আরেকদিন হবে। সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু স্পষ্ট বৃষ্টিতে পারলুম, বিপদে পড়েছে আমাকে নিয়ে। ছেলেমানুষ হোক আর ঘাই হোক একটা লোককে হুট করে বিদায় দেয় কি করে ? ওদিকে আমিও যে এগোতে পারলে বাঁচি সেটা বোঝাতে গেলে ওরা যদি কষ্ট পায় !

গোবেচারী মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন দেখলুম, যার দলপাতি সাজবার কথা সে ছেলেটা অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে শূধালে, ‘তুমি লাগ খেয়েছো !’

আমার সত্য ধর্ম ছিল মিথ্যা বলার, অর্থাৎ হ্যাঁ, কিন্তু আমার ভিতরকার শয়তান আমাকে বিপদে ফেলার জন্য হামেহাল তৈরী। সে-ই সত্যভাষণ করে বললে, ‘না, কিন্তু—’

কয়েকজন ছেলেমেয়ে একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললে, ‘আমার বাড়ি চলো !’

মেলা হটগোল। আমি বললুম, ‘অনেক ধন্যবাদ, বাছারা, কিন্তু তোমাদের বাপ-মা একটা ট্র্যাপকে—?’

মারিয়ানা মেয়েটা একদিন জার্মানীর রানী হবে যদি কৈলাস থেকে হুলিয়া বেরোয়। বলা-নেই-কওয়া-নেই খপ করে তার ছোট্ট হাত দিয়ে আমার হাত-খানা ধরে বললে, ‘চলো আমার বাড়ি। আমাতে ঠাকুমাতে থাকি। কেউ কিছু বলবে না। ঠাকুমা আমায় বড্ড ভালবাসে।’ তারপর ফিস্-ফিস্ করে কানে কানে বললে—যদিও আমার বিশ্বাস সবাই শুনতে পেলে, ‘ঠাকুমা চোখে দেখতে পায় না।’

ইস্কুল থেকে বেরিয়ে বিস্তর হ্যান্ড-শেক, বিস্তর চকলেট বদলাবদলি হল। মারিয়ানা বললে, ‘চলো। আমাদের বাড়ি গ্রামের সর্বশেষে। তুমি যেদিকে চলছিলে সেই দিকেই। খামোখা উল্টো পথে যেতে হবে না।’

আজ স্বাকার করছি, তখনো আমি উজবুক ছিলুম। কাকে কি জিজ্ঞেস

করতে হয়, না হয়, জানতুম না ; কিংবা হয়তো, কিছুদিন পূর্বেই কাবুলে ছিলুম বলে সেখানকার রেওয়াজের জের টানছিলুম—সেখানে অনেকক্ষণ ধরে ইনিয়িং বিনিয়িং হরেক রকমের ব্যক্তিগত প্রশ্ন শোধানো হল ভদ্রতার প্রথম চিহ্ন। জিজ্ঞেস করে বসেছি, ‘তোমার বাপ মা?’

অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে উত্তর দিলে, ‘বাবা? তাকে আমি কখনো দেখি নি। আমার জন্মের পূর্বেই লড়াইয়ে মারা যায়। আর মা? তাকেও দেখি নি। দেখেছি নিশ্চয়, কিন্তু কোনো স্মরণ নেই। সে গেল, আমার যখন বয়েস এক মাস।’

ইচ্ছে করে এরকম প্রশ্ন শূন্যে বিপদে পড়া আহাম্মুখি। লড়াই, লড়াই, লড়াই! হে ভগবান! তুমি সব পারো, শূন্য এইটে বশ্ব করতে পারো না?

ভাবলুম, কোন্ ব্যামোতে মা মারা গেল সেইটে শূন্যেলে হয় তো আলাপটা অন্য মোড় নেবে। শূন্যলুম, ‘মা গেল কিসে?’

বারো, জোর তেরো বছরের মেয়ে। কিন্তু যা উত্তর দিলে তাতে আমি বদলুম, আহাম্মুখের মত এক প্রশ্ন শূন্যে বিপদ এড়াবার জন্য অন্য প্রশ্ন শূন্যেতে নেই। বললে, ‘আমাদের গায়ে ডাক্তার নেই। বন্ শহরের ডাক্তার বলে, মা গেছে হাটে। ঠাকুমা বলে, অন্য হাটে। মা নাকি বাবাকে বন্ ভালো-বাসতো। সব নাকি তাদের বিয়ে হয়েছিল।’

*

*

*

নির্জন পথ চিত্তিভবং সাড়া নেই সারা দেশে।

রাজার দুয়ারে দুইটি প্রহরী তুলিছে নিদ্রাবেশে।

তার বদলে একটি সিঁড়ির উপর পাশাপাশি বসে দুটি বড়ী তুলছে।

আর খোলা জানালা দিয়ে আসছে ক্যানারি পাখীর গিটকিরিওল হুইসেলের মিষ্টিমধুর সঙ্গীত। ম্যারিয়ানা বললে, ‘দুই দুই বড়ী ঐ এক সঙ্গী—পাখিটি।’

॥ ৭ ॥

গ্রামের ঐ একটিমাত্র সদর-রাস্তা পেরিয়ে যাওয়ার পর দু’দিকের বাড়িগুলো রাস্তা থেকে বেশ একটুখানি দূরে—অর্থাৎ গেট খুলে বাগান পেরিয়ে গিয়ে ঘরে উঠতে হয়।

‘বাগান’ বললুম বটে, কিন্তু সেটাকে ঠিক কি নাম দিলে পাঠকের চোখের সামনে ছবিটি ফুটে উঠবে ভেবে পাচ্ছি নে।

তুকেই কম্পাউন্ডের বাঁ দিকে একটা ডোবাতে অনেকগুলো রাজহাঁস প্যাক-প্যাক করছে। টলটল শব্দ সরোবরে তরতর করে রাজহাঁস মরাল-সম্ভরণে ভেসে যাওয়ার শোখিন ছবি নয়—এ নিছক ডোবা, এদিকে-ওদিকে ভাঙা, ধসে-যাওয়া পাড়, জল ধোলা এবং কিছু কিছু শূন্য পাতা এদিক-ওদিক ভাসছে। সোজা বাঙলায়, এখানে রাজহাঁসের চাষ হচ্ছে, বাগানের নয়নাভিরাম দৃশ্য হিসেবে। এটাকে তৈরী করা হয় নি।

মারিয়ানার গথ পেয়েই রাজহাসিগুলো একজোটে ডোবা ছেড়ে তার চতুর্দিকে জড়ো হল। আমি লাফ দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালাম। রাজহাসি ময়ূরে এরা মোটেই নিরীহ প্রাণী নয়—যে বাই বলুন! মারিয়ানাও ব্যাপারটা বুদ্ধিতে পেয়ে শূদ্ধ বলল, ‘বাপ রে বাপ, জানোয়ারগুলোর কি খাই! এই সকালবেলা উঠেই গাদাগুচ্ছের খাইয়ে গিয়েছি, ডোবাতোও এতক্ষণ এটা-সেটা খেয়েছে, আবার দেখো, কি রকম লেগেছে! এদের পুর্বে যে কী লাভ, ভগবান জানেন।’

ইতিমধ্যে দেখি আরেক দল মোগামুগী এসে জুটেছে।

ঘরে ঢোকান আগে দেখি বাড়ির পিছনে এক কোণে জালের বেড়ার ভিতর গেমটাভিনেক শুরুর।

আমি অবাক হয়ে মারিয়ানাকে শূদ্ধালাম, ‘এই সব-কিছুর দেখ-ভাল তুমিই করো? তোমার ঠাকুমা না—?’

ঠোট বেঁকিয়ে বললে, ‘আমি করি কোথায়? করে তো কার্ল!’

আমি শূদ্ধালাম, ‘সে আবার কে? তুমি না বললে, তোমরা মায় দ্বুজনা?’

ইতিমধ্যে কার্ল এসে জুটেছে। মাঝারি সাইজের এলসেশিয়ান হলেও এলসেশিয়ান তো বটে—জর্মনির বলে শেপার্ড ডগ, অর্থাৎ রাখাল কুকুর—কাজেই একদিকে রাজহাসি, অন্যদিকে কুকুর, এ নিয়ে বিস্তৃত হওয়া বিচির নয়। কিন্তু দেখলাম, কার্ল স্যানা ছেলে, আমাকে একবার শূঁকেই মনিষির করে ফেলেছে, আমি মিশ্রপক্ষ।

মারিয়ানা বললে, ‘আমি ওদের খাওয়াই-টাওয়াই। কার্লই দেখা শোনা করে। তোমার মত ট্রাম্প কিংবা জিপসি সুযোগ পেলেই কপ করে একটা মুরগী ইস্তেক হাঁসের গলা মটকে পকেটে পুরে হাওয়া হাশে যাবে।’

আমি বললাম, ‘মনে রইল। এবারে সুযোগ পেলে ছাড়ব না।’

ভয় পেয়ে বললে, ‘এমন কন্সটি করতে যেয়ো না, লক্ষ্মীটি! অনেকেরই কার্লের চেয়েও বিরাট দ্বু-আসিলা শেপার্ড ডগ রয়েছে। সেগুলো বড় বড় হয়।’

আমি অবাক হয়ে ভাবছি, এই বারো বছরের মেয়ে দ্বু-আসিলা, এক-আসিলা ক্লস-ব্রীডের কি বোঝে?

মারিয়ানাই বুঝিয়ে বললে, ‘খাঁটি আলসেশিয়ান কার্লের চেয়ে বড় সাইজের হয় না। আলসেশিয়ানকে আরো তাগড়াই করার জন্য কোনো কোনো আহাম্মক আরো বড় কুকুরের সঙ্গে ক্লস করায়। সেগুলো সত্যিকার দ্বু-আসিলা, বড়মেজাজী আর খায়ও কয়লার ইঞ্জিনের মত।’

এর অনেক পরে এক ডাক্তার আমায় বুঝিয়ে বলেছিলেন, গরু-ভেড়া-ছাগল-মুরগী নিয়ে গ্রামের সকলেরই কারবার বলে কাক্সাবাক্সারা অল্পবয়সেই ব্রীডিং বদল, ‘বীচি’র মোরগ কি বুঝে যায়। তাই শহুরেদের তুলনায় এ-বিষয়ে ওদের সূক্ষ্ম স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি জন্মায়, এবং পরিণত বয়সে যৌন-জীবনে শহুরেদের তুলনায় এদের আচরণ অনেক বেশী স্বাভাবিক ও বেহাঙ্গামা হয়।

সৈয়দ মজতবা আলী রচনাবলী (৭ম)—১৪

থাক্ সে কথা। তবে এইবেলা এ কথাটি বলে রাখি, এই গ্রামাঙ্গলে ধোঁরাধূঁরির ফলে মানবের জীবনধারা সম্বন্ধে যে জ্ঞান সঞ্চার করোঁছি, শহরের বহু জ্ঞানব্রহ্ম, বার-রেক্তোরার পাকা জুঁড়ির হয়েও তার সিকির সিকিও হয় নি।

‘ঠাকুমা, আমি অতিথি নিয়ে এসেছি।’

আমি বললুম, ‘গ্র্যাস্ গট্ ঠাকুমা। আমি বিদেশী।’

ঠাকুমা সেই প্রাচীন যুগের লোক। গ্র্যাস্ গট্ বলাটাই হয়তো এখনো তাঁর অভ্যাস। তাই বলে বসলেন, ‘বসো।’ মারিয়ানাকে বললেন, ‘এত দৌর করলি যে। খেতে বস্। আর সানডে সেট বের কর। আর শোন, চাঁজ, চেরি-ব্র্যান্ড ভুলিস নি।’

‘হ্যাঁ, ঠাকুমা নিশ্চয়ই ঠাকুমা—’ বলতে বলতে আমার দিকে তাকিয়ে একটু-খানি চোখ টিপে হাসলে। বিশেষ করে দেৱাজের উপরের থাকের চেরি-ব্র্যান্ডের বোতল দেখিয়ে। অর্থাৎ অতিথি-সংকার হচ্ছে। সচরাচর এগুলো তোলাই থাকে।

এবং এটাও বোঝা গেল, নিতান্ত ঠাকুমা নাতনী ছাড়া আর কেউ নেই বলে রবিবার দিনও সানডে সেটের কাপ-প্লেট বের করা হয় না।

মারিয়ানা টেবিল সাজাচ্ছে। আমি ঠাকুমাকে শুধালুম, ‘আপনার স্বাস্থ্য কি রকম যাচ্ছে?’

ঠাকুমা উত্তর না দিয়ে বললেন, ‘তুমি তো আমার মত কথা বলো, আমার নাতনীর মত বলো না!’

আমি শুধালুম, ‘একটু বন্ধিয়ে বলুন।’

ঠাকুমা বললেন, ‘আমি হানোফারের মেয়ে। সেই ভাষাতেই কথা বলি। সে-ভাষা বড় মিষ্টি। আমি ছাড়বো কেন? আর নাতনীর বাপ-ঠাকুর্দা রাইনল্যান্ডের লোক। এরা সবই রাইনিশ বলে। তুমি তো হানোফারের কথা বলছো!’

মারিয়ানা বলে উঠলো, ‘ওঃ, কত না মিষ্টি! শিপৎসে, শ্টাইন বলতে পারে না; বলে স্পিংসে, স্টাইন।’

(অর্থাৎ ‘শ, স’-এ তফাত করতে পারে না; আমরা যে রকম ‘সামবাজারের সসিবার্ভর সসা খেয়ে খেয়ে সগ্গারোন’ নিয়ে ঠাট্টা করি।)

ঠাকুমা কণামাত্র বিচলিত না হয়ে বললেন, ‘আর তোরা ত কিশে’, কিশেতে তফাত করতে পারিস নে।’

(এ দুটো উচ্চারণের পার্থক্য বাঙলা হরফ দিয়ে বোঝানো অসম্ভব। তবে এক উচ্চারণ করলে ফলে দাঁড়ায় ‘আমি গিজ্জেটা (কিশে) থেলুম (!), এবং তারপর চেরি ফলে (কিশে) টুকলুম (!)’—যেখানে উচ্চারণে ঠিক ঠিক পার্থক্য করলে সত্যকার বক্তব্য প্রকাশ হবে, ‘আমি চেরিফল খেয়ে গিজ্জেস টুকলুম।’)

আমি বাঙাল-বাঁটি যে-রকম উচ্চারণ নিয়ে তর্ক করে, সে ধরনের কাজিয়ার
বাড়াবাড়ি থামাবার জন্য বললাম, ‘আমার গুরু ছিলেন হানোফারের লোক।’

। ৮ ।

“ধন্য হে জননী মেরী, তুমি মা করুণাময়ী। তুমি প্রভুর সামিথ্যলাভ
করেছ। রমণীজাতির মধ্যে তুমিই ধন্য, আর ধন্য তোমার বেহজাত সন্তান
যীশু। মহিমাময়ী মা মেরি, এই পাপীতাপীদের তুমি দয়া করো, আর দয়া করো
যেদিন মরণের ছায়া আমাদের চতুর্দিকে ঘনিয়ে আসবে।”

এই ‘আভে মারিয়া’ বা ‘মেরি-আবাহন-মন্ত্র’ উচ্চারণ না করে সাধারণত
ক্যাথলিকরা খেতে বসে না—আর গ্রামাঞ্জে তো কথাই নেই। অনেকটা
হিন্দুদের গাউনের মত। আর প্রটেস্ট্যান্টরা সাধারণত ‘হে আমাদের দুলোকের
পিতা’ (পাতের নস্তুর) মন্ত্র পাঠ করে। কোনো কোনো পরিবারের
উপাসনাটা অতি ক্ষুদ্র :

‘এস হে যীশু।

আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করো।

আমাদের বা ঘিয়েছো তার উপর

তোমার আশীর্বাদ রাখো।

‘কমে য়েজু, জাই উনজের গাস্ট্

উনট্ জেগনে ভাস ডু

উনস্ রেশেরট্ হাস্ট্ ॥’

মুসলমানদের উপাসনাটিও ক্ষুদ্র : ‘আমি সেই খুদার নামে আরম্ভ করি
যিনি দয়াময়, করুণাময়।’

১ বিলাতের কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোজনগৃহে এই মন্ত্রপাঠ করার
সময় জনৈক ভারতীয় ভোজনালয় ত্যাগ করেন। দেশে ফিরে এসে তিনি সেটি
ফলাও করে তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে বর্ণনা দেন। নাস্তিকের এই ‘সংসাহসের’
কর্মটি তিনি যদি ইনকুইজিশন যুগে করতেন তবু না হয় তার অর্থ বোঝা
যত। কিন্তু তাঁর এই আচরণ থেকে ধরে নিতে হবে, হয় ভারতীয়রা পরধর্ম
সম্বন্ধে অসহিষ্ণু, অথবা ঐ লেখক ভারতীয় নন। জাঁনি একজন ভারতীয়ের
আচরণ থেকে তাবৎ ভারতীয় সম্বন্ধে কোনো অভিমত নির্মাণ করা অযৌক্তিক
কিন্তু দেশ-বিদেশে সর্বত্রই তাই করা হয়।

পঞ্চাশত্রে খাঁটি নাস্তিক আনাতোল ক্রীস যখন একবার শুনতে পান, ফরাসী
সরকার যে পুস্তকে ভগবানের নাম উল্লেখ থাকে সে-পুস্তক স্কুল লাইব্রেরীর
জন্য কিনতে দেয় না, তখন তিনি চন্দ্রকণ্ঠে বলেছিলেন, ‘তাহলে ফরাসী
বিশ্বোদ্যে এত রক্তপাত করে পেলেম আমরা কী সে স্বাধীনতা—যে স্বাধীনতা
শাস্তিককে তার ধর্মবিশ্বাস প্রচার করতে দেয় না।’

এদের এই মস্তপাঠে একটি আচার আমার ভালো লাগে ; পরিবারের সর্ব-
কনিষ্ঠ—যে সব আধো আধো মস্ত্রোচ্চারণ করতে শিখেছে—তাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ
আদেশ দেন, উপাসনা আরম্ভ করতে ।

ঠাকুমা আদেশ করলেন, ‘মারিয়ানা, ফাঙেমালা আন—আরম্ভ কর ।’

প্রাগুক্ত শব্দ-বৈবেকমণ্ডিত ‘নাস্তিক’ ভ্রমণকাহিনী লেখক আমি নই ।
(ভ্রমণকাহিনী যদিও লিখেছি তবু তাঁর মত খ্যাতিলাভ করতে পারি নি ।) তাই
আমি হস্তী দ্বারা তাড়মানের ন্যায় খুঁটানের গৃহ ত্যাগ করলাম না ।

মারিয়ানার কিন্তু তখনো খাবার সাজানো হয় নি—রোববারের বাসন-
কোশন বের করতে একটু সময় লেগেছে বই কি, কিন্তু তাতে কিছু বায় আসে
না । সুপ্ স্যালাড আনতে আনতেই, সেই সদাপ্রসন্ন ভরূণ মদ্যটিতে কণামাত্র
গাভীৰ্ব না এনে সহজ সরল কণ্ঠে বলে উঠলো,

‘খ্যা হে জননী মেরি, তুমি মা
করুণাময় ।—’

বাচ্চাদের উপাসনা আমার সব সময়েই বড় ভালো লাগে । বড়দের কথায়
বিশ্বাস করে তারা সরল চিত্তে ধরে নিয়েছে ভগবান সামনেই রয়েছেন । ফলে
তাদের মস্ত্রোচ্চারণের সময় মনে হয় তারা যেন তাঁর সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে কথা
কইছে—যেন ঠাকুরমার সঙ্গে কথা না বলে ভগবানের সঙ্গে কথা বলছে । আর
আমরা, বন্ধুশ্রী, কখনো উপরের দিকে, কখনো মাথা নিচু করে ‘উপাসনা
করি’—তাঁর সঙ্গে কথা বলি নে ।

গ্রামের লোক হাতী ঘোড়া খায় না । শহরবাসীর মত আটপটী নিরতিশয়
ব্যালানস্‌ড্ ফুড—ফলে স্বভাবতই আন-ব্যালানস্‌ড্!—খায় না বলেই
শুনছি তাদের নাকি খ্রিস্টোবাসিস কম হয় ।

সুপ্ ।

আপনারা সান্নেবী রেস্টোরায় যে আড়াই ফোটা পোশাকী সুপ খেয়ে
ন্যাপকিন দিয়ে তার বেড় ফোটা ঠোঁট থেকে রট করেন এ সে বস্তু নয় । তার
থাকে তবু এর আছে বস্তু ।

হেন বস্তু নেই যা এ সুপে পাবেন না ।

মাংস, মজ্জা সুপ্, হাড়, চর্বি সেধ করা আরম্ভ হয়েছে কাল সন্ধ্যা থেকে,
না আজ সকাল থেকে বলতে পারবো না । তারপর তাতে এসেছে, বাঁধাকপি,
ফুলকপি, ব্রাসেল স্প্রাউটস্, দু’এক টুকরো আলু, এবং প্রচুর পরিমাণে মটর-
শর্ট । মাংসের টুকরো তো আছেই—তার কিছুটা গলে গিয়ে কাথ হয়ে
গিয়েছে, বাকিটা অর্ধ-বিগলিতালিসনে ভরকারির টুকরোগুলোকে জড়িয়ে
থেকেছে । এবং সর্বোপরি হেথা হোথা হাবুডুবু আছে অতিশয় মোলায়েম
চাউ চাউ ফ্রাঙ্কফুর্টার সসিজ । চর্বিঘন-মাংসবহুল-ভরকারি সম্বলিত
মজ্জামণ্ডিত এই সুপের পোরি-দাটের সঙ্গে ফেনীস রেস্টোরায় নমনীয়
কমনীয় কীচসংসদ ভোজ্য সুপ নামে পরিচিত তরল পদার্থের কোনো জ্বলনাই
হয় না ।

এর সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে এদেশের ভাষায় বলতে গেলে বলবো, মা মাসীকে ফুলিয়ে-ভালিয়ে কোনো গাভিকে পিকনিকে নিয়ে যেতে পারলে তাঁরা সাড়ে বাত্রিশ উপকরণ দিয়ে বে খিচুড়ী রান্না, ধর্ম-গোটে এ বেন তাই। খেয়েই যাচ্ছি, খেয়েই যাচ্ছি, শ্রদ্ধামাত্র খিচুড়ীই খেয়ে যাচ্ছি—শেষটার ঘোঁষ, গুমা, বেগুনভাজা যামলেটে হাত পৰ্বন্ত দেওয়া হয় নি।

জম্মিনের জনপদবাসী ঠিক সেই রকম সচরাচর ঐ একটিমাত্র সুপই খায়। তার সঙ্গে কেউ কেউ রুটি পৰ্বন্ত খায় না।

আজ রোববার, তাই ভিন্ন ব্যবস্থা। অতএব আছে, দ্বিতীয়ত, স্যালাড।

আবার বলছি, আপনাদের সেই ‘ফিনিস’ রেস্তোরাঁর উন্মাসিক ‘স্যালাদ রুস’ ‘স্যালাদ আলা মায়োনেজ’, ‘স্যালাদ ভারিয়ে ও-পোয়াসো’ ওসব মাল বেবাক ভুলে যান।

সুপে যেমন ছিল দুনিয়ার সাকুল্যে সর্বত্র, স্যালাডে ঠিক তার উল্টোটি। আছে মাত্র তিনটি বস্তু : লেটিসের পাতা, টম্বাটোর টুকরো, প্যাজের চাঙি—ব্যস!

এগুলো মেশানো হয়েছে আরো তিনটি বস্তু দিয়ে। ভিনিগার, অলিভ ওয়েল এবং জলে-মিশিয়ে-নেওয়া সরষেবাটা। অবশ্য নুন আছে এবং গোলমরিচের গুঁড়ো থাকলে থাকতেও পারে। কিন্তু ঐ যে সিরকা, তেল, সর্বে সেই তিন বস্তুর কতটুকু কতখানি দিতে হবে, কতকণ মাথতে হবে—বেশী মাথলে স্যালাড জ্বদখদ্ব হয়ে নোঁতয়ে যাবে, কম মাথলে সর্বত্র সর্ব জিনিসের পরশন শিহরণ জাগবে না—সেই হল গিয়ে স্যালাডের তমসাবৃত, সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য।

দম্ভভরে বলছি, আমি শংকর কপিল পড়েছি, কাশ্ট হেগেল আমার কাছে অজানা নন। অলংকার নথ্যান্য ঋচিয়ে দেখছি, ভয় পাই নি। উপনিষদ, সুফীতত্ত্বও আমার কাছে বিভিষিকা নয়। আমার পরীক্ষা নিয়ে সত্যেন বোসের এক সহকর্মী আমাকে বলেছিলেন, তিনি বছরে তিন আমায় রিলেটিভিটি কলকাতার দ্বন্দ্ববস্তুরলম্ব করে দিতে পারবেন। পুনরপি দম্ভ ভরে বলছি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের হেন বস্তু নেই যার সামনে দাঁড়িয়ে হকচাকিয়ে বলেছি, এ জিনিস? না, এ জিনিস আমাধারা ককখনো হবে না। আপ্রাণ চেষ্টা করলেও হবে না।

কিন্তু ভগ্নদত্তের মত নতমস্তকে বার বার স্বীকার করছি ঐ স্যালাড মেশানোর বিদ্যেটো আমি আজো রপ্ত করে উঠতে পারি নি। অথচ বস্তুমহলে—বেশ্বাইয়ের শচীন চৌধুরী থেকে আরম্ভ করে কলকাতার ডাক্তার ঘোষ পৰ্বন্ত—স্যালাড মেশানো ব্যাপারে আমার রীতিমত খ্যাতি আছে। তাঁরা যখন আমার তৈরী স্যালাড খেয়ে ‘আ মরি’, ‘আ মরি’ করেন, আমি তখন ঠাকুরার সেই স্যালাডের স্মরণে জানলা দিয়ে হঠাৎ কখনো বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে থাকি, কখনো বা মাথা নীচু করে বসে থাকি।

বাঙলা কথায় তুলনা দিয়ে বলতে হলে, শ্রদ্ধোই, তেলমর্দা আপনি মাথতে পারেন, আশো পারি, কিন্তু পারেন ঠাকুরার মত? ধনেপাতার চাটনিতে

ক'ই বা এমন কেমনানী ! কিন্তু পায়ের পদি পিসি পারা পিষতে ?

*
‘গুট্‌ন্‌ আপেটিট’ — ‘গুড্‌ এপিটাইট’ !

এর ঠিক বাংলা নেই। উপাসনার পর একে অন্যের দিকে তাকিয়ে সবাই বলে, ‘আশা করি তোমার ঘেন বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হয়, আর তুমি তৃপ্তির সঙ্গে খেতে পারো।’ ইংরিজীর মত জর্মানেও ‘হাঙার’ (হুঙার) ও ‘এপিটাইট’ (‘আপেটিট’) দুটো শব্দ আছে। ‘এপিটাইটে’র ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ নেই। ‘খাওয়ার রুচি, বাসনা’ অনেক কিছু দিয়ে মোটামুটি বোঝানো চলে কিন্তু ঠিক অর্থটি বেরোয় না। ‘ঘেমন ইংরিজিতে বলা চলে, ‘আই এম্‌ হাঙারি বাট্‌ হ্যাভ্‌ নো এপিটাইট’—‘আমার ক্ষুধা আছে কিন্তু খাবার প্রবৃত্তি নেই,’ কিংবা ‘মুখে রুচছে না’। আবার পেটুক ছেলে যখন খাই-খাই করে তখন অনেকেই বলে, ‘দি বয় হ্যাঙ্গ এপিটাইট বাট্‌ হি ইজ্‌ নট্‌ হাঙারি এট্‌ অল্‌।’ এম্বলে ‘এপিটাইট’ তাহলে দাঁড়ায় ‘চোখের ক্ষিধে’। আমার অবশ্য, দুইই ছিল।

আইনান্দুয়ারী আমার মাঝখানে বসার কথা, কিন্তু আমি একরকম জোর করে মারিয়ানাকে মাঝখানে বসিয়ে দিলুম। ঠাকুমার কখন কি দরকার হয় আমি তো জানি নে। মারিয়ানা কাছে থাকলে ওঁকে সাহায্য করতে পারবে।

বিরাত গোল এক চামচ দিয়ে সুপের বড় বোল্‌ থেকে আমার গভীর সুপ-প্লেটে মারিয়ানা চালান করতে লাগল লিটার লিটার সুপ। আমি যতই বাধা দিই কোন কথা শোনে না। তবু মাঝে মাঝে পাকা গম্বীর মত বলে, ‘মান্‌ জল্‌ অড্‌ ন্ট্‌লিষ্‌ এসেন—ভালো করে খেতে হয়, ভালো করে খেতে হয় !’

ঠাকুমা দেখি তখনো কি ঘেন বিড়বিড় করছেন। হয়তো নিত্য মস্তের উপর তাঁর কোন ইশ্টমন্স আছে—সেইটেই জপ করছেন।

আমার মা বলতো, আমাকে দেখলে যতটা বোকা বলে মনে হয়, আমি ততটা বোকা নই ; আর বড়দা বলতো, আমাকে দেখলে যতটা বুদ্ধিমান বলে মনে হয়, আমি ততটা বুদ্ধিমান নই। কোনটা ঠিক জানি নে, তবে আমার স্মৃতি-শক্তিটি ভালো সে-কথাটা উভয়েই স্বীকার করতেন। আমার মনে পড়ে গেল, আমার শহুরে বন্ধু পাউল একবার আমাকে ‘উপাসনার অত্যাচারের’ কথা শুনিয়েছিল। সমস্ত দিন খেতে খিদেয় হনো হয়ে চাষারা তাকিয়ে আছে সুপ-প্লেটের দিকে—ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপর—আর পাদ্রীসাহেব, তিনি সমস্ত দিন ‘প্রভুকে স্মরণ করেছেন বলে’ তাঁর হাঙার এপিটাইট কিছুই নেই—পাদ্রী সাহেবের উপাসনার আর অন্ত নেই।

আমি অনুমান করলুম, আমি বিশেষী বলে হয়তো মারিয়ানা মস্তোচ্চারণে কিছু কিছু কাট-ছাঁট করেছে। ফিস্‌ ফিস্‌ করে সে কথা শোধাতে তার সর্ব মন্থ শব্দ নয়, ঘেন ব্রুড্‌ চুলের গোড়াগুলো পর্যন্ত লাল হয়ে গেল। অপরাধ স্বীকার করে বললে, খাওয়ার পরের উপাসনা পুরোপুরি করে দেবে।

ঠাকুমার প্লেটে মারিয়ানা সুপ ঢেলেছিল অগুপই। তিনি প্রথম চামচ মুখে খেওয়ার পর আমরাও খেতে আরম্ভ করলুম। সঙ্গে সঙ্গে মারিয়ানা আমার

দিকে তাকিয়ে শূন্যে, ‘স্মক্ট্ এস্ ?’ অর্থাৎ ‘খেতে ভালো লাগছে তো ?’ এটা হল এদেশের দু নম্বরের টেবিল এটিকেট। আমি বললাম, ‘ধন্যবাদ ! অপূর্ব ! রাজসিক !’ জর্ননে কথাটা ‘হারালিস’—তার বাঙলা ‘রাজসিক’।

আমি বললাম, ‘ঠাকুমা, আপনাদের এই রবিবারের সেটিং ভারী চমৎকার !’

ঠাকুমা বললেন, ‘এ বাড়িতে কিন্তু মোটেই খাপ খায় না। তা কি করবো বলো। আমার মামা কাজ করতেন এক পস্টেলিন কারখানায়। তিনি আমাকে এটা দেন। সে কতকালের কথা—এস্ ইস্ট্ সো লাঙে হের।’

মারিয়ানা বললে, ‘চেপে যেও না, ঠাকুমা ! তোমার বিয়ের সময় উপহার পেয়েছিলে সেটা বললে কোন অপরাধ হবে না। ফের “এস্ ইস্ট্ সো লাঙে হের” বলে আরম্ভ করো না।’

আমি শুধু বললাম, ‘এস্ ইস্ট্ সো লাঙে হের—সে আবার কি ?’

উৎসাহের সঙ্গে মারিয়ানা বললে, ‘বুঝিয়ে বলছি, শোনো। ঠাকুমা যখনই আমাকে ধমক দিতে চায়, তখন হঠাৎ তাঁর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠে। “তোমার বাপ এ-পরবের সময় এরকম ধারা করতো না, তুই কেন করছিলি ? তোমার মা তার সাম্বৎসরিক পরবের দিনে (নামেনস্টাখ্) ভোরবেলা চার্চে গিয়েছিল, আর তুই ন’টা অবধি ভন্ডভন্ড করে নাক ডাকালি।” কে কবে হেসেছিল, কে কবে কেশেছিল টায়-টায় মনে গাঁথা আছে। আবার দেখো শীতকালে যখন দিনভর রাতভর দিনের পর দিন বরফ পড়ে, বাড়ি থেকে বেরনো যায় না, তখন যদি সময় কাটাবার জন্য ঠাকুরমাকে জিজ্ঞেস করি, “হ্যাঁ, ঠাকুমা বলো তো ভাই, লক্ষ্মীটি, ঠাকুরদা কি ভাবে তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পেড়েছিল। এক হাঁটু গেড়ে আরক হাঁটু মূড়ে, ফুলের তোড়া বাঁ-হাতে নিয়ে এগিয়ে দিয়ে, ডান হাত বুকের উপর চেপে নিয়ে—”

আমি বাধা দিয়ে বললাম, ‘অবাক করলি ! তুই এসব শিখলি কোথায় ? তোমার কাছে কেউ বিয়ের প্রস্তাব পেড়েছিল নাকি ?’

এইবারে ঠাকুমা ঠোঁট খুলল। বললেন, ‘বেশ হয়েছে।’

মারিয়ানা মুখ আবার লাল করে বললে, ‘দ্যাং ! সিনেমাতে দেখেছি। উইল-হেলম বুশের আঁকা ছবিতে দেখেছি।’ তা সে যাক গে, আমার কথা শোনো। এসব বিয়ের প্রস্তাব, বিয়ের পর পরলা ঝগড়া, ঠাকুরদা যখন লড়াইয়ে চলে গেল তখনকার কথা, এসব কথা জিজ্ঞেস করলে হঠাৎ ঠাকুরমার স্মৃতিশক্তি একদম লোপ পায়। আমাদের ঐ কাল্ কুকুরটা বেরকম পূর্ণচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে ডুকরে ডুকরে আর্ত-রব ছাড়ে ঠিক সেই গলায় ককিয়ে ককিয়ে বলে, সেই এক কথা—“এস্ ইস্ট্ সো লাঙে হের”, “সে কত প্রাচীন দিনের কথা, সে সব কি

১ জর্ননের সুকুমার রায়। ও’রই মত নিজের কবিতার ছবি নিজেই আঁকতেন। তবে সুকুমারের মত ‘প্যার ননসেন্স’ লেখেন নি। ও’র বেশীর ভাগই ইলাস্ট্রেশন গল্প।

আর আমার মনে আছে।” ধমকের বেলা সব মনে থাকে—তখন আর “লাও হের, লাও হের” নয়।’

আমি বললুম, ‘আলবাৎ, আলবাৎ।’

তার থেকে অবশ্য বোকা গেল না আমি কোন পক্ষ নিলুম। পরে বিপদে পড়লে বোদিকে খুশী ঘুরিয়ে নেব। অবশ্য আমি কালো, কৃষ্ণপক্ষ, অর্থাৎ ক্রীকফের পক্ষেই থাকার চেষ্টা করি।

ইতিমধ্যে আমি মারিসানার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছি।

ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে দুই দেওয়ালের সঙ্গে মিলে সিন্কে—জর্মনে বলে শ্‌পুন্স-স্টাইন।

দেয়ালে গাথা ওয়াশস্টেন্ডের মত, ছোট চোবাচ্চা-পানা—বেয়ালে গাথা বলে যেন হাওয়ায় দুলছে—মাটি পর্ষন্ত নেবে আসে নি। সেখানে ট্যাপে বাসন কোষণ মাজা হয়, মাছ-মাংস ধোওয়া হয়—তাই রান্নাঘরে, কিংবা হাওয়ায় (অবশ্য এই শীতের দেশে হাওয়া জিনিসটাই নেই) ঘড়াঘড়া জল রাখতে হয় না। খাওয়া-দাওয়ার পর তাবৎ বাসন-বর্তন, হাঁড়-কুড়ি ঐটেতে রেখে সেটাকে জলভর্তি করা হয়। তারই উপরে বাঁধকের দেয়ালে কয়েকটা হুকে ঝুলছে ধুঁকলের জালের পরিবর্তে ওয়েস্ট কটন, অতি সুক্ষ্ম তারের জালের স্পঞ্জ, খান দুই কাড়ন। আর তার নীচে দেয়ালে গাথা শেল্ফের উপর ভিন্নজাতীয় (ওদের বোধ হয় ‘পের্জল’) গর্দভের চোঙা, সাবান, আর দু-একটা টুকটাকি বেগুলো আমি চিনি নে। আমি তো আর জর্মন রান্নাঘরে ছেলেবেলা কাটাই নি। ডান দিকের দেয়ালে গাথা, কিংবা ঝোলানো একটা বেশ বড় খোলা শেল্ফ। সিন্কে হয়তো দুচার কাংলি গরম জলও ঢেলে দেওয়া হয়েছে—রান্না শেষ হওয়ার পর যেটুকু আগুন বেঁচে থাকে, সেটা ঝাতে করে খামকা নষ্ট না হয়, তাই তখন তার উপর কাংলি চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই গরম জলে বাসন-কোষণের চর্বি গলাবার জন্যে সিন্কে ঢেলে দেওয়া হয়, আর ইতিমধ্যে কেউ কফি বা চা খেতে চাইলে তো কথাই নেই। সিন্কেই সামনে বেয়ালমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে উপর থেকে ভিন্ন স্পঞ্জ পেড়ে নিয়ে এক একটা করে হাঁড়ি মাজবে, ঝাড়ন দিয়ে সেটা শুকোাবে, তারপর ডান দিকের শেল্ফে রাখবে। ভাল হয় যদি একজন মাজে আর অন্যজন ঝাড়ন দিয়ে পেঁাছে।

সিন্কেই ডান দিকে পূর্বের দেয়ালের সঙ্গে গা বেঁধে একটি প্রমাণ সাইজের মোক্ষম টেবিল। উপরের তক্তাখানা অন্তত দুইটি পুরু হবে। এর উপরেই মাছমাংস-ভরকারি কাটাকুটি হয়। তাই তার সর্ব-পৃষ্ঠে রিস্‌ রস্‌ ছোট-বড় সব রকম কাটার দাগ। পোরা ইঁদুর পরিমাণ জায়গা বেয়োবে বা বেখালে কোনো দাগ নেই। টেবিলের এক পাশে মাংস কোফ্তা করার জন্য একটা কল লাগানো আছে। টেবিলের সামনে একটি টুল—কিন্তু জর্মন মেয়েরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রান্নার কাজ করতে ভালোবাসে।

সিন্কেই বাঁধকে উত্তরের দেয়ালের সঙ্গে গা বেঁধে হাথ, উনুন, বা খুশী

বলতে পারেন। প্রায় টেবিল সাইজের একটা লোহার বাস্ক। উপরে চারটে উনুনের মত। নিচের দরজা খুলে কয়লা পোরা হয়। ভাঙা টুকরো টুকরো পাথরে কয়লা ছাড়া এরা ব্যবহার করে রিক্টেট। কয়লা গড়ে করে ই'টের (রিক্ট) সাইজে বানানো হয় বলে এগুলোর নাম রিক্টেট। হাত ময়লা না করে সাঁড়াশি দিয়ে তোলা যায়, আগুনও ধরে খুব তাড়াতাড়ি আর ধরোও বেশ অত্যন্ত। উনুনের পাশে একটা বালতিতে কয়লা, অন্য বালতিতে চিমটেসুন্ড একগাদা রিক্টেট। উনুন থেকে ধরো নিকাশের চোঙা বেরিয়ে যেখানে দেয়ালে গিয়ে ঢুকছে তারই ডান পাশে দেয়ালে গাথা আরেকটা গেল'ফ' তাতে বড় বড় জ্বার। কোনোটাতে লেখা 'মেল'—ময়দা, কোনোটাতে 'হুস্কার'—চিনি, কোনোটাতে 'জাল'—নুন। তামচীনির (স্টোন-ওয়েয়ার) জারগুলো পোড়াবার আগেই কথাগুলো লেখা হয়েছিলো বলে ওগুলো কখনো মূছে যাবে না। তারপর বোতল বোতল তেল, সিরকা ইত্যাদি তরল পদার্থ। সর্বশেষে মার্গারীন, মাখন আরো কি সব।

ঘরের মাঝখানে খাবার টেবিল।

ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে—অর্থাৎ সিন্‌কের তির্থ'ক কোণে—একখানা পুরনো নিচু আম'-চেয়ার। দক্ষিণ থেকে ঘরে ঢুকতেই বাঁদিকে পড়ে। এ-চেয়ারে ঠাকুমা বসে বসে ঢোলেন। সামনের ছোট ফুটস্টুল বা পাদপীঠের উপর পা রেখে।

এদের জুইংরুম-কম-ডাইনিংরুম আছে। কিন্তু তার ব্যবহার বড় একটা হয় না। সেটা যেন বহু পোশাকী। বসে সুখ পাওয়া যায় না, কথাবার্তা কেমন যেন জমে না। বসে ঘরের কেমন যেন একটা ভ্যাপসা গন্ধ।

আর এ-ঘরে কেমন যেন একটা হুয়াতা, খোলাখুলি ভাব। কেউ যেন ~~কিছু~~ পর নয়।

॥ ৯ ॥

কুকু-কুকু, কুকু-কুকু, কুকু-কুকু !

এ কি ?

এত যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রাম্মাঘরের বর্ণনা দিলুম, ঘড়িটা গিয়েছি বিলকুল ভুলে। লক্ষ্যই করি নি। পর্ব'বেক্ষণ-শক্তি আমার বিলক্ষণ অক্ষম বলে ছেলে-বেলায়ই আমার গুরুদশাই আমাকে 'রাষ্ট্রাশ্ব', 'দ্বিবাশ্ব' ইত্যাদি উত্তম উত্তম

২ 'স্টোন-ওয়েয়ার' শব্দ বাংলা অভিধানে 'পাথরের বাসন' বলা হয়। আসলে ওটা সব চেয়ে নিরেল পসেলিন বা 'গ্লোজড পটারি' বলা যেতে পারে। তাম্ববর্ণের চাঁনেমাটি বলে এ সব জায়কে প্দুবাবুলায় তাম্ব-চাঁনি বলে। উত্তম বাস্তবায়ই এগুলো ব্যবহার হয় প্রধানত আচার রাখার জন্য।

খেতাবে বিভূষিত করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, আমাদের আর যা হোক সাহিত্যিক হওয়া হবে না। আমার ঘোষের মধ্যে, লাটসারেবের কুকুরের যে একটা ঠ্যাঙ নেই, সেটা আমি লক্ষ্য করি নি। এবার সেটা পুনরায় সপ্রমাণ হল। অবশ্য আমার একমাত্র সাক্ষী, মারিয়ানা আমার চেয়ে একমাথা খাটো বলে দেয়াল ঘাড়টা ঠিক আই-লেভেলে ঝোলানো হয় নি।

এসব ঘড়ি সম্ভা হলেও এদেশে বড় একটা আসে না। ছোট্ট একটি বাজের উপর ডায়েল লাগানো কিন্তু কাঁচের আবরণ নেই। বাজের উপর ছোট্ট একটি কুটিরের মডেল—ব্ল্যাক ফরেস্ট (শুয়াৎস্ ভাল্ট—কালো বল) অঞ্চলে যে-রকম সচরাচর হয়ে থাকে, এবং কুটিরটি দেখা যাচ্ছে যেন তার পাশ থেকে, কারণ কোনো দরজা সেখানে নেই, আছে একটি হলধে রঙের জানালা—কুটিরটি সবুজ রঙের। প্রতি ঘণ্টায় ফটাস্ করে জানলার দুটি পাট খুলে যায় আর ভিতর থেকে লাফ দিয়ে তার চোঁকাঠে বসে একটি ছোট্ট পাখী মাথা দোলাতে দোলাতে কু-কু করে জানিয়ে দেয় কটা বেজেছে। তারপর সে ভিতরে ডুব মারে আর সঙ্গে সঙ্গে জানলার দুটি পাট কটাস করে বন্ধ হয়ে যায়।

ব্ল্যাক ফরেস্টের কুটিরশিল্প। এ দেশে রপ্তানি হতে শূন্য। হলেও বেকার হবে। এতটুকু কাঁচের আবরণ যে ঘড়ির কোথাও নেই সে ঘড়ি এই ধূলো-বালির দেশে দু দিনেই ধূলিশয্যা গ্রহণ করবে।

আমি চমকে উঠে বললাম, সর্বনাশ! তিনটে বেজে গেছে। আমাকে যে এগুতে হবে।

আমাদের তখন সবেমাত্র সূপ-পর্ব সমাধান হয়েছে। ঠাকুমা সূপ শেষ করে চুপচাপ বসে আছেন।

মারিয়ানা বললে, ‘এগুতে হবে মানে? খাবার শেষ করে তো যাবে। আজ যে রোববারের লাণ্ড—তার উপর রয়েছে রে রাগু।’

‘রাগু’ কথাটা ফরাসী। অর্থ ‘কোফ্তা-কাটা মাংস। আর ‘রে’ মানে হরিণ।

তার সঙ্গে টুকরো টুকরো করে কাটা থাকে ব্যাঙের ছাতা (এ দেশে মেদিনী-পূর বাঁকুড়ার লোক এর তত্ত্ব কিছু জানে, কাম্বীরীরা ভালো করেই জানে এবং টিনে করে রপ্তানি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে), পাজি আর ট্রাফ্ল—অবশ্য যদি এই শেষোক্ত বস্তুটি পাওয়া যায়।^১ রীতিমত রাজভোগ!

১ ট্রাফ্ল নামক সর্বাঙ্গীর্ণ জন্মান মাটির কয়েক ইঞ্চি নীচে, প্রধানত ক্র্যাম্পেই। একমাত্র কুকুর আর শূরোরই মাটির উপর থেকে গন্ধ পেয়ে এটা খুঁড়ে বের করতে পারে—যদিও ট্রাফ্ল কুকুরের খাদ্য নয়। এ জিনিস বের করার জন্য মাংসের টুকরোর লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে কুকুরকে ট্রেন করতে হয়। বেচারী কুকুরগুলোকে স্বার্থপর মানব অত্যন্ত কম খাইয়ে খাইয়ে রাখে—না হলে তারা ট্রাফ্লের সম্ভান করে না। আর কুকুরগুলোকে ট্রাফ্ল শিকারী খোঁজবার সময় যে মিনিট মিনিট কথা বলে সে শোনবার মত—‘ও বাহু, ও বাহু, ও আমায়

আমি শূন্যলুপ্ত, 'হরিণের মাংস পেলে কোথায়?'

বললে, 'দাঁড়াও, রাগটো নিয়ে আসি।'

আমার আর মারিয়ানার সূপ প্লেটের নীচে আগের থেকেই মারিয়ানা প্রধান খাদ্যের প্লেট সাজিয়ে রেখেছিল। এখন শূন্য সূপ প্লেটই উপর থেকে সরতে হল। শূন্যেই রাশাতে চার পদের লাগু ডিনার হলে এরকম ধারা চার চারখানা প্লেট একটার উপর আরেকটা সাজানো হয়। যেমন যেমন এক এক পদ খাওয়া শেষ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে সেই প্লেট সরানো হয়—প্রতিবারে নতুন করে পরের পদের জন্যে প্লেট সাজাতে হয় না। একথা আমি শুনছি, কারণ একাধিক রাশানের বাড়িতে আমি থেয়েছি—বলশী এবং জারিস্ট দুই সম্প্রদায়েরই কিন্তু এ-ব্যবস্থা দেখি নি। একখানা প্লেটের উপর সূপ প্লেট রাখলে উচ্চতায় বিশেষ কিছু হের-ফের হয় না, কিন্তু চারখানা প্লেটের উপর সূপ প্লেট রাখলে সে তো নাকের ডগায় পেঁচছে যাবে।

আত্ম-খুলে মারিয়ানা রে রাগ নিয়ে এল।

আমি ঠাকুরার দিকে তাকিয়ে মারিয়ানাকে চোখের ইশারা করলুম :

মারিয়ানা বললে, 'ঠাকুরা এক সূপ ভিন্ন অন্য কিছু খায় না। আমিও না। কিন্তু এ না জিজ্ঞেস করলে হরিণের মাংস কোথায় পেলে? আমাদের গ্রাম থেকে বেরলে দূরে দক্ষিণে দেখতে পাবে আরেকটা গ্রাম—তার নাম মূফেন-ডর্ফ'। তারপর-পরো একটা ক্ষেত পেরিয়ে র্যুগন্স ডর্ফ'। তার শেষে নাম-করা হোটেল ড্রেন—রাইনের পাড়ে। সেখানে কিন্তু ওপারে যাবার থেলা নেই। তাই কিছুটা দক্ষিণে গিয়ে মেলেম্ থেয়াঘাট। ওপারে ক্যোনিগ্ সভিস্টার। সেটা সীবেন-গেবিগের (সপ্তকুলাচলের) অংশ। তার আরো অনেক দক্ষিণে গিয়ে লরেলাই। ঐ যে তোমার পকেটে রয়েছে হাইনের কবিতার বই তাতে আছে লরেলাই সম্বন্ধে কবিতা'।^২

মারিয়ানা ইন্সকুল-মাস্টারের মত আমাকে বেশ কিছুটা ভূগোল-জ্ঞান দান করে বললে, 'হ্যাঁ, হরিণের মাংসের কথা হচ্ছিল। ঐ যে মূফেন-ডর্ফ (ডর্ফ = গ্রাম) সেটা এমনি অজ যে আমরা ওটাকে ডাকি মূফিকার—আফ্রিকার মত সভ্যতা থেকে অনেক দূরে আছে বলে আফ্রিকার 'ফ্রিকা'টি জুড়ে নিয়ে। আর আফ্রিকাবাসীকে যেমন জর্ম'নে বলা হয় 'আফ্রিকানার' ঠিক তেমনি ওদের আমরা ডাকি 'মূফিকানার'।

আমি হেসে বললুম, 'তোমাদের রসবোধ আছে।'

সোনার খনি! এগো না বাবা, খোঁজ না ধন!—আরো কত কী! শেষের দিকে বোচারী কুকুরকে মাংসের পরিবর্তে বাসী রুটির ছোট ছোট টুকরো দিয়ে ভোলানো হয়! ষ্ট্রাকলের নাকি এক্সোর্ডিসিয়াক গুল আছে। জাম্স ঐ দিয়ে বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা কামায়।

২ অধুনা প্রকাশিত 'হাইনের শ্রেষ্ঠ কবিতা' ('দীপায়ন প্রকাশনা'। 'বেশ' ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮ সংখ্যা, পৃ ৪১৮ প্রঃ পুস্তিকার ৮৬ ও ৮৭ পৃ পৃষ্ঠা।

মারিয়ানা বললে, ‘ঐ মুর্তিকার কাকা হানস্ বাবার বন্ধু। আসলে অবশ্য বাবার বন্ধু বলেই ওঁকে ডাকি অঙ্কল্ হানস। দৃজনাত্রে প্রতি শনিবারে শিকারে যেত। শতদিন বাবা বেঁচেছিল। এখন একা যায়। যেদিন ভালো শিকার জোটে সেদিন মাংসের খানিকটে আমার দিয়ে যায়। ব্যাঙের ছাত্তা আমি নিজে বন থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আসি আর প্যাজ তো ঘরে আছেই।’

আমি বললাম, ‘মারিয়ানা, লক্ষ্মী মেয়ে, আমার ঘেরি হয়ে যাচ্ছে।’

ঠাকুমার সুপ প্লেট সরানোর পর তিনি হাত দুটি একজোড়া করে অতি শাস্তভাবে আমাদের কথাবার্তা শুনেনে যাচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে অল্প মৃদু হাস্য করলে গাল দুটি টুকটুকে লাল হয়ে যাচ্ছিল। যেন সর্ব শরীরের রক্ত ছুটে গিয়ে গাল দুটিতে আশ্রয় নিচ্ছিল—হার, বৃড়ীদের গায়ে ক’ ফোটা রক্তই বা থাকে !

এবার তিনি মৃদু খুলে বললেন, ‘মারিয়ানা না বললো তুমি পায়ে হেঁটে হাইকিঙে বেরিয়েছো, তবে তোমার তাড়া কিসের ? এ গ্রাম যা, সামনের গ্রামও তা। গ্রামে গ্রামে তফাত কোথায় ? শহরে শহরে থাকে। কারণ ডগবান বানিয়েছেন গ্রাম, আর মানুষ বানিয়েছে শহর।’

এক লক্ষ্যে চোরার ছেড়ে মারিয়ানা ঠাকুমার কাছে গিয়ে দৃ হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে তার গালে ঝপাঝপ গন্ডা তিনেক চুমো খেলে। আর সঙ্গে সঙ্গে ‘ওঃ ! তুমি কি লক্ষ্মীটি ঠাকুমা ! তোমার মত মেয়ে হয় না ঠাকুমা ! আমার কথা শুনতে যাবে কেন ঐ ভবঘুরেটা। দেখা হয়েছে অবধি শৃধ পালাই পালাই করছে।’

ঠাকুমা ব্যতিব্যস্ত না হয়ে বললেন, ‘হয়েছে, হয়েছে। তুই খাওয়া শেষ কর।’

রে রাগদর সঙ্গে নোনা জলে স্নান করা আলু আর জাওয়ার ক্রাউট।

ঠাকুমা ব্যতিব্যস্ত না হয়ে বললেন, ‘ক্রাউট খেতে ভালোবানো ? আমি তো শুনোছি, বিশেষীরা ও জিনিসটা বড় একটা পছন্দ করে না।’

আমি বললাম, ‘জিনিসটা যে বাধার্কপার টক আচার। সত্যি বলতে কি, প্রথম দিন আমার ভালো লাগে নি। এখন সপ্তাহে নিদেন তিন দিন আমার চাই-ই চাই। জানেন, ক্রাস্সের প্রধান মন্ত্রী পিয়ের লাভাল যখন একবার বার্লিনে আসেন তখন তাঁর কেশবাসী কে যেন তাঁকে বলেছিল জর্মনির মত জাওয়ার ক্রাউট কেউ বানাতে পারে না। সে কথা তাঁর মনে পড়ল যেদিন ভোরে তিনি চলে যাবেন তার আগের রাতে আড়াইটার সময়। রেস্টোরাঁ তখন বন্ধ ; হলে কি হয় ক্রাস্সের প্রধান মন্ত্রী, তিনি খাবেন ক্রাস্সের জাওয়ার ক্রাউট—স্বোগাড় করতেই হল।’

সেই রাত সাড়ে চৌদ্দটার সময় ক্রাস্সের প্রধান মন্ত্রী সোল্লাসে খেলেন জাওয়ার ক্রাউট।’

আমি যে এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা পছন্দ করি না তার প্রধান কারণ ঐ খাবারটি সম্বন্ধে তিনি অচেতন।

জাওয়ার ক্লাউট নিয়ে বস্ত্র বেশী বাগাড়ম্বর করার বাসনা নেই। আমাদের কাস্‌মোথার মত ওতে বস্ত্র বামনাকার খিটনিটি। তার কারণ সমস্যা হুঁজুনায়েই এক। তেল, নুন, সিরকা, চিনি এসব কোনো সংরক্ষণকারী বস্তু অর্থাৎ প্রিজারভেটিভ ব্যবহার না করে কিংবা যতদূর সম্ভব অল্প ব্যবহার করে কি প্রকারে খাদ্যবস্তু বহুকাল ধরে আহারোপযোগী করে রাখা যায়, কাস্‌মোথ ও জাওয়ার ক্লাউটের এই নিয়ে একই শিরঃপীড়া। সেই কারণেই বোধ হয় কাস্‌মোথ বানাবার ‘আস্য’ পদ্য বাঙলার বেশী পরিবারে নেই। মুসলমানরা আদপেই কাস্‌মোথ বানাতে পারে না বলে কাস্‌মোথ বানাবার সময় অক্ষয় তৃতীয়ায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বস্ত্র বেড়ে যায়। বানাবার ‘আস্য’ না থাকলেও সহাস্য বধনে খাবার ‘আস্য’ সকলেরই আছে।

পশ্চিমের উপর খুদাতালার মেহেরবানিও অত্যধিক। ওদের তরির-তরকারি ফলমূল বেবাক তৈরী হয়ে ওঠে গ্রীষ্মের শেষে। তার পরেই শীত এসে খাদ্য-বস্তু সংরক্ষণে সাহায্য করে। আমাদের উত্তম উত্তম তরির-তরকারি তৈরী হয় শীতের শেষে—তার পরই আসে গ্রীষ্মকাল—সংরক্ষণকর্মে প্রকৃতির কোনোই সহায়তা পাই নে। ফল পাকে গ্রীষ্মকালে—তার পরই এসে যায় ভ্যাপসা বর্ষা—মসনে-ছাতি পড়ে সব-কুছ বরষা। পচা বর্ষার শেষের দিকে দুই নয়া পয়সার রোস্‌মুদর ওঠা-মাঠই গিম্বীমা’রা আচারের বোল্লাম নিয়ে টাট্টা খোড়ার বেগে বেরোন ঘর থেকে। ফের পইন্ট জিরো ইলশে গুঁড়ি নাবামার তাঁরা ‘ঐশ্যা, গেল গেল, ধর ধর’ বলে বেরোন রকেট-পারা। আর বাইবেলী ভাষায় ‘খনা যাহারা সরল হৃদয়’—অর্থাৎ ভোলা-মন, তাদের তো সর্বনাশ।

জানি, তেলে টাইটম্বার করে রাখলে মসনে পড়ে না, কিন্তু বস্ত্র বেশী তেল চিট্‌চিটে আচার খেয়ে শুখ নেই। তবুপরি ভেজাল তেলের ঠেলায় এ গ্রীষ্মে মোক্ষম মার খেয়ে আমি আচারের মাথায় ঘোল ঢেলে দিয়ে বিদায় দিয়েছি। এখন রইলেন শুধু জারক নেবু, আর বাজারের ওঁচা আচার।

আমি বললুম, ‘মারিয়ানা, ঠাকুরমার সেই “লাঙে হের, ল্যাঙে হের”—পূরনো দিনের গল্প বলো না?’

অপরাজের টারচা সোনালী রোদ এসে পড়েছে ঠাকুরমার নীল সদা সেটের উপর আর মারিয়ানার ব্রুড চুলের উপর। চেরী ব্রাডির বেগুনী রঙের সঙ্গে সে আলো মিশে গিয়ে ধরেছে এক অদ্ভুত নতুন রঙ। ডাবরের সুপের ফোঁটা ফোঁটা চর্বি’র উপর আলো যেন স্থান না পেয়ে ঠিকরে পড়ছে। সে রোদে ঠাকুরমার বরফের মত সাধা চুল যেন সোনালী হয়ে উঠলো। তার পিঠের কালো জামার উপর সে আলো যেন আদর করে হাত বুলোচ্ছে। জানলার পরদা যেমন যেমন হাওয়ার দুলছে সঙ্গে সঙ্গে আলোর নাচ আরম্ভ হয় ঝকঝকে বাসন-কোশনের উপর, গেলাসের তরল প্রবোয় উপর আর ঠাকুরমা-নাতনীর চুলের উপর।

অনেককাল পর গ্রামাঙ্গলে এসেছি বলে খেতে খেতে শুনিছি, রকম-বেরকম

পাখির মধুর কুজন। এদের সময় ঘনিষে এসেছে। এরা আর বেশীদিন এখানে থাকবে না। শীত এলে দক্ষিণের দিকে পাড়ি দেবে। তখন গ্রাম শহরের তফাৎ হুটে বাবে।

আসবার সময় এক সারি পপলার গাছের নিচু দিকে ছায়ায় ছায়ায় বাড়ি পেঁছেছিলুম। রবিবারের অপরাহ্ন বলে এখনো সমস্ত গ্রাম সুবৃন্দ—শুধু ঐ চিনারের মগড়ালের ভিতর দিয়ে বাতাস চলার সামান্য গুঞ্জরণ ধ্বনি কানে আসছে, কিংবা কি এদেরই ডোবার পাড়ে যে নদ্রে পড়া উইপিং উইলো দেখেছি তারই ভিতর দিয়ে বাতাস ঘুরে ঘিরে বেরোবার পথ পাচ্ছে না? এ গাছের জলের উপর লুটিয়ে-পড়া, মাথার সমস্ত চুল এলোমেলো করে দিয়ে সদ্য-বিধবার মত গুমরে গুমরে যেন কামার ক্ষীণ রব ছাড়া—এগুলো আমার মনকে বড় বেদনায় ভরে দেয়। দেশের শিউলি ফুলের কথা মনে পড়ে। তার নামও কেউ কেউ ইংরিজীতে দিয়েছে ‘সরো ফাওয়ার’ বিষাদ-কুসুম।

ঠাকুমা ঢুলতে ঢুলতে হঠাৎ জেগে উঠলেন। জানি নে, বোধ হয় ‘লাও হেরে’র ফাঁড়া কাটাবার জন্য মারিয়ানাকে শূধোলেন, ‘কাল ছের হান্সের সঙ্গে কি কথাবার্তা হল?’

মারিয়ানা আমার দিকে তাকিয়ে দুটু হাসি হেসে বললে, ‘দেখলে? তা সে যাক। কিন্তু জানো, হান্স্ কাকা বড় মজার লোক। যত সব অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বলে—কোনটা যে সত্যি, কোনটা যে তার বানানো কিছুটা বোঝার উপায় নেই। কাল বলছিল, একবার হান্স্ কাকা আর বাবা নাকি লড়াইয়ের ছুটি পেয়ে দুজনা শিকারে গেছে—তখন লড়াইয়ের সময় বলে বন্দুকের লাইসেন্স নিয়ে বস্ত্র কড়াকাড়ি। হঠাৎ একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়েছে পদলিস, দেখতে চেয়েছে লাইসেন্স। পদলিসকে যেই না দেখা অর্মান হান্স্ কাকা বাবাকে ফেলে দিয়ে চৌ-চাঁ ছুট। পদলিসও ধরবে বলে ছুটেছে পিছনে। ওঁদিকে হান্স্ কাকা মোটা-সোটা গান্ধা-গান্ধা মানুষ। আধ মাইল যেতে না যেতেই পদলিস তাকে ধরে ফেলেছে। কাকা বললে, পদলিস নাকি হুকুম দিয়ে লাইসেন্স চাইলে। কাকাও নাকি ভাল মানুষের মত গোবেচারী মনুষ করে পকেট থেকে লাইসেন্স বের করে দেখালে।’

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, ‘লাইসেন্স যদি ছিল তবে ওরকম পাগলের মত ছুটলো কেন?’

মারিয়ানা বললে, ‘আহ, শোনোই না। তোমার কিছতেই সবুর সয় না। পদলিসও তোমারই মত বেকুব বনে ঐ প্রগ্নই শূধালে। তখন হান্স্ কাকা নাকি হাসতে হাসতে গড়াগড়ি দিয়ে বললে, আমার লাইসেন্স আছে, কিন্তু আমার বন্দুর নেই। সে এতক্ষণ হাওয়া হয়ে গিয়েছে।’ পদলিস নাকি প্রায় তাকে মারতে তাড়া করেছিল।’

আমি হাসতে হাসতে বললুম, ‘খাসা গল্প। পদলিসের তখনকার মন্থের ভাবটা দেখবার আমার বড় ইচ্ছে হচ্ছে। জানো, আমাকেও একবার পদলিস তাড়া করেছিল। ওরে বাপ রে বাপ! সে কী ছুট, কী ছুট, কিছু ধরতে পারে নি।’

মারিয়ানার কচি মন্থ ভয়ে শব্দিকরে গিয়েছে। হেঁচট খেতে খেতে শব্দধোলে,
‘কেন, কি হয়েছিলো?’

আমি বললুম, ‘কি আর হবে, বা আকছারই হয়ে থাকে। পদাঙ্গে শটুডেন্টে
পাছো।’

মারিয়ানা নির্বাক ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি শব্দধোলে, ‘কি হল? আমার মাথার পিছনে ভুত এসে দাঁড়িয়েছে
নাকি?’

তোৎলাতে তোৎলাতে শব্দধোলে, ‘তুমি মর্নিভার্সিটির শটুডেন্ট!’

আমার তখনো জানা ছিল না, এ দেশের গ্রামাঞ্চলের লোক বিশ্ববিদ্যালয়ে
বড় একটা যায় না। কাজেই এখানে তাদের বড় সম্মান, রীতিমত সমীহ করে
চলা হয়। তাই আমি আমার সফরের শেষের দিকে কথাটা বেবাক চেপে
যেতুম। আমি ট্র্যাম্প, ট্র্যাম্পই সই। কী হবে ভুললোক সেজে!

মারিয়ানা বললে, ‘তাই বলো। আমিও ভাবছি, ট্র্যাম্পই যদি হবে তবে
নখের ভিতর দাঁড়ি ময়লা নেই কেন? ট্র্যাম্পই যদি হবে তবে গোয়ালে
গিলছে না কেন? খেতে খেতে অন্তত বার তিনেক ছুরিটা মন্থে পড়লো কেন?’

আমি অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে বললুম, ‘ভুলগুলো মেরামত করে নেব।’
‘ধ্যাৎ! ওগা লো নোংরামি। শিখতে হয় নাকি?’

আমি বললুম, কোথায় শটুডেন্ট বলে পরিচয় দিলে লাভ, আর কোথায় ট্র্যাম্প
সাজলে লাভ এখনো ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারি নি। যখন যেটা কাজে লাগে
সেইটে করতে হবে তো। এই তো যেমন তুমি। মনে হচ্ছে ট্র্যাম্পের কদরই
তোমার কাছে বেশী।’

এইটুকু মেয়ে। কি বা জানে, কীই বা বোঝে। তবু তার মন্থে বেধনার
ছায়া পড়লো। বড় বড় দই চোখ মেলে নিঃসঙ্কোচে আমার দিকে তাকিয়ে
বললে, ‘তোমাকে আমার ভালো লাগে, তা তুমি ট্র্যাম্পই হও, আর শটুডেন্টই
হও।’

পঞ্চদশীর স্মরণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘অকারণ বেধনার ছায়া ঘনার
মনের দিগন্তে, ছল ছল জল এনে দেয় নয়নপাতে।’ এ মেয়ে একদিন বড় হবে।
ভালোবাসতে শিখবে। সেইদিনের আগমনী আজকের দিনের এই ‘কচিৎ
জাগরিত বিহঙ্গ-কাকলীতে।’

এবারে কি? মারিয়ানা সেয়ানা। আহা! সন্তোষ উপাসনা আরম্ভ করলে, ‘তোমাকে
কৃতজ্ঞতা জানাই, হে প্রভু সর্বশক্তিমান’ দিয়ে এবং শেষ করলো পরলোকগত
শ্রুতাদ্যদের স্মরণে।

এসব প্রার্থনার সন্মুখ অনুরোধ করা প্রায় অসম্ভব। সর্ব ভাবের সর্ব

প্রার্থনার বেলাই তাই। প্রণব কিংবা 'রুম্ম যব্বের দক্ষিণ' মদ্রুম ভেল মাং পাখি নিত্যম্'-এর বাঙলা অনুবাদ হয় না। আমি বহু বৎসর ধরে মদ্রুমমানের প্রধান উপাসনা, 'ফাতিহা' অনুবাদ করার চেষ্টা করছি। আজ পর্যন্ত কোনো অনুবাদই মনকে প্রসন্ন করতে পারে নি। 'আভে মারিয়া' মন্ত্রটি অতি ক্ষুদ্র। ট্রামে-বাসে ঘরে-বাইরে বার বার মনে মনে এটির অনুবাদ করেছি—আঠারো বছর ধরে, এবং এখনো করছি—কোনোটাই মনঃপূত হয় না। দেশের যেনে আমার পরিচিত এক ক্যাথলিক পাদ্রী সাহেবের সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ ধরে ঐ 'আভে মারিয়া'র দুটি শব্দ নিয়ে আলোচনা হয়। ঐ মন্ত্রে মা-মেরির বিশেষণে ল্যাভনে আছে, 'গ্রাৎসিয়া প্লেনা', ইংরিজীতে 'ফুল অব গ্রেস', জার্মানে 'ফুল ডের গ্রাডে'। আমি বাংলা করেছিলাম 'করুণাময়ী'। পাদ্রী সাহেবের সেটা জানা ছিল। শব্দটা আমার মনঃপূত হয় নি, কিন্তু দৃষ্টিতে বহু চেষ্টা করেও পছন্দসই শব্দ বের করতে পারলাম না।

কাজেই মারিয়ানার প্রার্থনাগুলোর বাংলা অনুবাদ উপস্থিত মূলতুবী থাক। মারিয়ানা বাসনকোশন হাঁড়িবর্তন সিনকে ফেলেছে।

আমি উঠে গিয়ে সিনকের সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আমি মাজি : তুমি পেঁছো।'

জুতো দিয়ে কাঠের মেঝেতে ঠোঙ্গর মেয়ে মারিয়ানা বললে, 'একদম অসম্ভব! তার চেয়ে তুমি ঐ টুলটার উপর বসে আমাকে ইন্ডিয়ান গল্প বলো।'

এখানে আমার পাঠকদের বলে রাখা ভালো যে এ-কাহিনীতে অনেক কিছু কাট-ছাঁট বাদ-সাদ দিয়েই আমি লিখছি। কারণ ভারতবর্ষ কত বড় দেশ, পাহাড় নদী আছে কি না, লোকে কি খায়, মেয়েদের বিয়ে ক'বছর বয়সে হয়, এসব জানবার কোঁতুল বাঙালী পাঠকের হাওয়ার কথা নয়, আর হলেও জার্মানির গ্রামাঞ্জে হাইকিঙের বর্ণনায় সেগুলো নিশ্চয়ই অবান্তর ঠেকবে। অথচ জার্মানরা ঐ সব প্রশ্নই বার বার জিজ্ঞেস করে বলে কথাবার্তার বারো আনা পরিমাণই ভারতবর্ষ নিয়ে। তাই পাঠক ভাববেন না, জার্মান জনপদবাসী আমার সামনে আপন দেশ নিয়েই বড়ফাটাই করেছে, আর-কিছু শুনতে চায় নি।

আমি বললাম, 'দেখো মারিয়ানা, তুমি যে বললে, আমাকে তোমার ভালো লাগে, সেটা নিছক মৃত্যুর কথা। আমাকে খাইয়েছো বলে আমাকে দিয়ে বাসন মাজিয়ে নিতে চাও না—কারণ তা হলে খাওয়ানোটা মজুরি হয়ে দাঁড়ায়। এসব হিসেব লোকে করে, যে-জন আপন নয়, তার সঙ্গে। আপনজনকে মানুষ সব কর্ম অকর্মের অংশীদার করে। এইটুকু বলে, রাস্তার নাসপাতিওয়া যে আমাকে শেষ পর্যন্ত তার গাড়ি ঠেলতে দিয়েছিল সে-কথাও বললাম।

এ-কথাটা বলা হয়তো আমার উচিত হয় নি। টম-বয় হোক, আর হুটবওয়ালী হোক, মেয়েছেলে তো মেয়েছেলে। দেখি, মারিয়ানার চোখ টলটল করছে। আমাদের দেশে মানুষের নীল চোখ হয় না, আকাশের হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন : 'জল ভরেছে ঐ গগনের নীল-নয়নের কোণে—' দেশে যে জিনিস আকাশে দেখেছি, এখানে সেটা মানুষের চোখে

দেখলুম। অবশ্য এদেশের আকাশ কিন্তু আমাদের আকাশের মত ঘন নীল, ফিরোজা নীল হয় না।

আমি তাড়াতাড়ি এই সজল সংকট কাটাবার জন্যে ঝাড়ন নিয়ে মারিয়ানার পাশে দাঁড়ালুম। সে কিছদু না বলে একখানা প্লেট আমার দিকে এগিয়ে দিলে।

আমি সংকটের সম্পূর্ণ অবসান করার জন্যে মাজার গদ়ো একটা হাঁড়ির উপর ছড়াতে ছড়াতে শূধালুম, ‘ঠাকুমা দ্দপূরবেলা ঘুমোয় না?’

‘ঐ চেয়ারেই। দিন-রাতের আঠেরো ঘণ্টা ওরই উপরে কাটায়, রাত্রেও অনেক বলে-কয়ে তাকে শোবার ঘরে নিয়ে যাই। মাঝে মাঝে কার্ল অবশ্য ওকে বেড়াতে নিয়ে যায়।’

আমি শূধালুম, ‘কার্ল? কুকুরটা? তুমি নিয়ে যাও না?’

‘ঠাকুমা কাল্‌র সঙ্গে যেতেই পছন্দ করে। লীশে ঢিল পড়লেই ঠাকুমা থেমে যায়, টান পড়তেই আস্তে আস্তে এগোয়। ঠাকুমা বলে, ওতেই নাকি তার সুবিধা বেশী। জানো, লোকে আমার কথা বিশ্বাস করে না, যখন বালি কার্ল ঠিক বুদ্ধিতে পারে কখন বৃষ্টি নামবে। তার সম্ভাবনা দেখতে পেলেই সে ঠাকুমাকে বাড়ি ফেরত নিয়ে আসে।’

হঠাৎ কাল্‌র দিকে মদুখ ফিরিয়ে বললে, ‘ঠাকুমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবি নে?’

সঙ্গে সঙ্গে কার্ল পাশের ঘরে গিয়ে তার কলার লীশ মদুখে করে নিয়ে এসে ঠাকুমার কোলে রাখল। তিনি চমকে উঠে বললেন—হয়তো বা ইতিমধ্যে তাঁর তন্দ্রা এসে গিয়েছিল—‘আমি এখন বেড়াতে যাবো কি করে?’

মারিয়ানা হেসে বললে, ‘না ঠাকুমা, আমি শূধু ওকে দেখাচ্ছিলুম কার্ল কি রকম চালাক।’ তারপর কার্লকে বললে, ‘যাও কার্ল! আজ ঠাকুমা বেরোবে না। স্পষ্ট বোঝা গেল, কার্ল অতিশয় ক্ষুদ্র মনে লীশ কলার মদুখে তুলে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। এবং খুব সম্ভব, অভিমান করে ফিরে এল না।’

আমি শূধালুম, ‘ঠাকুমা কারো বাড়িতে যায়?’

মারিয়ানা বললে, ‘রোববার দিন গিজেন্স। অন্যদিন হলে পাদ্রী সায়েবের বাড়ি। আর মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে গোরস্তান যায়। আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে না। বাবা তো সেখানেই নেই, শূধু মা আছে। তাকেও চিনি নে।’

ওর বলার ধরণটা এমনই সরল আর স্বাভাবিক যে আমার চোখে জল এসে গেছে। পাছে সে সেটা দেখে ফেলে তাই শেলফ্টার কাছে গিয়ে শূকনো বাসনগুলো এক পাশে সরাতে লাগলুম। তাতেও দেখলুম, কোন কাজ হয় না। তখন বুদ্ধলুম, এ বোঝা নামিয়ে ফেলাই ভালো।

ফের মারিয়ানার কাছে এসে বললুম, ‘আমাদের দেশের কবির একটি কবিতা শুনবে?’

উৎসাহের সঙ্গে বললে, ‘নিশ্চয়ই!’

সৈয়দ মজ্জতবা আলী রচনাবলী (৭ম)—১৫

আমি বললুম, ‘অনুবাদে কিন্তু অনেকখানি রস মারা যায় । তবু শোনো :

“মনে পড়া মাকে আমার পড়ে না মনে ।

শুধু কখন খেলতে গিয়ে

হঠাৎ অকারণে

একটা কী সদর গুনগুনিয়ে

কানে আমার বাজে,

মায়ের কথা মিলায় যেন

আমার খেলার মাঝে ।

মা বুদ্ধি গান গাইত, আমার

দোলনা ঠেলে ঠেলে ;

মা গিয়েছে, যেতে যেতে

গানটি গেছে ফেলে ।

মাকে আমার পড়ে না মনে ।

শুধু যখন বসি গিয়ে

শোবার ঘরের কোণে,

জানলা থেকে তাকাই দূরে

নীল আকাশের দিকে

মনে হয়, মা আমার পানে

চাইছে অনিমিত্তে ।

কোলের ‘পরে ধরে কবে

দেখতো আমায় চেয়ে,

সেই চাউনি রেখে গেছে

সারা আকাশ ছেয়ে !!”

এ কবিতার অনুবাদ যত কাঁচা জন্ম নে যে কেউ করুক না কেন, মা-হারা কিচি হৃদয়কে নাড়া দেবেই দেবে । হয়তো এ কবিতাটি মারিয়ানাকে শোনানো আমার উচিত হয় নি, কিন্তু ইয়োয়োপীয় সাহিত্যে মাকে নিয়ে কবিতা এত কম, এবং আমার দেশের কবির এত সুন্দর একটি কবিতা—এ প্রলোভন আমি সংবরণ করতে পারি নি বললে ভুল বলা হবে—আমি কেমন যেন আপন অজানাতেই কবিতাটি আবৃত্তি করে ফেলোছি ।

রবীন্দ্রনাথ ‘পলাতক’ লেখার পর প্রায় চার বছর কোনো কবিতাই লেখেননি কিংবা অতি অল্পই লিখেছিলেন । তারপর কয়েকদিনের ভিতর অনেকগুলি কবিতা লিখে আমাদের ডেকে পাঠিয়ে সেগুলি পড়ে শোনালেন । ‘মাকে আমার পড়ে না মনে’ তারই একটি । এ কবিতাটি শুনে আমরা সবাই যেন অবশ হয়ে গিয়েছিলুম । শেষটায় কে একজন যেন গুরুদেবকে শুধালে, ঠিক এই ধরনের কবিতা তিনি আরো রচনা করেন না কেন ? তিনি বললেন, মা-হারা শিশু তাঁর কাছে এমনই ট্রাজেডি বলে মনে হয় যে, ঐ নিয়ে কবিতা লিখতে তাঁর মন যায় না ।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ যদি সেদিন মারিয়ানার মৃৎস্থ্যি দেখতেন তবে তিনি এ-কবিতাটি তাঁর কাব্য থেকে সরিয়ে ফেলতেন, এবং আমাদের উপর হৃদয় করতেন, আমরা যেন কখনো আর এটি আবৃত্তি না করি।

ভেজা চোখেই মারিয়ানা শূদ্যালো, 'তোমার নিশ্চয়ই মা আছে, আর তুমি তাকে খুব ভালবাসো ?'

আমি আশ্চর্য হয়ে শূদ্যালুম, 'তুমি কি করে জানলে ?'

বললে, 'এ কবিতাটি তারই হৃদয় খুব স্পর্শ করবে যার মা নেই, আর যে মাকে খুব ভালোবাসে। আর আমার মনে হচ্ছিল, তোমার মা না থাকলে তুমি এ কবিতাটি আমাকে শোনাতে না।'

আমি বিস্ময়ে হতবাক। এইটুকু মেয়ে কি করে এতখানি বুঝলো ! এতখানি হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারলো ! তখন আবার নতুন করে আমি সচেতন হলুম, ছোটদের আমরা যতখানি ছোট মনে করি ওরা অতখানি ছোট নয়। বিশেষ করে অনুভূতির ক্ষেত্রে। এবং সেখানেও যদি বাচ্চাটি মা-হারা হয় তবে তার বেদনা-কাতরতা এতই বৃদ্ধি পায় যে তার সঙ্গে কইতে হয় বেশ ভেবে-চিন্তে।

এবারে শূদ্যালো শেষ মোক্ষম প্রশ্ন : 'তুমি যে এতদূর বিদেশে চলে এসেছো তাই নিয়ে তোমার মা কিছ্ বললে না ? এই যে ঠাকুমা সমস্ত দিনরাত ঐ দোরের পাশের চেয়ারটায় বসে থাকতে চায় কেন জানো ? বাবা ঠিক সেটারই পাশের দরজা দিয়ে সব সময় বাড়ি ঢুকত—সবর দরজা দিয়ে নয়—অবশ্য আমার শোনা কথা। বাবা যেন সর্বপ্রথম ঠাকুমাকে দেখতে পায়, ঠাকুমাই যেন বাবাকে দেখতে পায়। লড়াইয়ের সময়েই সেটা আরম্ভ হল। বাবা যে কখন ছুটি পাবে, কখন বাড়ি পৌঁছবে তার ঠিক-ঠিকানা ছিল না বলে ঠাকুমা দিবারান্তর ঐ চেয়ারটার উপর কাটাতে। এখনো সে অভ্যাস ছাড়তে পারে না।'

আমি মিনতি করে বললুম, 'আর থাক, মারিয়ানা।'

কান্না-হাসি হেসে বললে, 'আচ্ছা, তবে এ দিকটা থাক। এখন আমার কথার উত্তর দাও। তোমার মা কি বলে ?'

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললুম, 'মাকে ফেলে দূরে চলে আসাটাই আমার জীবনের সব চেয়ে বড় পাপ। কিন্তু কি করবো বলো। ইংরেজের সঙ্গে যুগড়া করছি, তার ইস্কুল-কলেজে পড়বো না—অবশ্য গাধীর আদেশে। বিদেশে না গিয়ে উপায় কি ? কিন্তু মা কি সেটা বোঝে ?'

এবার মারিয়ানা হেসে উঠলো। বললে, 'তুমি ভারী বোকা। মা-রা সব বোঝে, সব মাপ করে দেয়।'

এর কথাই ঠিক। এ তো একদিন মা হবে।

আবার বললে, 'তোমার কিছ্টি ভাববার নেই। দাঁড়াও, তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই হল শেষ প্লট। এটা পড়ে নিয়ে বেশ করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নাও। এই যে বোতলে তরল সাবান আছে তাতে নেবুর খুঁশবাই মাখানো আছে। তোমাকে একটা কবিতা পড়ে শোনাবো—তুমি তোমারটা

শোনালে না ?'

আমি হাত ধুয়ে ঠাকুরমার মন্থোমুখি বেয়ালের চেয়ারে এসে বসলাম ।

রবারের এপ্রন^১ খুলতে খুলতে মারিয়ানা বললে, 'কই, দাও তোমার বইখানা ! ঐ যাতে হাইনের কবিতা আছে । আশ্চর্য এই যোগাযোগ ! মাত্র কয়েক দিন আগে আমরা ক্লাসে কবিতাটি পড়েছি ।'

এক ঝটকায় কবিতাটি বের করে বেশ সন্দ্বন্দর গলায়, সুস্পষ্ট উচ্চারণে পড়তে আরম্ভ করলো,

“আন্ মাইনে মটোর” —মাতার উদ্দেশে

‘ইষ বিন্‌স্ গেভোন্ট্—’

সমস্ত কবিতাটি পড়ে শেষের কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করলে একাধিক বার :—

‘আজ ফিরিয়াছে মন ভবনে আপন,

যেথা মা গো, তুমি মোরে ডাকিছ সদাই ।

আজ দেখিলাম যাহা দৃষ্টিতে তোমার,

সেই তো মমতা, চির আরাধ্য আমার ।’^২

আমি অস্বীকার করবো না, কবিতাটি আমার মনে অপূর্ব শান্তি এনে দিল । অন্য পরিবেশে হয়তো কবিতাটি আমার হৃদয়ের এতটা গভীরে প্রবেশ করতো না । বিশেষ করে ছাপাতে পড়া এক জিনিস আর একটি বারো-তেরো বছরের মেয়ে—অবশ্য তার কবিতা পাঠ, তার রসবোধ দেখে তার স্বপ্ন-মনের বয়েস ষোল সতেরো বলতে কোনো আপত্তি নেই—তার ‘মায়ের উদ্দেশে’ কবিতা সন্দ্বন্দর উচ্চারণে, দরদ দিয়ে পড়ে শোনালে, সে একেবারে ভিন্ন জিনিস ।

ঠাকুরমার গলা শোনা গেল । ক্ষীণ কণ্ঠে আমার উদ্দেশে বলছেন, ‘তুমি কোনো চিন্তা করো না । তুমি তো কোনো অন্যায় করো নি । আর অন্যায় করলেও মা সব সময়ই মাপ করে দেয় । ছেলের অন্যায় করার শক্তি যতখানি, মায়ের মাপ করার শক্তি তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী । আর তুমি তোমার মাকে ভালোবাসো সেইটেই সব চেয়ে বড় কথা । কাছে থেকে না-ভালোবাসার চেয়ে কি দূরে থেকে ভালোবাসা বেশী কাম্য নয় ? এই যে মারিয়ানার বাপ আমার আগে চলে গেল ! আমার একটি মাত্র ছেলে । কিন্তু আমি জানি, সে মা-মেরির চরণতলে আশ্রয় পেয়েও এই মায়ের জন্য প্রতীক্ষা করছে । আমিও অনেক আগেই চলে যেতুম, কিন্তু এই তো রয়েছে আমার মারিয়ানা । আমি কি তার ঠাকুমা ? আমি তার মা । এ প্রথম মা হোক, তারপর আমি হেসে হেসে চলে যাবো । তুমি কোনো চিন্তা করো না । আপন কতব্য করে যাও ।’

^১ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ । পূর্বে প্রসিদ্ধিত ‘হাইনের শ্রেষ্ঠ কবিতা’-পৃ. ১৬ দ্রষ্টব্য ।

জার্মান ভাষায় নবীন সাধকদের এছলে একটু সাবধান করে দিই । ১৭ পৃষ্ঠার মূল জার্মানে পঞ্চম ছত্র হবে চতুর্থ ছত্র, আর চতুর্থ ছত্র হবে পঞ্চম ছত্র ।

ঠাকুমা কথাগুনি বললেন অভিশয় ক্ষীণ কণ্ঠে কিন্তু তাঁর বাক্যে বিশ্বাসের কী কঠিন দার্ঢ্য ।

আমি উঠে গিয়ে ঠাকুমার হাত দুটিতে চুমো খেলুম । ফিরে এসে মারিয়ানার মস্তকাঘ্রাণ করলুম ।

॥ ১১ ॥

বিদায় নেওয়াটা খুব সহজ হয় নি । অঙ্গপক্ষণের পরিচয়ের বশ্ধ আর বহু-কালের পরিচিত বশ্ধর কাছ থেকে বিদায় নেবার ভিতর পার্থক্য আছে সত্য, কিন্তু অনেক সময় অঙ্গ পরিচয়ের লোকও সেই স্বপ্ন সময়ের মধ্যেই এতখানি মোহাচ্ছন্ন করে দেয় যে, তার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় মনে ক্ষোভ থেকে যায় যে, এর সঙ্গে দীর্ঘতর পরিচয় হলে কত না নতুন নতুন বাক্যে বাক্যে নতুন নতুন ভুবন দেখতে পেতুম ।

দু বছরের বাচ্চা মারা গেলে মার যে শোক হয় সে কি পঞ্চাশ বছরের ছেলে মরে যাওয়ার চেয়ে কম ? আমার একটি ভাই দুই বছর বয়সে চলে যায়, কিন্তু থাক সে কথা —

*

*

*

এ-দেশে গ্রীষ্মের দিন যে কত দীর্ঘ হতে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের মনে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকলেও তার অভিজ্ঞতা না হওয়া পর্যন্ত সে-সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হয় না । তুলনা দিয়ে বলতে পারি, পূর্ণচন্দ্র অমাবসায় কি পার্থক্য সেটা গ্রামের লোক যতখানি জানে চৌরঙ্গীর লোক কি ততখানি বোঝে ? আমিও এ-দেশের শহুরে ; গ্রামে এসে এই প্রথম ‘নিদাঘের দীর্ঘদিন’ কি সেটা প্রত্যক্ষ হৃদয়ঙ্গম হল ।

সূর্য তখনো অস্ত যায় নি । হঠাৎ বেথেস্নালে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখি রাত আটটা ! কিন্তু ‘রাত আটটা’ কি ঠিক বলা হল ? আটটার সময় যদি দিবালোক থাকে তবে তো সেটা এ-দেশে সকালের আটটা, দিনের আটটা । তা সে থাক । সেক্সপীয়র ঠিকই বলেছেন, ‘নামেতে কি করে ?’ সূর্যেরে যে নামে ডাকো আলোক বিতরে !

মধুময় সে আলো । অনেকটা আমাদের কনে দেখার আলোর মত । কোনো-কোনো গাছে, ক্ষেতে ইতিমধ্যেই পাক ধরেছে । তাদের পাতা দেখে মনে হয়, সমস্ত দিনের সোনালী রোদ্দ থেকে থেকে সোনালী হয়ে গিয়ে এখন তারাও যেন সোনালী আলো বিকিরণ করছে । কীটস না কার যেন কবিতায় পড়েছিলুম, পাকা আঙুরগুলো সূর্যরশ্মির স্বর্ণসুধা পান করে করে টাইটম্বার হয়েই যাচ্ছে, হয়েই যাচ্ছে, আর তাদের মনে হচ্ছে এই নিদাঘ রোদ্দের যেন আর অবসান নেই । আমিও এগোছি আর ভাবছি, এ-দিনের বৃষ্টি আর শেষ নেই । এতক্ষণে বৃষ্টিতে পারলুম মারিয়ানা যখন আমাকে তাদের বাড়িতে রাতটা কাটাবার জন্য অন-

রোধ করছিল তখন নানা আপত্তি দেখানো সঙ্গেও এটা কেন বলে নি, রাতের অন্ধকারে আমি যাবো কি করে? আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে যেমন অতিথিকে ঠেকাবার জন্য শরৎ-পদ্বিগ্ণ-মা-সন্ধ্যায় এ অজুহাত তোলা চলে না, রাতের অন্ধকারে পথ দেখবেন কি করে?

গ্রামের শেষ বাড়িটার চেহারা দেখে আমার কেমন যেন মনে হল এ-বাড়িটার বর্ণনা কে যেন আমায় দিয়েছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আমার যাত্রারত্নের সেই প্রথম পরিচয়ের—কি যেন নাম, হ্যাঁ, টেরমের, হ্যাঁ, এটা সেই টেরমের, যার বউ নাকি খাণ্ডার, এটা তারই বাড়ি বটে নিশ্চয়।

সাদা রঙের বৃক অবধি উঁচু ফালি ফালি কাঠের গেটের উপর দুই কনুই রেখে আবার একটি রমণী। কই, খাণ্ডারের মত চেহারা তো ঠিক নয়। আর এই অসময়ে এখানে দাঁড়িয়েই বা কেন? তবে কি টেরমের এখনো বাড়ি ফেরে নি?

আমার মাথায় দুই বৃষ্টি খেলল। দেখিই না পরখ করে। সত্যি খাণ্ডার, না, পথে যে সেই লড়াই-ফেরতা বলেছিল, একটু হিসাবী এই যা। খাণ্ডার হোক, আর যাই হোক, আমাকে তো আর চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারবে না। আর খেলেও হজম করতে হবে না। এ-দেশে ভেজাল নেই। আমি নির্ভেজাল ভেজাল। ফুড-পাইজনিঙে যা কাৎরাতে কাৎরাতে মরবে সে আর দেখতে হবে না। সখা টেরমেরও নগ্না শাদি করে সুখী হবেন, কিংবা—কিংবা আকছারই যা হয়, যাদু টেরটি পাবেন, পরলা বউটি কত না লক্ষ্মী মেয়ে ছিল—খাণ্ডার তো নয়, ছিল যেন গ্রীষ্মের তৃষ্ণায় কচি শশাটি। অবশ্য ইতিমধ্যে যদি আমার ভ্রাতা ইংল অখানে এসে ডাক ছাড়ে, “হে বাতাপে! তুমি নিষ্কান্ত হও।” তা হলে তো আর কথাই নেই। আমিও—মহাভারতের ভাষাতেই বলি—খাণ্ডারি-নীর “পার্বদেশ বিদীর্ণ করে সহাস্য-আস্যে নিষ্কান্ত হব।”

ইতিমধ্যে আমি আমার লাইন অব অ্যাকশন অর্থাৎ বহু নিৰ্মাণ করে ফেলেছি।

কাছে এসে আমার সেই ছাতা হ্যাট হাতে নিয়ে প্রায় মাটি ছুঁইয়ে, বাঁ হাত বৃকের উপর রেখে, কোমরে দু' ভাঁজ হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে অর্থাৎ গভীরতম ‘বাও’ করে মধ্যযুগীয় কায়দায় বিশুদ্ধতম উচ্চারণে বললুম, ‘গুট্টন আববেড, মোডিগে ফ্রাউ’ অর্থাৎ আপনার সম্মুখা শুভ হোক, সম্মানিতা মহিলা।’

এই ‘সম্মানিতা মহিলা’ বলাটা কবে উঠে গিয়েছে ভগবান জানেন। আজ যদি আমি কলকাতা শহরে কোনো মহিলাকে ‘ভদ্রে’ বলে সম্বোধন করি, কিংবা গৃহিণীকে ‘মুন্স’ বলে কোনো কথা বোঝাতে যাই তা হলে যে রকম শোনাচ্ছে অনেকটা সেই রকমই শোনাগো।

ভাঁর গলা থেকে কি একটা শব্দ বেরতে না বেরতেই আমি শূদ্রালম্-‘আপনি কি দয়া করে বলতে পারেন মেলেম গ্রামটি কোথায়?’

অবাক হয়ে বললে, ‘সে তো অস্তুত ছ মাইল!’

আমি বললুম, ‘তাই তো! তবে আমি নিশ্চয়ই পথ ভুল করে বসে আছি।’

তা সে থাক গে। আমি ম্যাপটা বের করে একটুখানি দেখে নিই। এই হাই-কিঙের কমে' আজ সকালে মাত্র হাতেখড়ি কিনা।'

আমি ইচ্ছে করেই বাচালের মত হেসে হেসে কথাই কয়ে যেতে লাগলুম, 'থাকি বন্ শহরে। গরমের কলেজের ছুটিতে যে যার গেছে আপন বাড়ি। আমি কি করে যাই সেই দূর-দরাজের ইন্ডিয়ায়? এই তো ম্যাপটা পেয়েছি। এব'ধা টচটা আনি নি! বললুম তো হাতেখড়ি। তা সে—'

এতক্ষণে রমণী অবাক হয়ে সেই পূরনো—এই নিয়ে চারবারের বার—ইন্ডার-ইন্ডিয়ানার গুবলেট পাকালে। সেটার আর পুনরাবৃত্তি করে কোন লাভ নেই।

আমি বললুম, 'তা হলে আসি, মাদাম (যেন আমার পালাবার কতই না তাড়া!)। আপনি শব্দ মোটামুটি দিকটা বাৎলে দিন।'

কিন্তু ইতিমধ্যে দাওয়াই ধরেছে। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'চলুন। ঘরের আলোতে ম্যাপটা ভালো করে দেখে নেবেন।'

আমি আমতা আমতা করে বললুম, 'হ্যাঁ, মাদাম, তা মাদাম, কিন্তু মাদাম—'

অথচ ওদিকে দিব্য খোলা গেট দিয়ে তাঁর পিছন পিছন মারিয়ানার কালের মত নিভ'য়ে এগিয়ে চললুম। মনে মনে এক গাল হেসে বললুম, 'ট্রয়ের ঘোড়া চুকেছে, হুঁশিয়ার।'

তবু বলতে হবে সাবধানী মেয়ে। রান্নাঘরে না নিয়ে গিয়ে গেল ডুইংরুমে।

পাঠক আমাদের বোকা ঠাউরে বলবেন, এতেই তো আমাদের সম্মান দেখানো হলো বেশী; কিন্তু আমি তা পূর্বেই নিবেদন করেছি এ-দেশের গ্রামাঞ্চলে ক্ষমতা দেখাতে হলে কিচেন, লৌকিকতা করতে হলে ডুইংরুম।

আমাদের পূর্ব বাঙলায় যে রকম 'আতি' করতে হলে রাগিবেলা লুচি, আপন জন হলে ভাত।

॥ ১২ ॥

হিটলারের পিতা যখন তাঁর মাতাকে বিয়ে করতে চান, তখন বিশেষ কোনো কারণে চার্চের অনুমতির প্রয়োজন হয়েছিল। দরখাস্তে বিবাহের পক্ষে নানা সদ'বৃত্তি দেখানোর পর সব'শেষে বলা হয়, 'তদ'পরি বধু অর্থ-সামর্থ্যহীন; অতএব সে যে এ-রকম উত্তম বিবাহের সুযোগ পূরণায় এ-জীবনে পাবে সে আশা করা যায় না।'

পণ-প্রথা তোলার চেষ্টা করুন আর না-ই করুন, এ জিনিসটা সমাজের

১ আউগুস্ট কুবিৎসেক কর্তৃক 'ইয়াং হিটলার', ১৯৫৪, পৃঃ ২৮। হিটলারের বাল্যজীবন সম্বন্ধে এ রকম উপায়ে গ্রন্থ আর নেই।

বিশেষ বিশেষ প্রণীতে আমি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দেখেছি। বিশেষ করে মধ্যবিন্দু সম্প্রদায়ে।

চাষার বাড়ির ভূইয়রুম প্রায় একই প্যাটার্নের। এই বাড়িতে কিন্তু দেখি, শেলফে বইয়ের সংখ্যা সচরাচর যা হয় তার চেয়ে অনেক বেশী, অপ্রত্যাশিত রকমের বেশী। তদুপরি দেখি, দেয়ালে বেশ কিছু অত্যন্তম ছবির ভালো ভালো প্রিন্ট, সুন্দর সুন্দর স্কেমে বাঁধা। আমার মনে বোধ হয় বিশ্বাসের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। মাদামই বললেন, 'বিয়ের পূর্বে আমি কিছুদিন বন্ শহরে এক প্রকাশকের ওখানে কাজ করেছিলাম।'

অ। সেই কথা। অর্থাৎ এ-দেশে যা আকছারই হয়ে থাকে। কনের বিস্ত-সামর্থ্য না থাকলে সে চাকরি করে পয়সা কামিয়ে 'যৌতুক' কেনে। 'যৌতুক' কথাটা ঠিক হল না। 'স্ত্রী-ধন' কথাটার সঙ্গে তাল রেখে ওটাকে 'বর-ধন' বলা যেতে পারে।

এ-দেশের নিয়ম কনেকে রান্নাঘরের বাসন-বর্তন, হাঁড়িকুড়ি, মায়া সিনক্—রান্নাঘরের তাবৎ সাজ-সরঞ্জাম, যার বর্ণনা পূর্বের এক অনুচ্ছেদে দিয়েছি—শোবার ঘরের খাট-গদি-বাঁলিশ-চাদর-ওয়াড়-আলমারি, বসবার ঘরের সোফা-চেয়ার ইত্যাদি সব কিছু সঙ্গে নিয়ে আসতে হয়। শহরাঙ্গলে বর শূদ্ধ একখানি ফ্ল্যাট ভাড়া করেই খালাস। বিয়ের কয়েকদিন আগে তিনি শূদ্ধ ফ্ল্যাটের চাবিটি কনের হাতে গুঁজে দেন। কনে বেচারী সতেরো-আঠারো বছর বয়স থেকে গা-গতর খাটিয়ে যে পয়সা কামিয়েছে তাই দিয়ে এ-মাসে কিনেছে এটা, ও-মাসে কিনেছে সেটা—বছরখানেক ধরে, দাঁও বৃক্ষে—এখন কয়েকদিন ধরে আস্তে আস্তে সেগুলো সরানো হবে, বরের ফ্ল্যাটে। বিয়ের পর বরকনে কখনো বা সোজা চলে যায় হানিমুদনে, আর কখনো বা ফ্ল্যাটে দু'চার দিন কাটিয়ে। কিন্তু একটা কথা খাঁটি; এর পর আর মেয়েকে ঘর-কন্না চালাবার জন্য অন্য-কিছু দিতে হয় না—জামাই যষ্ঠীর তত্ত্ব ফস্ব এ-দেশে নেই।

আর 'ট্রুসোর' কথাটা পাঠিকারা নিশ্চয়ই এ'চে নিয়েছেন। সেও আরম্ভ হয়ে যায় ঐ ঘোল-সতেরো বছর বয়স থেকে। জামা-কাপড় ফ্রক-গাউনের এম্ব্রয়ডারি আরম্ভ হয়ে যায় ঐ সময়েই থেকেই—মায়ের সাহায্যে—এবং পরে কোনো পরিবারে চাকুরি নিলে সে বাড়ির গিন্নীমা অবসর সময়ে কখনো বা এম্ব্রয়ডারির কাজ দেখিয়ে দেন, কখনো বা নিজেই খানিকটা করে দেন। শুনেনিছ, বাড়ন্ত মেয়েরা টাইট-ফিটের জামা গাউনগুলোর সব কিছু তৈরী করে রাখে—বিয়ের কয়েকদিন আগে দরজীর দোকানে গিয়ে কিংবা মা-মাসী সাহসিনী হলে তাঁদের সাহায্যে নিজেই কেটে সেলাই করে নেয়।

ব্যাপারটা দীর্ঘদিন ধরে চলে বলে এতে একটা আনন্দও আছে। আমার এক বন্ধু পরীক্ষা পাস করে চলে যাওয়ার সময় বলে গিয়েছিল তার ফিয়ার্সেকে যেন মাঝে মাঝে একটুখানি বেড়াতে নিয়ে যাই। বেচারী নিতান্ত একা পড়ে যাবে বলে, এবং আমার কোনো ফিয়ার্সে এমন কি বাশধবী পর্যন্ত নেই বলে।

রাস্তায় নেমে আমি হয়তো বললাম, 'বাসন-কোশনের আলমারি হয়েছে,

উনুন হয়েছে, 'এইবার সিন্‌ক্—না ?'

বললে, 'হ্যাঁ, গোটা তিনেক এদিক ওদিক দেখেছি। আমার একটা ভারী পছন্দ হয়েছে। শহরের ঐ প্রান্তে।'

আমি বললুম, 'আহা, চলই না, দেখে আসা যাক্ কি রকম।'

'তুমি না বলেছিলে, রাইনের ওপারে যাবে ?'

'কি জ্বালা! রাইন তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।'

ছোট্ট শহর বন্। ডাইনে মদ্যনষ্টার গির্জা রেখে, রেমিগিউস স্ট্রীট ধরে, ফের ডাইনেই মদ্যনিসিটি পেরিয়ে ঢুকলুম মার্কেট প্লেসে। বাঁ দিকে কাম্ফ মনোপোল, ডান দিকে মদ্যনিসিপ্যাল আপিস। মার্গারেট বললে, 'দাঁড়াও। এদিকেই যদি এলে তবে চলো ঐ গলিটার ভিতর। রীডিং ল্যাম্পের শেল হচ্ছে—সস্তায় পাওয়া যাবে—আমার যদিও খুব পছন্দ হয় নি।'

দেখেই আমি বললুম, 'হ্যাঃ!'

মার্গারেট হেসে বললে, 'আমিও তাই বলছিলাম।'

ক'রে ক'রে, অনেকক্ষণ সেটা দেখে দেখে—সবই রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, ঘোকারে ঢোকা নদারদ, এখনো পাকাপাকি কেনার কোনো কথাই ওঠে না, মার্গারেটের মা দেখবে, পিসি দেখবে, তবে তো—পেঁছলুম সেই সিন্‌কের সামনে। আমি পাকা জুটির মত অনেকক্ষণ ধরে ডাইনে ঘাড় নাড়ালুম, বাঁয়ে ঘাড় নাড়ালুম, তার পর বাঁ হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে ডান কানের উপরটা চুলকোতে চুলকোতে বললুম, 'হ্যাঁ, উত্তমই বটে। গেপটি চমৎকার, সাইজটিও বড়িয়া—দুজন লোকের বাসনকোশনই বা ক'খানা, তবে হ্যাঁ, পরিবার বাড়লে—'মার্গারেট কি একটা বলছিল; আমি কান না দিয়ে বললুম, 'তবে কি না বস্ত্র ধবধবে সাদা। এটিকে পরিষ্কার রাখতে জান বেরিয়ে যাবে। একটুখানি নীল ঘেঁষা হলে কিংবা ক্রিজ চাইনার মত হলে—'মার্গারেট বললে, 'সেই ঘষে ঘষে সাফ যদি করতে হয় তবে ধবধবে সাদাই ভালো। মেহমত করবো, উনি নীলচেই থেকে যাবেন, লোকে ভাববে হাড়-আলসে বলে নীল রঙের কিনেছি—কী দরকার!'

আহা, সে-সব শ্লো টেম্পার ডিমে তেতালার দিনগুলো সব গেল কোথায় ? এখন সকালে বিয়ে ঠিক, সম্ভার ভিতরই ডেকরেটররা এসে সব কিছু ছিমছাম ফিটফাট করে দিলে। তবে হ্যাঁ, তখন বাড়ি পাওয়া যেত সহজেই; এখন আর সে সুখটি নেই। কিছুদিন পূর্বেই ইয়োরোপের কোন এক দেশে নারিক কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল :—

পাত্রী চাই ! পাত্রী চাই ! পাত্রী চাই !!! আপন নিজস্ব সবস্বত্ত্ব সংরক্ষিত বাড়ি যার আছে এমন পাত্রী চাই। বাড়ির ফোটোগ্রাফ পাঠান।

*

*

*

কোথা থেকে কোথা এসে পড়লুম ! ট্রাম্পকে নিয়ে এই তো বিপদ। সে যে রকম সোজা রাস্তায় নাক-বরাবর চলতে জানে না, তার কাহিনীও তেমনই পারলেই সদর রাস্তা ছেড়ে এর খিড়িকির দরজা দিয়ে তাকায়, ঘোপের আড়াল থেকে ওর

পিছনের পুরুরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

আমি আমার ম্যাপ খুলে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার ভান করলাম। তারপর ধাঁড়িয়ে উঠে বললাম, ‘অনেক ধন্যবাদ, মাদাম। আপনাকে অবস্থা বিরক্ত করলাম।’

এইবারে ‘মাদামের’ অগ্নিপরীক্ষা। ...মাদাম পাস! টেরমের ফেল্।

অবশ্য কিছুটা কিস্তি-কিস্তি করেই বলেছিল—কিস্তি বলেছিল তো ঠিকই—‘এখন তো রাত ন’টা। ভিন গাঁয়ে পে’ছতে—’

আমি বাধা দিয়ে এক গাল হেসে বললাম, ‘আদপেই না, মাদাম! আপনাকে সব কিছু খুলে কই।’

‘বসুন না।’ মাদাম শূধু পাস না; একেবারে ফাস্ট’ ক্লাস ফাস্ট’।

‘আমি শুনছি, আপনাদের দেশে গরমের সময়ে দিনগুলো এত লম্বা হয় যে একটা দিনের আলো নাকি পরের দিনের ভোরকে ‘গুড্ মর্নিং’ বলার সুযোগ পায়। ঠিক মত অশ্বকার নাকি আদপেই হয় না। এখানে আমি থাকি শহরে। ছ’টা সাতটা বাজতে না বাজতেই সব কড়া কড়া বিজলি বাতি দেয় জ্বালিয়ে। কিছুটা বোঝবার উপায় নেই, আলো, না অশ্বকার। ফিকে অশ্বকার, তরল অশ্বকার, ঘোরঘর্দা অশ্বকার—শুনছি মিড্-সামারে নাকি গ্রামাঞ্জে এর সব ক’টাই দেখা যায়। আমি হাঁটতে হাঁটতে দিব্য এগুতে থাকব আর অশ্বকারের গোড়াপত্তন থেকে তার নিকুচি পর্যন্ত রসিয়ে রসিয়ে চেখে চেখে খাবো। এবং—’

‘কিস্তি আপনার আহারাধি?’

কে বলে এ রমণী খাশ্ডার!

মারিয়ানার ঠাকুমাই তাকে বলেছিল, ‘দেখ দিকিনি, ও যে হাইকিঙে বেরিয়েছে, সঙ্গে স্যান্ডউইচ আছে কিনা।’ আমার কোন আপত্তি না শূনে মারিয়ানা আমার আধা-বাসী সাদামাটা স্যান্ডউইচগুলো তুলে নিয়ে আমার ব্যাগটা ভরতি করে দিয়েছিল গাদা-গাদা রকম-বেরকমের স্যান্ডউইচে। সঙ্গে আবার টুথপেস্ট ট্যাবের মত একটা ট্যাবও দিয়েছিল। ওর ভিতরে নাকি মাস্টার্ড আছে। বলেছিল, ‘স্যান্ডউইচে মাস্টার্ড মাখিয়ে দিলে ওগুলো খুব তাড়াতাড়ি মিইয়ে যায়। যখন খাবে, তখন রাইটা মাখিয়ে নিয়ো।’ আমাকে সন্তুখ দিয়ে বলেছিল, ‘তোমারগুলো কাল সকালে আমি খাব।’

তাই আমার ব্যাগটাকে আধর করতে করতে তাড়াতাড়ি বললাম, ‘কি আর বলবো, মাদাম, আমার সঙ্গে যা স্যান্ডউইচ আছে, তার জোরে আমি আপনাকে পর্যন্ত রূপালী বোর্ডারওয়ালা সোনালী চিঠি ছাপিয়ে নিমন্ত্রণ করতে পারি। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। আমি খাই অনেক ধৈর্যে। রাত এগারোটায় লময়।’

বললে, ‘সে তো ঠাণ্ডা। গরম সুপ আছে।’

আমি অনেক-কিছু এক ঝটকায় বলে গেলুম। সখা টেরমের প্রতি রাগে

না হোক রোববার রাতে ইয়ার-দোস্তের সঙ্গে ‘পাবে’ (মদের দোকান, ক্লাব এবং আড্ডার সমন্বয়) গুলতানী করে বাড়ি ফেরেন অনেক রাত্রিতে। পৃথিবীর কোনো জায়গাতেই গিন্নীমারা এ অভ্যাসটি নেকনজরে দেখেন না। তাই সৃষ্টির আদিম যুগ থেকে একটা ভীষণ লড়াই চলেছে খরবেগে। এক দিকে ‘পাব’-ওয়ালা, অন্য দিকে গৃহিণীর দল। গ্রামের কোনো কোনো ‘পাবে’ তাই যেথোঁছি, পাব-ওয়ালা বেশ পয়সা খর্চা করে বড় বড় হরফে দেয়ালে নিম্নোক্ত কবিতাটি পেঁট করে নিয়েছে,

ফাগে নিষট্ ডী উর ভী স্পেট এস সাই

ডাইনে ফ্রাউ শিমফট্ উমৎসেন

গেনাও ভী উম ড্রাই !

ঘাড়টাকে শূঁখিয়ে না, কটা বেজেছে।

তোমার বউ তোমাকে দশটার সময় সেই বকাই বকবে, যেটা তিনটের সময় বকে।

মানুষ করেই বা কি? জমঁনরা কারো বাড়িতে বসে আড্ডা জমানোটা আদর্শেই পছন্দ করে না। ডিনার লাগে নিমন্ত্রণ করলে অবশ্য অন্য কথা—কিন্তু সে তো সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। এ-দেশেও একরকম লোক আছে, যাদের পেতে হলে চায়ের দোকানে যেতে হয়। পনের বাড়িতে যায় না, নিজের বাড়িতেও থাকে না।

এ অবস্থায় মেয়েরা কি করে?

কাচ্চা-বাচ্চা সামলায়। খামকা তিনবার বাচ্চাটার ঝক বদলিয়ে দেয়, চার বার পাউডার মাখায়, হাতের কাজ ক্ষান্ত দিয়ে ঘড়ি ঘড়ি ছুঁ মেরে যায় - বাচ্চা ঠিকমত ঘুমুচ্ছে কিনা।

সেইখানে, যেখানে থাকবার কথা, ভরা গাঙ্গের তরতর স্রোত, যার উপর দিয়ে কলরব করে ধেয়ে চলবে ভরা পাল তুলে টেরমের গিন্নীর যৌবনতরী—হার, সেখানে বালচড়া। নৌকাটি যে মোক্ষম আটকা আটকেছে, তার থেকে আর নিষ্কৃতি নেই—কি করে জানি নে, কথায় কথায় বোরিয়ে গিয়েছে, বেচারী সন্তানহীনা।

সমস্ত পৃথিবীটা নিষ্ফল সাহারায় পরিণত হোক, কিন্তু এ-টি রমণীও যেন সন্তানহীনা না হয়, মা হওয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হয়।

তাই কি এ রমণীর হৃদয় থেকে সর্বরস বাষ্প হয়ে নক্ষত্রলোকে চলে গিয়েছে।—কেউ বলে খাণ্ডার, কেউ বলে হিসেবী? কিন্তু কই, ঠিক জায়গার সামান্য-তম খোঁচা লাগা মাত্রই তো তার নৌকা চলুক আর না চলুক, পালে তো হাওয়া লাগল—স্বামীর জন্য তৈরী সুপ বাউন্ডলের সামনে তুলে ধরতে চায়।

আমি এমোঁছিলুম মজা করতে, বাজিয়ে দেখতে খাণ্ডার কিনা, এখন কেঁচো খড়্গেতে সাপ।

ঘরের আসবাবপত্র, ছবি, বই—এসব টেরমের-বউ যোগাড় করেছিল ষোতুকের টাকা জমাবার সময়—কেমন যেন আমার কাছে হঠাৎ অত্যন্ত নিরা-

নশ্ব, নিঃসঙ্গ, নীরস বলে মনে হতে লাগল। এরই ভিতর একা-একা দিন কাটায় এ রমণী। টেরমের লোক নিশ্চয়ই খারাপ নয়—যে দৃঢ়-চারটে কথা বলেছিলুম, তার থেকে আমার মনে অতি দৃঢ় ঐ প্রত্যয় হয়েছিল—এবং আমার মনে হল, মজনার ভিতরে ভালবাসাও আছে যথেষ্ট, কিন্তু একজনকে ভালবাসা দেওয়া এক জিনিস, আর সঙ্গ দেওয়া অন্য জিনিস। এ-মেয়ে শাস্ত গম্ভীর। খুব সম্ভব, স্বামী বাচ্চা নিয়ে নিজ'নে থাকতে চায়, আর ওদিকে টেরমের ইয়ার-দোস্তের সঙ্গে বসে পাঁচজনের পাঁচ রকমের সুখ-দুঃখের কথা না শুনলে, না বললে, তার মনে হয় তার জীবনটা যেন সর্বক্ষণ অসম্পূর্ণ হয়ে গেল।

এসব বলা বৃথা, টেরমের গিন্নী কি অন্য কিছু দিয়ে জীবন ভরে তুলতে পারে না? কেউ কেউ পারে, কিন্তু অনেকেই পারে না। এ মেয়ে যেন গ্রামোফোন রেকর্ডের কাটা লাইনের ভিতরে পড়ে গিয়েছে সাউন্ড বক্সটা—আছে ঠায় ধাঁড়িয়ে, রেকর্ড ঘুরেই যাচ্ছে, ঘুরেই যাচ্ছে, সে কিন্তু আর এগুতে পারছে না। আমার অনেক সময় মনে হয়, এই একবেয়ে নীরস জীবনের চেয়ে অনটনের জীবন, সংকটের জীবন কাম্যতর। সেখানে অন্তত সেই অনটন, সেই সংকটের দিকে সর্বক্ষণ মনঃসংযোগ করতে হয় বলে মনটা কিছু-না-কিছু একটা নিয়ে থাকে। বেদনার শেষ আছে, কিন্তু শূন্যতার তো নেই।

আমার বড় লজ্জা বোধ হল। ঠাট্টাছলে মস্করা করতে এখানে এসেছিলুম বলে। স্থির করলুম, সব কথা খুলে বলবো, নিদেন এটা বলবো যে, তার স্বামীকে আমি চিনি, সে আমাকে নিমন্ত্রণ করতে চেয়েছিল।

আমি ভয়ে ভয়ে আরম্ভ করলুম, 'আপনার স্বামী—'

আমার কথা আর শেষ করতে হল না। এই শাস্ত—এমন কি গুরুগম্ভীরও বলা যেতে পারে—মেয়ে হঠাৎ হো-হো করে অটহাস্যে হেসে উঠলো। কিন্তু ভারী মধুর। বিশেষ করে ঝকঝকে সাদা দাঁপাটি দাঁত আর চোখ দুটি যা জ্বলজ্বল করে উঠলো সে যেন অশ্ধকার রাত্রে আকাশের কোণে বিদ্যুজ্জ্বলা! কতদিন পরে এ-রমণী এভাবে প্রাণ খুলে হাসলে কে জানে! কত তপ্ত নিদ্রাঘ দিনের পর নামলো এ-বারিধারা! তাই হঠাৎ যেন চতুর্দিকের শব্দকল্লিম হয়ে গেল সমৃদ্ধ। দেয়ালের ছবিগুলোর গুমড়ো কাচের মূখের উপর দিয়ে যেন খেলে গেল এক পশলা আলোর ঝলমলানি।

'আমার স্বামী—' বার বার হাসে আর বলে, আমার 'স্বামী—'। শেষটায় কোনো গাতিকে হাসি চেপে বললে, 'আমার স্বামী আপনাকে পেলে হাল্লেইয়া রব ছেড়ে আপনাকে ধরে নাচতে আরম্ভ করতো। এ-গ্রামের যে-কোনো একজনকে পেলেই তার ক্রিসমাস। আপনি কত দূর দেশের লোক। আপনাকে পেলে এখুনি নিয়ে যেতে 'পাবে'।' আবার হাসতে হাসতে বললে, 'আপনি বৃদ্ধি ভয় পেয়েছেন, ও যদি হঠাৎ বাড়ি ফিরে দেখে আমি একটা ট্রাম্পকে—অবশ্য আপনি ট্রাম্প নন—যত্ন করে সুপ খাওয়াচ্ছি তা হলে সে চটে গিয়ে তুলকালাম কাশ করবে! হোলি মেরি! যান আপনি একবার 'পাবে'। ও গিয়েছিল শহরে। এতক্ষণে ফিরেছে নিশ্চয়ই, এবং বাড়ি না এসে গেছে সোজা

‘পাবে’। শহরে কি কি দেখে এল তার গরমাগরম একটা বগরগে বর্ণনা তো দেওয়া চাই। যান না একবার সেখানে। নরক গুলজার।’ তারপর আবার হাসি। শেষটায় বললে, ‘আমি যদি ওকে বলি যে, সে যখন শহরে কিংবা ‘পাবে’, তখন এক বিদেশী—তাও সেই সুন্দর ইন্ডিয়া থেকে, ফ্রান্স কিংবা পর্তুগাল থেকে নয়—আমাদের বাড়িতে এসেছিল তা হলে সে দৃষ্টিতে ক্ষোভে বোধ হয় দেয়ালে মাথা ঠুকবে। তাই বলছি, যান একবার ‘পাবে’। খচার কথা ভাবছেন? আমার স্বামী যতক্ষণ ওখানে রয়েছে—!’

আমি ইচ্ছে করেই বেশ শাস্ত কণ্ঠে বললুম, ‘আমি তো শুনছি, আপনি চান না, আপনার স্বামী বেশী লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা করুক।’

হঠাৎ তার মুখের হাসি শুকিয়ে গেল। আমার মনে দৃষ্টি হল। কিন্তু যখন মনঃস্থির করেছি সব কথা বলবোই তখন আর উপায় কি? গোড়ার থেকে সব কিছু বলে গেলুম, অবশ্য তাঁর স্বামীর ভাষাটাকে একটু মোলায়েম করে এবং লড়াই-ফেরতা চাষা কি বলেছিল তার অভিমতও।

নাঃ! বিধাতা আমার প্রতি সুপ্রসন্ন। টেরমোরিনীর মুখে ফের মৃদু হাস্য দেখা দিল। তা হলে বোধ হয়, একবার গান্ধীযেঁর বাঁধন ভাঙলে সেটাকে আর চুট করে মেরামত করা যায় না। হাসিমুখেই বললে, ‘সে এক দীর্ঘ কাহিনী। আপনি বরঞ্চ ‘পাবে’ যান।’ আমি বললুম, ‘আপনি যদি সঙ্গে চলেন, তবে যেতে রাজী আছি।’ স্তম্ভিত হয়ে বললে, ‘আমি? আমি যাবো ‘পাবে’?’ আমি বললুম, ‘দোষটা কি?’ আপনার স্বামী যখন সেখানে রয়েছেন।’ তাড়াহাড়াই বললে, ‘না, না। সে হয় না।’ তারপর আমাকে যেন খুশী করার জন্য বললে, ‘আরেকদিন যাব।’

আমি বললুম, ‘সেই ভালো, মাদাম। ফেরার মুখে যখন এ গাঁ দিয়ে যাবো তখন তিনজনাতে একসঙ্গে যাব।’

রাস্তায় নেমে শেষ কথা বললুম, ‘ঐ কথায় রইল।’

॥ ১৩ ॥

বিচক্ষণ লোক ঠিক জানে, এই শেষবার, এরপর দোকানী আর ধার দেবে না। হুঁশিয়ার লোক দোকানীর সামান্যতম চোখের পাতার কাঁপন কিংবা তার নিঃশ্বাসের গতিবেগ থেকে এই জব্বাট জেনে যায়, এবং তারপর আর ও-পাড়া মাড়ায় না। নৈসর্গিক পরিবর্তন সম্বন্ধেও সে কিছু কম গুরুত্বহীন নয়। মাঠ দিয়ে যেতে যেতে দিব্য আপনার সঙ্গে নির্বিশ্রাম মনে কথা বলে যাচ্ছে, যেন অন্য কোনো দিকে তার কোন খেয়াল নেই, অথচ আকাশের কোন কোণে কখন সামান্য এক রুতি মেঘ জমেছে, কখন একটুখানি হাওয়া কোন দিক থেকে এসে তার টাকের উপর মোলায়েমসে হাত বুলিয়ে গিয়েছে সেটা লক্ষ্য করেছে ঠিকই, এবং হঠাৎ কথা বন্ধ করে বলবে, ‘চল দাদা, একটু পা চালিয়ে। ঐ

মন্দির দোকানে একটুখানি মন্ডি খাবো ।’ দোকানেটোকা মাত্রই ককড় করে বাজ আর টিনের ছাতের উপর চকড় করে গামলা-ঢালা বৃষ্টি । তখন আপনার কানেও জল গেল, আপনার হৃদিশয়ার ইয়ার কোন মন্দির সম্মানে মন্দির দোকানে ঢুকেছিলেন ।

ট্রাম্প মাত্রেরই এ-দ্দিটির কিছু কিছু ধরকার । তালেবর ট্রাম্পরা তো—কাণ্টের ভাষায় বলি—মানুষের হৃদয় থেকে আরম্ভ করে আকাশের তারার গতিবিধি নখাথ-ধপাধপে ধরে । তারই একজনের সঙ্গে আমার একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল ; অন্তকুল লগ্নে সে-সব কথা হবে ।

ওয়াকিফহাল তো নই-ই, দ্দু ব্যাপারেই আমি বে-খেয়াল । কাজেই কখন যে শাস্ত্রাকাশের আসাদেশে ভুকুটির কটা ফেটে উঠেছে সেটা মোটেই লক্ষ্য করি নি । হঠাৎ ঘোরঘড়ি অশ্রুকার হয়ে গেল—আশ্চর্য ! এরকম তো হওয়ার কথা ছিল না—এবং সঙ্গে সঙ্গে

কণ্ঠের বরণ যার

শ্যাম-জলধরোপম,

গোরী-ভুজলতা যাহে

রাজে বিদ্যুল্লতা সম

নীলকণ্ঠ প্রভু সেই

করুন সবে রক্ষণ—

আমাকে ‘রক্ষণ’ না করে রুদ্দের অট্টহাস্য হেসে বৃষ্টি নামলেন আমার মস্তকে মৃষলধারে । এরকম হঠাৎ, আচম্কা, ঘনধার বৃষ্টি আমি আমার আপন দেশেও কখনো দেখি নি ।

তবে এটা ঠিক—কালো মেঘের উপর সাদা বিদ্যুৎ খেললে কেন সেটা নীল-কণ্ঠের নীল-গলার উপর গোরীর গোরা হাতের জড়িয়ে ধরার মত দেখায় সেটা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হল । বিস্তর বিদ্যুৎ চমকালো বটে ।

আর সে কী অসম্ভব কনকনে সূচীভেদ্য ঠান্ডা !

এতিমানে বুদ্ধিতে পারলুম, ইয়োরোপীয় লেখকরা ভারত, মালয়, বর্মায় মোসুমী বৃষ্টিতে ভিজে কেন লিখেছেন, ওয়োর্ম ট্রীপকাল রেনন্স । জৈন্তের খরদাহের পর আষাঢ়ের নবধারা নামলে আমরা শীতল হই, সে-বৃষ্টি হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে দেয় না । তাই ইংরেজের কাছে এ বৃষ্টি ওয়োর্ম এবং আনন্দদায়ক । কারণ একে অন্যকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানালে সায়েব বলে, আমি তার কাছ থেকে ওয়োর্ম রিসেপশন পেলুম । আর আমরা যদি বলি, আমাকে দেখেই উনি গরম হয়ে উঠলেন তবে অন্য মানে হয় ।

যাক্ এসব আশ্চিভা । বাঙলা দেশে মানুষ বহুকাল ধরে তর্ক করেছে, মিষ্টি কথা দিয়ে কোনো জিনিস ভেজানো যায় কি না ? কিন্তু উল্টোটা কখনো ভাবে নি—অর্থাৎ মিষ্টি কথা, এতলে আশ্চিভা দিয়ে ‘সৈলিকাঙ্গেলের’ মত ভিজে জিনিস শুকনো করা যায় কি না ? আবার এ বৃষ্টি আসছে চতুর্দিক থেকে, নাগাড়ে এবং ধরণী অবলুপ্ত ।

অবশ্য দশ মিনিট যেতে না যেতেই আমার ভিজে যাওয়ার ভাবনা লোপ পেলে। অল্প ভেজা থেকে মানুষ আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করে কিন্তু ভিজে ঢোল হয়ে যাওয়ার পর তার সে উদ্বেগ কেটে যায়। মড়ার উপর এক মণও মাটি, একশ' মণও মাটি। কিংবা সেই পূরনো দৌঁহা,

অল্প শোকে কাতর।

অধিক শোকে পাথর ॥

হোঁচট খেয়ে খেয়ে চলেছি। একটি গাড়ি কিংবা মানুষের সঙ্গেও দেখা হল না। গোরী ও নীলকণ্ঠও বোধ হয় দ্যুলোকের পিকনিক সমাপন করে কৈলাসে ফিরে গিয়েছেন। বিদ্যুৎ আর চমকাচ্ছে না। ঘোরঘুটি অশকার।

অনেকক্ষণ পরে আমার বাঁ দিকে—দিক বলতে পারবো না—অতি দূরের আকাশে একটা আলোর আভা পেলুম। প্রায় হাতড়ে হাতড়ে সামনে বাঁয়ের মোড় নিলুম। আভাটা কখনো দেখতে পাচ্ছি, কখনো না। যখন আলোটা বেশ কিছু পরিষ্কার হয়েছে, তখন সামনের কয়েকটা গাছের আড়াল থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল একটা জোরদার বাড়ির আলো! বাঁচলুম।

কই বাঁচলুম? বাড়ির সামনের সাইনবোর্ডে আলোতে আলোতে লেখা 'তিন সিংহ'! বলে কি? ঘরে ঢুকে তিনটে সিঙির মূখোমুখি হতে হবে নাকি?

নাঃ। অতখানি জার্মান ভাষা আমি জানি। এরা এদের 'বার' হোটেল 'পার'-এর বিদ্যবদুটে বিদ্যবদুটে নাম দেয়। 'তিন সিংহ', 'সোনালী হাঁস'—আরো কত কী!

দরজা খুলেই দেখি, আমি একটা খাঁচা কিংবা লিফটের মত বাস্তব দাঁড়িয়ে আছি। আমি আমার ভেজা জামাকাপড় নিয়ে কি করে ঢুকবো সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম বলে লক্ষ্য করলুম, পায়ের তলায় জাফরির ফুটোওলা পুরো রবারের শীট। ভয়ে ভয়ে সামনের দরজা খুলে দেখি বিরাট এক নাচের ঘর প্লাস 'বার-পার'। অথচ একটি মাত্র খশ্বের নেই। এক প্রান্তে 'বার'। পিছনে একটি তরুণী। সাদামাটা কাপড়েই অতি সুন্দর দেখাচ্ছে। আমি মুখ ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি দেখে বেশ একটু চেঁচিয়ে বললে, 'ভিতরে আসুন না?' আমি আমার জামা কাপড় দেখিয়ে বললুম, 'আমি যে জলভরা বালিটির মত।' বললে, 'তা হোক।' তারপর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে, একটা জাফরির রবারের পর্দা চলে গিয়েছে ঘরের অন্য প্রান্তের বাথরুম অবধি। আমি ঐটে ধরে ধরে বেবাক ঘর না ভিজিয়ে যখন প্রায় বাথরুমের কাছে পেঁহেছি তখন মেয়েটি কাউন্টার ঘুরে পার হয়ে আমার কাছে এসে বললে, 'আপনি ভিতরে ঢুকুন। আমি আপনাকে তোয়ালে আর শুকনো কাপড় এনে দিচ্ছি।'।

গ্রামাণ্ডলে এরা এসব আকছারই করে থাকে, না আমি বিদেশী বলে? কি জানি? শহরে এ রকম ঢোল আপন বাড়ি ছাড়া অন্যত্র কোথাও ঢুকতে কখনো দেখি নি।

শাট, 'সুয়েটার, প্যান্ট আর মোজা ধিয়ে গেল। অবশ্য বাহারে নয়। বাহার! হুঁ! আমি তখন গজাসূর বা ব্যাঘ্রচর্ম পরে কৃষ্ণবাস হতে রাজী আছি।

চার সাইজের বড় রাবারের জুতো টানতে টানতে ‘বার’-এর নিকটতম সোফায় এসে হেলান দিয়ে এলিয়ে পড়লুম। মেয়েটি শূদ্রালে, ‘আপনি কি খাবেন?’ আমি ক্লান্ত কণ্ঠে বললুম, ‘যাচ্ছেতাই।’

এবারে যেন কিঞ্চৎ দরদ-ভরা সুরে বললে, ‘গরম ব্র্যান্ডি খান। আপনি যা ভিজিয়েছেন তাতে অসুখ-বিসুখ করা বিচিত্র নয়। আমার কথা শুনুন। আমি সবাইকে ড্রস্ক দিই। জানি, কখন কি খেতে হয়।’

আমি তখন ট্র্যান্স্পিরের অল্পপ্রাশনের দিনেই নিমন্তলাগমন ঠেকাতে ব্যস্ত। পূর্বোক্তিত গজাসুরের গজ-বসাও খেতে প্রস্তুত। বললুম, ‘তাই দিন।’

গরম ব্র্যান্ডি টেবিলের উপর রেখে বললে, ‘সুন্দর’ ভোল জাইন।’ এটা এরা সব সময়েই বলে থাকে। অর্থ বোধ হয় অনেকটা—‘এটা দ্বারা আপনার মঙ্গল হোক।’

আমি বললুম, ‘ধন্যবাদ। আপনি কিছুর একটা নিন।’

বললে, ‘আমার রয়েছে।’

আমি এক চুমুক খাওয়ায় বেশ কিছুরক্ষণ পরে মেয়েটি ‘বার’-এর পিছন থেকে শূদ্রালো, ‘আপনি যদি নিতান্ত একা বসে না থাকতে চান তবে আমি সঙ্গ দিতে পারি।’

আমি খাড়া হয়ে উঠে বসে বললুম, ‘নিশ্চয় নিশ্চয়। আন্তেজ্ঞা হোক, বোন্তেজ্ঞা হোক।’ মেয়েটি এসে একটি চেয়ার একটুখানি দূরে টেনে নিয়ে এক জানুর উপর আরেক জানু তুলে বসলো।

কি সুন্দর সুডোল পা দুটি!

॥ ১৪ ॥

হিটলার যখন মস্কোর চৌকাঠে তখন তিনি তাঁর খ্যাতির মধ্যগগনে। ঐ সমস্ত লাগ-ডিনার খাওয়ার পর তিনি যে-সব বিশ্রান্তালাপ করতেন সেগুলো তাঁর সেক্রেটারি বরমানের আদেশে লিখে রাখা হয়। তারই একাধিক জায়গায় হিটলার রমণীদের সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা ও মতামত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, আমরা শহরে রঙ-চঙা সুন্দরীদের দেখে এতই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে, গ্রামের সুন্দরীরা আর আমাদের চোখে পড়ে না। অথচ তাঁর মতে, সিনেমা-ওলাদের সুন্দরীর সম্মানে বেরোতে হলে যাওয়া উচিত গ্রামাঙ্গলে—সৌন্দর্যের খনি সেখানে।

লেখাটি পড়েছি আমি অনেক পরে, কিন্তু সেই অঝোরে ঝরার রাতে কোটে কিশোরকে দেখে আমার মনে এই তথ্যটিই আবছা-আবছা উদয় হয়েছিল। তার দেহটি তো স্বাস্থ্যে পরিপূর্ণ ছিলই, তদুপরি চোখে ছিল একটি অবর্ণ-নীয় শাস্ত মধুর ভাব। চুল ছিল চেসনাট ব্লু এবং এমনি অদ্ভুত ঝিলিক মারতো যে মনে হত যেন তেল ঝরে পড়ছে, যদিও জানি ইয়োরোপের মেয়েরা চুলে তেল মাখে না।

আমার টেবিলে আসার সময় সে তার অর্ধসমাপ্ত বিয়ারের গেলাস সঙ্গে এনেছিল। ঢাউস হাফ লিটারের পূরু কাঁচের মগ। কোটের চোখ দুটি ঈষৎ রক্তাভ। সেটা বিয়ার খেয়ে হয়েছে, না, চোখের জল ফেলে হয়েছে বুঝতে পারলুম না। আবার এটাও তো হতে পারে যেকোনো কেসে সন্তান পায় নি তখন শোক ভোলার জন্য বিয়ার খেয়েছে। কিন্তু আমিই বা এত সেন্সিটিভ মেটাল কেন? পৃথিবীটা কি শুধু কাম্বোতেই ভরা?

ইতিমধ্যে প্রাথমিক আলাপচারি হয়ে গিয়েছে।

আমি বার দুই বিয়ার মগের দিকে তাকিয়ে বললুম, ‘আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, ময়রা সম্বেশ খায় না।’

কোটে হেসে বললে, ‘এ-দেশেও মোটামুটি তাই। তবে আমি খাই অন্য কারণে। তাও সমস্ত দিন, এবং জালা জালা।’

এদেশে বিয়ার খাওয়াটা নিশ্চিন্দ নয়—বরং সেইটেই স্বাভাবিক—কিন্তু পিপে পিপে খাওয়াটা নিশ্চিন্দ, আর মাতলামোটা তো রীতিমত অভদ্র, অন্যায় আচরণ বলে স্বীকৃত হয়েছে। আমাদের দেশে যে রকম একটু-আধটু তাস খেলা লোক মেনে নেয় কিন্তু জুয়ো খেলে সবস্ব উড়িয়ে বেওয়া পাপ বলে ধরা হয়।

কোটে কেন জালা জালা খায় সেটা যখন নিজের থেকে বললে না, তখন আমিও আর খোঁচাখুঁচি করলুম না। শুধালুম, ‘আমি এখানে আসার সময় আকাশে একটা আলোর আভা দেখতে পেয়েছিলুম। সেটা কিসের?’

‘ও, সে তো রাইন নদীর ঘাট আর জাহাজগুলোর।’

আমি অবাক হয়ে বললুম, ‘আমি কি রাইনের পারে এসে পে’ছি গিয়েছি?’

হেসে বললে, ‘যা বৃষ্টি হচ্ছে তাতে আপনি যে আপন অজানাতে পায়ে হেঁটেই রাইন পেরিয়ে ওপারে চলে যান নি সেই তো আশ্চর্য! আমাদের ‘পাব’ থেকে রাইন তো অতি কাছে। আসলে আমাদের খন্দেরও অধিকাংশ রাইনের মাঝে মাঝেই। সমুদ্রের সময় নোঙ্গর ফেলে এখানে এসে বিয়ার খায়, নাচা-নাচি করে এবং মাঝে মাঝে মাতলামোও। সেলার কিনা! আজ জোর বৃষ্টি নেমেছে বলে ‘পাব’ একেবারে ফাঁকা। আমার আজ বড় ক্ষতি হল।’

‘আপনার ক্ষতি? আমি তো ভেবেছিলুম, আপনি এখানে কাজ করেন।’

ক্ষণতরে শ্রীমতীর মুখ একটু গম্ভীর হল। মূর্খবকে চাকর বললে তাঁর যে ভাব-পরিবর্তন হওয়ার কথা। তারপর ফের একটু হাসলে। বোধ হয় ভাবল, বিদেশী আর বুঝবেই বা কি? বললে, ‘না। এটা আমার ‘পাব’। অর্থাৎ মায়ের ‘পাব’। আমরা দুই বোন। ছোট বোন ইন্সকুলে যায় আর ‘পাব’ চালাবার মত গায়ের জোর মা’র নেই। তাই আমি এই জোয়ালে বাঁধা। অবশ্য আমি কাজ করতে ভালোবাসি। কিন্তু সকাল আটটা ন’টা থেকে রাত একটা অবধি কাজ করা চাটখানি কথা নয়। ছোট বোনটা ইন্সকুল থেকে ফিরে এসে মাঝে মাঝে আমাকে জোর করে ঘরে নিয়ে শুনিয়ে দেয়। অবশ্য একটা ঠিকে আছে। কিন্তু সে বেচারীর আবার শিগরিগর বাচ্চা হবে।’

সৈয়দ মজতবা আলী রচনাবলী (৭ম)—১৬

ক্যোটে যেভাবে সব কথা নিঃসঙ্কেচে খোলাখুলি বলে যাচ্ছিল তাতে আমি ভরসা পেয়ে হেসে বললুম, 'তা আপনি একটা বিয়ে করলেই পারেন, এত বড় ব্যবসা তায় আপনি সন্স্বরী—'

'চুপ করো—' হঠাৎ ক্যোটে 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে চলে এল। বললে, 'চুপ করো। আমি গায়ে থাকি বলে কি গাইয়া? আমি কি জানি নে ইন্ডিয়ান নত'কীরা কি অদ্ভুত সন্স্বরী হয়? বর্ণটি সন্স্বর শ্যাম, মিশমিশে কুচকুচে কালো চুল, লম্বা লম্বা জোড়া চোখ, চমৎকার বাস্ট আর হিপ—'

আমি গলা খাঁকারি দিয়ে বললুম, 'তুমি অতশত জানলে কোথেকে?'

বললে, 'এই যে সব মাঝি-মাল্লারা এখানে বিয়ার খেতে আসে তাদের অনেকেই ভাটি রাইনে হল্যান্ড অবধি যায়। সেখানে সমুদ্রের জাহাজে কাজ নিয়ে কেউ কেউ তামাম দুনিয়া ঘুরে বেড়ায়। তাদেরই দূ-একজন মাঝে মাঝে আমাকে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ছবির পোস্টকার্ড পাঠায়। বিশেষ করে যারা আবার সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে খানিকটে হতাশ হয়েছে তারা ইন্ডিয়া, ইজিপ্ট, থেকে খুবসুন্দরত মেয়েদের ছবি পাঠিয়ে জানাতে চায়, 'তুমি তো আমাকে পাস্তা দিলে না; এখন দেখ, আমি কি পেয়েছি।'

আমি রক্তের গম্ব পেয়ে বললুম, 'সন্স্বরী ক্যোটে, তুমি যে বললে, যারা তোমার সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে খানিকটে হতাশ হয়েছে—এ কথাটার প্রকৃত অর্থ আমাকে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে বলবে কি?'

ক্যোটে বললে, 'সন্স্বরী! বেশ বলেছো চাঁদ। কিন্তু সে কথা থাক। রাত একটা বেজেছে। পোলিশমাই স্টুডে—পুলিস-আওয়ার্স—অর্থ' 'পাব' বন্ধ করতে হবে। এই ঝড়-বৃষ্টিতে এখন তুমি যাবে কোথায়? উপরে চলে—'

আমি বাঙলা দেশের ছেলে। অন্য কারণে যা হোক তা হোক, কিন্তু বৃষ্টির ভয়ে আমি কারো বাড়িতে করুণার অতিথি হব—সেটা আমার জাত্যভিमानে জন্মের লাগে। অবশ্য এই পোড়ার দেশে বারান্দা, রক, ভিলিকিনি (ব্যাল্কনি) নেই বলে শূন্য নদীর পোলের তলা ছাড়া অন্য কোথাও বৃষ্টির সময় গা বাঁচানো যায় না। বললুম, 'দেখো ফ্লাইন ক্যোটে—'

ক্যোটের অঙ্গ নেশা হয়েছে কি না জানি নে—শুনেছি, অঙ্গ নেশাতে নাকি মানুষের সাহস বেড়ে যায়—কিংবা সে টেরমের-গিম্মীর মত তথাকথিতা খাডারনী, কিংবা সত্যই প্রেমদায়িনী জানি নে। আমার দিকে কটকট করে তাকিয়ে বললে, 'চুপ!'

তারপর উঠে গিয়ে সব ক'টা জানলার কাঠের রেলিঙ পর্দা নামালে—এতক্ষণ শব্দ শাসি'গুলোই বন্ধ ছিল—মেন দরজা আর সেই লিফটপানা খাচার ডবল ডবল চাবি ঘোরালে, বায়ের পিছনে গিয়ে দু মিনিটে ক্যাশ মেলালে, সুইচ বোর্ডের কাছে গিয়ে পটপট করে সে ঘরের চোদ্দটা আলো নেবালে, উপরে যাবার আলো জ্বালিয়ে দিয়ে আমাকে বললে, 'চলো।'

উপরে গিয়ে একটা কামরার দরজা খুলে আলো জ্বালালে। সত্যি সন্স্বর ঘর। চমৎকার আসবাবপত্র। এক কোণে বাহারে কটেজ পিয়ানো।

দেয়ালে নানা দেশের তীরধনুক ঝোলানো। এক প্রান্তে অতি সুক্ষ্ম ডাচ লেসের কাজওলা বেডকভার দিয়ে ঢাকা বিরাট রাজসিক কালো আবলুশ কাঠের পালক।

বললে, ‘বসো। আমি এখন দুটো গিলবো। এই ঘরেই নিয়ে আসছি। রোজ রাতে আমাকে একা খেতে হয়, বড় কষ্ট লাগে। তোমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়ই। তবে দাড়াও, এই সিগারেটটা খাও।’ বলে সেন্টার টেবিলের উপর থেকে একটি সিগারেট নিয়ে ধরালে। আমার হাতে দিয়ে বললে, ‘খাও।’ এ রমণী সম্পূর্ণ লৌকিকতা-বর্জিত।

দশ মিনিট পরে এল বিরাট এক ট্রে হাতে করে। তাতে দু প্লেট সুদৃশ্য, দু প্লেট সার্ভিন-সসিজ-অলিভ, গুচ্ছের রুটি-মাখন। টেবিল সাজিয়ে, দুখানা চায়ার মুখোমুখি বসিয়ে বললে, ‘আরম্ভ করো।’ আমি মারিয়ার ঠাকুরার মত আদেশ করলুম, ‘ক্যুটে, ফাণ্ডে মাল আন্—আরম্ভ করো অর্থাৎ প্রার্থনা করো।’ ক্যুটের হাত থেকে ঠং করে চামচ-কাটা পড়ে গেল। ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকালে।

শ্রীমতী ক্যুটেকে লজ্জা দেবার জন্য যে আমি উপাসনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম তা নয়, আসলে আমি এ বাবদে চার্লস ল্যামের শিষ্য। তিনি বলেছেন খাবার পূর্বের এই প্রার্থনা কেমন যেন বেখাপা। বরং ভোরবেলায় শান্তমধুর পরিবেশে বেড়াতে বেরোবার পূর্বে, কিংবা চাঁদনী রাতে হেথা-হোথা চলতে চলতে আপন-ভোলা হয়ে যাওয়ার প্রান্তালে, কিংবা বৃন্দসমাগমের পূর্বমুহূর্তের প্রতীক্ষাকালে ভিন্ন ভিন্ন উপাসনার প্রয়োজন। শূদ্র ভাই? মিলটন পঠন আরম্ভ করার সময় বিশেষ প্রার্থনা করা উচিত, শেক্সপীয়রের জন্য অন্য উপাসনা এবং ‘ফেরারি কুইন’ পড়ার পূর্বে অন্য এক বিশেষ উপাসনার প্রয়োজন। ভোজনকর্মের চেয়ে এসব জিনিসের মূল্য আমাদের জীবনে অনেক বেশী। প্রার্থনা যদি করতে হয় তবে এগুলোর জন্য আলাদা আলাদা প্রার্থনা তৈরি করে রাখার প্রয়োজন।

ল্যামকে আমি শ্রদ্ধা করি অন্য কারণে। এই কার্যারম্ভের উপাসনা সম্বন্ধে বিবর্তি দেবার সময় তিনি এক জ্ঞানগায় বলেছেন, ‘হায়! শাক-সবজির জগৎ থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি—ওসব আর খেতে ভালো লাগে না, কিন্তু এখনো যখন এসপেরেগাস সামনে আসে তখন আমার মন মধুর আত্মচিন্তায় নিমগন হয়।’ আপ্তবাক্য, আপ্তবাক্য, এ একটা আপ্তবাক্য!

আমার অনুরাগী পাঠকদের বলি, আমার লেখা যে আগের চেয়েও ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছে তার প্রধান কারণ, বহুকাল ধরে এসপেরেগাসের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই। তাজাটার কথা হচ্ছে না, তিনি মাথায় থাকুন, টিনেরটার কথাই বলছি। সরকার আমদানি বন্ধ করে দিয়েছেন। সেকো বিষ নাকি এখনো আসে।

খুব অল্প লোকই মদ্যের লাভণ্য জ্বলম্বল না করে চিবানো কর্মটি করতে পারে।

আমি একটি অপরূপ সুন্দরী অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মহিলাকে চিনতুম। চিবোবার সময় তাঁর দুই চোয়ালের উপরকার ছোট ছোট মাংসপেশীগুলো এমনই ছোট ছোট দড়ির মত পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতো যে বোধ করি তিনিও সেটা জানতেন, তাই যতদূর সম্ভব মাথা নিচু করে একদম প্লেটের কাছে হুক পড়ে মাংস চিবোতেন। ক্যুটের বেলা দেখলুম, উল্টোটা। খাবার সময় তার মুখের হাসি-হাসি ভাবটা যেন আরো বেড়ে গেল। অবশ্য সে খেল অটাই। বিয়ার পান করল প্রচুর। উপরে আসবার সময় ঢাউস এক জাগ বিয়ার সঙ্গে এনেছিল।

আমি বললুম, ‘অত বিয়ার খাও কেন? দিনের শেষে না হয় এক আধ গেলাস খেলে। ঐ বিয়ার খেয়ে খেয়ে স্কির্বেটি তো একেবারে গেছে। আমার দেশে অনেকেই চা খেয়ে খেয়ে এ রকম পিতি চটায়।’

আশ্চর্য হয়ে শূধালো, ‘চা খেয়ে খেয়ে! একজন মানুষ দিনে ক’কাপ চা খেতে পারে?’

আমি বললুম, ‘আমার দেশের লোকও ঠিক এই রকম অবা ক মেনে শূধোবে, “একজন মানুষ দিনে ক’গেলাস বিয়ার খেতে পারে?”’

বিরাস্তির সুরে বললে, ‘থাক ওসব কথা। তুমি আর পাঁচজনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ঐ একই জিগির তুলো না। সমস্ত দিন ভুতের মত খাটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ঐ বিয়ারই আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। না হলে হুঁমড়ি খেয়ে মদুখ খুবড়ে পড়ে যেতুম।’

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললুম, ‘কিন্তু এর তো একটা সরল সমাধানও আছে। তোমাদের ‘পাবে’ বিস্তার আমদানি, তুমি দেখতে ভালো, বিয়ে করে একটা ভালো লোক এনে তাকে কাজে ঢুকিয়ে দাও না? তোমাদের দেশে তো শূনেছি, এ ব্যবস্থাটা অনেকেরই মনঃপূত।’

ক্যুটের ঐ চড়ুই পাখীর খাওয়া ততক্ষণে শেষ হয়ে গিয়েছে। চেয়ারটা টেবিলের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে, আরেকখানা চেয়ারের উপরে দু’পা লম্বা করে দিয়ে ভস্ ভস্ করে সিগারেট টানছিল। হেসে বললে, ‘সে এক্সপেরিমেন্ট হয়ে গিয়েছে।’

আমি অবা ক হয়ে শূধালুম, ‘এই অল্প বয়সে তোমার আবার বিয়ে হল কি করে?’

‘দূর পাগলা! আমি না। মা করেছিল এক্সপেরিমেন্টটা। সে তার বাপের একমাত্র মেয়ে। তাই বাবাকে বিয়ে করে এনে স’পে দিয়েছিল ‘পাব’টা তার হাতে।’

আমি শূধালুম, ‘তারপর?’

চিন্তা করে বললে, ‘সমস্তটা বলা একটু শক্ত। শূনেছি, বাবা কাজকারবার ভালোই করতো। এ ঘরের মত আর সব ঘরেও যে-সব ভালো ভালো আসবাব-পত্র আছে সেগুলো ঐ সময়েই কেনা—বাবা লোকটি শৌখিন। তারপর আমার আর আমার ছোট বোনের জন্ম হল। তারপর বাবার বয়েস যখন চার্জিশ—বাবা

মা'র একই বয়েস—তখন সে মজে গেল এক চিৎড়ি মেয়ের প্রেমে, বয়েস এই ঊনিশ-বিশ। তারপর কি হয়েছিল জানি নে, আমি কিছু কিছু দেখেছি, তবে তখনো বোঝবার মত জ্ঞান-গম্য হয় নি। শেষটায় একদিন নাকি হঠাৎ মা নিচে এসে 'বারে'র পিছনে ঝাঁড়াল, 'পাবে'র হিসেবপত্র নিজেই দেখতে আরম্ভ করলো। তখন বাবা নাকি বার্ডি ছেড়ে চলে গেল।'

আমি শূধালদুম, 'ডিভোর্স' হয়েছিল?'

বললে, 'না। মা চায় নি, বাবাও চায়নি। কেন চায় নি জানি নে।'

আমি শূধালদুম, 'তারপর কি হল?'

কোটে বললে, 'ঠিক ঠিক জানি নে। তবে শুনছি, বাবাতে আর ঐ মেয়েতে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কার নেশা আগে কেটেছিল বলতে পারবো না। তারপর হয়তো বাবা-মা'তে ফের বনিবনা হতে পারতো, কিন্তু হয় নি। বোধ হয় মা-ই চায় নি, অবশ্য আমি সঠিক বলতে পারবো না, কারণ মা আমার নিদারুন আত্মাভিমানিনী—এসব যা বললুম, এর কিছুটা আমার চোখে দেখা, আর কিছুটা পাঁচজনের কাছ থেকে শোনা—মা একদিনের তরে একটি কথাও বলে নি।'

আমি শূধালদুম, 'তোমার বাবা—?'

বললে, 'বুঝেছি। মাইল তিনেক দূরে ঐ র‍্যুঙ্‌স্ ডর্ফ থাকে। অবস্থা ভালো নয়, মন্দও নয়। আমার সঙ্গে মাসে ছ'মাসে রাস্তায় দেখা হলে, হ্যাট তুলে আগের থেকেই নমস্কার করে—যেন আমি তার পরিচিতা কতই না সম্মানিতা মহিলা—কাছে এসে কুশলাদিও শূধোয়। বাবার আদবকায়দা টিপ-টপ। মায়ের সঙ্গে দেখা হলেও তাই। একবার আমি মায়ের সঙ্গে ছিলুম। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দূরজনাতে কথাবার্তাও হল, তারপর যে যার পথ ধরলো।' এক মগ পুরো বিয়ার শূন্য করে বললে, 'তোমার বোধ হয় ঘুম পেয়েছে?'

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললুম, 'না না, মোটেই না।' আসলে আমার তখন জ্বর-জ্বর ভাব আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, আর সে-সময় সব রক্ত মাথায় উঠে গিয়ে ঘুম দেয় চটিয়ে।

কোটে উঠে বললো, 'জল ধরেছে। এবারে জানলাটা খুলে দিই। দেখবে বৃষ্টিশেষের কী অদ্ভুত সুন্দর ভেজা পাইন-বনের গন্ধ আসছে।'

আমি বললুম, 'এই বিয়ার আর সিগারেটের গন্ধ তোমার তো নাক-মুখ ভরতি, এর ভিতরও সেই অতি সামান্য পাইনের খুশবাই পাও?' কোটে জানলা খুলে দিলে দুই কনুই কাঠের উপর রেখে নিঃশব্দে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলুম, যেন আমাদের দেশের কোনো সুন্দরী নারীমূর্তি পিছন থেকে দেখছি। 'আমাদের দেশের নারীমূর্তি' ইচ্ছে করেই বললুম, কারণ ইয়োয়োপীয় ভাস্কররা তাদের নারী-মূর্তির পিছনের দিকটা বড় অবদে খোদাই করে। 'নির্ভাবনী'র ইংরিজী প্রতিশব্দ নেই।

ফিরে এসে বললে, ‘কিছু মনে করো না, তোমাকে জাগিয়ে রাখছি বলে । তা আমি কি করবো, বলো ! কাজ শেষ করে খেতে খেতে দেড়টা বেজে যায় তখন আমি কার সঙ্গে সোসাইটি করতে যাব ? আমার সঙ্গে রসলাপ করার জন্য কেই বা তখন জেগে বসে !’

আমি বললুম, ‘সে রকম প্রাণের সখা থাকলে সমস্ত রাত জানলার নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রহর গোনো । পড়ো নি বাইবেল, তরুণী শোক করছে, তার দয়িত সমস্ত রাত হিমে দাঁড়িয়ে মাথার চুল ভিজিয়ে ফেলেছে বলে ! অতখানি না হোক , একটা সাদামাটা ইয়াং ম্যানই যোগাড় করো না কেন ?

বুকের কালো জামায় সিগারেটের ছাই পড়েছিল । সেইটে ঠোনা দিয়ে সরাতে সরাতে বললে, ‘আমার আছে । না না, দাঁড়াও, ছিল । কি জানি, ছিল না আছে, কি করে বলবো !’

আমি অবাক হয়ে শূদ্রালুম, ‘সে কি ? এ আবার কি রকম কথা ?’

বললে, ‘প্রথম বৈদিন তাকে ভালোবেসেছিলাম সৈদিনকার কথার স্মরণে আজও আমার মনপ্রাণ গভীর শাস্তিতে ভরে যায় । আজও যদি তাই থাকতো, তবে এতক্ষণে ছুটে যেতুম না তার বাড়িতে ? তাকে ধরে নিয়ে এসে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতাম এই রাত তিনটেতেও !

॥ ১৫ ॥

ছেলেবেলায় শরচাটুজ্যের আত্মজীবনী-মূলক ভ্রমণ-কাহিনীতে পড়েছিলাম, একদা গভীর রাতে হৃদয়-তাপের ভাপে ভরা একখানা চিঠি লিখে সেই গভীর রাতেই সেখানা পোস্ট করতে যান, কারণ মনে মনে বিলক্ষণ জানতেন, ভোরের আলো ফুটে ওঠার পর সাদা চোখে তিনি ও-চিঠি ডাকে ফেলতে পারবেন না । শরচাটুজ্যে কোনোপ্রকারের নেশা না করে শূদ্র নিশীথের ভূতে পেয়েই বে-এস্তোয়ার হয়েছিলেন, আর এস্থলে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এতক্ষণে বিয়ার এ-মেয়ের মাথা : বেশ কিছুটা চেপেছে—কাজের জিম্মাদারিতে মগ্ন সচেতন মন ওটাকে ক্যাশ না মেলানো অবধি আমল দেয় নি—এবং জরুরের তাড়সানিতে আমিও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নই ; এখন ময়েটি কি বলতে যে কি বলে ফেলবে আর পরে নিজের কাছে নিজেই লিখিত হবে সেই ভেবে আমি একটু শঙ্কিত হলাম ।

হঠাৎ চেয়ারটা কাছে টেনে এনে আমার দিকে ঝুঁকে বললে, ‘তুমি ভাবছো, আমি আমার হৃদয়টাকে জামায় আঁস্তিনে বয়ে বয়ে বেড়াই—না ? আর যে কেউ একজনকে পেলেই তার কাছে মাথা রেখে, ফর্দিয়ে ফর্দিয়ে কাদতে কাদতে তার কোটের পিছন দিকটা ভিজিয়ে দিই—না ?’

আমি অনিচ্ছায় বললুম, ‘আর বললেই বা কি ? আমরা প্রায় একবয়েসী, তায় আমি বিদেশী, কাল চলে যাবো আপন পথে—’

‘কি বললে ? কাল চলে যাবে ? কি করে যাবে শূনি ? আমি কি লক্ষ্য

করি নি যে তোমার জ্বর চড়েছে ? এখন তোমাকে শূতে দেওয়াই আমার উচিত । কিন্তু তাতে কোনো লাভ নেই । জ্বর তার চরমে না ওঠা পর্যন্ত এখন তুমি শূদ্ধ এপাশ-ওপাশ করবে, আর মাথা বনবন করে ঘুরবে । তাই কথাবার্তাই বলি । জ্বরের পর অবসাদ যখন আসবে তখন উঠবো ।’

আমি এতক্ষণ একটা সুযোগ খুঁজছিলুম আমার এখানে থাকা-খাওয়ার স্বাক্ষর কথটা তুলতে । মোকা পেয়ে বললুম, ‘দেখো, ফ্লাইন ক্যেটে—’

‘ফ্লাইন বলতে হবে না ।’

আমি বললুম, ‘সুন্দরী ক্যেটে, কাটেরিনা অর্থার ক্যাথরিন, আমি বেরিয়েছি হাইকিঙে । তুমি আমার কাছ থেকে যত কমই নাও না কেন, ‘ইন্’, হোটেল ‘ফ্লাইপে’তে থাকবার মত রেশু আমার পকেটে নেই । কালই আমাকে যেতে হবে ।’

ক্যেটে আপন মনে একটু হাসলে । তারপর বললে, ‘তুমি বিদেশী, তদুপরি গ্রামাঞ্চলে কখনো বেরোও নি । না হলে বৃষ্টিতে এটা হোটেল নয়, এখানে রাত্রিবাসের কোনো ব্যবস্থা নেই । এ ঘরটা আমাদের আপন আত্মীয়স্বজনদের জন্য গেস্ট-রুম, এরকম আরো দু’-তিনটে আছে । প্রায় সংবৎসরই ফাঁকা পড়ে থাকে । কিন্তু সেটা আসল কথা নয় । আসল কথা হচ্ছে, তুমি ভাবছো আমরা ‘পাব’ চালাই বলে আমাদের আর কোনো লৌকিকতা, সামাজিকতা নেই—ঘরা-মায়া, দোস্ত-মহস্বতের কথা না হয় বাদই দিলুম । ভালোই হল । এবার থেকে যখন আমার গড়ফাটার এ ঘরটায় শোবে, তখন সকালবেলা ব্রেকফাস্টের সঙ্গে তাঁকে একটা বিল দেব ।’

আমি আর ঘাটালুম না । আমি অপরিচিত, অনাত্মীয় এসব কথা রাত তিনটের সময় সুন্দরী তরুণীর সামনে—তাও নির্জন ঘরে—তুলে কোনো লাভ নেই । আমার শূদ্ধ আবছা-আবছা মনে পড়লো, আফ্রিকা না কোথায়, মার্কে’ পোলো গাছতলায় বসে ভিজছেন আর একটি নিগ্রো তরুণী গম না ভুট্টা কি যেন পিষতে পিষতে মা’কে গান গেয়ে গেয়ে বলছে, ‘মা, ঐ বিদেশীকে বাড়ি ডেকে এনে আগ্রয় দিই ।’ সত্যেন দস্ত গানটির অনুবাদ করেছেন । এবং একথাটাও এ-প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত, খাস নিগ্রোরা সাদা চামড়ার লোককে বড় ‘তাচ্ছল্য’র দৃষ্টিতে দেখে—আমাদের মত সাদা-পাগলা নয় ।

নিগ্রো তরুণীর মায়ের কথায় আমাদের কথার মোড় ঘোরাবার সুযোগ পেলুম । বললুম, ‘হোটেল যদি না হয়, তবে এরকম অপরিচিতকে ঘরে আনাতে তোমার মা কি ভাবে ?’

পাছে বাড়ির লোক ডিস্টার্বড্ হয় তাই রুমাল দিয়ে মুখ চেপে ক্যেটে তার খল খলানি হাসি থামাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু হাসি আর থামতেই চায় না । আমি বেকুবের মত হাঁড়িয়ে রইলুম ।

অনেকক্ষণ পরে গুমরানো হাসি চেপে-ছেড়ে চেপে-ছেড়ে বললে, ‘তোমার মত সরল লোক আমি সত্যি কখনো দেখি নি । তোমার কল্পনাশক্তিও একে-বারেই নেই । আচ্ছা ভাবো তো, রাত বারোটোর সময় তিনটে আধ-মাতাল

মাল্লা যদি আমার ‘পাবে’ ঢুকে বিয়ার চায়, তখন কি আমি তাদের তাড়িয়ে দিই? ‘সেলার’ মানে বাপের সুপদন্তুর নয়। আমিও দেখতে মন্দ না। ‘পাব’ও নির্জন। ওরা ‘বারে’ ঘাড়িয়ে গাল-গতপ এমন কি ফাষ্টি-নষ্টির কথা বলবেই বলবে। তখন কি মা এসে আমার চরিত্ররক্ষা করে?’

আমি আমতা আমতা করে বললুম, ‘তা বটে, তা বটেই তো। কিন্তু বল তো, ওরা যদি বিয়ার খেয়ে পয়সা না দিয়ে চলে যেতে চায় তখন তুমি কি করো?’

হেসে বললে, ‘দেখবে?’ তারপর উঠে গিয়ে ঘরের দরজা একটুখানি ফাঁক করে আস্তে আস্তে মাত্র একবার শিস দিলে। অমনি কাঠের সিঁড়িতে কিসের যেন শব্দ শুনতে পেলুম। আর সঙ্গে সঙ্গে দরজা ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকলো ভীষণদর্শন বিকটের চেয়েও বিকট ইয়া লাশ এক আলসেশিয়ান। আমার দিকে যে ভাবে তাকালে তাতে আমি লাফ দিয়ে জুতোসুদৃশ উঠে দাঁড়িয়েছি খাটের উপর। ভয়ে আমার মূখ্য দিয়ে কথা ফুটেছে না যে বলবো, ওকে দয়া করে বের করো। কোটের তবু দয়া হল। কুকুরটাকে আদর করতে করতে বললে, ‘না, রুনো ইনি আমাদের আত্মীয়। বুঝলি?’ এবারে আরো বিপদ। রুনো নাজ নাড়তে নাড়তে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন আমার ‘প্যার’ নেবার জন্য। আমি হাতজোড় করে বললুম, ‘রক্ষে করো, নিশ্কৃতি হাও।’

কোটে বললে, ‘কিছু না। শুধু রুনোকে বলতে হয়, ঐ তিনটে লোককে ঠেকা তো। ব্যাস! সে তখন দরজায় দাঁড়িয়ে তিনটে বেহেড সেলারকে ঠেকাতে পারে। অবশ্য এরকম ঘটনা অতিশয় কাল-কস্মিনে ঘটে। বাপের সুপদন্তুররা তখন সুড়সুড় করে পয়সা দিয়ে পালাবার পথ পায় না। অবশ্য রাইন নদীর প্রায় সব সেলারই পদ্রুমানক্রমে এ ‘পাব’ চেনে। নিতান্ত ডাচ-ম্যান কিংবা ঐ ধরনের বিদেশী হলে পরে আলাদা কথা—তাও তখন ‘পাবে’ অন্য খন্দের থাকলে কেউ ওসব করতে যায় না।’

তারপর বললে, ‘তুমি এখন একটু ঘুমুবার চেষ্টা করো। আমি তোমাকে একটা নাইট-শার্ট দিচ্ছি।’ ঘরের আলমারিতেই ছিল। বললে, ‘আমি এখ-খুনি আসছি।’ আমি আর লৌকিকতা না করে কোট-পাতলুন ছেড়ে সেই শেমিজ-পারা নাইট শার্ট পরে লেপের ভিতর গা-ঢাকা দিলুম।

হে মা মেরি! এ কি? কোটে আরেক জাগ বিয়ার নিয়ে এসেছে।

আমি করুণ কণ্ঠে বললুম, ‘আর কত খাবে?’

বিরস্ত্রিত সুরে বললে, ‘তুমিও ওর সঙ্গে িড়লে নাকি?’

আমি বললুম, ‘না, বাপ, আমি আর কিছু বলবো না। একদিন, না হয় দুদিনের চিড়িয়া, আমার কোথায় বা সুযোগ কই বা শক্তি! কিন্তু এবারে তুমি ওর সঙ্গে ভিড়লে নাকি’ বললে—সেই ও-টি কে?’

‘অটো। যাকে ভালোবাসি, না বাসি নে বুঝতে পারছি নে। তাই বলছিলাম, সে আছে কি নেই জানি নে।’

আমি বললুম, ‘তুমি বড় হে’মালিতে হে’মালিতে কথা বলো।’

‘আদর্শই না। আসলে তুমি বিদেশী বলে আমাদের আচার-ব্যবহার সামাজিকতা-লৌকিকতা জানো না। তাই তোমার অনেক জিনিস বুদ্ধিতে অসম্ভব হই, যেগুলো আমাদের দশ বছরের বাচ্চার কাছেও জলের মত তরল। যেমন তুমি হয়তো মনে করেছ আমি ‘বার’-এর পিছনে ধাঁড়িয়ে বিয়ার বিক্রি করি বলে আমি ‘বার-মেড’। এবং ‘বার-মেড’রা যে সচরাচর খন্দেরকে একাধিক প্রকারে তুষ্ট করতে চায়—প্রধানত অর্থের বিনিময়ে—সেটাও কিছু গোপন কথা নয়। বিশেষত শহরে। গ্রামে ঠিক ততখানি নয়। আমি যদি এখানে কাজের সাহায্যের জন্য ঠিকে নিই, তবে সে আমাদের চেনাশোনারই ভিতরে বলে অস্ত-খানি বে-এক্সেলার হতে সাহস পাবে না। আর আমি, আমার মা-বোন, দাদা-মশাই আমরা ‘পাব’-এর মালিক। আমরা যদি মদ্য, দরজী বা গারাজের মালিক হতুম তা হলে আমাদের সমাজ আমার কাছ থেকে যতখানি সংশয় আশা করতো এখনো তাই করে। অবশ্য বাড়িতে ব্যাটাছেলে থাকলে সে-ই ‘বার’-এর কাজ করতো, ভিড়ের সময় মা-বোনেরা একটু-আধটু সাহায্য করতো। মদ্য কিংবা কসাইকে যেমন তার বউ-বেটি সাহায্য করে থাকে।’ তারপর হঠাৎ এক ঝলক হেসে নিয়ে বললে, ‘তুমি ভাবছো, আমি শব,—না? জাতের দোষাক করছি। আমি ‘বার-মেডের’ মত ফ্যালনা নই—রীতিমত খানদানী মনিষ্য,, না?’

॥ ১৬ ॥

‘আমি চুপ। যে-যেয়ে মাতাল সেলারদের সামলায় আমি তার সঙ্গে পারবো কেন?’

কোটে বললো, ‘তবে শোনো,—

আচ্ছা বলো তো, তোমার কখনো এমনধারা হয়েছে, যে-জিনিস দেখে দেখে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলে সে হঠাৎ একদিন দেখা দিল অপরিপক্ব নবরূপ নিয়ে? এই যে দিক-খেড়েকে অটো-টা, চুল ছাঁটা যেন পিনকুশনের মাথাটা, হাত শূন্য থানা যেমন বেটপ বে’টে—থাক গে, বর্ণনা দিয়ে কি হবে—একে দেখে আসছি হবে থেকে জ্ঞান হয়েছে, ইশ্কুলে গিয়েছি ফিরেছি একসঙ্গে, কখনো মনে হয় নি পাড়ার আর পাঁচটা বাঁদর আর এ বাঁদরে কোনো তফাত আছে, অথচ হঠাৎ একদিন তার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, এ কাকে দেখছি? সে সুন্দর কিনা, কুন্দী কিনা, কিছুই মনে হল না, শুধু মনটা যেন মধুতে ভরে উঠলো আর মনে হল, এ আমার অটো, একে আরো আমার করতে হবে।

তুমি বিশ্বাস করবে না, ঠিক সেই মধুতেই সেও আমার দিকে এমন ভাবে তাকালে যে আমি নিঃসম্মেহে বুদ্ধিতে পারলুম, সেও ঠিক ঐ কথাটিই ভেবেছে।

আর এমন এক নতুন ভাবে তাকালো যে আমার লজ্জা পেল। আমার মনে

হল, পদ্মভাট্টার উপর কোটটা থাকলে ভাল হত।

আচ্ছা, বলো তো, এ কি একটা রহস্য নয়! যেমন মনে করো, তুমি আমার একখানা বই দেখে মদুপ হয়ে বললে, ‘চমৎকার বই!’ আমি কি তখন তোমাকে সেটি এগিয়ে দেব না, যাতে করে তুমি আরো ভালো করে দেখতে পার?’

চূপ করে উত্তরের প্রতীক্ষা করছে বলে বললুম, ‘আমি কি করে বলবো? আমি তো ব্যাটা ছেলে।’

বললে, ‘অন্য দিন ইন্সকুল থেকে ফিরে বাড়ির কাজে লেগে যাই, আজ বারবার মনে হতে লাগল, যাই একবার অটোকে দেখে আসি। যাওয়া অত্যন্ত সোজা। কোনো অছিলায়ও প্রয়োজন নেই। তার দু’দিন আগেই তো এক বিকেলের ভিতর মা আমার অটোদের বাড়িতে পাঠিয়েছে তিন-তিনবার—এটা আনতে, সেটা দিতে। তা ছাড়া ইন্সকুলের লেখাপড়া নিয়ে যাওয়া-আসা তো আছেই। কিন্তু তবু কেন, জানো, যেতে পারলুম না। প্রতিবারে পা বাড়িয়েই লজ্জা পেল। খুব ভাল করেই জানি মা কিছু জিজ্ঞেস করবে না, তবু মনে হল, মা বদমাশ শব্দেবে, ‘এই! কোথা যাচ্ছিস?’ আর জিজ্ঞেস করলেই বা কি? কতবার বেরোবার সময় নিজের থেকেই তো বলছি, ‘মা, আমি ঝপ করে এই অটোদের বাড়ি একটুখানি হয়ে আসছি।’ মা হয়তো শুনতেই পেত না।

তবু যেতে পারলুম না। আর সর্বক্ষণ মনে হল, মা যেন কেমন এক অশুভ নুতন ধরনে আমার দিকে তাকাচ্ছে।

অন্য দিন বালিশে মাথা দিতে না দিতে আমার ঘুম বেঘোর। আজ প্রহরের পর প্রহর গিজের-ঘড়ির ঘণ্টা শুনতে লাগলুম রাত বারোটো পর্যন্ত। আর মনে হল স্নান মানুষ বিনিদ্রদের কথা চিন্তা করে ঘড়ির ঘণ্টা বানায় নি। সম্ভ্রান্ত ছ’টা ঘণ্টা দিয়ে শব্দ না করে যদি একটা ঘণ্টা দিয়ে শব্দ করতো তবে রাত বারোটায় তাকে শুনতে হত মাত্র ছ’টা ঘণ্টা। এখন পৃথিবীতে যা ব্যবস্থা তাতে যাদের চোখে ঘুম নেই তাদের সেই ঠ্যাং-ঠ্যাং করে বারোটায় ঘণ্টা না শোনা অবধি নিশ্চয় নেই।

তারপর আরম্ভ হল জোর ঝড়-বৃষ্টি। ঝড়ের শৌ-শৌ আওয়াজ আর ঝড়-খড়ি জানলার ঝড়ঝড়ানি আমার শব্দে শব্দে শুনতে বড় ভালো লাগে, কিন্তু আজ হল ভয়, কাল যদি এরকম ঝড় থাকে তবে মা তো আমাকে ইন্সকুলে যেতে দেবে না। অটোকে দেখতে পাবো না। পরশ্ব করে নিতে পারবো না, সে আবার তার পুরনো চেহারায় ফিরে গিয়েছে, না আজ যে-রকম দেখতে পেলুম সেই রকমই আছে।

সব মনে আছে, সব মনে আছে, প্রত্যেকটি কথা আমার মনে আছে।’

কোটে বোধ হয় আমার মূখে কোনো অবিশ্বাসের চিহ্ন দেখতে পেরেছিল তাই একথা বললো। আমি ভাবছিলাম, বেশী বিস্ময় খেলে মানুষের স্মৃতি-শক্তি তো দুর্বল হয়ে যায়, এর বেলা উল্টোটা হল কি করে? হবেও বা। পায়ে কাঁটা ফুটলে বম্ব লাগে, কিন্তু পাকা ফোড়াতে সেই কাঁটা ফুটিয়ে দিয়েই তো মানুষ আরাম পায়। বললুম, ‘তুমি বলে যাও। প্রেম বড় অশুভ জিনিস!’

ক্যোটে অনেকক্ষণ ধরে বিয়ারে চুমুক দেয় নি, সিগারেটও ধরায় নি। প্রেমে তো নেশা আছে বটেই, প্রেমের স্মরণেও নেশা—অন্য নেশার প্রয়োজন হয় না !

ক্যোটে বললে, ‘আশ্চর্য, এবং তুমিও বিশ্বাস করবে না, আমি তখনো বন্ধুতে পারি নি, কবিরা একেই নাম দিয়েছেন প্রেম। প্রেমের যা বর্ণনা কবিরা দিয়েছেন তাতে আছে, মানুষের সর্বসত্তা নাকি তখন বিরাটতর চৈতন্যলোকে নিমজ্জিত হয় এবং পরমহুতেই সে নাকি নভোমন্ডলে উদ্ভীষমান হতে হতে দ্বন্দ্বলোক সুরলোক হয়ে হয়ে ব্রহ্মাণ্ডাতীত লোকে লীন হয়ে যায় ; আর আমি ভাবছি, কাল যদি ঝড় হয় তবে আমি ইস্কুল যাব কী করে ? দূটো যে একই জিনিস জানবো কি করে ?

পরদিন দেখি, আকাশ বাতাস সুপ্রসন্ন। আসন্ন বর্ষণেরও কোনো আভাস নেই।

অন্যদিন মায়ের তাড়া খেতে খেতে হস্ত-দন্ত হয়ে শেষ পরমহুতে বাড়ি থেকে বেরোতুম, ইস্কুল যাবার জন্যে ছোট বোন বিরক্ত হয়ে আগে বেরিয়ে যেত, আজ আমি এক ঘণ্টা আগে থেকে তৈরী। অন্য দিন জুতোতে কালি-বুড়ু লাগাবার ফুরসৎ কোথায় ? আজ ফিটফাট। আমি জামা-কাপড় সম্বন্ধে চিরকালই একটু উদাসীন—অন্য মেয়েদের মত নই—আর ওয়ার্ডরোবের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল এ যেন সার্কাসের সতের ওয়ার্ডরোব খুলেছি।’

আমি বললাম, ‘তোমাকে সাদা-মাটা কাপড়েই এত সুন্দর দেখায় যে বাহারে জামা-কাপড় পরলে যে আরো প্রীতিস্থি হবে তা আমার মনে হয় না। এক লিটার বিয়ারের মগে এক লিটারই ধরে। সস্তা বিয়ার দিয়ে না ভরে দামী শ্যাম্পেন দিয়ে ভরলেও তাই।’

ক্যোটে বললে, ‘থ্যাংকস্’। সুন্দরী বলাতে ইতিমধ্যে দুবার তাড়া খেয়েছি। এবার দেখি, সে মোলায়েম হয়ে গিয়েছে।

বললে, ‘অটোও এখন বলে আমাকে সাদা-মাটাতেই ভালো দেখায়।’ একটু করুণ হাসি হাসলে।

ক্যোটে যে ‘এখন’ কথাটাতে বেশ জোর দিয়েছে সেটা আমার এড়িয়ে যাব নি। তাই শুধালুম, ‘অটো ‘এখন’ বলে, কিন্তু আগে কি অন্য কথা বলতো ?’

‘সেই ‘তখন’ আর ‘এখনের’ কথাই তো হচ্ছে। সেটাই প্রায় শেষ কথা। একটু সবুধ করো। না, তাড়াতাড়ি শেষ করে দেব ?’

আমি বললাম, ‘দোহাই তোমার সেটি ক’রো না। পরের দিন সকালবেলা কি হল, তাই বলো।’

‘এক ঘণ্টা আগের থেকে তৈরী অথচ বেরোবার সময় যতই এগিয়ে আসতে লাগল, আমার পা যেন আর নড়তে চায় না। এদিকে বোন খুশী হয়েছিল, আজ আমার সঙ্গ পাবে বলে। সে বার বার বলে, “চলো, চলো,” আর আমি তখন বন্ধুতে পেরেছি, কি ভুলটাই না করেছি ! বোন সঙ্গে থাকবে—ওদিকে অটোকে একা পেলেই ভালো হত না ? অত সাততাড়াতাড়িতে তৈরী না হলে বোন বেরিয়ে গেলে অটোতে আমাতে, শব্দ আমরা দুজনাতে একসঙ্গে যেতে

পারতুম। অবশ্য এমনটাও আগে হয়েছে যে আমার ঘের দেখে বোন বেরিয়ে গিয়েছে, এবং তারপর আরো ঘের হওয়াতে অটোও আমার জন্য অপেক্ষা করে নি। কিন্তু তখন তো আমি অটোর জন্য থোড়াই পরোয়া করতুম!

শেষটায় বোনের সঙ্গেই বেরুতে হল। ঘরে বসে থাকবার তো আর কোনো অছিল নেই। ওদিকে আবার ভয়, বেশী ঘের দেখে অটো যদি একা চলে যায়।

ঘর থেকে দেখি, অটো রাস্তায় দাঁড়ি।

এবং আশ্চর্য! পরেছে রবিবারে গির্জা যাবার তার রু সাজের পোশাকী স্যুট। এটা এতই অস্বাভাবিক যে বোন পর্যন্ত চেঁচিয়ে শুন্যালে, 'এ কি অটো, রম্বারের স্যুট কেন?'

'অটোর রম্বারের স্যুট পরা নিয়ে সৈয়দ কী হাসাহাসি! অটোটাও আকাট। কাউকে বলে ইস্কুলে ছুটির সঙ্গে সঙ্গে সোজা মামাবাড়ি যাবে, কাউকে বলে পান্ট্রী সায়েবের কাছে যাবে। আরে বাপু, যা বলবি একবার ভেবে-চিন্তে বলে নে না।

আমি কিন্তু হাসি নি। অটো রাজবেশে সেজেছিল, তার রাজরানীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে—আর আমি রাজরানী সেজেছিলাম, আমার রাজার সঙ্গে দেখা হবে বলে।'

আমি বললাম, 'কোটে, এটা ভারী সুন্দর বলেছ।'

কোটে বললে, 'শীতকালে যখন দিনের পর দিন অনবরত বরফ পড়ে, রাইনেও জাহাজ আঁধা-বোটের চলাচল কমে যায়, খন্ডের প্রায় থাকেই না, তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর দিন কাটে 'পাবে'র কাউন্টারের পিছনে বসে বসে। তখন মন যে কত আকাশ-পাতাল হাতড়ায়, কত অসম্ভব অসম্ভব স্বপ্ন দেখে, অটোকে বলার জন্য সুন্দর সুন্দর নতুন নতুন তুলনা ছলনা খোঁজে, সেটা বলতে গেলে মশ মিনিটের ভিতরেই শেষ হয়ে যাবে, অথচ আমি ভেবেছি, দুই আড়াই তিন বছর ধরে।'

আমি বললাম,

'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা

আকাশ কুসুম চয়নে

সব পথে এসে মিলে গেল শেষে

তোমার দু'খানি নয়নে ॥'

কোটে পড়াশুনোর বোধ হয় এককালে ভালোই ছিল, অন্তত লিরিকে যে তার মশকাতরতা আছে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর এঞ্জিনিসটা তো লেখাপড়া শেখার উপর খুব একটা নির্ভর করে না। রাগরাগিনী-বোধ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সাড়া দেওয়া এসব তো ইস্কুল শিখিয়ে দিতে পারে না, যার গোড়া থেকে কিছু আছে তারই খানিকটে মেজেঘষে দিতে পারে মাত্র।

সব চেয়ে তার ভাল লাগল এ আকাশ-কুসুম-চয়ন ব্যাপারটা।

আমি বললাম, 'জানো, ঐ সমাসটা আমার মাতৃভাষায় এমনই চালা যে

ওটা দিয়েও নতুন করে রসসৃষ্টি করা যায়, এ রকম আকাশ-কুসুম-চয়ন মহৎ কবিত্ব করতে পারেন। এই যে রকম সকলের কাছে সাদা-মাটা অটো হঠাৎ একদিন তোমার কাছে নবরূপে এসে ধরা দিল।

‘তারপর?’

ইস্কুল ছাড়ি আমি দুজনাতে একসঙ্গেই। আমি পাবে ঢুকলুম। অটো রেমাগেনে এপ্রিষ্টিসিতে।

সময় পেলেই ‘পাবে’ দু’মেরে আমাকে দেখে যেত। আর শনির সন্ধ্যা থেকে সোমের সকাল অবধি ছিল আমাদের ছুটি—মা তখনো ‘পাবে’র কাজ সম্পূর্ণ ছেড়ে দেন নি। সে সময় পায়ে হেঁটে, বাইসিক্লে, ট্রেনে বাসে আমরা এদেশটা ইণ্ডি ইণ্ডি করে চষিছি। শেষটায় অটো কিনলো একটা ক্যাম্পিসের পোর্টেবল, কলাপিসবল্ নোকো। তাতে চড়ে উজানে লিন্ংস থেকে ভাটিতে কলোন পর্যন্ত কত বারই না আসা-যাওয়া করেছি। শুধু আমরা দুজনা, আর কেউ না। গরমের দুপুরে ননেন্বেট বীপে—এ তো রাইন দিয়ে একটু ভাটার দিকে—গাছতলায় শূয়ে শূয়ে, পোকাকার উপাতে মৃৎ রুমাল দিয়ে ঢেকে, জ্যোৎস্নারাতে নোকো স্রোতের হাতে ছেড়ে দিয়ে, বরফের ঝড়ে আটকা পড়ে গ্রামের ঘরোয়া ‘পাব’ বা ‘ইনে’ কাটিয়েছি রাত। দুজনাতে নিয়েছি দুটি ছোট কামরা। শেষরাতে ঘুম ভাঙলে মাঝখানের দেয়ালে টোকা দিয়ে অটোকে জাগিয়েছি, কিংবা সে আমাকে জাগিয়েছি। জেলের কয়েদীরা যে রকম দেয়ালে টোকা দিয়ে সাংকেতিক কথা কয়, আমরাও সেই রকম একটা কোড্ আবিষ্কার করেছিলাম। আর সমস্তক্ষণ মনে মনে হাসতুম, সে অনায়াসে আমার ঘরে আসতে পারে, আমি তার ঘরে যেতে পারি—তবু বড় ভালো লাগত এই লুকোচুরি।

ইস্কুলে থাকতে অটো কালেক্সিমনে একটু-আধটু বিয়ার খেত—সে কিছু ধর্তব্যের মধ্যে নয়। চাকরি পেয়ে সে আশু আশু মাত্রা বাড়ালো। আমিও সঙ্গে সঙ্গে খেতে লাগলাম। তারপর একদিন তার মাত্রা এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছিল যার তুলনায় আমার আজকের বিয়ার খাওয়া নিতান্ত ‘জলযোগ’ই বলা যেতে পারে। অর্থাৎ শনির সন্ধ্যা থেকে সোমের সকাল অবধি সবদাই ঢুলঢুলদ নয়ন।

আমি মস্তব্য করি নি, বাধাও দিই নি। যতখানি পারি তাকে সঙ্গ দিতুম।

তারপর একদিন হল এক অশুভ কান্ড। পড়ল কোন এক টেম্পারেন্স না কিসের যেন পাদ্রীর পাল্লায়। তাদের নাকি সব রকম মাদক দ্রব্য বর্জন করা ধর্মেরই অঙ্গ। আমরা ক্যাথলিক। মদ খাই—বাড়িবাড়ি না করলেই হল। আর স্ক্যান্টিস্‌কানর, বেনেডিক্টিনার এসব ভালো ভালো লিক্যোর তো আবিষ্কার করেছে পাদ্রী সায়েবরাই। আমাদের গায়ের পাদ্রী সায়েবের ‘সেলারে’ যে মাল আছে তা আমার ‘পাবে’র চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

অটো দম্ করে মদ ছেড়ে দিল। আমি খেলে আমার দিকে আড়নয়নে তাকায়। এ আবাস কী।

মদ সিগারেট কোন-কিছু একটা হঠাৎ ছেড়ে দিলে মানুষ খিটখিটে হয়ে যায়। অটো আমাকে ভালোবাসতো বলে সেটা যতদূর সম্ভব চাপবার চেষ্টা করতো। আমি টের পেতুম।

জানি নে পুরোনো অভ্যাসবশত, না কত ব্যক্তানে সে তখনো আমার সঙ্গে শনি রবি বাইরে যায়, কিন্তু কেমন যেন আর জমতে চায় না। একদিন তো বলেই ফেললে, আমার মৃত্যুে বিয়ারের গন্ধ।

শোন কথা! দুদিন আগেও দু'দু'ড চলতো না তোমার যে বিয়ার নাথেকে, সেই বিয়ারে তুমি পাও এখন গন্ধ!

তখন—এখন না—তখন ইচ্ছে করলে আমি বোধ হয় বিয়ার ছাড়তে পারতুম, কিন্তু আমার মনে হল, এ তো বড় এক অস্বভূত ন্যাকরা। আমাকে তুমিই খেতে শেখালে বিয়ার, আর এখন তুমি হঠাৎ বনে গেলে বাপের সদুদ্ভৱ! এখন বিয়ারের গন্ধে তোমার বাইবেল অশুদ্ধ হয়!

আমি বললুম,

‘জাতে ছিল কুমোরের ঝি,
সরা দেখে বলে “এটা কি”?’

কোটেকে প্রবাসটা বোঝাতে বেশীক্ষণ লাগে নি।

কোটে বললে, ‘ভুল করলুম না ঠিক করলুম জানি নে—আমি ভাবলুম, এ রকম ন্যাকামোকে আমি যদি এখন লাই দিই, তবে ভবিষ্যতে কত-কিছুই না হতে পারে! একদিন সে ন্যাডিস্ট কলোনিতে মেসবার হতে চেয়েছিল, আমি বাধা দিয়েছিলুম—কেমন যেন ও জিনিসটা আমার বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়—পরে সে বলেছিল, আমি বাধা দিয়ে ভালোই করেছিলুম। এখন যে তাই হবে না, কে জানে?’

হাঁতমধ্যে এল আরেক গেরো।

বলা-নেই, কওয়া-নেই হঠাৎ একদিন এসে বলে, সে পাদ্রী হবে, সে নাকি ভগবানের ডাক শুনতে পেয়েছে। আমি তো গলাভর্তি বিয়ারে হাসির চোটে বিষম খেয়ে উঠেছিলুম। শেষটায় ঠাট্টা করে শূধিয়েছিলুম, ‘পৃথিবীতে কত শত অটো আছে। তুমি কি করে জানলে, আকাশবাণী তোমার জন্যই হয়েছে!’

রাগে গরগর করতে করতে অটো চলে গেল।

অর্থাৎ তা হলে আমাদের আর বিয়ে হতে পারে না।

সেই থেকে এই তিন মাস ধরে চলেছে টানপোড়েন। পর পর দুই শনি যখন এটা ওটা অঁছিল করে আমার সঙ্গে একস্কাফর্শনে বেরলো না, তখন আমিও আর চাপ দিলুম না। এখন মাঝে মাঝে রাত দশটা-এগারোটাই ‘পাবে’ এসে এক কোণে বসে, আর বিশ্বাস করবে না, লেমনেড—হ্যাঁ হ্যাঁ, লেমনেড খায়! আমি বিয়ার হাতে তার পাশে গিয়ে বসি।

ধর্ম আমি মানি। খৃষ্টে আমার বিশ্বাস আছে। কিন্তু ধর্মের এ কী উৎপাত আমার উপর! আমি ‘পাব’-ওয়ালীর মেয়ে। আমার ধর্ম বিয়ারে ফাঁকি না দেওয়া, যে বানচাল হবার উপক্রম করছে তাকে আর মদ না বেচে বাড়িতে

পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা, মা-বোনের দেখ-ভাল করা—আমি নান্ হতে বাব কোন দৃষ্টে !

তবু জানো, এখনো আমি তার পদধ্বনির প্রতীক্ষা করি ।’

কোটের গলায় কি রকম কি যেন একটা জমে গেছে । ‘তুমি ঘুমোও’ বলে আলো নিবিয়ে দিয়ে হুটু করে চলে গেল ।

। ১৭ ।

পড়ল পড়ল বড় ভয়

পড়ে গেলেই সব সন্ন ।

ভোরের দিকে ভয় হয়েছিল, বৃষ্টিতে ভেজার ফলে যদি আরো জ্বর চড়ে ! চড়ুলোও । তখন সর্ব দর্ভাবনা কেটে গেল । এবার যা হবার হবে । আমার কিছ্র করার নেই ।

সকালে ঘুম ভাঙতেই কিন্তু সর্ব প্রথম লক্ষ্য করেছিলুম, খাটের পাশের চেয়ারে আমার সব জামা-কাপড় পরিপাটি ইস্ত্রি করে সাজানো, ড্রাইক্লিনিঙেরও পরশ আছে বোঝা গেল । ধন্য মেয়ে ! কখনই বা শব্দে গেল, আর কখনই বা সময় পেল এ-সব করার ?

কিন্তু আমার টেম্পারেচার দেখে সে যায় ভিরমি । আমি অতি কষ্টে তাকে বোঝালুম, এ-টেম্পারেচার জর্মানিতে অজানা, কারণ এটা খুব সম্ভব আমার বাল্য-সখা ম্যালেরিয়ার পুনরাগমন ।

এবার কোটে সত্যিই একদম ফ্যাকাশে হয়ে গেল । ‘ম্যা—লে—রি—য়া ? ওতে শব্দ পূর্বের বেশে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক মরে !’

আমি কোটের হাত আমার বুকের উপর রেখে বললুম, ‘তুমি নিশ্চিত থাকো, আমি মরবো না । তদুপরি, আমাদের এতে কিছ্র করার নেই । বন, কলোন কোথাও কুইনিন পাওয়া যায় না । বন-এ আমার এক ভারতীয় বন্ধুর ম্যালেরিয়া হয়েছিল ; তখন হলান্ড থেকে কুইনিন আনাতে হয়েছিল, কারণ ডাক্তারের কাজকারবার আছে জুরে-ভর্তি ইন্ডোনেসিয়ার সঙ্গে ।’

কোটে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, ‘তাহলে হলান্ডে লোক পাঠাই !’

আমার ঘোঁষা নিষ্ফলিত নেই । বললুম, ‘শোনো, কোটে, আমার ভালিৎ, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আজ না হোক, কাল সকালেই আমার জ্বর নেবে হবে । তখন তুমি হবে সত্যসত্যি ভিরমি । কারণ টেম্পারেচার অন্তর্ধান নামেও না এদেশে কখনো—৩৬ সেন্টিগ্রেড । যদি না নামে তবে কথা দিচ্ছি, তুমি হলান্ডে লোক পাঠাতে পারো ।’

‘তাহলে ওঠো, ব্রেক-ফাস্ট খাও ।’

এই জর্মানদের নিয়ে মহা বিপদ । প্রথমত, এদের অসুস্থ বিসুস্থ হয় কম । পেটের অসুস্থ তো প্রায় সম্পূর্ণ অজানা—যেটা কি না প্রত্যেক বাঙালীর বার্ষ-

রাইট— ! আর যদি বা অসুখ করলো, তখন তারা খায় আরো গোথাসে । ডায়েটিং বলে কোন প্রক্রিয়া ওদেশে নেই, উপাস করার কষ্টপনা ওদের স্বপ্নেও আসে না । ওদের দৃঢ়তম বিশ্বাস, অসুখের সময় আরো ঠেসে খেতে হয় যাতে করে রোগা গায়ে গাঁত লাগে !

একেই কোনো মেয়ে ছলছল নয়নে তাকালে আমি অস্বস্তি বোধ করি, তদ্দ-পরি এ মেয়ে অপরিচিতা, বিদেশিনী ! এবং সব চেয়ে বড় আশ্চর্য লাগলো, যে মেয়ে রায়বাঘিনীর মত মাতাল 'সেলার'-দের ভেড়ার বাচ্চার মত গণনা করে, তার এই এত সুকোমল দিকটা এল কোথেকে ? তখন মনে পড়ল, কে যেন বলেছিল, 'ফাঁসিডের ছেলের পায়ে কাঁটা ফুটলে সে কি বিচলিত হয় না ?'

কোটেকে বললুম, 'তুমি দয়া করে তোমার 'পাব' সামলাও গে । আর শোনো, যাবার পূর্বে আমাকে একটি চুমো খাও তো !'

এবারে কোটের মূখে হাসি ফুটলো । আমার দুই গালে দুটি বম্-শেল ফাটাবার মত শব্দ করে দুটি চুমো খেয়ে যেন নাচতে নাচতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ।

রুচিবাগীশ পাঠকদের বলে রাখা ভালো, এদেশে গালে চুমো খাওয়াটা স্নেহ হৃদয়তার প্রতীক । ঠোঁটের ব্যাপার প্রেম-ট্রেম নিয়ে । যশ্মিন্ দেশাচার । কোটে নিশ্চিত হয়ে কাজে গেল—আমি বিদেশী নই, আমি ওদেরই একজন । এই যে-রকম কোনো সায়েব যদি আমাদের বাড়িতে খেতে খেতে হঠাৎ বলে ওঠে, 'দুটো কাঁচা লঙ্কা দাও তো, ঠাকুর'—তা হলে আমরা সেরকম নিশ্চিত হই ।

*

*

*

জ্বর কমেছে । পাবে এসে বসেছি । জামাকাপড় ইঙ্গি করা ছিল বলে ভদ্রলোকের মতই দেখাচ্ছিল । কোটে 'পাব'-কীপারের' মত কেতা-দরুস্ত কায়দায় আমাকে শূধোলে, 'আপনার আনন্দ কিসে !' সঙ্গে আবার মৃদু হাস্য—'আপন-প্রিয়' বাধবীর মত ।

আমি বললুম, 'বুইয়ো—বুইয়ো' ঘনচর্বি'র শূরুয়া । ওতে আর কিছ্ থাকে না । কোটে আরো পুরো-পাক্ষা নিশ্চিত হল—আমি খাঁটি জর্ম'ন হয়ে গিয়েছি । আশ্চর্য, সব'ই মানুষের এই ইচ্ছা—বিদেশীকে ভালো লাগে, কিন্তু তার আচার-ব্যবহার যেন দিশীর মত হয় ।

বুইয়ো দিতে দিতে বললে, 'অটোকে খবর দিয়েছি ।'

খানিকক্ষণ পরেই অটো এল ।

স্বীকার করছি, প্রথম দর্শনেই ওকে আমার ভাল লাগে নি । জর্ম'নে যাকে বলে 'উন-আপেটীটাল্'—অর্থাৎ 'আন-এপিটাইজিং' । পাঠক চট করে বলবেন, 'তা তো বটেই । এখন তুমি কোটেতে মজ্জে ! সপত্নীকে আনএপিটাইজিং মনে হবে বইকি ।' আমি সাফাই গাইব না, কিন্তু তবু বলি, এটুকু ছোকরার মূখে 'ধর্ম'-ধর্ম' ভাব আমার বেথাপ্পা বেমানান, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিন্ধু ভাঙামি বলে মনে হয় । অটো ফ্রন্টাল এটাক করলে । পান্টরীয়া বা আকছারই করে থাক । খুব সম্ভব, আমিই তার পয়লা শিকার । অন্য জর্ম'ন যেখানে

ব্যক্তিগত প্রশ্ন শুধোয় না, সেখানে পাদ্রীদের চক্ৰলঙ্কা অল্পই। পরে অবশ্য অনেকেই পোড় খেয়ে গেছে। শূধালে, ‘আপনি খৃষ্টান নন?’

বললুম, ‘আমি খৃষ্টান নই, কিন্তু খৃষ্টে বিশ্বাস করি।’

সাত হাত পানিমে’। শূধালে, ‘সে কি করে হয়?’

আমি বললুম, ‘কেন হবে না? খৃষ্টান বিশ্বাস করে, প্রভু যীশুই একমাত্র হ্যাণকর্তা। সেই একমাত্র হ্যাণকর্তাকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ না করলে মানুষ অনন্তকাল নরকের আগুনে জ্বলবে। আমি বিশ্বাস করি, প্রভু বৃদ্ধ, হজরৎ মহম্মদে বিশ্বাস করেও হ্যাণ পাওয়া যায়। এমন কি কাউকে বিশ্বাস না করে আপন চেষ্টাতেও হ্যাণ পাওয়া যায়।’

গিলতে তার সময় লাগলো। বললে, ‘প্রভু যীশুই একমাত্র হ্যাণকর্তা।’

আমি চুপ করে রইলুম। এটা একটা বিশ্বাসের কথা। আমার আপত্তি করার কি আছে।

কিন্তু এর পর যা আরম্ভ করলো সেটা পীড়াহান্নক। সর্ব ধর্মের মিশনারিই একটুখানি অসহিষ্ণু হয়। তাদের লেখা বইয়ে পরধর্মের প্রচুর নিন্দা থাকে। মিস মেয়োর বইয়ের মত। আঁত সামান্য অংশ সত্য, বেশীর ভাগ বিকৃত সত্য, কোরিকোচার। গোড়ার দিকে আমি এসব জানতুম না। আমি বন-এ যে পাড়াতে থাকি তারই গিজ্জাতে প্রতি রববারে যেতুম বলে গিজ্জার পাদ্রী আমাকে একখানা ধর্মগ্রন্থ দেন। তাতে পরধর্ম নিন্দা এতই বেশী যে মনে হয় মিস মেয়ো এ-বইখানাও লিখেছেন। অবশ্য এ-কথাও সত্য মানুষের ভ্রমতা জ্ঞান যত বাড়ছে এ-সব লেখা ততই কমে আসছে। একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি; ষাট সত্তর বছর আগে আমাদের দেশের খবরের কাগজে, মাসিকে তর্কাতর্কির সময় যে সৌজন্য দেখানো হত আজ আমরা তার চেয়ে অনেক বেশী দেখাই। এবং এ-কথাও বলে রাখা ভালো যে এ-সংসারে হাজার হাজার মিশনারি আছেন, যারা কখনো পরনিন্দা করেন না। শত শত মিশনারি পরধর্মের উত্তম উত্তম গ্রন্থ আপন মাতৃভাষায় অনুবাদ করে আপন আপন ভাষার গ্রীবাঙ্খ সাধন করেছেন, দুই ধর্মকে একে অন্যের কাছে টেনে এনেছেন।

কিন্তু এই গ্রামের ছেলে অটো এসব জানবে কোথা থেকে? সে কখনো নিগ্রোদের নিন্দা করে, কখনো পলিনেশিয়ানবাসীর, কখনো, বা হিন্দু-মুসলমানের। এ সবই তার কাছে বরাবর।

আমি এক জায়গায় বাধা দিয়ে বললুম, হোর অটো! অন্যের পিতার নিন্দা না করে কি আপন পিতার সূখ্যার্তি গাওয়া যায় না?’

বেশ গরম সূরে বললে, ‘আমি অসত্যের নিন্দা করছি।’

আমি বিনীত কণ্ঠে বললুম, ‘প্রভু যীশু বলছেন, ভালোবাসা দিয়ে পাপী-তাপীর চিত্ত জয় করবে।’

ক্যোটে লম্বা এক ঢোক বিয়ার গিলে, গেলাসটা ঠক করে টেবিলে রেখে বললে, ‘হুক্ কথা।’

‘স্বার্থে স্বার্থে’ বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে ঘটেছে সংগ্রাম—কিন্তু যখন সংগ্রামটা স্বার্থে স্বার্থে না হয়ে আদর্শে আদর্শে হয় তখন সেটা হয় আরো দীর্ঘস্থায়ী এবং প্রাণঘাতী। কারণ খাঁটি মানুষ অনায়াসে স্বার্থ ত্যাগ করতে রাজী হয় কিন্তু আদর্শ বর্জন করতে রাজী হয় না।

অটোকে যদিও প্রথম দর্শনে আমার ভালো লাগে নি, তবু তর্ক করতে করতে স্পষ্ট বুদ্ধিতে পারলুম, সে খাঁটি। সে স্থির করেছে, সর্বস্ব ত্যাগ করে ধর্ম প্রচার করবে। সেটা যে ক্যোটের স্বার্থের সঙ্গে সংঘাতে এসেছে তা নয়—ক্যোটেও খাঁটি মেয়ে, স্বার্থ ত্যাগ করতে প্রস্তুত—ক্যোটে দেখেছে, তার মার বয়েস হয়েছে, তার ছোট বোনকে ভালো ষোতুক দিয়ে বিয়ে দিতে হবে, পরিবারের মঙ্গল কামনা তার আদর্শ। দুই আদর্শ-সংঘাত! এ সংগ্রামে সশিখ নেই, কমপ্রমাইস হতেই পারে না।

অটোকে বোঝানো অসম্ভব, খৃষ্টধর্মের প্রতি তার যে রকম অবিচল নিষ্ঠা, দৃঢ় বিশ্বাস ঠিক তেমনি বৌদ্ধ ভ্রমণ রয়েছে, মুসলমান মিশনারি আছেন—আপন আপন ধর্মের প্রতি এঁদের নিষ্ঠা, এঁদের বিশ্বাস কিছুমাত্র কম নয়। অটোর কেমন যেন একটা আবছা-আবছা বিশ্বাস, এরা সব কেমন যেন একটা মোহাচ্ছন্ন অবস্থায়, একটা মায়ার ঘোরে আছে—খৃষ্টের বাণী তাদের সামনে একবার ভালো করে তুলে ধরতে পারলেই ওরা তৎক্ষণাৎ সত্য ধর্মে আশ্রয় নেবে।

ততক্ষণে আমি বিলক্ষণ বুঝে গিয়েছি, অটোর সঙ্গে তর্কাতর্ক বা আলোচনা করা নিষ্ফল। সে তার পথ ভালো করেই ঠিক করে নিয়েছে। এবং সেটা যখন খৃষ্টের পথ, তবে চলুক না সে সেই পথে।

আমি বললুম, ‘হ্যার অটো! আমার একটি নিবেদন শুনুন। আমি ছেলেবেলায় গিয়েছি পাদ্রী ইন্সকুলে, আমার প্রতিবেশীরা ছিল সব হিশ্দ্। ভিন্ন ধর্মের খুব কাছে আপনি কখনো আসেন নি—কাজেই আমার মনের ভাব আপনি বুদ্ধিতে পারবেন না আপনারটাও আমি বুদ্ধিতে পারবো না। আমার শ্রদ্ধা একটি অনুরোধ—যেখানেই ধর্ম প্রচার করতে যান না কেন, প্রথম বেশ কিছুদিন সে দেশবাসীর শাস্ত্র, আচার-ব্যবহার, সামাজিক প্যাটার্ন ভালো করে দেখে নেবেন, শিখে নেবেন, তার পর যা করবার হয় করবেন।’

অটোর চোখ-মুখের ভাব থেকে অনুমান করতে পারলুম না, আমার পরামর্শটা তার মনে গাঁথেছে কি না। এতক্ষণ আমি তাকে তাকে ছিলুম, কি করে এ-আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে অন্য দিকে চলে যাওয়া যায়। তাই শূধালুম, ‘আপনি কোন্ দেশে ধর্ম প্রচার করতে যাবেন?’

অটো বললে, ‘এখনো ঠিক করি নি।’

আমি তৎক্ষণাৎ আলোচনার মোড় নেবার সুযোগ পেয়ে গেলুম—বললুম, ‘ভারতবর্ষ, ইরান, আরব এ সবের কোনো একটা দেশে যাবেন। অর্থাৎ যেখানকার লোকের রঙ আমার মত বাদামী। এরাই ভগবানের সর্বোত্তম সৃষ্টি।’

অটো বদ্বতে না পেরে বললে, ‘কেন ?’

ক্যোটে বলল, ‘আমরা জম’নরা চামড়ার বাদামী রঙ পছন্দ করি বলে ?’
অটো কেমন যেন একটু ঈর্ষার নয়নে আমার দিকে তাকালে। বাঁচালে ! ক্যোটের
প্রতি তার সব ‘দুর্বলতা’ তা হলে এখনো যায় নি।

আমি বললুম, ‘বুঝিয়ে বলি। সৃষ্টিকর্তা যখনমানুষ গড়তে প্রথম বসলেন,
তখন এ বাববে তাঁর বিলকুল কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। প্রথম সেট বানা-
নোর পর সেটা ‘বেক’ করার জন্য ঢোকালেন “বেকিং বস্কে”। যতখানি সময় বেক
করার প্রয়োজন তার আগেই বাস্ক খোলার ফলে সেগুলো বেরোল ‘আন্ডার-
বেক্ট’ সাদা সাদা। অর্থাৎ তোমরা, ইয়োরোপের লোক। পরের বার
করলেন ফের ভুল। এবারে রাখলেন অনেক বেশী সময়। ফলে বেরোল পুড়ে-
যাওয়া কালো কালো। এরা নিগ্রো। ততক্ষণে তিনি টাইমিংটি ঠিক বদ্ব
গেছেন। এবারে বেরুল উত্তম ‘বেক’-করা স্দের রাউন-লেড। অর্থাৎ আমরা,
ইরানী, আরব জাত।’

ক্যোটে হাসতে হাসতে তখন পুনরায় আরম্ভ করলো ভারতীয় নর্তকী-
সৌন্দর্য-কীর্তন। এবারে অটোর হিংসা করার কিছু নেই—কারণ প্রশংসাটা
হচ্ছে মেয়েদের। কিন্তু মানব-সৃষ্টিরহস্যের গম্পটা শুনে সে প্রাণভরে হাসলে
না। নিছক ভদ্রতা রক্ষা করার জন্য কেমন যেন শূকনো শূকনো।

আমি বললুম, ‘আর প্রভু খৃষ্টও তো ছিলেন বাদামী। তাঁর আমলের
কিছু কিছু ইহুদী এখনো প্যালেস্টাইনে আছে। তাদের বর্ণসংস্কার দোষ নেই।
এখনো ঠিক সেই স্দের বাদামী রঙ, মিশমিশে কালো-নীল চুল। ইণ্ডিয়া
যাবার পথে প্যালেস্টাইনে দেখে নেবেন।’

ক্যোটে অভিমান-ভরা স্দের বললে, ‘তুমি দেখি অটোকে দেখছাড়া করার জন্য
সাত-তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে লেগেছো !’

আমি সপ্রতিভ কণ্ঠে উত্তর দিলুম, ‘কেন, তুমি কি ওর সঙ্গে যাচ্ছো না ?’

অটো বললে, ‘ওর অভাব কি ? সৌন্দর্যদানে তো ভগবান ওর প্রতি কাপ’ণ্য
করেন নি।’

ক্যোটে রোষ-কষায়িত লোচনে অটোর দিকে তাকালো। মস্তবাটা আমারও
মনে বিরক্তির সঞ্চার করলো। এতক্ষণ ধর্ম নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল বলে ওকে
কোনো প্রকারের আঘাত না দেবার জন্য টাপে-টাপে কথা বলছিলাম, এখন
আর সে পরোয়া নেই। বাঁকা হাসটাকে প্রায় চক্রাকারে পরিবর্তিত করে
বললুম, ‘আপনি বুঝি ধরে নিয়েছেন, প্রত্যেক পরিবর্তনই প্রগতি, এবং
পরিবর্তনটা করা হবে ঝটপট ! আজ আছ মসলমান, কাল হয়ে যাও খৃষ্টান ;
আজ ভালবাসো অটোকে, কাল ভালবেসে ফেলো ডাভিড কিংবা খ্রীর্ডরষকে !
যেমন এখন খাচ্ছো বিয়ার, পরে গেলাস ভরে নাও লেমনেড দিয়ে ! না ?’

অটোর আঁতে খানিকটে লেগেছে। তাই শূককণ্ঠে বললে, ‘মিথ্যা প্রতিমা
(ফল্‌স্‌ আইডল্‌স্‌) যতদূর সম্ভব শীঘ্র বর্জন করে সত্যধর্মে আগ্রহ নেওয়া
চীত।’

আমি রীতিমত রাগত কণ্ঠে বললাম, ‘মিথ্যা প্রতিমা ! নরনারীর প্রেম-মিথ্যা, আর কোথায় কোন আশ্রিত্যের জঙ্গলে পড়ে আছে নিগ্রো তার মাংস-জাম্বো নিয়ে—হয়তো সুখেই আছে, শান্তিতেই আছে—তাকে তার ‘অজ্ঞতা’, ‘কুসংস্কার’, ‘পাপ’ সম্বন্ধে সচেতন করাই সব চেয়ে বড় সত্য !

শুনুন হ্যার অটো ! আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, যে লোক ঐশীবাণীর স্পন্দন তার হৃদপিণ্ডে অনুভব করেছে তার ‘কিছু বাকি থাকে না’—আমাদের দেশের গ্রাম্য সাধক পৰ্যন্ত গেয়েছে, ‘যে জন ডুবলো সখী তার কি আছে বাকি গো’ ?

কিন্তু ধর্মের দোহাই, নরনারীর প্রেম অবহেলার জিনিস নয়। আপনি রাগ করবেন না, আমি জিজ্ঞেস করি, আজ যে আপনি প্রভু যীশুকে ভালবাসতে শিখেছেন, তার গোড়াপত্তন কি কোটের প্রতি আপনার প্রথম প্রেমের উপর নয় ?

টায়-টায় মিলবে না, তবু একটি উদাহরণ দিই। আমার একজন আত্মীয়া উনিশ-বিশ বৎসর অবধি তার মাকে বৃদ্ধ অবহেলা এমনকি তাচ্ছিল্য করতো। তার পর তার বিয়ে হল, বাচ্চা হল। তখন সে জীবনে প্রথম বদ্ব্যপ্তে পারলো বাচ্চার প্রতি মার ভালোবাসা কি বস্তু। তখন সে ভালোবাসতে শিখল আপন মাকে।

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে আপনার ধর্মের অনেকখানি মিল আছে। সংসারাত্মম ত্যাগ করে, সম্যাসী হয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করাই সে ধর্মের অনুশাসন। অথচ জানেন, সে ধর্মও মায়ের আসন অতি উচ্চ। বুদ্ধদেব যখন তাঁর প্রধান প্রধান শিষ্যদের নিয়ে ধর্মালোচনা করতেন তখন তাঁর একমাত্র কিশোর পুত্র রাহুল অত্যন্ত বিমর্ষ বদনে এক কোণে বসে থাকতো—সে তো শ্রমণ নয়, তার তো কোনো আসন নেই সেখানে। আপন পিতা বুদ্ধদেব পৰ্যন্ত শিষ্য মহামোহগল্যায়ন, সারিপুস্তের সঙ্গে যে রকম সানন্দে কথা বলেন, তার সঙ্গে সে রকম ব্যবহার করেন না। তখন রাহুল স্থির করলেন, সম্যাস নেবেন বলে। সৎ-কথা শুনতে পেয়ে রাহুল-জননী যশোধারা নিরাশকণ্ঠে বলেছিলেন, ‘আর্থ-পুত্র আমাকে বর্জন করেছেন, আমি তাঁকে পেলাম না। তিনি সিংহাসন গ্রহণ করলেন না, আমিও পট্ট-মহিষী হওয়ার গৌরব থেকে বঞ্চিত হলুম। এখন বুদ্ধি তিনি আমার শেষ-আশ্রয়ের স্থল যুবরাজ রাহুলকেও আমার কোল থেকে কেড়ে নিতে চান !’ একথা শুনতে পেয়ে বুদ্ধদেব অনুশাসন করেন, “মাতার অনুমতি ভিন্ন কেউ শ্রমণ হতে পারবে না।” আড়াই হাজার বছর হয়ে গেছে—এখনও সে অনুশাসন বলবৎ। আমার আশ্চর্য বোধ হয়, হ্যার অটো ! মাতা হয়তো নিরক্ষরা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন। কিন্তু তারই উপর নির্ভর করছে, পুত্রের আদর্শ-বাদ, সধর্ম গ্রহণ, সব কিছুর। সেই মূর্খণী মাতা অনুমতি দিলে সে সব চেয়ে মহৎ কর্ম প্ররজ্যা গ্রহণ করতে পারবে না—আজ আপনি যে রকম করতে পারছেন। আর এ তো আবার প্রেম।

“ভগবান কোথায় ?”—নাস্তিক জিজ্ঞেস করেছিল সাধুকে, আমার হৃৎকর মনে পড়েছে খুঁটান সাধুকেই। কৃষ্ণসাধনাসক্ত, দীর্ঘ তপস্যারত চিরকুমার সাধু বলেছিলেন, “তরুণ-তরুণীর চুম্বনের মাঝখানে থাকেন ভগবান।”।

‘আমি বললুম, ‘প্রীমতী ক্যোটে, কাল ভোরে আমি বেরবো।’

ইতিমধ্যে তিনটি দিন কেটে গিয়েছে। ফিল্ম-স্টারের আদরে কবরে। শরীর একটু লুপ্ত বোধ হলেই নিচের পাবে এসে বসেছি, ক্যোটের কাউটারের নিকটতম সোফায়। তারও বোধ হয় মনে রঙ ধরেছে। কিংবা তার কপাল ভালো,—কি করে যেন ‘বারে’র একটা ঠিকে জুড়ে গিয়েছে বলে অধিকাংশ সময় তার বিয়ারের মগসহ আমার সামনে বসে। আর যখন মৌজে ওঠে তখন সোফায় এসে আমার গা ঘেঁষে। অটোও প্রতি রাতে এসেছে। আমাদের যত-খানি ভাব জমেছে ক্যোটে সেটা অটোর কাছ থেকে লুকোবার চেষ্টা করে নি। অটোর হাব-ভাব দেখে অন্তর্মান করলুম, সে পড়েছে ধনে। অস্কার ওয়াইল্ড বলেছেন, ‘আমাদের প্রত্যেকের কাছে এমন একাধিক জিনিস আছে যেগুলো আমরা স্বচ্ছন্দ পথের ধুলোয় ছুঁড়ে ফেলে দিতুম, যদি না জানতুম, অন্য লোকে সেগুলো তৎক্ষণাৎ কুড়িয়ে নেবে।’ অটো ভাবছে সে ক্যোটেকে কবুল জবাব দেওয়া মাত্রই আমি তাকে লুফে নিয়ে বটন-হোলে বসরাই গোলাপের মত গন্ধে নেব।

একবার শূদ্ধ অটোকে বলেছিলুম, ‘আপনার কবি গ্যোটে অতুলনীয়। সুন্দর ভারতের আমরা যে হীর্ষেন, আমরাও তাঁকে সম্মান করি। তিনি বলেছেন,

‘দূরে দূরে তুমি কেন খুঁজে মরো

হেরো প্রেম সে তো হাতের কাছে,

শিখে নাও শূদ্ধ তারে ধরিবারে

সে তো নির্গাধিন হেথায় আছে।’

‘Willst du immer weiter schweifen ?

Sieh, das Gute liegt so nah.

Lerne nur das Glueck ergreifen,

Denn das Glueck ist immer da.’

অটো এর উত্তরে কিছু না বলে শূদ্ধ অন্য কথা পেড়ে আমাকে বলেছিল, ‘আপনি এখানে আরো কিছুদিন থাকুন। আশু আশু সব কথাই বুঝতে পারবেন।’

এ আরেক প্রহেলিকা !

ক্যোটে চালাক মেয়ে। আমার উড়ুন্ডু ভাব বুঝতে পেরে আমাকে কিছুতেই বিদায় নেবার প্রস্তাব পাড়তে দেয় না। কী করে যে বুঝে যায়, কথার গতি ঐকিঞ্চে মোড় নিচ্ছে আর অমনি দুম্ করে ভারতবর্ষের ফকীরদের কাহিনী শুনতে চায়, আমার মা বছরে ক’বার তার বাপের বাড়ি যায়—অতিশয় ধূর্ত মেয়ে, কি করে যে বুঝে গেছে আমি আমার মায়ের গল্প বলতে সব সময়ই ভালোবাসি, আমিও একবার মর্খের মত বলেছিলুম, মায়ের গল্প সব গল্পের মা—মা চলে গেলে বাড়ি চালায় কে, আরো কত কী ?

আর আমিও তো অতটা নিমক-হারাম নই যে এতখানি স্নেহ-ভালবাসা পাওয়ার পর হঠাৎ বলে বসবো, ‘আমি চললুম।’ যেন পচা ডিমের ভাঙা খোসাটা জানালা দিয়ে ফেলে দেবার মত ওদের বাড়ি বর্জন করি !

শেষটায় মরীয়া হয়েই প্রস্তাবটা পাড়লুম।

কোটে বললে, ‘কেন ? এখানে আরো কয়েকটা দিন থাকতে আপত্তি কি ? তুমি যে ঘরটায় আছো সেটা সাড়ে এগারো মাস ফাঁকা থাকে, খন্দেরঘের জন্য এখানে প্রতিদিন রান্না হয় অন্তত তিরিশটা লাঞ্চ-ডিনার। একটা লোকে বেশী খেল কি কম খেল তাতে কি যায় আসে ?’

আমি বললুম, ‘আমি আর তিনদিন থাকলেই তোমার প্রেমে পড়ে যাব।’

আমি ভেবেছিলুম, কোটে বলবে, ‘তাতে ক্ষেতিটা কি ?’ সে কিন্তু বললে অন্য কথা। এবং অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে। বললে, ‘কোনো ভয় নেই তোমার। তোমার স্বভাব প্রেমের লক্ষণে দীন (যেন, হুবহু রবীন্দ্রনাথের ভাষা)। মানুষ হঠাৎ একদিন প্রেমিক হয় না। যে প্রেমিক, সে প্রেমিক হয়েই জন্মায়। কিংবা যেমন কেউ বাঁকা নাক নিয়ে। যাদের কপালে প্রেমের দূর্ভাগ আছে তাদের জন্ম থেকেই আছে। তোমার সে ভয় নেই।’

আমি চুপ করে রইলুম।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, ‘অটো যত দূরে চলে যাচ্ছে আমার জীবনটা ততই ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। এই যে তোমার প্রিয় কবি হাইনরিখ হাইনে তাঁরই একটি কবিতা আছে—

গোলাপ, কমল, কপোত, প্রভাত রবি—

ভালবাসিতাম কত যে এসব আগে,

সে সব গিয়েছে, এখন কেবল তুমি,

তোমারি মূর্তি পরাণে কেবল জাগে !

নিখিল প্রেমের নিকর—তুমি, সে সবি—

তুমিই গোলাপ, কমল, কপোত, রবি।’

কবি একদিন তাঁর প্রিয়াতেই গোলাপ, কমল, কপোত সবই পেয়ে গেলেন ! কিন্তু তারপর আরেকদিন যখন তাঁর প্রিয়া তাঁকে ছেড়ে চলে গেল তখন কি তিনি সঙ্গে সঙ্গে আবার গোলাপ কমলকে ভালোবেসে সে অভাব পূর্ণ করতে পারলেন ? আমার হয়েছে তাই। এ তো আর চটিজুতো নয় যে, যখন খুশী পরলে যখন খুশী ছুঁড়ে ফেলে দিলে। এ যেন নিজের স্বীপে পেঁছে নোকো-টাকে পুড়িয়ে দেওয়া। তারপর একদিন যখন ভূমিকম্পে স্বীপটি সমুদ্রে বিলীন হয়ে গেল তখন তুমি যাবে কোথা ?

এর উত্তর আমার ঘটে নেই। তাই অন্য পন্থা ধরে বললুম, ‘তোমার বয়স আর কতটুকু ? এত শিগগির নিরাশ হয়ে গেলে চলবে কেন ?’

ইতিমধ্যে অটো এসে পড়তে আমাদের এ আলোচনা বন্ধ হল। অটোকে

অশেষ ধন্যবাদ । তাকে বললুমও, ‘অটো, আপনি অনেক লোকের বহু উপকার করবেন ।’

অটো বঝতে না পেরে বললে, ‘কি রকম ?’

আমি বললুম, ‘পরে বলবো । আমি কাল চললুম ।’

অটো কিছু বলার পূর্বেই কোটে আমাকে বললে, ‘কিন্তু তুমি তো এখনো আমার গান শোনো নি ।’

অটো বললে, ‘ও সত্যি খুব ভাল গাইতে পারে ।’

আমি বললুম, ‘কোটে, ডালিং, একটা গাও না ।’

‘পাবে’র এক প্রান্তে গ্র্যান্ড পিয়ানো । প্রায়ই দেখেছি, সেলারদের একজন কিংবা কোটে স্বয়ং সেটা বাজায়, আর বাকিরা নাচে ।

কোটে গুলে বসে মৃদুতমাত্র চিন্তা না করে বাজাতে আরম্ভ করলে । তার পরেই গান,

তুমি তো আমার
আমি তো তোমার
এই কথা জেনো,
ষিধা নাহি আর ।
হিয়ার ভিতরে
তাল চাবি দিয়ে
রাখিন্ তোমারে
থাকো মোরে নিয়ে
হারায় গিয়েছে
চাবিটি তালার
নিষ্কৃতি তব
নাই নাই আর ।’

গান শেষ হলে কোটে দৃষ্টপথে ফিরে এসে অটোর মৃদুমুখি হয়ে তাকে শ্রদ্ধা, ‘অটো, এ গানটা তুমিই আমাকে শিখিয়েছিলে না ?’

-
- ১ Du bist min, ich bin din :
des solt du gewis sin.
du bist beslozen
in minem herzen :
verlorn its daz sluezzelin :
du most immer drinne sin.
(ষাটশ শতাব্দীর লোকসঙ্গীত)

‘বলা বাহুল্য’ যে কতখানি বলা বাহুল্য এই প্রথম টের পেলুম। কোটের কাছ থেকে বিদায় নেওয়াটা যে উভয়ের পক্ষেই বেদনাদায়ক হয়েছিল সেটা বলা বাহুল্য, না বলাও বাহুল্য।

ধোপার কালি দিয়ে সে আমার শার্টটার ঘাড়ের ভিতরের দিকে তাদের বাড়ির ফোন নম্বর ভালো করে লিখে দিয়ে বলল, ‘দরকার হলে আমাকে ফোন করো।’

আমি শূদ্রালদুম, ‘আর দরকার না হলে?’ এটা ইন্ডিয়টের প্রশ্ন। কিন্তু আমি তখন আর কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। কোটে কোনো উত্তর দিলে না। ইতিমধ্যে কোটের মা বোন এসে পড়াতে আমি ঘেন বেঁচে গেলুম।

কোটের মা আমার গলায় একটি ক্রুশাবিধ্ব যীশুর ক্ষুদ্র মূর্তি ঝুলিয়ে দিলেন। চমৎকার সূক্ষ্ম, সুন্দর কাজ করা। এখনো আছে।

* * *

প্রথমটায় রাইনের পাড়ে পাড়ে সদর রাস্তা দিয়েই এগিয়ে চললুম।

এবেশের লোক বিদেশীর প্রতি সত্যিই অত্যধিক সদয়। পিছন থেকে যে সব গাড়ি আসছে তাদের ড্রাইভার সোওয়ার আমার ক্ষুদ্রাকৃতি, চামড়ার রঙ আর বিশেষ করে চলার ধরন দেখে বুঝে যায় আমি বিদেশী আর অনেকেই—কেউ হাত নেড়ে, কেউ গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেস করে লিফট চাই কিনা। আমি মৃদু হাসির ধন্যবাদ জানিয়ে হাত নেড়ে ওদের এগোতে বলি।

মনে মনে বলি, এও তো উৎপাত। আচ্ছা, এবারে তা হলে গায়ের রাস্তা পাওয়া মাত্রই মোড় নেব। এমন সময় একখানা ঝাঁকচকচে মোটর আমার পাশে এসে দাঁড়াল। ওনার ড্রাইভার। দরজা খুলে দিয়ে আমার দিকে তাকালে। আমি যতই আপত্তি জানাই সে ততই একগুয়েমির ভাব দেখায়। শেষটায় ভাবলুম, ‘ভালোই, কোটের থেকে যত তাড়াতাড়ি দূরে যাওয়া যায় ততই ভালো।’ গাড়ীতে বসে বললুম, ‘ধন্যবাদ।’

ভদ্রলোক বললেন, ‘মোটেই না। এই হল বুদ্ধিমানের কাজ।’ তারপর শূদ্রলোকে, ‘ইন্ডার?’

এই প্রথম একটা বিচক্ষণ লোক পেলুম যে প্রথম দর্শনেই ধরে ফেলেছে, আমি কোন্ দেশের লোক। এশ্চিমো বা মঙ্গলগ্রহবাসী কিনা, শূদ্রলো না।

বললে, ‘কোথা যাবে।’ ভদ্রতার খুব বেশী ধার ধারে না।

‘ইন্ডিয়া।’

আদর্শই বিচলিত না হয়ে বললে, ‘তাহলে তো অনেকখানি পেট্রল নিতে হবে। ঠিক আছে। সামনের স্টেশনেই নিয়ে নেব। তা আপনি বন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়েন—না?’

শার্লক হোমসের জার্মান মামা ছিল নাকি? পরিষ্কার ভাষায় সেটা শূদ্রালদুমও।

হেসে বললে, ‘না। শুনুন। আচ্ছা, আপনি লেফারকুজেন ফার্বেন

ইন্ডিয়ান নাম শুনছেন ? ইন্ডিয়ান সব চেয়ে বড় না হোক—দুসরা কিংবা তেসরা, রঙ আর গুণ্ডা বানায় ?

আমি অজ্ঞতা স্বীকার করলাম ।

বললে, ‘আমি সেখানে কাজ করি । এখন হয়েছে কি, আমরা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই বহুত কিছু বেঁচি । ইন্ডিয়াও আমাদের বড় মার্কেট । একটা গুণ্ডার বিজ্ঞাপন ছাপতে গিয়ে দেখি তাতে ইন্ডিয়ান যা খরচা পড়বে তার চেয়ে অনেক কম খরচায় হবে এখানে । ইন্ডিয়া থেকে ছবি ক্যাপশন আনিয়া এখানে জোড়াতালি লাগিয়ে ছাপতে গিয়ে হঠাৎ মনে হল, এ জোড়াতালি লাগানোতে যদি উল্টো-পাল্টা হয়ে গিয়ে থাকে তবেই তো সর্বনাশ । ছাপা হবে তিন লক্ষখানা—তদুপরি মেলা রঙ-বেরঙের ছবি । খরচাটা কিছু কম হবে না—যদিও ঐ যা বললাম, ইন্ডিয়ান চেয়ে অনেক কম । তাই ভাবলাম, ওটা কোন ইন্ডিয়ানকে দেখিয়ে চেক আপ করে নিই । আমাদের লেফারকুজেন শহরে কোনো ভারতীয় নেই । কাছেই কলোন বিশ্ববিদ্যালয় । গেলুম সেখানে ।

তারা তাদের নথিপত্র ঘেঁটে বললে, ভারতীয় ছাত্র তাদের নেই, তবে পাশের বন্ শহরে থাকলে থাকতেও পারে—সেখানে নাকি বিদেশীদের ঝামেলা । কি আর করি, গেলুম সেখানে । সেখানেও গরমের ছুটির বাজার । সবাই নাকে কানে ক্লোরোফর্ম—আমাদের কোম্পানীরই হবে—ঢেলে ঘুমুচ্ছে । অনেক কষ্ট করে একজন ইন্ডারের নাম বাড়ির ঠিকানা বের করা গেল । তার বাড়ি গিয়ে খবর নিতে জানা গেল সে মহাত্মাও বেরিয়েছেন হাইকিঙে । লাও ! বোঝো ঠ্যালা ! এসেছিঁস তো বাবা তিন হাজার না পাঁচ হাজার মাইল দূরের থেকে ! তাতেও মন ভরলো না । এবার বেরিয়েছেন পায়ে হেঁটে আরো এগিয়ে যেতে । আমার আরো কাজ ছিল মানহাইমে । ভাবলাম রাস্তায় যেতে যেতে নজর রাখবো ইন্ডারপানা কেউ চোখে পড়ে কি না । তারপর এই আপনি ।’

আমি বললাম, ‘আমি ইন্ডার নিশ্চয়ই, কিন্তু তাতে আপনার সমস্যার সমাধান হবে কি না বলা কঠিন । ইন্ডিয়াতে খান তেরো-চোদ্দ ভাষা । তার সব কটা তো আর আমি জানি নে ।’

বললে, ‘সর্বনাশ ! তা হলে উপায় ? সেই জোড়াতালির মাল ইন্ডিয়া পাঠাব, সেটা ফিরে আসবে, তবে ছাপা হবে, ওতে করে যে মেলা দোর হয়ে যাবে ।’

আমি শুধালুম, ‘ইন্ডিয়ান কোন জায়গাতে সেটা তৈরি করা হয়েছে মনে পড়ছে কি ?’

বললে, ‘বিলক্ষণ ! কালকুট্টা ।’

আমি বললাম, ‘তা হলে বোধ হয় আপনার মদুশকিল আসান হয়ে যাবে । অবশ্য জোর করে কিছু বলা যায় না । কারণ কলকাতার শহরেও সাড়ে বারিশ রকম ভাষায় কাগজপত্র ছাপা হয় ।’

বেশ সপ্রতিভ কণ্ঠেই বললে, ‘আর শুনুন । আমরা কোনো কাজই ঠী করাই নে । আপনি বললেন না ।’

আমি বললুম, ‘আপনি কিছুমাত্র দৃষ্টিস্তা করবেন না। আপনাদের মহাকবি হাইনরিখ হাইনের আমি অশ্ব ভক্ত। তাঁর সর্বক্ষণই লেগে থাকতো টাকার অভাব। পেলেই খরচা করতেন দেহাৱ এবং বে-এক্টোর। তিনি বলেছেন, “কে বলে আমি টাকার মূল্য বৃদ্ধি নে? যখনই ফুরিয়ে গিয়েছে, তখনই বিলক্ষণ বৃদ্ধিতে পেরেছি।” আমার বেলাও তাই। আপনি নিভয়ে আপনার মাল বের করুন।’

জর্মন বললে, ‘ঐ তো ডবল সর্বনাশ! আমি সেটা সঙ্গে আনি নি। মোটরে তেল-মেলের ব্যাপার, জিনিসটা জখম হয়ে যেতে পারে সেই ভয়ে। তার জন্য কোনো চিন্তা নেই। সামনের কোব্‌লেন্‌ৎস্ শহরে সব চেয়ে দামী হোটেলের ম্যানেজার আমার বন্ধু, অতিশয় পণ্ডিত এবং সজ্জন। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। তার সঙ্গে দু’ দণ্ড রসালাপ করে সত্যিই আপনি আনন্দ পাবেন। আপনার হোটেল খরচা অতি অবশ্য আমাদের কোম্পানিই দেবে। আমিও প্রতিবার মানহাইম যাবার সময় সেখানে দু’ রাত্তিরই কাটিয়ে যাই। আপনাকে তার কাছে বসিয়ে আমি লেফারকুজেন যাবো আর আসবো।’

মোটর থামলো।

বাপস! রাজসিক হোটেল। ম্যানেজারটির চেহারাও যেন রাজপুত্রের।

আরামসে বসেছি। হোটেল খরচা দিতে হবে না। পকেটে একশ মার্ক।

ম্যানেজারের সঙ্গে গালগল্প করলুম। রাত এগারোটায় সেই জর্মন ফিরে এল। কাজকর্ম হল। আরো একশ টাকা পেলুম।

কিন্তু বাধ সাধল পাশের ঐ টেলিফোনটা। বার বার লোভ হচ্ছিল। কোটেকে একটা ফোন করি।

মুসাফির

কৈফিয়ত

এ পুস্তকের একটি ক্ষুদ্র মূখবন্ধের প্রয়োজন আছে ।

একাধিক খ্যাতনামা ভূপৰ্ণটক পরিণত বয়সে নাক্ষত্র দ্বিগ্নে অসম্ভোটে স্বীকার করেছেন, উঠান-সমুদ্র পেরিয়ে বাড়ির বাইরে বেরনোটাই মূখ্যমিষ্ট চুড়ান্ত নিদর্শন । খ্যাতনামা লেখক না হয়েও আমি এসব প্রাক্তম্মরণীয়দের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত । কিন্তু তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলছেন কি, ভ্রমণ-কাহিনী লিখে সে মূখ্যমিষ্ট চুড়ান্ত পরিচয়টি তাঁরা দিতে গেলেন কেন ?

১৯২৭ থেকে আপনাদের বংশবধ এ-লেখক ঘরছাড়া । মাঝে-মাঝে দু'চার বছরের জন্য হেথা হোথা সে আগ্রহ পেয়েছিল বটে কিন্তু গৃহনির্মাণ করার সুযোগ সে কখনো পায় নি । ফের পথে নামতে হয়েছে । সে নিরো ফরিয়াব করি নে । একদা নাবিকজনের অধিকাংশই সমুদ্রে মারা যেত । তাদের যে-সব ভীতু ছেলে ভাইপো সমুদ্রযাত্রা করতো না তারা মরতো বাড়িতে । ফল তো একই । আমার বেলা আরো একটা ভয় আছে । উঠান-সমুদ্র পেরিয়ে অপকর্ম করেছি সে পাপ তো এইমাত্র স্বীকার করলাম, কিন্তু বাড়ি থেকে না বেরুলে যে আরো মেলা জন্মের জন্মের ব্রহ্মহত্যা করতুম না সে ভরসা দেবেন কোন গোসাই ? অবঁচীন জনই মন্তব্য করে, হিটলার যদি অম্লক ভুলটা না করতেন তবে তিনি আর্থেরে বিজয়ী হতেন—ঐ ভুলটা না করলে তিনি যে পরে গণ্ডা দশেক ততোধিক মহামারাত্মক ভুল করতেন না সে আশ্বাস দেবেন কোন বিধানরাজ !

তবে এসত্য আমি বারবার বলবো, আমি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছি অতিশয় অনিচ্ছায়—গতাস্তর ছিল না বলে । প্রতি আগ্রহ লাভের পর ফের যে বেরিয়েছি সেটা আরো বেশী অনিচ্ছায়—নিতাস্ত বাধ্য হয়ে ।

এবং শেষ মোক্ষম পাপাচার স্বীকার করছি, যে-পাপ কৃতী পৰ্ণটককে আঘাত স্বীকার করতে হয় নি, কারণ তাঁরা আপন আপন সাহিত্যের গ্রীবাধি সাধন করে পুনরায় অপাপবিশ্ব হতে পেরেছিলেন, আমার তরে সে-দুঃস্বার বন্ধ । আমার মোক্ষমতম গুরুপাপ—আমি ভ্রমণকাহিনী (তথা অন্যান্য সর্ববিধ রচনা) লিখেছি সর্বাধিক অনিচ্ছায় ।

অসাহসু পাঠক শৃঙ্খলবেন, আমরা ক্যাথলিক পাদ্রী নাকি যে বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ তুমি আপন পাপ কনফেস্ করতে আরম্ভ করলে ?

না, আপনারা অতি অবশ্যই পাদ্রী নন । কারণ শৃঙ্খ পাদ্রী কেন, সর্ব সম্প্রদায়ের আচার্যগণকেই ধর্মদর্শ অক্ষত রাখবার জন্য প্রায়ই কঠোর কঠিন হতে হয় । পক্ষান্তরে, যে-সব পাঠক এতদিন ধরে আমার রচনা বরদাস্ত করে এসেছেন তাঁরা অকরুণ হবেন কি প্রকারে ? আর আমি মোক্ষা পদ্রুত পাবই বা কোথায় ? এবং অতিশয় গ্লাঘাভরে উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করছি আমার পাঠকই আমার মোক্ষা, আমার পদ্রুৎ । একমাত্র তার কাছেই আমার সর্ব অক্ষমতার ভার নামানো যায় ।

পূর্বেই নিবেদন করেছি, ১৯২৭-এ আমি গৃহহারা হই। প্রথম দু'বৎসরের কাহিনী আমি সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় কীর্তন করি নি। সে-ইচ্ছাটার পিছনে যে ছিল সে বহুকাল হল জিম্বাবাসিনী। সে করুণ কাহিনী থাক্।

তার পরের দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর বৎসরের প্রতিবেদন আমারই মত ছিন্নছাড়া দেশকালপাঠ মেনে নিয়ে সেটা মিষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত হয় নি কারণ, চিরাচরিত আপ্ত বাক্য আছে “ধাহা অগপ তাহাই মিষ্ট”—কাজেই সংক্ষিপ্ত না হয়ে সে হয়েছে ক্ষিপ্ত।

সে সম্বন্ধে অগপবিস্তর সবিস্তর আলোচনা করেছি—এ-পুস্তকের ত্রোতাপর্বে যারা আমার নতিস্বীকার, অধিসিদ্ধ কনফেশন সম্বন্ধে উদাসীন তাঁরা সে যুগটি অবহেলাভরে বর্জন করলে ধূলিপরিমাণও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। আর যারা ক্ষিপ্তের তাণ্ডবে কোনো সঙ্গতি আছে কিনা (মেথড্ ইন্ ম্যাড্‌নেস্) সেটা নিজের মুখে ঝাল খেয়ে রগড় দেখতে চান, কিংবা যারা আমার অসংলগ্ন খণ্ড-প্রতিবেদন সমষ্টিতে শ্রেণীবদ্ধ করার বধ্যাগমনসূত্রে নিষ্ফল প্রয়াস লক্ষ্য করে তথাকথিত রুঢ় কণ্ঠে, ন্যায়সঙ্গত কটুবাক্য শুনিয়ে পত্রাঘাত করেছেন, অপরন্তু যারা বালিনী দ্বিরদরদস্ত্রোপরি সিংহাসন থেকে কিংবা যারা নেটিভ বিদ্যালয়ের গো-অন্বেষণ কর্মে লিপ্তাবস্থায় গলদগর্ম কলেবরে অশেষ ক্লেশস্বীকার করে আমা হেন দীনহীনজনোপরি মহামূল্যবান উপদেশ অকৃপণভাবে বর্ষণ করেছেন, তাঁরা এ পুস্তকের দ্বিতীয় উল্লাসে আমার অকৃপণতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভুরিভুরি স্বর্গোজ্জ্বল নিদর্শন পাবেন।

ভগবৎকৃপায় অব্যবহিত প্রত্যাদেশ লাভ করেছি, আমার ডবলীলা সংহরণ প্রত্যাসন্ন। দৈদৃশ্য মুখবন্ধের প্রতি রুদ্রের দক্ষিণ মুখ পুনর্বীর প্রসন্ন হবেন সে-আশা দুরাশা।

কিমধিকর্মিত
সৈয়দ মুজতবা আলী

দুপ্লেন যখন ইংলিশ চ্যানেলের উপর দ্বিগ্নে যাচ্ছে তখন ছোকরা মৃদুজ্যে শূন্যালে, 'চাচা, লন্ডনে গিয়ে উঠবো কোথায়, চিন্তা করেছেন কি?' ছোকরা এই প্রথম বিলেত যাচ্ছে, প্রশ্নটা অতিশয় স্বাভাবিক। আমি বললুম, 'বাবাজী, কিছুটা ভাবতে হবে না। রসুই বামদুন না হলেও তুমি তো ব্রাহ্মণসন্তান বটে। হাটে গিয়ে চাল-ডাল কিনে নিয়ে আসবে; আমি ততক্ষণে বটগাছতলায় ই'টের উনুন জ্বালিয়ে রাখবো। শুনছি লন্ডনের উপর বিস্তর বোমা পড়ছিল, ই'ট পেতে অসুবিধে হবে না।'

এয়ার পোর্ট থেকে বেরিয়ে বিস্তর খোঁজাখুঁজির পরও যখন বটগাছ পাওয়া গেল না, তখন বাধ্য হয়ে হোটেলে উঠতে হল।

রসিকতা নয়, একটুখানি সবদুর করুন।

সেদিন সম্মুখাবেলায়ই মৃদুজ্যের বয়েসীই তার এক ইংরেজ বন্ধু এসে উপস্থিত। ছোকরা খাঁটি ইংরেজ, লড়াইয়ের সময় ভারতবর্ষে এসেছিল, এ-দেশটাকে এতই ভালোবেসে ফেললে যে শেষ পর্যন্ত দ্বিশী মেম নিয়ে বিলেত গেল। বললে, 'এদেশের লোক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এমনি অগা যে, সেদিন এক গবেষ্ট বিবিসিতে বস্তুত্ব দিতে গিয়ে বললে, "ভারতবর্ষের এক-তৃতীয়াংশ লোক বাইরে শোয়।" আমি ভয়ঙ্কর চটে গিয়ে বিবিসিতে কড়া চিঠি লিখেছি।'

আমি বললুম, 'এতে চটবার কি আছে? কথাটা তো সত্য। গরমের দেশের লোক ১১৪ ডিগ্রীতে সর্বাপেক্ষে কম্বল জড়িয়ে ঘরের ভেতর শোবে নাকি? তোমাদের দেশের লোক মাইনাস দশ ডিগ্রীতে যদি বাইরে শোয় তবে মরে যাবে। আমাদের দেশের লোক গরমে ঘরের ভিতর ধমবন্ধ হয়ে মারা যাবে না বটে, কিন্তু সারারাত এপাশ ওপাশ করে কাটাতে হবে। হীট হার্ট'স, কোল্ড কিল্‌স্।'

এই কোল্ড কিল্‌স্ নিয়ে প্রাচ্য-প্রতীচ্য সভ্যতার পার্থক্য। বটগাছতলা আর হোটেলের পার্থক্য।

গরমের দেশে জীবনধারণের জন্য অত্যধিক সাজ-সরঞ্জাম আসবাবপত্রের প্রয়োজন হয় না; পক্ষান্তরে শীতের দেশে পাকা-পোক্ত ঘর-বাড়ি চাই, মেঝেতে শোওয়া যায় না; লেপ-কম্বল গাধি-বালিশ চাই। শীতের ছ'মাস শাক-সমাজী ফলমূল কিছুই ফলে না, ছ'মাসের তরে মাংসের শট্টকি জমিয়ে রাখতে হয়; আমরা দিন আনি দিন খাই, ছ'মাসের খাবার-দাবার জমিয়ে রাখার কথা শুনলে নাভিভ্রাস ওঠে। ছ'মাসের খাবার কিনতে গেলে বেশ কিছু রেস্টোর প্রয়োজন।

তাই বোধ হয় ইয়োরোপীয়রা একদিন ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ডাকাতি করতে প্রাচ্য দেশে এসেছিল। আজ ডেনমার্ক, জার্মানি, নরওয়ে, সুইডেনের খাবার-দাবার ব্যবসা-বাণিজ্য করেই চলে। ডাকাতিতে জিতেছিল ইংরেজ। আজ সে-সব লুণ্ঠন-ভূমি কস্মা থেকে খসে পড়ে যাচ্ছে। চার্চিল ব্রিটিশ রাজত্বের লিকুইডেটর হতে চান নি; আজকের শাসনকর্তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় হতে হচ্ছে। ওদিকে খাওয়া-দাওয়া থাকা-পরার মান অনেকখানি উঠু হয়ে গিয়েছে—

সেটাকে বজায় রাখা যায় কি প্রকারে ? আজ না হয় হইল, ভবিষ্যতে হবে কি ? সেকুরিটি কোথায় ?

এই সেকুরিটি নিয়েই যত শিরঃপীড়া ।

সমসাময়িক ইংরিজী সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় অল্প । তবে সমঝদারদের মধ্যে শুনছি, সেখানেও নাকি গৃহীজ্ঞানীরা প্রাণপণ সেকুরিটি খুঁজছেন । ধর্ম বিশ্বাস নেই, আদর্শবাদ গেছে, চরম মূল্য পরম সম্পদ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আদৌ আছে কি না তাই নিয়ে গভীর সম্বেদ—সেই প্রাচীন ‘ওয়েস্টল্যান্ড’ নাকি আরো বিস্তীর্ণ হয়ে সর্বব্যাপী সর্বগ্রাসী হয়ে উঠছে ।

তবে কি কাল মার্কসের নীতিই ঠিক ? দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অভাব-অনটন উপস্থিত হলে সাহিত্যে সেটা প্রতিবিম্বিত হবেই হবে ?

তা সে যা হয় হোক, কিন্তু এই সেকুরিটির ব্যাপার আরেক সূত্রে উঠলো ।

ঐক্যসাধারণকে যে ইংরেজ মহিলা স্ত্রী-শিক্ষার প্রচার প্রসারে প্রচুর সাহায্য করেন, তাঁরই এক নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে আমাদের আবার দেখা হল লন্ডনে । নাম কার্পেটার । ইনি জীবনের অধিকাংশ ভাগ কাটিয়েছেন ভারতবর্ষে । আমি তাঁকে যখন একবার কলকাতাতে শ্রুধাই তিনি কি মিস কার্পেটারের কোনো আত্মীয় হন, তখন উত্তরে তিনি বলেন, ‘আমার ঠাকুরদার বোন ।’ তারপর হেসে বলেছিলেন, ‘আমি কিন্তু তাঁর মত টাকা ছড়াতে আসি নি ; তারই কিছুটা কুড়িয়ে নিতে এসেছি ।’

তিনি নিমন্ত্রণ করে স্প্যানিশ রেস্টোরাঁয় মুর পশ্চিতিতে তৈরী বিরয়ানী (সে কথা পরে হবে) খাওয়াচ্ছিলেন । কথায় কথায় তাঁকে শ্রুধালুম, ‘এই যে সাধারণ কালোয় বস্ত্র লেগেছে এদেশে, তার মূল কারণ কি ?’

তিনি এক কথায় বললেন, ‘গার্লস ।’

আমি অন্যত্র শুনছিলাম চীপ লেবার অর্থীণ কালারা কম মজদুরীতে কাজ করতে তৈরী । ম্যানেজাররা তাই তাদের চায় । ইংরেজ মজদুর তাই চটে গেছে ।

তাহলে ‘গার্লস’ এল কোথেকে ?

আসলে দুটোই এক জিনিস ।

নিগ্রোদের কথা বলতে পারবো না—সিলেট-নোয়াখালির খালাসীদের কথা জানি । তাদের অনেকেই লন্ডনে এসে অন্য খালাসীদের জন্য রাইস-কারির দোকান খোলে । বাঙালী ছাত্ররাও সেখানে মাঝে মাঝে গোয়ালন্দ-চাঁদপুরী জাহাজের রাইস-কারি খাবার জন্য যায় ।

গিয়ে দেখবেন মিশকালো খালাসীর ইংরেজ বউ । দু’জনাই খেদেরকে খাবার দিচ্ছে । মাঝে মাঝে সেই সিলেটি আছমৎ উল্লা বউকে ডেকে খাস সিলেটিতে বলছে, ‘ওগো ভূরা (ডোরা), সাবরে আরক কট্টা মৃগীর সালন দে (সাবরকে আরেক কটোরা-বাটি মৃগীর খোল দে) !’

সেমসাছেব সিলেটি শিখে নিয়েছে ! কারণ আছমৎ উল্লা ইংরিজটা রপ্ত করতে পারেন নি ।

এখন প্রশ্ন, এই মেমটি আছমৎ উল্লাকে বিয়ে করলো কেন ?
সেকুরিটি ।

আছমৎ উল্লা মদ খায় না । তাই মাতাল হয়ে বউকে মারপিট করে না—
এবং তার চেয়েও বড় কথা মদ খেয়ে টাকা গুড়ায় না । রেসে যায় না, তিন
পাতি তাস খেলেও সর্বস্বান্ত হয় না । সম্প্রদায় পর বাড়িতেই থাকে । এই হল
এক নম্বর ।

দুই নম্বর—বিয়ের পর (আগেও ডোরা ছাড়া) অন্য রমণীর দিকে প্রেমের
বাণ হানে না ।

এই দুটি সেকুরিটি রমণী মাত্রই খোঁজে । অন্যান্য ছোটোখাটো কারণের
উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই—বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা
করে, কান্নাকাটি করলে বউকে ধমকে দিয়ে ড্রইয়ংরুমে লেপকম্বল নিয়ে শূতে
চলে যায় না । আছমৎ উল্লার দেশের কঁড়েঘরে তারা বশজন শূতো,—তার
দাদার কাচ্চা-বাচ্চা সে সামলেছে, পরিবার বেসামাল বড় ছিল বলেই তো
দুই মৃত্যু ভাতের জন্য সে এদেশে এসেছে ।

যদি বলেন, কালচারল লেভেল কি এক ? নিশ্চয়ই । ডোরা খানদানী
ডিউকের মেয়ে নয়, সে এগাজ্জটেনশিয়ালিজম নিয়ে মাথা ঘামায় না, আর
আমাদের আছমৎ উল্লাও জমিদারবাড়ির ছেলে নয়, সে ‘যোগাযোগ’ পড়ে নি ।

যদি বলেন, ‘সাদা মেয়ে কি কালোকে পছন্দ করে ?’ উত্তরে বলি, ‘আমাদের
ভিতরে যে যত কালো সে-ই তো তত ফর্সা বউ খোঁজে ।’ (এই সাদার তরে
পাগলামি এদেশে খুব বেশী দিন হল আসে নি । দুশ বছর আগেকার লেখা
বইয়ে ইয়োরোপীয় পণ্টকরা লিখেছেন, ‘ভারতীয়রা আমাদের ফর্সা রঙ দেখে
বেদনা ভরা কণ্ঠে শূধোয়, “হায়, ভগবান এদের সবাইকে ধবলকুণ্ঠ দিয়েছেন
কেন ?” কথাটা ঠিক । এদেশের দুই মহাপুরুষ কৃষ্ণ এবং রামের একজন
কালো, অন্যজন নবজলধরশ্যাম ।)

সেই সেকুরিটির অভাবই মদ্যপানের অন্যতম কারণ ।

ইংলণ্ডে যে মদ্যপান বেড়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ।

কোনো দেশের জ্ঞানীগুনীর কি ভাবেন, কি চিন্তা করেন, সে-কথা জানবার
জন্য সে-দেশে যাবার কোনো প্রয়োজন আমি বড় একটা দেখি নে ! আপন
দেশে বসে বসে সে দেশের উত্তম অধম পুস্তক, মাসিক, খবরের কাগজ পড়লেই
সে সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা জন্মে ! কিন্তু সে দেশের টোপাওলা বিড়িওলা
জ্বাইভার কারখানার মজদুর কি ভাবে, কি চিন্তা করে সেটা জানতে হলে সে দেশে
না গিয়ে উপায় নেই । কারণ তারা বই লেখে না, খবরের কাগজে সম্পাদককে
চিঠি লিখে নালিশ ফরিয়াদ জানায় না । তাদের কান্নাকাটি গালমন্দ যা-কিছু
করার সব কিছুই তারা করে এদেশে চায়ের দোকানে, ওদেশে ‘পাবে’ অর্থাৎ
শরাবখানায় । আর শরাবখানায় মস্ত বড় একটা সুবিধা—আমাদের চায়ের
দোকানেও তাই—করো সঙ্গে দুই-দুই রসলাপ করতে চাইলে সে খেঁকিয়ে ওঠে
না, গুণীজ্ঞানীদের সঙ্গে দেখা করতে হলে বিস্তর বয়নাষ্ঠা, আত্মাশ্রয়নাও
সৈয়দ মদুদেবা আলী রচনাবলী (৭ম)—১৮

তাতে কিঞ্চিৎ আছে কিংবা এ-চিন্তাও মনে উদয় হওয়া অসম্ভব নয়, ‘আমি কে যে তার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে যাব?’

কেন্সিংটন গির্জার পাশে ছোট্ট একটি শরাবখানাতে এক কোণে বসেছি। প্রচণ্ড ভিড়। এমন সময় একটি বড়ী বার থেকে এক গেলাস জিন কিনে এনে আমার পাশে বসতে গেলে তার হ্যান্ডব্যাগটি মাটিতে পড়ে গেল। সেটি কুড়িয়ে টেবিলের উপর রাখলুম। বড়ী গলে গিয়ে ‘থ্যাংকস্, থ্যাংকস্’ বলে চেয়ারে বসে থানিকটে আমাকে শুনিয়ে থানিকটে আপন মনে বিড়বিড় করতে লাগলেন, ‘আজকালকার ছোঁড়াদের ভদ্রতা বলে কোন জিনিস নেই, তবু—’ বাকিটা তিনি আর শেষ করলেন না। আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না তিনি কি বলতে চান। ছোঁড়াদের ভদ্রতা নেই কিন্তু আমার আছে, এ কি করে হয়, কারণ আমি ছোঁড়া নই। তবে বোধ হয় বলতে চান ছোঁড়াদের নেই, কিন্তু এ বড়োর (অর্থাৎ আমার) আছে। সেটা অনুমান করেও উল্লাস বোধ করি কি প্রকারে? আমি বড়ো ঘটি কিন্তু থুথুড়ে বড়ীর কাছ থেকে সে তত্ত্ব শুনেন তো আনন্দিত হওয়ার কথা নয়।

তা সে থাক্ গে। আমি তখন অবাক হয়ে ‘বারে’র দিকে তাকিয়ে বার বার তাক্ত্ব মানছি। হরেক রকম চিড়িয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝপাঝপ বিয়ার, ‘এল’, জিন খাচ্ছে এ কিছু নয়া তসবীর নয়, কিন্তু আশ্চর্য, চাঁবশ-ছাঁবশ বছরের মেয়েরা পর্যন্ত ‘বারে’ কটাশ করে শিলিঙ রেখে অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে ঢকাঢক বিয়ার খেয়ে হুট করে বেরিয়ে যায়। যৌবনে যখন লন্ডন গিয়েছি, তখন দুপুরবেলা ‘বারে’ একা একা খাওয়া মাথায় থাকুন রাতে ডিনারের সময়ও কোনো ভদ্র মেয়ে তার বশ্ধ বা আত্মীয়ের সঙ্গেও এসব জায়গায় আসতে ইতস্তত করতো। নিতান্ত যেতে হলে যেত রেস্টোরাঁ অর্থাৎ খাবারের জায়গায় যেখানে মদ্যপান করা হয় খাবার অত্যাৱশ্যক অঙ্গরূপে—আমাদের গ্রামাঞ্চলে যে রকম শূধ জল খেতে দেয় না, সঙ্গে দুটি বাতাসা দেয়।

বড়ো-বড়ীদের দৃষ্টিশক্তি কমে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে এ তত্ত্বটাও সত্য যে, যা দেখে তার থেকে অর্থ বের করতে পারে সেই অনুপাতে অনেক বেশী। তাই সেই বড়ী এক ঢোক জিন খেয়ে আমাকে শূধালে—(এ সব জায়গায় ইংরেজ লৌকিকতার বজ্রবান্দন কিঞ্চিৎ ঢিলে হয়ে যায়) ‘বাবাজী কি এদেশে এই প্রথম এলে?’

বুঝলুম, বাঙালের হাইকোর্ট-দর্শন দর্শন করে ঘটি যে রকম পত্রপাঠ ঠাহর করে নেয়, লোকটা বাঙাল; আর আমি তো আসলে বাঙাল; কলকাতায় যে-রকম প্রথম হাইকোর্ট দেখেছিলুম এখানেও ঠিক তেমনি ক্যাবলাকাস্তের মত সব কিছু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছি। যতই পলস্তুরা লাগাই না কেন সে বাঙালত্ব যাবে কোথায়। প্রতিজ্ঞা করলুম সাবধান হতে হবে। শহুরেদের মত সব কিছু দেখব আড়নয়নে শিরামদার মত ‘বাকি চোখে’।

অপরোধীর সুরে বললুম, ‘তা ম্যাডাম, প্রায় তাই। ত্রিশ বছর পূর্বে এসেছিলুম, আর এই। লন্ডন ইতিমধ্যে পূর্নজন্ম না হোক অর্ধজন্ম তো লাভ

করেছে !’

বুড়ী মহা উত্তেজিত হয়ে উঠলো । বলে কি ? ত্রিশ বছর পরে ! তাহলে তো এর কাছ থেকে অনেক-কিছু শোনা যাবে । অবশ্য উত্তেজনার কারণ জিন্‌ও হতে পারে ।

‘সবে দাড়ি-গোঁপ-কামাতে-শিখেছে এক স্কচ ছোকরা বাড়ি থেকে পালিয়ে মার্কিন মুল্লুকে উধাও হয় ।

বহু পয়সা কামিয়ে ত্রিশ বছর পরে সে ফিরছে দেশে । বাড়ি ফেরার সময় এত দিন বাদে এই সে প্রথম চিঠি লিখেছে । স্টেশনে বাপ-চাচা-দাদা সবাই উপস্থিত, সবাই খুশী, প্রচুর পয়সা কামিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসছে ।

চুমাচুমি আলিঙ্গনের পর ছোকরা শূধোলে, “তোমরা সবাই এরকম লম্বা লম্বা দাড়ি রেখেছ কেন ? এই বুঝি ফ্যাশান !”

জ্যাঠা বিড়বিড় করে বললেন, “ফ্যাশান না কহু ! তুই যে পালাবার সময় রেডখানা সঙ্গে নিয়ে গেলি !”

বুড়ী আরেক টোক জিন্‌ থেয়ে হেসে বললেন, “আমার পিতৃভূমি স্কট-ল্যান্ডে ; কাজেই আমার অজানা নয় যে সেখানে কুল্লের পরিবার এক রেডে দাড়ি কামায় । কিন্তু ত্রিশ বছর—?

আমি বললুম, “ঠিক বলেছেন, ম্যাডাম । আমি ত্রিশ বছর পূর্বে লন্ডন ছাড়ার সময় আমার রেডখানা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম কিন্তু তাই বলে লন্ডনের লোক দাড়ি কামানো বন্ধ করে দেয় নি । ইশ্তেক গোফ পর্যন্ত কামিয়ে ফেলেছে !’

‘মানে ?’

‘মানে মেয়েদের রাজস্ব । আমার ভাইপো এই প্রথম লন্ডনে এসেছে । তার কাছে সব কিছুই নতুন ঠেকছে । সে আজ সকালে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর বলল, “ফোর টু ওয়ান” অর্থাৎ রাস্তা দিয়ে যদি চারটে মেয়ে চলে যায়, তবে একটা ছেলে । আমি অবশ্য বললুম, “এখন আপিস, আদালত, দোকানপাট খোলা, সেখানে পুরুষেরা কাজ করছে । অন্য সময় গুললে হয়তো অন্য রেশিয়ো বেরোবে ।” সে বলল, “ওসব জায়গায়ও তো মেয়েরাই বেশী । নিতান্ত বাস আর ট্যাক্সি মেয়েরা চালাচ্ছে না ।” (পরে অবশ্য ফ্রান্স না জর্মনি কোথায় যেন তাও দেখেছি) ।’

তারপর বললুম, ‘এক একটা লড়াই লাগে আর মেয়েদের পায়ের শিকলি খোলার সঙ্গে সঙ্গে মনের শিকলিও খুলে যায় ।’

‘মানে ?’

আমি বললুম, বেশী দূরে যাবার কি প্রয়োজন ? ঐ ‘বারে’র দিকে তাকিয়ে দেখেন না । ত্রিশ বছর আগে উড়ন্ত বয়সের মেয়েদের দুপদ্রবেলা ‘বারে’ হাল গিলতে দেখেছেন ?

বুড়ী একটু লাজ্জিত নয়নে আমার দিকে তাকালেন ।

আমি তাতে পেলুম আরো লজ্জা । আবার বাঙাল-পনা করে ফেলছি ।

তাড়াতাড়ি বললুম, ‘না, না, এতে আমার কোন আপত্তি নেই।’ তারপর অস্বাভাবিক কুয়াশা কাটাবার জন্য হাসির রোদ ফুটিয়ে বললুম, ‘সবাই কি গ্রীষ্ম বছরের দাড়ি নিয়ে বসে থাকবে? সময়ের সঙ্গে কখন কখন এগিয়ে যেতে হয়।’

বুড়ি যেন আমার কথায় কান না দিয়ে বললেন, ‘এর জন্য আমরাই দায়ী। তবে শুনুন।’

‘এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে লন্ডনের উপর কি রকম বোমা পড়েছে তার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। কয়েক বছর আগে এলেও দেখতে পেতেন লন্ডনের সর্বাত্মক তার জখমের দাগ। এখনো কোন কোন জায়গায় আছে—নিশ্চয়ই দেখেছেন। কিন্তু ওসব বাইরের জিনিস। আজ যদি ভূমিকম্পে লন্ডনের আধখানা তলিয়ে যায় তবে তাই নিয়ে বাকী জীবন মাথা খাবড়াবো নাকি?’

‘কিন্তু মাটির তলার ঘর “সেলারে” বসে প্রতি বোমা পড়ার সময় ভয়ে-আতঙ্কে যে রকম কেঁপেছি সেটা হাড়গুলোকে নরম করে দিয়ে গিয়েছে,—সে আর সারবার নয়। বসিং-এর পর রাস্তায় বেরিয়ে মড়া দেখেছি, জখমীদের কাতর আত্নাদ শুনছি—বুকের উপর তার দাগ সেও কখনো মূছে যাবে না। আমার ফ্ল্যাটটা বহুদিন টিকে ছিল—অনেককে তাতে আশ্রয় দেবার সুযোগ পেয়েছি, দু’চার দিন থেকে তারা অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে, কেউ বা বেশী দিন থেকেছে। একদিন এক মর-মর বুড়োকে আশ্রয় দিলুম। তাকে নিয়ে কি করবো সেই কথা ভাবতে ভাবতে যখন বাড়ি ফিরছি তখন জর্মান ‘বমারে’র বাঁশী বাজলো। ঘণ্টাখানেক মাটির নিচের আশ্রয়ে কাটিয়ে যখন বাড়ি ফিরলুম তখন দেখি স্বয়ং ভগবান আমার সমস্যাটির শেষ সমাধান করে দিয়েছেন। বাড়িটি নেই। সঙ্গে সঙ্গে বুড়োও গেছে।’ একটুখানি থেমে বললেন, ‘পরে অবশ্য লাশটা পাওয়া গিয়েছিল।’

বুড়ীর জিন ততক্ষণে ফুরিয়ে গিয়েছে। কাপড়-চোপড় দেখে মনে হল অবস্থাও খুব ভালো নয়। স্বকে হাঁটুর কাছটার আনাড়ি কিম্বা বুড়ো হাতের একটুখানি দ্বিপদও দেখতে পেলুম। এবার কিন্তু বাঁকা চোখে।

‘এখনি আসছি’ বলে বারে গিয়ে একটা জিন নিয়ে এলুম।

মনে মনে বললুম, সদাশয় ভারত সরকার যে কটি পাউন্ড ভারতীয় মুদ্রা মারফৎ কিনতে দিয়েছেন তা দিয়ে এ রকম করলে আর কদিন চলবে? কিন্তু তাই বলে তো আর ছোটলোকমণী করা যায় না। আমার ক্যাশিয়ার মুখুজ্যেও পই পই করে বলেছে, ‘কিন্টেমি করা চলবে না; পাউন্ড যদি ফুরায় যায় তবে তন্দেই দেশে ফিরে যাবো—ফিরতি টিকিট তো কাটাই আছে।’

বুড়ী বললেন, ‘না, না। আপনি আবার কেন—? আমি এমনতেই অনেকগুলো খাই।’

আমি হেসে বললুম, ‘গ্রীষ্ম বছর পরে এসেছি; একটুখানি পরব করবো না। যদিও শ্বচ ছোঁড়ার মত মিলিয়ন নিয়ে আসি নি।’

বুড়ী বললেন, ‘তখনই আমার নাভ’স যায়। অনেকেই যায়।’ তারপর ফিসফিস করে বললেন, ‘চারদিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখুন না, আমার-

যেসেই ক'গুডা বড়ী মদ গিলছে !

‘খাবার জোটে না, অহরহ বোমা পড়ছে, কানের পর্দা শব্দের হাতুড়ী পেটা খেয়ে খেয়ে যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে—লক্ষ্য করেন নি, অনেকেরই কান খারাপ হয়ে গিয়েছে, সবাই একটুখানি চেঁচিয়ে কথা কয় (আমি অবশ্য করি নি—তবে কথাটা সম্পূর্ণ ভুল নাও হতে পারে)—দিনরাত কেটে যাচ্ছে, চোখের পাতায় ঘুম নেই, এমন সময় পাশের বাড়ি উড়ে যাওয়ার পর তাদের “সেলার” থেকে বেরুলো এক গুদোম মদ ।

‘আগের থেকেই নাভ’স ঠাণ্ডা করার জন্য ধরেছিলুম সিগারেট, এখন পেলুম ফ্রী মদ । মদ খেলে আরেকটা সুবিধে । খিদেটা ভুলে থাকা যায়, আর নেশাটা ভালো করে চড়লে দিবা ঘুমনোও যায়—বোমা ফাটার শব্দ সবেও ।

‘খাবার নষ্ট হয়ে যায় সহজেই, কিন্তু মদ একবার বোতলে পুরলেই হল । তাই খাবারের চেয়ে মদ জুটতো সহজে—অন্তত আমার বেলা তাই হয়েছে । সেই যে অভ্যাসটা হয়ে গেল সেটি আর গেল না । এই দেখুন হাত কাঁপছে । গুডখানেক খাওয়ার পর হাত দড়ো হবে । আর নাই বা হলো দড়ো । কদিনই বা বাঁচার আর বাকি আছে !

‘কিন্তু যে কথা বলিছিলুম । আমাদের মত বড়ীদের দেখে দেখে ছাড়ীরাও মদ খেতে শিখেছে । দোষটা তো আমাদেরই ।’

বড়ী থামলেন । খোলা দরজা দিয়ে চোখে পড়ল বৃষ্টি নেমেছে । দেশের মত গামলা-ঢালা বর্ষণ নয়—সে-বস্তু এদেশে কখনো দেখি নি । ঝিরঝিরে ফিন-ফিনে । তারই ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আরো যেন ঠাণ্ডা হয়ে ‘পাবে’ ঢুকে আমার হাড়ের ভিতর সেঁঁধিয়ে গিয়ে কাঁপন ধরিয়ে দিল । ওদের অভ্যাস আছে, বড়ী পর্যন্ত বিচলিত হল না, কেউ দরজা বন্ধ করে দেবার কথা চিন্তাও করলে না ।

পাবেই বলছি বড়ীরা দেখে কম, বোঝে বেশী । বললেন, ‘বাবাজী’ এদেশে এলেন অক্টোবর মাসে, যেটা কিনা ইংল্যান্ডের ওয়েস্টেস্ট মন্থিং, বৃষ্টি হয় সব চেয়ে বেশী । অবশ্য এ বছর আবহাওয়ার কোনো জমা-খরচ পাওয়া গেল না—তেষাটি বছরের ভিতর এ-রকম ধারা কখনো হতে দেখি নি ! যখন বৃষ্টি হওয়ার কথা, তখন ঝাঁ ঝাঁ রোশদর, আর যখন রোশদর হওয়ার কথা, ফসল কাটার সময়, তখন হল বৃষ্টি । এ-রকম হলে এদেশ থেকে চাষবাসের যেটুকু আছে তাও উঠে যাবে ।’

আমি বললুম, ‘এই অনিশ্চয়তার জন্যই গত একশ’ বছর ধরে এদেশে গমের চাষ কমে গিয়েছে—কোথায় যেন পড়েছি ।’

বড়ী বললেন, ‘এবারের সঙ্গে কিন্তু আদপেই তার তুলনা হয় না । সবাই বলে এটম বম নিয়ে মাতামাতি করার ফলে । হবেও বা । আপনাদের দেশেও তো শুনোঁছি একেবারে তুলকালাম কাণ্ড হয়েছিল—বিস্তর গমী, অল্প বৃষ্টি ।’

একটু আরাম বোধ করলুম । তাহলে বড়ী এখনো খবরের কাগজটা অন্তত পড়ে । জীবনে আঁকড়ে ধরার মত অন্তত কিছু একটা আছে । বললুম,

‘সেকথা আর তুলবেন না, ম্যাডাম। দিনের পর দিন কাড়া দুটি মাস ধরে ১১৪ ডিগ্রীর ১১৪ ন্যাজাওলা ক্যাট অ নাইন টেলসের চাবুক খেয়ে পিঠে ঘা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখন ঠান্ডায় সে-কথা ভাবতে চিন্তে পলক লাগে, দেহ কদম ফুলের মত—’

‘সে আবার কি ফুল?’

খাইছে! এ যেন লন্ডন শহরে মদুখুজ্যের বটগাছ সম্প্রদান করার মতো। বললুম, ‘ম্যাডাম, সে তো বোঝানো অসম্ভব। এদেশের কোনো ফুল তার কাছ ঘেঁষেও যায় না। বোঝাতে গেলে সেই অশ্বের বক খাওয়ার মতো হবে। অশ্বকে শূন্যে “দুধ খাবে?” “দুধ কি রকম?” “সাদা।” “সাদা কি রকম?” “বকের মতো।” “বক কি রকম?” লোকটা তার কনুই থেকে বক-দেখানোর বাঁকানো হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত অশ্বের হাতে বুলিয়ে দিল। অশ্ব ভয় পেয়ে বললে, “বাপ্‌স্! ও আমি খেতে পারবো না—আমার গলা দিয়ে ঢুকবে না।”

তারপর বললুম, ‘কিন্তু ম্যাডাম, আপনি যে বললেন, ছুঁড়ীরা আপনাদের অনুকরণে মদ খেতে শিখেছে এ কথাটা আমার মনকে সাড়া দিচ্ছে না। আমরা মনে হয়, যারা মদ খায় তাদের অধিকাংশই দুরন্ত দৌড়াপটার কাজ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই ঐ কর্ম করে। চাষাবাদের কাজ চিমেতেতাল। তারা মদ খায় কম। কারখানার কাজ জলদ তেতাল; তারা খায় বেশী। আগে শূন্য পুরুষেরা যে-সব ধূন্দুমােরের কাজ করতো এখন মেয়েরাও সে সব কাজ করছে বলে তাদেরও একটু-আধটু পান করতে হচ্ছে। কিন্তু এটাও বলে রাখছি এ রেওয়াজ বেশীদিন থাকবে না।’

‘কেন?’

আমি বিজ্ঞের ন্যায় বললুম, ‘পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও পড়িনি, আমি নিজে কোথাও দেখিনি মদ নিয়ে মেয়েদের বাড়াবাড়ি করতে—ও বস্তু যেখানে জন্মের মত সস্তা সেখানেও। তার কারণ মেয়েদের বাচ্চা প্রসব করতে হয়। প্রকৃতি চায় না মদের বাড়াবাড়ি করে মেয়েরা স্বাস্থ্য নষ্ট করুক। এবং শেষ কথা পুরুষের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের আবার ঘরকন্নার দিকে ফিরে যেতে হবে।’

বুড়ী বললেন, ‘কি জানি! প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তাই হয়েছিল বটে, কিন্তু এবার কি তারা যে স্বাধীনতা পেয়েছে সেটা আর ছেড়ে দেবে? সেবারে শূন্য তারা পুরুষের কাজ করার অধিকার পেয়েছিল, এবারে তার টাকা ওড়বার অধিকারও তারা পেয়েছে যে। এই যে তারা “পাবে” আসে, সেটা কেন? পুরুষের মত আড্ডা জমাতে তারাও শিখে গিয়েছে।’

আমি শূন্যলুম, ‘বাড়িতে মদ খাওয়া অনেক সস্তা!’

বুড়ী আনমনে বললেন, ‘অনেক। কিন্তু বাড়িতে আমার আর কে আছে? কর্তা তো আগেই গেছেন। ছেলেরাও ফ্রান্সের আন্ডার গ্রাউন্ডে কাজ করতে গিয়ে নিখোঁজ হল।’

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—গলায় নেশার চিহ্নমাত্র নেই—
“কিন্তু জানেন, আমি তার আশা এখনো ছাড়তে পারি নি। হঠাৎ পেছন থেকে
ডাক শুনতে পাবো—“মা”।’

শেষে ঘুম ভাঙতেই শুনি, পাশের বাড়ির লক্ষ্মীছাড়া রেডিয়োটা ‘ধর্ম-
সঙ্গীত’ গাইছে।

মনে কতো শেষের সে দিন ভয়ংকর

অন্য বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।

কোথায় রাস্কামুহুর্তে প্রসন্নমনে জানলা দিয়ে সবুজ গাছটার দিকে তাকিয়ে
তাকিয়ে সবুজ প্রাণশক্তি আহরণ করব, তা না, তখন স্মরণ করিয়ে দিলে শেষের
দিনের কথা। ঘুম তো এক রকমের মৃত্যু, সেই মৃত্যুর থেকে উঠে শুনতে
হয় ঐতিহাসিকাময় আরেক মৃত্যুর কথা—তাও বিটকিল ‘গানে গানে’!

এখানে সকালবেলা খাটের পাশে রেডিয়োটা চালিয়ে দিই আবহাওয়ার
ভবিষ্যৎবাণী শোনার জন্য। এ-দেশে সেটা জানার বড়ই প্রয়োজন। বৃষ্টি
হলেই গেছি—বুড়ো হাড় নিয়ে রাস্তাঘাটে ঝুঁ, নিউমোনিয়া কুড়োতে ভয় করে।
রোদের সামান্যতম আশা পেলে মনটা চাপ্তা হয়ে ওঠে।

এ-দেশের আলিপূর কতখানি নির্ভরযোগ্য! দেশে থাকতে আবহাওয়ার
বিলিতি এক ওয়ার এক বিবৃতি পড়েছিলুম। তিনি কলকাতায় এসে বেশ মদ্র-
স্বিয়ানার সুরে বললেন, ‘তোমাদের দেশে এখনও আবহাওয়া যথেষ্ট পর্ববেক্ষণ
করার মত ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে দফতর নেই বলে প্রায়ই ভবিষ্যৎবাণী করতে পার
না। আমরা কিন্তু এখন বিলেতে মোটামুটি পারি।’

এর পরীক্ষা হাতেনাতে হয়ে গেল।

একদিন ঘুম দেবীতে ভাঙায় বেতার-রিপোর্টটা শুনতে পাই নি। সিঁড়ি
দিয়ে নামাবার সময় বাড়ির বুড়ী বিশ্বের সঙ্গে দেখা—তার এক হাতে ভ্যাকুয়াম
ফ্লীনার অন্য হাতে বালতি। শূধালাম, ‘বেতারে আবহাওয়ার বাণী কিছু
শুনেছ?’

একগাল হেসে বললে, ‘এবারে যা আবহাওয়া—’ বলে সেই ‘পাবে’র
বুড়ীর মতো অনেক কথাই বললে—ইন্সেক এটম বম্ যে এ-সব গড়বড়ের প্রধান
কারণ সেটা বলতেও ভুলল না।

সর্বশেষে বললে, ‘যেন সব কিছু যথেষ্ট বরবাদ হয় নি বলে শেষমেষ এলেন
ঝড়, ‘গেল’! ওঃ, তার কী দাপট!’

আমি শূধালাম, ‘আবহাওয়া দফতর সতর্ক করে নি, ওয়ানিং দেয় নি?’

গম্ভীরভাবে বললে, ‘ইয়েস, সার, আফটারওয়াড’স, ঝড়ের পরে দিয়েছিল।’

রসবোধ আছে বৈকি।

কিন্তু মোশ্বা কথায় ফিরে যাই। আবহাওয়ার ভবিষ্যৎবাণী করার পূর্বে
বেতারে হয় ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা উপাসনা। সাতসকালে ওটাও সেই
‘অন্যলোকে কবে কথা তুমি রবে নিরুত্তর’ গোছ। কিন্তু পাছে আবহাওয়া
মিস্ করি তাই সেটা শুনতে হত।

সর্বপ্রথম যেটা কানে ঠেকে সেটা পাদরী সায়েবের ভাষা।

একদা ধর্ম প্রভাব করতো সাহিত্য, কলা, সঙ্গীত তাবৎ রসপ্রকাশ-প্রচেষ্টাকে—এখনোও করে। এ কথা ফলাও করে বোঝাবার কিছুমাত্র দরকার নেই—কারণ বহু শতাব্দী ধরে রিলিজিয়াস আর্টের সাধনা করার পর মানুষ এই সবে সেকুলার আর্ট আরম্ভ করেছে।

এখন আরম্ভ হয়েছে উল্টো টান। এখন ধর্মযাজকরা আপন-আপন ভাষা সরল, প্রাঞ্জল, ওজস্বিনী, মর্মস্পর্শী করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য থেকে বচনভঙ্গী ধার নিচ্ছেন। আজকের দিনের জীবন যে চরম মূল্যে বিশ্বাস হারিয়ে দেউলে হয়ে গিয়েছে তারই বর্ণনা দিতে গিয়ে এক পাদরী সায়েব যখন ভোরবেলা বস্তুতা দাঁড়িয়ে তখন আমার কেমন যেন আবছা-আবছা মনে পড়তে লাগল, কোথায় যেন এটা পড়েছি। তারই সম্মুখে যখন আমার মন আর স্মৃতিশক্তি লুকোচুরি খেলছে তখন, ও হরি, পাদরী সায়েবই মাইকের উপর হাঁড় ফাটালেন। বললেন, আজকের দিনের দুনিয়া দেউলে; সর্বভূবন এখন এক বিরাট ‘ওয়েস্টল্যান্ড’।

কবিতাটি আমি মাত্র একবার পড়েছি, তাও বহু বৎসর পূর্বে এবং সেও খামচে খামচে, অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে স্কিপ করে করে, কারণ ও-কবিতায় একাধিক ভাষার যে জগা-খিচুড়ি পাকিয়ে ভাষা-শেখাতে-অগা এক-ভাষা-নিষ্ঠ (মনোগ্রাট) ইংরেজকে তাক লাগাবার কিশোরসুলভ প্রচেষ্টা আছে, তা দেখে আমি বে-এস্তোরার হব কেন—আমি তো এ সব কটা ভাষা এলিয়টের মতই বিলক্ষণ মিসান্ডারস্টেড করতে পারি।^১ কাজেই কবিতাটি স্মরণ করতে যদি সময় লেগে থাকে তাহলে আশা করি, যাদের কাছে ঐ ‘কবিতা’ রামায়ণ-মহাভারতের চেয়েও প্রণয় তীরা অপরাধ নেবেন না।

ইংলন্ডের প্রার্থনার কথা ওঠাতে যদি ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে এম্বলে কিঞ্চিৎ বাক্যবিন্যাস করি, তবে বিবেচনা করি, সেটা নিতান্ত বেখাপা শোনাবেনা, এবং সে-বাসনা যে আমার কিঞ্চিৎ আছেও, সেটা অস্বীকার করব না, কিন্তু তাহলে মূল বস্তু থেকে অনেকখানি দূরে চলে যাব বলে পাঠক হয়ত ঈষৎ অসহিষ্ণু হয়ে উঠবেন। তাই শুধু এই প্রশ্নই শুধাই, ভোরবেলায় পাদরী সায়েব বেছে বেছে আমাদের এলিয়ট সায়েবকেই স্মরণ করলেন কেন?

মার্কিন মুল্লুকের লেখককে ইংরেজ সহজে কতক দেয় না কাজেই এই কতক পাওয়ার জন্য এলিয়টকে বিস্তর কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বহু জায়গায় বিস্তর কতক পাওয়ার পর ইংলন্ডের

১। “...they are simply the kind of thing that goes on in the head of a troubled man who has drunk at the best universities and is half-drugged with literature, who has studied a little Sanskrit at Harvard and done a certain amount of travelling in Europe……”—E. Wilson.

কনসারভেটিভ পার্টিতেও তো জাতে ওঠবার জন্য তিনি লিখলেন “দি লিটারেচার অব পলিটিক্স” — “টিএস্ এলিয়ট ও এম কর্তৃক লিখিত; রাইট অন-রেবল স্যার এর্টন ঈডন, কে জি; এম সি; এম্ পি কর্তৃক ভূমিকা সম্বলিত”। এরকম ব্যাপার যে ইংলন্ডে হতে পারে আমি জানতুম না। আজ যদি শ্রদ্ধেয় পরশুরাম “শ্রীরাজ-শেখর বসু রায়সাহেব কর্তৃক লিখিত এবং শ্রীযুত ভূতনাথ ভড় রায়বাহাদুর, বিধান-সভার সদস্য, কাইসার-ই-হিন্দ দ্বিতীয় শ্রেণী মেডলপ্রাপ্ত কর্তৃক ভূমিকা সম্বলিত” পুস্তক প্রকাশ করেন তবে যে-রকম বিস্মিত এবং বিরক্ত হব। সাহিত্যজগতে (এলিয়ট যে পলিটিশিয়ান নন, সে সবাই জানে) তিনি তার ও. এম উপাধিটি উল্লেখ করতে ভুলবেন না, আর ঈডন তো সালস্কার থাকবেনই। মুসলমান বলে আমি ঠিক বলতে পারবো না, তবে অনুমান করি চাঁড়াল যদি পৈতে পেয়ে যায়, (স্বগুণেই বলছি) তবে বোধ হয় সে সেটা সর্বক্ষণ মাথায় জড়িয়ে পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়! আশা করি, এর পর যখন বাঙলার সাহিত্যিকরা রাজনীতিকদের দাওয়াতের সভাপতি বানিয়ে, তাদের দিয়ে সাহিত্য অথবা সাহিত্যিকদের চরিত্রের আনাড়ি সমালোচনা করাবেন, তখন শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ অনাধৃত খাঁটি সাহিত্যিকরা অহেতুক উষ্ণ-গোস্ সা প্রদর্শন করবেন না। এঁদের গুরুঠাকুর মহামান্যবর এলিয়ট সাহেব—এঁরা তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন মাত্র।

সাহিত্যজগতে কতক পেয়েই এলিয়ট সন্তুষ্ট নন। তিনি আরও বহু কতক বহু জায়গায় পেয়েছেন।^১ কিন্তু ইংলন্ডের সর্বোচ্চ এবং সর্বশেষ কতক ধর্মচক্রে —কে না জানে সে দেশের রাজা এবং রানীর অন্যতম জাঁদরেল উপাধি “ডিফেন্ডার অব ফেথ”? স্বয়ং পোপ ইটি অষ্টম হেনরিকে দিয়েছিলেন। সেখানে কতক পাওয়া চাই-ই-চাই।

এলিয়ট তাঁর ধর্মবিশ্বাস পরিষ্কার ভাষাতেই প্রকাশ করেছেন—সেটা তাঁর কবিতার মত তেবটি রকমে বোঝা এবং বোঝানো যায় না, এই রক্কে। পাস্ কাল সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ‘ধর্মগুলোর ভিতর খ্রীষ্টধর্ম’, এবং তার ভিতরে ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্মই জগৎ এবং বিশেষ করে অধ্যাত্মজগতের সমস্যা এবং কার্যকারণ সর্বোত্তমভাবে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে (‘টু অ্যাকাউন্ট মোস্ট সেটিসফেকটরিলি ফর দি ওয়াল্ড অ্যান্ড টেম্পারালি দি

১ “Who is who”-তে আছে D. Litt of Oxford, a Litt. D. of Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Bristol, Leeds and Washington; an LL.D. of Edinburgh and St. Andrews, a D. es L. of Paris: Aix-Marseille, and Rennes, a D. Phil of Munich; an Honorary Fellow of Merton College and of Magdalene College, an offer de la Legion d’Honneur, and a foreign Member of the Accademia dei Lincei of Rome.

এ ছাড়া নোবেল প্রাইজ তো আছেই।

মরাল ওয়াৰ্ড' উইদিন')। যীশুখ্রীষ্ট যে জলকে মদ্যরূপে পরিবর্তিত করে-
ছিলেন, 'মৃতজনে প্রাণ' দিয়েছিলেন এসব অলৌকিক কাৰ্য'কলাপে তিনি বিশ্বাস
করেন।^১ তিনি অ্যাংলো ক্যাথলিক গির্জায় (বিলাতের সরকারী, রাজরানীর
প্রতিষ্ঠান) গিয়ে পূজোপাট করেন, মণ্ডপে রুটি এবং মদের মাধ্যমে খ্রীষ্টের
সঙ্গে অশরীরী ভাবে 'হরিহরাখ্যা' হন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাতে কারও কোনও আপত্তি থাকার নয়। আমাদের মডার্ন কবিরাও
হয়ত ইতু ঘেঁচুর পূজো করেন, নজরুল ইসলাম আজ যদি মোল্লার কাছ থেকে
পানি-পড়া তাবিজ-কবজ নিয়ে ব্যামো সারাতে চান তবে আমরা উল্লাস অনুভব
করব—ডাক্তার-কবরেজ তো হার মেনেছেন—কিন্তু এ-বাবদে একটা প্রশ্ন
স্বভাবতই উদয় হয়।

গোঁড়া ক্যাথলিকরা বিশ্বাস করেন, অ-খ্রীষ্টানরা অন্তত নরকের আগুনে
জ্বলবে। গোঁড়া মুসলমানরা অতখানি ঠিক করেন না—তাদের মতে কোনও
অনৈসলামিক ধর্মের মূলতত্ত্ব (ফা'ডামেন্টেলস্) যদি ইসলামের সঙ্গে মেলে তবে
সে-ধর্মের লোক স্বর্গে না গেলেও অনন্ত নরকে জ্বলবে না। এখন প্রশ্ন
এলিয়ট কি বিশ্বাস করেন, তাঁর বাঙালী হিন্দু-মুসলমান চেলারা অনন্ত নরকের
আগুনে রোস্ট মটন্ কিংবা তন্দুরী মৃগী'ভাজা হবে? যারা তাঁর সঙ্গে
পেয়েছেন তাঁরা যদি বাংলাে দেন, তবে উপকৃত হব।

কিন্তু ইহুদীদের সম্বন্ধে এলিয়ট তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন।
পাঠক স্মরণ রাখবেন, ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ 'প্রাচীন নিয়ম' (ওল্ড টেস্টামেন্ট)
খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থও বটে এবং খ্রীষ্টানদের একেশ্বরবাদ, প্রতিমাবর্জন, স্বর্গ-
নরক, শেষ বিচার, গির্জার প্রার্থনা-পদ্ধতি ইহুদীদের কাছ থেকে নেওয়া, এবং
সব চেয়ে বড় কথা স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট ইহুদী-সন্তান—মথিলিখিত সূসমাচারে
আরম্ভই যীশুর কুলাজি নিয়ে; তিনি ইহুদীদের বংশোদ্ভূত আব্রাহামের
(ইব্রাহিমের) বংশধর।

এলিয়ট আদর্শ সমাজব্যবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'যে সে আদর্শ
সমাজে 'রক্ত ও ধর্ম' এই দুয়ে মিলে মূর্ত্যুচিস্তাশীল ইহুদীদের (আদর্শ সমাজে)
বেশী সংখ্যায় থাকা অবাঞ্ছনীয়।'

(Reasons of race and religion combine to make any large
number of free-thinking Jews undesirable)

সোজা বাঙলার প্রকাশ করতে গেলে দাঁড়ায় :—যেমন মনে করুন রবীন্দ্র-
নাথ যদি বলে যেতেন, 'পাসীদের ধর্ম এবং রক্ত আলাদা (এবং এটাও লক্ষণীয়
যে, ইহুদী ও পাসী উভয় সম্প্রদায়ই বিজ্ঞানশীল) এ দুয়ে মিলে গিয়ে এমনই

২ এ বাবদে বার্নার্ড শ'র ধারণা (ব্রাক গাল) তুলনীয়। তিনি খ্রীষ্টকে
'ক্রেভার কনজিয়োরার' বা 'ঘড়েল ম্যার্জিশিয়ান' বলে উল্লেখ করেছেন। রাম-
মোহন রায় খ্রীষ্টের মহত্ব স্বীকার করেও তাঁর অলৌকিক কাৰ্য'কলাপে
(মিরাক্‌ল্) বিশ্বাস করতেন না বলে পাদরী বৃন্দগণ কতক বর্জিত হন।

এক বিপর্যয় ঘটেছে যে এদের থেকে বেশী লোক ভারতীয় সমাজে থাকুক এটা বাস্তবীয় নয় ।' !!!

অ্যান্টনি ডিউনের ভূমিকাসম্বলিত এলিয়টের যে 'লিটারেচার অব্ পলিটিক্স' বইয়ের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি তাতে এলিয়ট চারজন কনসারভেটিভ সাহিত্যিকের উল্লেখ করেন ; বলিংব্রুক, বার্ক, কোলরিজ্ এবং ডিজ্‌রেলি । ডিজ্‌রেলির কথা বলতে গিয়ে এলিয়ট বলেছেন, 'হ্যাঁ, ইনি (এখানে বোধ হয় এলিয়ট একটু থেমে গিয়ে মৃদু গলাখাঁকারি দিয়েছিলেন) একটা সাদামাটা পাস পেতে পারেন মাত্র ; আমি অবশ্য গির্জার সদস্য গ্ল্যাডস্টনকেই পছন্দ করি বেশী ।'

সমালোচক উইলসন কার্ণহান্সি হেসে এস্থলে বলেছেন, 'হ্যাঁ, একজন মস্ত-চিন্তাশীল ইহুদী চললেও চলতে পারে, অবশ্য তিনি যদি কনসারভেটিভের স্বার্থে কাজ করেন ।'

অনেকটা রবি ঠাকুর যেন বলেছেন, 'নৌরজী চললেও চলতে পারেন ; আমি কিন্তু গোড়া টিলককেই পছন্দ করি ।'

এ-আলোচনা উঠেছিল যখন বিবিসি দর্শনে ঘাই—হাজার হোক এ-জীবনের চারটি বছর দিশী বেতারে নষ্ট করেছি তো !

পারস্যে প্রখ্যাত কবি মুশররফ্ উদ্দীন বিন্-মুসল্লিহ উদ্দীন শেখ সাদীকে একদিন দেখা গেল ভরসংখ্যাবেলা গোরস্তানের দেউড়ির সামনে । এ সময়টা মৃতের সদগতি-প্রত্যাশাকামী উপাসনার জন্য প্রশস্ত নয় ; তাই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কবির এক বন্ধু তাকে দেখতে পেয়ে শূধ্যালেন, 'অবেলায় এখানে কি করছেন, শেখসাহেব ?'

দীর্ঘ দাড়ি দুলিয়ে, দীর্ঘতর নিঃস্বাস ফেলে বৃদ্ধ বললেন, 'আর বলা না ভাই, গেরো গেরো । জানো তো অমুককে । আমার কাছ থেকে একশ' তুমান ধার নিয়েছিল বছরটাক হয়ে গেল । ফেরৎ পাই নে । পাড়ায় পাড়ায় খেঁদিয়ে বেড়িয়েও তাকে ধরতে পাই নে । তখন আমার এক গদরুড়াই আমাকে পরামর্শ দিয়েছে এখানে এসে অপেক্ষা করতে । গোরস্তানে নাকি সবাইকে একদিন আসতে হয় ।'

বিবিসি লন্ডন তথা ইংল্যান্ড, এমন কি লন্ডনাগত বিদেশী গৃণী-জ্ঞানীরা জ্যাস্ত গোরস্তান । গাইয়ে, বাজিয়ে, নাট্যকার, বক্তৃতাবাজ, পাহাড়-চড়নে-ওলা, চোরের সেরা, ডাকাতে-বাড়া (এরাও ইন্টারভু দেয়) হেন প্রাণী নেই যে সেখানে একদিন না একদিন না-আসে ।

আমার জন্মভূমি সোনার দেশ ভারতবর্ষে অবশ্য ভিন্ন ব্যবস্থা । তার সম্বন্ধে অন্য গল্প আছে । সেটা কিন্তু বাজারে চালু হয় নি । 'আকাশবাণী'তে সামান্য যেটুকু প্রোগ্রামে পায় তাও কাটা যাবার ভয়ে সে গল্পই কেউ বলতে চায় না, শুনলেও ভুলে যেতে চায় ।

এটম্ বম্ পড়লে কি কি কাণ্ড হতে পারে তারই রগরগে বর্ণনা শুনে এক নীরব বঙ্গসন্তান তার বৈজ্ঞানিক বস্তুকে শূন্যে, 'এ সব কি সত্যি?'

'এক বম্ ! বরঞ্চ কমিয়ে সমিয়ে বলেছে।'

'তা হলে উপায় ? দুঃস্বপ্নে, লড়াইয়ের আওতার বাইরে কোনো নির্জন বীপে চলে গেলে হয় না?'

'হয়। কিন্তু এদেশের সরকার এটম বম্বের বিরুদ্ধে উত্তম ব্যবস্থা করেছেন। বম ফাটার সম্ভাবনা দেখলেই, আকাশবাণীর কোনো ষ্টুডিওতে ঢুকে পড়ো। সেখানে কোনো রেডিও-গ্র্যাক্টিভিটি নেই।'

আমি অবশ্য মোলানা সাদীর মতো দেনাদারকে পাকড়াবার জন্য বিবিসিতে যাইনি। আমি গিয়েছিলুম আপন ঋণ শোধ করতে। পূর্বেই বলেছি, এতদ্বা আমি বেতারে বাঁধা ছিলুম। সে সুবাদে দু'একজন কর্মীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা এমন কি দহরম-মহরম হয়। দেশে নিষ্কর্ম বিবোচিত হওয়ার পর বিবিসি এদের লুফে নিয়েছে—পাড়ার মেধো ওপাড়ার মধুসূদন তুচ্ছার্থে বলা হয়, এখানে কিন্তু সত্যি।

জর্মণির জন্য বিবিসি যে জর্মণ প্রোগ্রাম করে তারই বড় কর্তা আসলে ভিয়েনাবাসী জর্মণিভাষী ডঃ ভল্ফের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে আমাদের সিন্‌হা (আসলে সাদামটা কায়েতের পো 'সিঙ্গি', নিতান্ত সম্মানার্থে 'সিংহ', কিন্তু ছোকরা হামেশাই একটু সায়েবী ঘেঁষা ছিল বলে আমরা বাঙলাতে কথা কইবার সময়ও সিন্‌হা বলতুম)। লোকটি অসাধারণ পণ্ডিত এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর দৈনন্দিন সব সমস্যা সম্বন্ধে অহরহ সচেতন। এ সম্ভব সচরাচর চোখে পড়ে না।

আশ কথা পাশ কথার পর আমিই বললুম, বিবিসির জর্মণ কর্মচারীদের উচ্চারণ জর্মণি থেকে সম্প্রসারিত খাস জর্মণ বেতার বাণীর চেয়ে ভালো। প্রিয় অসত্য আমি যে একেবারেই বলি নে তা নয়, কিন্তু প্রিয় সত্য বলবার সুযোগ পেলে আত্মপ্রসাদ হয় ঢের ঢের বেশী।

হিটলার বরিশালের লোক। অর্থাৎ বরিশালের লোক কলকাতার ভাষা বলতে গেলে যে রকম তার কথায় আড় থেকে যায়, হিটলারের পোশাকী জর্মণে তেমনি শূন্য আড় নয়, তাঁর জন্মভূমি অষ্ট্রীয় উপভাষার বোটকা গন্ধ পাওয়া যেত। হিটলার কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনো যান নি, শিক্ষিত আচার্য পণ্ডিতদের তিনি দু'চোখে দেখতে পারতেন না, তদুপরি নতুন ভাষা শেখা বাবদে তিনি ছিলেন ষোল আনা অগা। (মূসসোলীনি চমৎকার জর্মণ বলতে পারতেন এবং একমাত্র তাঁর সঙ্গেই কথা কইতে তাঁর দোভাষীর প্রয়োজন হত না। ওদিকে আবার স্ত্রালিনের রুশ উচ্চারণে ককেসাসের গুরুভার ছিল বলে তিনি লেকচর বাজী করতে ভালবাসতেন না কিন্তু টেক্সটিক ছিলেন বহু ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত। কাজেই এসব উল্টোপাল্টা নমনা থেকে আমি কোনো সূত্র আবিষ্কার করতে পারি নি।) হিটলার যখন রাজ-রাজেশ্বর হয়ে গেলেন তখন যে তাঁর চেলাচামুঁডারা শূন্য তাঁর উচ্চারণ নকল করতে আরম্ভ করলেন তাই নয়, তাঁরই

মত কব'শ গলায় (হিটলার টেনসিলে ভুগতেন) দাঁবড়ে দাঁবড়ে কথা বলতে আরম্ভ করলেন—এক গ্যোবেল্‌স্ ছাড়া। জর্ম'নির খানদানী শিক্ষিত পরিবারে যে খজ্ঞ, স্বচ্ছ, চাঁচাছোলা উচ্চারণ প্রচলিত ছিল, অধ্যাপকরা যে ভাষায় কথা বলতেন, থিয়েটার অপেরাতে যে উচ্চারণ আদর্শ বলে ধরা হত, সেটা প্রায় লোপ পাবার উপক্রম করলো। যুদ্ধ লাগার পূর্বে এবং পরে যারা লন্ডনে পালিয়ে গিয়ে বিবিসির জর্ম'ন সেকশনের ভার নিলো তারা প্রধানতঃ ঐ সব শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী। আজকের দিনে যারা বিবিসিতে জর্ম'ন বলে তারা ওদেরই ঐতিহ্যে চলে। ওদিকে যদিও জর্ম'নরা হিটলারী রাজত্বের বারো বৎসরের দংশ্বপ্ন যত তাড়াতাড়ি পারে ভুলে যেতে চায় তবু পূর্বনো দিনের অভ্যাস অত সহজে যাবে কেন ?

তাই বিবিসির জর্ম'ন উচ্চারণ এমন খাস জর্ম'নীর থেকে খানদানী।

অভ্যাস যে সহজে যেতে চায় না তার উদাহরণ যতন্তর্য সব'ত্র দেখতে পাওয়া যায়। বাঙলা দেশ থেকেই তার একটা অতি সাধারণ উদাহরণ দিয়ে আরম্ভ করি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এদেশে কাপড়ের কি অনটন পড়েছিল সে-কথা আমরা ভুলি নি। তারই ফলে পাঞ্জাবির খুল কমে কমে প্রায় গোঞ্জির মতো কোমরে উঠে গিয়েছিল! তারপর লড়াই শেষ হওয়ার পর যখন বাজারে আর আশ্বিনর অভাব রইল না, তখনো কিন্তু খুল আর নামে না। ইতিমধ্যে এটেই হয়ে গিয়েছে ফ্যাশান !

ইংলণ্ডও তাই। সেই যে যুদ্ধের সময় কাপড়ের অভাবে মেয়েরা অ'প ঘেরের স্কার্ট বা'াতে বাধ্য হয়েছিল আজ সেটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং তার ঘের এতই মারাত্মক রকমের অ'প যে বাসের পাদানিতে পা তোলা যায় না। বাসের হ্যান্ডিল ধরে মেমসালেবদের লাফ দিয়ে একসঙ্গে দু'পা তুলে বাসে উঠতে হয়। আমরাই চোখের সামনের একদিন একটা কেলেংকারি হয়ে গেল। একটি 'ফুল্ স্লিম' (আজকাল 'মোটো' বলা অসভ্যতা—সেটা সংস্কৃত পদ্ধতিতে 'ফুল-স্লিম' বলাটা যে আইনস্টাইন আবিষ্কার করেছেন তাঁকে বার বার নমস্কার !) মহিলা বাসে উঠতে গিয়ে লাফ না দিয়ে পুরুষদের মতো পা তুলতেই চড় চড় করে স্কার্টটি প্রায় ইস-পার উস-পার !

যাদের কম ঘেরের লুঙ্গি পরার অভ্যাস আছে তাদের নিশ্চয়ই এ ভাবিজ্ঞতাটি একাধিকবার হয়েছে—প্রধানত লুঙ্গীর বার্ধ'ক্যে।

ঘটনাটা নিত্য নিত্য এ-দেশে হয় কি না বলতে পারবো না, কারণ যে কটি লোক কাস্টো দেখলে তারা মৃদু হাস্য করা দূরে থাক, তাদের নয়নের উদাস ঘূটি যেন সঙ্গে সঙ্গে উদাসতর হয়ে গেল। আমিও ইতিমধ্যে কিশিৎ শহুরে হয়ে গিয়েছি। মাথা নিচু করে গভীর মনোযোগ সহকারে খবরের কাগজে বভরিলের বিজ্ঞাপন—বিজ্ঞাপন তো বিজ্ঞাপনই সই—পড়তে লাগলুম।

ঘটনাটি প্রচুর 'ধর্মান' ও ব্যঞ্জন সহকারে এক ইংরেজ বন্ধুকে যখন বাখানিয়া বললুম, তখন তিনি বললেন, 'কেন, এ ব্যাপার তো এখন ক্লাসিকসের পর্যায়ে উঠে গেছে! শোনো। এক কক'নি আর এক কক'নিতে উপবেশ দিচ্ছে, মিলের

শেয়ার না কিনতে। “কি হবে কিনে? কাপড়ের এখন আর কতখানি প্রয়োজন? এই দেখ না, আমি আমার শরীর গেল বছরের স্কার্ট দিয়ে নেকটাই বানিয়েছি, আর তিনি আমার গেল বছরের টাই দিয়ে এ বছরের স্কার্ট বানিয়েছেন।”

কিন্তু এহ বাহ্য। এসব জিনিস দিয়ে ইংরেজ চরিত্রের অদল-বদল হয়েছে কি না সে-কথা বলা অসম্ভব না হলেও কঠিন। এক মার্কিন সেপাই যুদ্ধের সময় দেশের ভিতর দিয়ে যাবার সময় দেখে, যেখানেই পুরুদর কাটা হয়েছে সেখানেই পুরুদের মাঝখানে মাটির কোনিকাল থাম রাখা হয়েছে—আসলে এটা কতখানি মাটি কাটা হয়েছে তার মাপ রাখার জন্য এবং মাটি-কাটাদের মজুরী চুকিয়ে দেবার পর এ থামগুলোও কেটে ফেলা হয়—কিন্তু মার্কিন তর ভ্রমণকাহিনীতে লিখলে, ‘বাঙলা দেশের লোকই সব চেয়ে বেশী শিবলিঙ্গ পূজা করে। এস্তের পয়সা খরচ করে বিরাট বিরাট পুরুদর খুঁড়ে মাঝখানে শিবলিঙ্গ স্থাপন করে।’

এটা শুনে আমার শিক্ষা হয়ে গিয়েছে। না হলে ক্রিয়োপাত্তার নীডল্ (অবিবলিঙ্গ) ইয়োরোপের যে সম্মানের সঙ্গে রাখা হয়েছে তার থেকে মীমাংসা করে আমিও বলে দিতাম, ইয়োরোপেও লিঙ্গ-পূজা হয়।

যতই খবরের কাগজ পড়ি, রেডিয়ো শুনি, টেলিভিজন দেখি, ‘পাবে’ কথা-বার্তা কই, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে লণ্ড-ডিনার খাই, মোটরে করে গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে যাই, ট্যাক্সি-ড্রাইভারের সঙ্গে অবরেনবরে রসালাপ করি (তার সুযোগ বিস্তর, কারণ ট্রাফিক জামের ঠেলায় ঘাটে ঘাটে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়) বাঁকা নয়নে সব কিছু দেখি, খাড়া কানে অর্ধমাচরণে অন্য লোকের কথা-বার্তা শুনি ততই মনে হয়, সেই পুরনো ফরাসী প্রবাদ, প্রু সা শাজি, প্রু সে লা মেম্ শোজ (দি মোর ইট চেজেস, দি মোর ইট ইজ দি সেম্ থিং) খোলনলচে বদলেও সেই পুরনো হুকো।

এই যে জর্মনির হাতে ইংরেজ বেধড়ক বন্ খেল, কই, কথায় কথায় তো জর্মনকে কটুকাটব্য করে না; দু’এক জায়গায় যে কালো-খলয় মারামারি হচ্ছে, কই সাধারণ ইংরেজ তো সাধারণ পিছনে দাঁড়ায় নি, উঠে প্রতিবাদ জানাচ্ছে, এমন কি শুনতে পেল্লুম পার্লামেন্টে নাকি কে যেন বিল আনবেন, যে সব হোটেলওলা কালো-খলয় ফারাক করে তাদের সায়েস্তা করবার জন্য; নানা প্রকার আমদানি রপ্তানির উপর যদিও বাধ্য হয়ে কিছু কিছু আইন-কানুন জারি করতে হচ্ছে তবু তো ইংরেজ আরো কয়েকটা জাত নিয়ে একটা ‘খোলা বাজার’ তৈরী করার চেষ্টায় উঠেপড়ে লেগেছে। বিশ বছর আগেও মনে হয়েছে, এখনো মনে হলো, ইংলন্ডে কনসারভেটিভও লিব্‌রেল লেবারও লিব্‌রেল হয়ে গিয়েছে। তাই বোধ হয় খাস লিব্‌রেল দলের জেন্সাই সেখানে কমে গিয়েছে। যে দেশের সবাই ভাত খায় সেখানে তো আর ভাতখেকোদের আলাদা হোটেল হয় না।

তাই তাজব ঘানি, এলিয়ট এত অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন কি করে ?

সিন'হা না ডলফ্ শূধিযোছিলেন সে কথাটা মনে নেই ।

আজ যখন এ্যারোপ্লেনে করে অষ্টপ্রহরই অষ্টপ্রহরে কলকাতা থেকে লন্ডনে যেতে পারি, প্যারিসের লোক আর কয়েকদিনের ভিতরেই দেশে থাকে ব্রেকফাস্ট—নিউ ইয়র্কে থাকে লাঞ্চ, সর্বদেশের ভৌগোলিক গাড়ি যায়-যায়, শব্দ-দর্শন আলোচনা করতে হলে প্রাণের উল্লেখ না করলে সমালোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, ক্রোচের সমালোচনায় অভিনব গল্পের নামোল্লেখ অভিনব বলে মনে হয় না, লন্ডন পৌন্ডের দাম কমালে আর পাঁচটা দেশ পড়িমরি হয়ে সেই কর্ম করে, জার্মানিতে নতুন দাওয়াই বেরোলে সেটা কলকাতার কালামাজারে ঢেকে সাত দিনের ভিতর, বিলিতি ফিমের 'মরমিয়া' কে'ই কে'ই সুরের দিশী ভেজাল 'হ'টরওয়ালীতে' শোনা যায় পক্ষাধিক কালে, তখন শুনতে হবে খৃষ্টধর্মের, একমাত্র খৃষ্টধর্মের, তাও চর্চা অব ইংলন্ডের খৃষ্টধর্মের জয়গান ? সেইটে বরণ না করলে পৃথিবীর আদর্শ সমাজে আমাদের স্থান নেই ? কারণ এলিয়ট অতি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'আমাকে যদি ধর্মাত্মক বলা হয় তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই । যদি খৃষ্টীয় সমাজই চাও তবে তাহলে মেলা স্বাধীন পক্ষ, স্বাধীন মতবাদের ঝামেলা লাগলে চলবে না (ইউ ক্যানোট এলাও কনজেরীজ অব ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেক্টস্) । ইংলন্ডের নৈতিক পক্ষ এবং বৈদেশিক নীতি ঠিক করে দেবে চার্চ'ই ।' আর তার আদর্শ রাষ্ট্রে ইহুদীদের সংখ্যা যে অতিশয় সীমাবদ্ধ থাকবে সে-কথা তো পূর্বেই নিবেদন করেছি । (এখানে বলে দেওয়া ভালো আমি পাপী, সে আদর্শ সমাজে স্থান চাই নে, আমি শূদ্ধ তাঁর বাঙালী শিষ্যদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দৃষ্টিভ্রান্ত হইয়াছিলাম ।)

আমি তো আশা করেছিলাম, ভৌগোলিক গাড়ি যখন জেরিকোর দেয়ালের মত ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে তখন শিক্ষিত মানুষ সেই ধর্মেরই অনুসন্ধান করবে যে ধর্ম তার 'বিরাত বাহু মেলে' সবাইকে আলিঙ্গন করতে চায় । আমার তো মনে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ যখন ইংলন্ডে 'মানবধর্মের' জয়গান গেয়েছিলেন তখন তিনি বলদের সামনে বেদপাঠ কিম্বা মোষের সামনে বীণা বাজান নি ।

'ইংরেজের বাড়ি, হিন্দুর শাড়ি, মুসলমানের হাড়ি'—অর্থাৎ ইংরেজ বাড়ি-ঘর ছিমছাম রাখে, হিন্দু মেয়েরা জামাকাপড় (বিশেষ করে গয়নাগাটি) পরে ভালো, আর মুসলমানের কুল্লি পয়লা যায় তার হাড়িতে, উত্তম আহারাদি করে তার দিন কাটে । তাই শিরামদা একদিন আপন মনে প্রশ্ন শূধিযোছিলেন, 'মুসলমানদের ভিতর এত শিক্ষাভাব কেন ?' তারপর আপন মনেই উত্তর দিয়েছেন, 'যেখানে শিক্ষা-কাবাব বেশী সেখানে শিক্ষাভাব তো হবেই ।'

বিবিসির অন্যতম বাঙালী মুসলমান কর্মী আমাকে বার্লিনে আসলে দর্শন সম্বন্ধে প্রশ্ন শোধান নি, জার্মান প্রেসিডেন্ট হয়েসের আসন্ন লন্ডনাগমনের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আমার সুপক্ক মতামত জানতে চান নি, এমন কি

ইংরেজ নারীর নমনীয়তা কমনীয়তা সম্বন্ধেও তিনি উদ্বাসীন। আমাকে শুনালেন, ‘আহারাদি?’

আমি বললাম, ‘ইংরেজের তো বাড়ি, দুনিয়ার “হাঁড়ির খবর” রেখেও তার হাঁড়ি শুনাই থেকে গেছে।’

তারপর বিজ্ঞভাবে মাথা নেড়ে জর্মন অধ্যাপকদের বক্তৃতা দেওয়ার ভঙ্গীতে আরম্ভ করলাম, ‘নরমানরা আলবিয়ন ভূমি জয় করার ফলে ধর্ম, রাজনীতি তথা সাহিত্যজগতে যে সব বহুবিধ ঘূর্ণিবাতা, ভূমিকম্প, প্রাবল্যমূলক আরম্ভ হয়েছিল তদ্বশ্যে বহুতর পুস্তক, সংখ্যাতীত প্রবন্ধ এবং ভূরি ভূরি গবেষণামূলক কোষ লিপিবদ্ধ হয়েছে, কিন্তু ওহো হতোশ্মি, ইহলোক পরলোক উভয় লোকের সঙ্গমভূমি এই যে উদর (পিতৃলোকের একমাত্র কাম্য পিণ্ড, ও তথা কুলাঙ্গারও স্মরণ রাখে!) তদ্বশ্যে অতিশয় যৎসামান্য স্মৃতিশ্রুতি বর্তমান। পরম মনস্তাপের বিষয় অধ্যাবাধি আলবিয়ন ভূমির শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় এই সর্বোত্তম সনাতন মার্গ সম্বন্ধে সম্যক সংবিদিত হয় নি।’

কর্মণী বললেন, ‘বাংলা অভিধান হাতের কাছে নেই।’

গ্রিভাল থেকে একতালে যাওয়া অশাস্ত্রীয়। কিন্তু শাস্ত্র মেনে কি হবে? পূর্বেই নিবেদন করেছি, রবীন্দ্রনাথের সর্বশাস্ত্রসম্মত ‘মানবধর্ম’ শ্বেতভূমিতে অনাদৃত।

আমি বললাম, ‘নরমানরা আসার পূর্বে এদেশের লোক বেধে হয় কাঁচা মাংস খেত। এই দেখুন জ্যাস্ত ভেড়ার নাম ইংরিজীতে ‘শীপ’, তার মাংস রান্না করে খেতে হলে সেটা হয়ে যায় ‘মটন’। ‘শীপ’ শব্দ খাস ইংরিজী, ‘মটন’ শব্দ ফরাসী, নরমান যা খুশী বলতে পারেন; ‘কাউ’ ইংরিজী কিন্তু খেতে হলে (তোবা, তোবা!) ফরাসী শব্দ বীফ; ‘কাফ’ ইংরিজী কিন্তু খেতে হলে ফরাসী শব্দ ‘ভীল’; ঠিক সেইরকম ‘সুয়াইন’ ইংরিজী কিন্তু খেতে হলে (রাম রাম!) ফরাসী শব্দ ‘পোক’; ইংরিজী ‘ডগার’ ফরাসী ‘ভেনজন’ ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন কি যে সব রসবস্তু দিয়ে এগুলোকে সুস্বাদু করা হয়, যথা ‘সস’, ‘সেভারি’, ‘ভিনিগার’, ‘মায়োনেজ’, ‘সেগুলো’ ও ফরাসী শব্দ। খাবার ‘মেনু’ ফরাসী; তার প্রধান প্রধান ভাগ ‘অরদ্যল’ (অবতরণিকা) ‘ক’সমে-পতাজ’ (শুদ্রেরা বিভাগ), আঁঠে (প্রবেশ), পিয়েস দ্য রেজিসতাস (পীস্ অফ রেজিসটেনস্ অর্থাৎ প্রধান খাদ্য, যা দিয়ে পেট ভরাবে), ‘স্যুলাড’, ‘ডেসের’ (ফলমূল, মিষ্ট), ‘সেভারি’ (শেষ চাট) সবই ফরাসী। আর পদগুলোর নাম, ‘ক’সমে জুলেয়ান’, ‘পটাজ ও ফেরমিয়ে’ (চাষাদের (!) সূদপ), ‘অমলেট ওজ্জ্‌ব’ (পেরাজ পুষ্কিনার অমলেট) এখানেও দেখুন ‘এগ’ ইংরিজী শব্দ কিন্তু ‘অমলেট’ ফরাসী। এসব আরম্ভ করলে তো রাত কাবার হয়ে যাবে। (আশু ইংলংডগামী এর কাটগুটা রাখলে উপকৃত হবেন; আমাকে নিমন্ত্রণ করে সঙ্গে নিয়ে গেলে আরো বেশী উপকৃত হবেন। কারণ যোগুলোর নাম করলাম এগুলো ভোজনতীর্থের বিখ্যাত কাশী বন্দাবন—‘হিংলাজ’-‘গোটাটিকরে’ নিয়ে যেতে হয় হাতে ধরে।)

এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। মহানগরী কলকাতার হিন্দুসন্তান যখন পোশাকী মাংস খায় তখন সে 'ভাত খায়' না, সে তখন বেরোয় 'খানা খেতে' এবং 'ঘবনের হাতে' কিন্তু খেবছায়। কোমরা, কালিয়া, বিন্নয়ান, কাবাব, দোলমা এ সব কটি শব্দই বিদেশী; বাঙলা প্রতিশব্দ নেই। চপ, কাটলেট, মমলেটও বিদেশী শব্দ। তফাত এই যে ইংরিজীগুলো হিন্দু হেঁসেলে ঢুকেছে, মুসলমানীগুলো ঢুকতে পারে নি। তার কারণ, মুসলমানীগুলোর রান্না একটু বেশী শুষ্ক।

শেষোক্তগুলো কলকাতার মুসলমানরাও খেতে শিখেছেন।

এক মুসলমান গেছেন হোটেল। 'বয়, এক কাটলেস লে আও।'

'হুজুর আজ মীট-লেস।'

সায়ের বললেন, 'কুছ পরোয়া নাহী; সো হী লাও।'

সায়ের ভেবেছেন 'মীট-লেস' (দিন) বৃষ্টি কাটলেসের এক নবীন সংস্করণ।

মূল কথায় ফিরে যাই।

নরমান জয়ের পর ক্রমে ক্রমে যেসব বিদেশী খাদ্যরাজি বিলাতে প্রবর্তিত হল, তার ইতিহাস এখনো আমার চোখে পড়ে নি—পক্ষান্তরে ফরাসী খাদ্যের সর্বাঙ্গসুন্দর উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে উত্তম উত্তম পুস্তক দেখেছি। শুনছি, মহামান্যবর স্বর্গীয় আগা খান এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ভোজনরসিক ছিলেন। তাঁর নাকি একখানি বিশাল বিরাট এটলাস ছিল—তাতে পৃথিবীর কোন জায়গায় কোন সময় কোন খাদ্য উত্তমরূপে প্রস্তুত হয় সেগুলো চিহ্নিত ছিল। এ পৃথিবীর সব খাদ্যই যখন তিনি একাধিকবার খেয়ে পরিতৃপ্ত হলেন তখন নতুন রসের সন্ধানে অন্যলোকে চলে গেলেন। আমার হাজার আপসোস তাঁর সঙ্গে কখনো দেখা হয় নি বলে।

তা সে যাই হোক, এ কথা মোটামুটি বলা যেতে পারে বর্বর ইংরেজী রান্নার প্রতীক ছিল 'ব্রুয়েট স্ট্যান্ড' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবধি। এতে থাকতো সিরকা, অলিভেল, উষ্টার সস আর সরষে। নুন গোলমরিচ তো আছেই। বস্তুত এর কোনো একটা কিংবা একাধিক বস্তু না মিশিয়ে অধিকাংশই খাওয়া যেত না। নিতান্ত খরগোশ গোত্রজাতরাই ইংরেজের স্যালাড কচর কচর করে চিবুতে পারতো। পার্ক সার্কাসের রসিদ্ধতম ধনে কিংবা পুদিনা স্যালাড এর তুলনায় অমৃতগন্ধী মধুমঞ্জরী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সেপাইরা ঝেঁঙে শূয়ে শূয়ে অখাদ্য খেয়ে খেয়ে স্বপ্ন দেখতো, ছুটিতে প্যারিসে ছিমছাম রেস্টোরাঁ করকরে জেঁবলরুথওলা ছোট্ট টেবিলের উপর 'মেডফুড'—অর্থাৎ তৈরী খাবারের; ইংরিজী ধরনে নুন লস্কা তেল সস মিশিয়ে খেতে হয় না, ফরাসী শেফ এসব বস্তু রান্নাঘরেই পরিপাটীরূপে 'তৈরী' করে দিয়েছে—আমাদের মা-মাসীরা বেরকম মাছের ঝোল কিংবা চালতের অম্বল করে দেন। তারই ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরিজী রান্নার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন হয়। সেইটে আমি চোখে দেখি ১৯৩০ সনে। অখাদ্য লেগেছিল কারণ, সদ্য গির্যোঁছ লন্ডনে—প্যারিস থেকে।

সৈয়দ মজতবা আলী রচনাবলী (৭ম)—১৯

ইন্ডেশনের জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিশ্ববাস্যের জাত-বেজাত জড়ো করা হল ইংলণ্ড—আলেকজান্ডারের সময় মেরিসিডোনিয়ার কিংবা রোমের মধ্যাহ্ন দীপ্তির সময়ও ঐ শহরে বোধ হয় এরকম সাড়ে বত্রিশ ভাজা কখনো হয় নি। ফলে লন্ডনের রাস্তা আপাদমস্তক বদলে গিয়েছে।

সেইটে চাখলুম '৫৮-এ।

সব কিছু বোবাক বদলে গিয়েছে। ইস্তেক জুয়েট তার মালমসলাসুখ গায়েব। যেদিন নুন-লংকার শিশিও যাবে, সেদিনই ইংরিজী রাস্তা তার চরম মোক্ষে পৌঁছবে। কে না জানে, ভালো রাধুনী কাউকে ফালতো নুন নিতে দেখলে বেদনা পায়। প্যারিসে শোনা যায়, ভোজরাজ সম্রাট অর্গা থান এক বিখ্যাত রেস্টোরাঁর মনের ভুলে একটু ফালতো নুন নিয়েছিল বলে রেস্টোরাঁর রাধুনী মনের দুঃখে আত্মহত্যা করে। ইংলণ্ড এখন পাচকই রাস্তাঘরে আহারাতি তৈরী করে। গাহককে ডাইনিং হলে টেবিলের উপর পি সি সরকারের মত নিপুণ যাদুকরী হস্তে সিরকা সস ঢেলে কাঁচা-সেম্ব মালকে সুস্বাদ করতে হয় না। পৃথিবীর আর পাঁচটা জাত—মায় বাস্তু হটেনটট—এতকাল যা করে আসছে।

এবং জাত-বেজাতের নতুন নতুন পদও তার রাস্তাঘরে ঢুকতে দ্বিগেছে।

ত্রিশ বছর আগে রাইস-কারি খেতে হলে আপনাকে লিভিংস্টোনের মতো ছ'মাসের চালচিড়ে পুরনো ধূতিতে বেঁধে বেরোতে হত তারই আবিষ্কারে। বহু বাজে লোক কর্তৃক বেপথে চালিত হয়ে, বহু পদলিসমেনের 'সক্রিয় সহযোগিতা'র ফলে, 'অশেষ ক্লেশ ভুঞ্জিয়া' আপনি যখন মোকামে পৌঁছতেন তখন রাইস-কারি খতম! সেই লক্ষ্মীছাড়া বীফস্টেক খেয়ে বাড়ি ফিরতেন। মনে পড়তো সেই গরীব মোল্লার কাহিনী। চেয়েচিন্তে অতি কষ্টে খেয়ার একটি পয়সা যোগাড় করে সে যখন ওপারে ফাতেহার (প্রাশ্বে) ভোজে পৌঁছল তখন সব কিছু ফুরিয়ে গিয়েছে। মেহমানকে তো আর অভুক্ত ফেরানো যায় না—তাড়াতাড়ি ভাত আর মসুর ডাল সেম্ব করে তাকে খাওয়ানো হল। মনের দুঃখে সে বললো, 'ওরে ডাল, আমি না হয় খেয়ার পয়সা ধার করে যোগাড় করলুম; তুই পেলি কোথায়?' আপনিও স্টেককে শূদ্রাবেন, 'এ পথ তুই পেলি কোন পদলিসকে শূদ্রিয়ে?'

একদম পয়লা নম্বরী হোটেলে—অর্থাৎ যেখানে গুস্তারের ড্যাক, কেষ্টের ডায়েস খেতে যান—আমি যাই নি। তার অধিকাংশই দামের ঠেলায় ফাঁকা। বিরাত হলের এখানে দু'জন ওখানে চারজন লোক খাচ্ছে, আর বেকারু ওয়েটার-গুলো ঈর্জনিং ড্রেস পরে হেথা-হোথা জটলা পাকাচ্ছে, বাড়িটা ঘেন খাঁ খাঁ করছে—এমন জায়গায় খেয়ে সুখ নেই। মোহনবাগান-ইন্সটিটিউট চ্যারিটি ম্যাচে যদি গিয়ে দেখেন মাত্র আপনি আর ওপাড়ার গোবর্ধন উপস্থিত, আর কেউ নেই, তখন কি খেলা দেখাটা জমে? অবশ্য যেখানে এমন ভিড় যে পলায়মান বয়ের কাছাতে হ্যাঁচকা টান না দেওয়া পর্যন্ত একটা হাফ-সিসিল চা জোটে না সেখানেও 'গব্বদগুণা'। বাচ্চা এবং চা আসি-আসি করে না এলে কি পীড়া

তা শুধু পোয়াতী আর গাহকরাই জানে।

অতএব যেতে হয় দুই নম্বরী হোটেলে। এবং সেখানে আপনি হরবকং রাইস-কারি পাবেন—পয়লা নম্বরীতে পান আর না-ই পান। আর কোনো কোনো রেস্টোরাঁয় লেখা আছে ‘পাটনা রাইস’! পাটনা রাইসের প্রতি এ দুর্বলতা কেন? রাষ্ট্রপতির শহর বলে?

আর যারা খাচ্ছে তারা বাঙালী নয়, ভারতীয় নয়—দুনিয়ার চিড়িয়া।

এই সব খাস বিলিতি রেস্টোরাঁতেই যদি রাইস-কারি জামাইয়ের কদর পাচ্ছে তবে তার আপন বাড়িতে অবস্থাটা কি রকম?

সে এক অভিজ্ঞতা।

লন্ডনের বৃক্কের উপর তবে ঠিক বড় রাস্তায় নয়। ভালোই। হট্টগোল কম। এই আমাদের বড়বাজারে যতখানি। তবে বড় রাস্তায় গোলমাল কত? শুধুয্যেকে শোধাবেন। সে বেচারী ঘুমুতে পারতো না।

ইয়া লম্বা, উদী পরা, মাথায় পাঠানী পাগড়ী, ছ’ফুট দরোয়ান। যেখানে হ্যাট রেনকোট ছাড়তে হয় সেখানেও তথৎ। ঢুকেই লাউজ—কক্টেলটা-আসটা খাবার জন্য, ভার্গিস ওটা মদ্যরাজী ভাই চালান না। সাজসজ্জা পুরো ভারতীয়। হেথায় নটরাজের গ্লোজ, হোথায় পেতলের ভারতীয় অ্যাসট্রে, আরো এটা সেটা, ধূপকাঠিও জ্বলছে।

এগিয়ে এলেন এক খাপসদরং শ্যামাঙ্গী, পরনে মদ্যশিখাবাধী, চুলে তেল পড়েছে—মেমেদের শন-পাটের মত স্নেহহীন নয়—খোঁপাটিও ন’সিকে বাঙালোরী, ব্লাউজ ব্লাউজেরই কাজ করছে—চোলীর প্রসিদ্ধি দিচ্ছে না—চোখে-মুখে খুশী, ভারি চটপটে। একটা ‘নমস্কে’ ভী পেশ করলে।

বাঃ, এ তো বেড়ে ব্যবস্থা!

গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।

তাহলে উত্তম আহারাদি হবে।

ফরাসী গদ্যী রশফুকোল বলেছেন, ‘আহার প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু রসিক-জনের মত আহার করা আর্ট।’ ভোভানার্গ বলেছেন, ‘মহৎ চিন্তা পেটের ভিতর থেকে আসে।’ গ্রীক দার্শনিক এপিফুর বলেছেন, ‘প্রকৃতিদত্ত বৃদ্ধিমান উত্তম কর্মে নিযুক্ত করবে এবং সুবৃদ্ধিমানের মত পরিপাটি আহার করবে।’ এবং ইক্লেসিয়াসটের মাধ্যমে নমস্য বাইবেল গ্রন্থ অনুশাসন দিয়েছেন, ‘পান, আহার ও আনন্দ করার (ইট, ড্রিঙ্ক অ্যান্ড বি মেরি) চেয়ে মহত্তম কর্ম গ্রহণবনে নেই।’

আর মলিয়ার যখন বলেন, ‘আমরা বাঁচার জন্য খাই; খাওয়ায় জন্য বাঁচি নৈ’, তখন তিনি বর্বারজনসদৃশ প্রলাপ বাক্য ব্যবহার করেছেন। ‘আমরা খাওয়ার জন্য বাঁচি, বাঁচার জন্য খাই না।’

ভোজনাদি সম্বন্ধে আমি আলোচনা আরম্ভ করলেই কোন কোন উন্নাসিক পাঠক বিরক্ত হন, আবার কেউ কেউ বলেন, এ-সব কথা তো আগেও যেন শুনিয়েছি বলে মনে হচ্ছে। উত্তরে নিবেদন, সব কথা শোনেন নি; আর শুনে

থাকলেই বা কি? পূরনো জিনিসের পুনরাবিস্তার করতে গিয়ে নীচুশে একদা লিখেছেন, 'এ কথা আমি পূর্বেও বলেছি, কিন্তু মানুষ শোনা কথাই শুনতে চায়, জানা কথাই বিশ্বাস করে।' একদম খাঁটি কথা। আমাদের মোহর বীবী, কাগকা ব্যানার্জিকে যখন শুধাই, 'সেই রেকর্ডে দেওয়া তোমার গান "ওগো তুমি পশুদর্শী" ফের বেতারে গাইলে কেন? ওটা তো ইচ্ছা করলেই রেকর্ড বাজিয়ে আবার শোনা যায়', তখন সে বলে, 'কি করবো, সৈয়দদা, লোকে যে পূরনো গানই শুনতে চায়।' বৃক্সলুম, বাচ্চাদের কাছে নতুন গল্প বলতে চাইলে তারা যে রকম চেঁচিয়ে ওঠে, 'না মামা, কালকের সেই বাঘের গল্পটা বলো।'।

দ্বিতীয়ত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার রচনা বাঙলা দেশে অজরামর হস্কে থাকবে না, আমার রসনির্মাণপ্রচেষ্টা বাণী-সরস্বতীর অঙ্গদে কুশলে মাল্যারূপে চিরভাব্যর হয়ে থাকবে না, কিন্তু এ-কথা স্থিরনিশ্চয় জানি, এই বঙ্গসন্তানদের যেদিন কাণ্ডজ্ঞান সম্যক প্রস্ফুরিত হবে, যেদিন তারা 'ভরতনাট্যম', 'পিকাস্‌সো', 'সিংহেন্দ্র মাধ্যম' কিংবা 'ভাল্লুকপশুদর্শী', পশ্চাৎধাবন কর্ম বর্বরস্য শক্তিক্ষয় বলে সুষ্ঠুরূপে স্বদয়ঙ্গম করতে পারবে সেদিন সে উদরমাগের সস্থানে নব নব অভিধানের পথে নিঃক্রান্ত হবেই হবে। আজ যে রকম রুচিং-জাগরিত বিহঙ্গ-কাকলীর ন্যায় কোন কোন বিবক্ষজন চৈতন্যচরিতামৃতের ভোজনামৃত খাদ্য-নিষাটু অধ্যয়ন করতে করতে বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন উত্থাপন করেন 'কিমাশ্চর্যম্! ছানার সন্দেশের উল্লেখ তো কুত্রাপি নেই?'—ঠিক সেইরূপে অস্মদ্বেশে যেদিন রাজবর্ষে রাজবর্ষে চিংকার প্রতিধ্বনিত হবে, 'আমাদের দাবি মানতে হবে! ভোজনমাগের গীতা রচনা করো! ইনকিলাব-জিন্দাবাদ; পেট-কিলাব-ঝাণ্ডা তোলা!' সেদিন, বলতে লজ্জা করছে, বিনয়ে বাধছে, সেদিন এই অধমের, হ্যাঁ! এই অধমের বইয়ের সস্থানেই বেরোতে হবে বঙ্গের ম্যাক্সমুলালার মমজেনকে। আফগানিস্থানের সর্বাক্সসুন্দর ইতিহাস নির্মাণে মল্লিখিত 'দেশে-বিদেশে' ব্যবহৃত হবে কি না জানি না, কিন্তু এ বিষয়ের সূচাগ্রণ স্তূতীক্ষেপণ সম্ভব নেই যে আজ আমরা যে রকম আমাদের বোধধর্মের ইতিহাস রচনার সময় নিরপেক্ষ পর্ষটক পরিদর্শক হিউয়েন সাঙের শরণাপন্ন হই, ঠিক সেই রকম ইংল্ড-সন্তান যেদিন সভ্য হয়ে তার দেশের ভোজনোতিহাস লিপিবদ্ধ করবে সেদিন তাকে বেরোতে হবে—পূরনার ব্রীড়িত হাচ্ছি—এই আমারই বইয়ের সস্থানে, রাখাল বাড়ুয়াকে যে রকম মোন-জো-দড়োর সস্থানে একদা বেরোতে হয়েছিল; আপনাদের রবি ঠাকুরের 'চাঁদ উঠেছিল গগনে'র সস্থানে সস্থানে দেশে কেউ আসবে না। রায়গুণাকর অম্বদাশঙ্করের 'রত্ন ও প্রীমতী'র জন্য তার প্রকাশক মাত্র ইয়োরোপকে চেলেজ করছে, আমার প্রকাশক বিশ্বভূবনকে ক্রৌঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করবে, কাজী সাহেবের ভাষায় (আজ্ঞা তাঁর বিমারী বরবাদ করে জিম্মেগী, দ্বাজ করুন!) ত্রিভুবনেশ্বরের সিংহাসন নিয়ে আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ আরম্ভ করবে।

সেই রহস্যময়ী শ্রীমতী তো ফরাসিস পানীয়ের কথা ওঠাতে আরেকবার 'বিলক্ষণ' বলে অস্বর্থান করলেন ; আমি ভাবলুম, ঐ য়্‌ যা । ব্যাকরণে বুদ্ধি গলতি হয়ে গেল । এ যে সম্ভ্রান্ত ভারতীয় ভোজনালয় ! এ সব বিবন্ধ পানীয় বোধ হয় এখানে নিষিদ্ধ । আবার বাঙাল বনে গেলুম নাকি ?

নাঃ ! কোনো ভয় নেই । ভাতিজা, চ্যাংড়া মদ্যখ্যে ঘটিস্যা ঘটি । সে ধোঁখি দিবি্য তার টুথব্রাশ-গোঁফে আঙ্গুল বুলোতে বুলোতে নিশ্চিন্ত মনে এঁদিক ওঁদিক তাকাচ্ছে—চোখ দুটো যেন রীটিং পেপার—সব কিছু শুষে নিচ্ছে ।

পূরীর সমুদ্রপারে ঢেউ দেখে অবন ঠাকুর ভীত হয়ে যখন পালাবার পথ খুঁজছিলেন, তখন তাঁর এক স্যানা বন্দু তাঁকে বলেন, 'ভয় কিসের ? সায়েব-সুবোরা তো চতুর্দিকে রয়েছেন ।' অর্থাৎ তেমন কিছু বিপজ্জনক পরিস্থিতি হলে পুলিস আগেই তাঁদের খবর দিতেন, তাঁরাও কাটতেন ।

যাক্‌ । এদেশে আনকোরা আগত মদ্যখ্যে যখন নিশ্চিন্ত তবে আর আমার ভয় কি ?—তখন কি আর ছাই জানতুম, সে আমারই ভরসায় নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে !

কিন্তু, সায়েব-সুবোরা তো রয়েছেনই । তেনারা তো 'পানীয়' বেগর ভোজন করতে পারেন না ।

এবং সাতশয় উল্লাসের সঙ্গে লক্ষ্য করলুম, কোনো ভারতীয় লাউজে নেই । তারা নিশ্চয়ই মনোনিবেশ এই পানে লিপ্ত হয়ে পাপবিম্ব হয় না । সোজা ডাই-নিংরুমে ভোজন করতে গিয়েছে । তাদের চরিত্রবল দেখে উল্লাস বোধ করলুম ।

ওঁদিকে ধোঁখি শ্রীমতী অন্য খন্দেরকে স্বাগত জানাচ্ছেন । ভারী বিরক্তিবোধ হল । এ যে ধোঁখি হুদুদু বাঙালী দোকানের মতো । আপনাকে জিনিস দেখাতে দেখাতে হঠাৎ অন্য খন্দের ঢুকছে দেখে দিল ছুট তার দিকে—আপনাকে ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলিয়ে রেখে, কিংবা যে রকম নিম্নলিখিত সিংহাস্ত সিংহাস্ত জানান যে আপনার পরীক্ষার ফল পরে বেরুবে ।

নাঃ । আমারই ভুল ! দেখি হেলেন্দলে একটি মোটাসোটা ভারি ধরনের লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে । এর গলায় গলাবন্ধ কোটের উপর ঝোলানো মসীক্ষ উপবীত ও তৎসংলগ্ন কুণ্ডিকা দেখে এর জাতগোত্র বুঝতে আমার কণামাত্র সময় লাগলো না, যাঁরা সংস্কৃতে লেখা 'প্রতিমালক্ষণ' সংক্রান্ত অতুৎকৃষ্ট গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন করেছেন তাঁরাই জানেন, প্রতিমা দেখে কোনটা কোন দেব না দেবীর জানতে হলে স্মরণ রাখতে হয়, কোন দেবীর দক্ষিণ হস্তে কুবলয় বলয়, কার বাম হস্তে চক্র, কার মস্তকে উষ্ণীষ, কার পদে নুপুংর ।

কুণ্ডিকাসম্বিত কুঙ্কোপবীত 'ওয়াইন মাস্টার'র লক্ষণ ।

আপনি যদি চাষাড়ে হুইস্কি বিয়ার রাম্‌ জিন না খেয়ে উত্তম বিদ্য ফরাসী কিংবা জর্ম'ন অথবা ইতালীয় 'ওয়াইন' খেতে চান, তবে এই ভদ্রসন্তান আপনাকে পরম বাস্খবের ন্যায় তাবৎ সম্বিসদুদ্ভব বাতলে দেবেন । চাণক্য বলেছেন, 'ব্যসনে (এবং মধ্যপান ব্যসন-বিশেষ) যে সঙ্গে থাকে সে বাস্খব ।' ইনি তাই করে থাকেন । তবে চাণক্যের বাস্খব আপনাকে কোনগতিকে ঠেকিয়ে

ঘাড় নিয়ে ঘাবার চেষ্টা করে ; ইনি মোকা পেলে ওস্কাবার চেষ্টা করেন—এই যা তফাত ।

মদুজাতায় যে রকম কৈলাসে বিহার করেন, রাশান ডিকটের যে রকম ক্রেম-লিনে বাস করেন, ভেজাল যে রকম খাদ্যে বিরাজ করেন, এই ‘ওয়াইনমাস্টারটি’ ঠিক তেমনি বিচরণ করেন অতিশয় পয়লানস্বরী খানদানী ‘ভয়াংকুর’ রেস্টোরাঁতে । ‘ভয়াংকুর’ বললুম ইচ্ছে করেই । এখানে অংকুর পষন্ত বিনষ্ট হয় । ইনি আপনার সব্‌স্ব অপহরণ করেন । পাতলদুন বশ্বক দিয়ে বিল শোধ করতে হয় ।

ভীতকণ্ঠে ভাতিজাকে শূধালাম, ‘ওরে, রেস্ট আছে তো ?’

ভিতরের বৃক-পকেটের উপর ধাবড়া মারার মদ্রা দেখিয়ে বললে, ‘কুছ পরোয়া নেই ; আপনি চালান ।’

সোনার চাঁদ ছেলে । একেই বলে বাশ্বব । বাসনে সঙ্গে থাকে ।

একজীবনে আর যদি কখনো চাকরি নিই তবে উমেদার হব এই ‘ওয়াইনমাস্টারের’ চাকরির জন্য—বেতারের কাজ হয়ে গিয়েছে, সেখানে শূধু খাপ-সদরং কলাবতীর আমেলা ; তারা আমাকে যথেষ্ট ‘কল্‌চরড্’ বলে বিবেচনা করেন না ।

খানদানী রেস্টোরাঁর চার ইঞ্চি পদরু মহামূল্যবান ইরানী গালচের উপর মদ্রু পদসংরগ করে কাটবে আপনার জীবন—ভ্রমর যে রকম তশ্বঙ্গীর বিশ্বাধরে পদক্ষেপ করে ঠিক সেই রকম (বিশ্বাস না হলে কালিদাস পশ্য) এক জোড়া চার আউন্স ওজনের ঈর্ভানিং শূতে কেটে যাবে ঝাড়া দশটি বছর—হাপসোল পষন্ত বদলাতে হবে না । এ টেবিলে গিয়ে কাউকে বলবেন, ‘তিপামের ‘নীরেনস্টাইনার’—সে একটা স্বপ্ন, স্বপ্ন । ১৯৫৩-এ সেখানকার আঙ্গুর মোলায়েম রোদে যা রসে টাইটস্‌বুর হয়েছিল, সেরকম ধারা আর কখনো হয়নি । তাই দিয়ে এ সুধা নির্মিত হয়েছে । কখনো না অন্য টেবিলে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করবেন ‘মাদাম, দেখুন, দেখুন, এই শ্যাম্পেনের বদ্বদ কি রকম লক্ষ লক্ষ পরীর মত সলো-মনের বোতল-বশ্ব জিনের ন্যায় নিষ্কৃতি পেয়ে লক্ষ লক্ষ হাওয়ার ডানা মেলে উধ্বপানে উড়ে যাচ্ছে । এ বস্তু গলা দিয়ে নাবার সঙ্গে সঙ্গে আপনিও ইহ-লোকের সববশ্বন থেকে মদ্রুতি পেয়ে নীলাম্বরের মমমাঝে উধাও হয়ে যাবেন ।’ তারপর একটু মদ্রু হাসি হেসে বলবেন, ‘তাই, মাদাম, এ শ্যাম্পেন যিনি অর্ডার দেন তাঁর কাছ থেকে আমরা আগেভাগেই বিলটা আদায় করে নিই অবশ্য, আপনাদের বেলা সে কথাই উঠছে না ।’

এ তো হল । তারপর আপনি ঘড়ি ঘড়ি ‘বারে’ সেলারে গিয়ে তদ্বারক করবেন, সববস্তু রাজসিক পশ্বাতিতে প্রস্তুত রয়েছে কি না । রাধুনীকে যে রকম সে-সব জিনিস মাঝে মাঝে চেখে দেখতে হয় আপনাকেও ‘নিতান্ত বাধ্য হয়ে’, ‘অতিশয় অনিচ্ছায়’—আমাদের বরকর্তারা যে রকম পণ নেন ‘অপ-ব্বপ মাঝে-মাঝে চেখে দেখতে হবে বইকি ?

তাও হল । ওদিকে আপনাকে প্রতি শরতে ফ্রান্স যেতে হবে, সেখান থেকে

নিলামে পানীয় কিনে সেলার পূর্ণ করার জন্য। আগনার কমিশনটা-আসটা ঠেকার কে? আপনার ভারী ভারী গাহক খন্ডেরের বাড়ির জন্য তাদের প্রাইভেট অর্ডারও সাপ্লাই করবেন। তাতেই বা কম কি? ওনরা হাত উপদ্রব করলেই আমাদের পর্বত-প্রমাণ!

আমাদের 'ওয়াইন মাস্টারটি' এসে নমস্কে জানালেন। চমৎকার চেহারা। নেয়াপতি ভুঁড়ি, চোখ দুটি জ্বাক্সদুস'কাশং যা হওয়ার কথা।

আমি সবিনয়ে বললুম, 'ত্রিশ বছর পরে এসেছি। ইতিমধ্যে একটা লড়াই হয়ে গিয়েছে। জর্ম'নরা ফ্রান্স ছাড়ার সময় প্যারিসের 'নগ্ন দাম' গির্জা' সঙ্গে নিয়ে যায় নি বটে, কিন্তু ফ্রান্সের সেলারে সেলারে ঢুকে তার উত্তম-অধম সর্ব-পানীয় খতম করে যায়। এখন যা ফ্রান্স ইংল্যান্ডে পাওয়া যাচ্ছে, তার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। আপনি পথপ্রদর্শন করুন। তবে এইটুকু বলতে পারি, বর্দো এবং শান্ত।'।

'শান্ত' মানে যে বস্তু সোডার মত বদজবদজ করে না, তেলের মতো শুল্লো থাকে।

চাকুরে যে রকম পেন্সন'ধারীকে খাতির করে, 'মাস্টার' আমাকে সেই রকম বদর করলে। আহা এককালে লোকটা সব কিছুর জানতো। এখন না হয় আউট অব ডেট।

ম্যাক্সম'লার নাকি আমাদের সংস্কৃত শিখে ভাষাচাষদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন, হিরিনাথ দে নাকি গ্রীক শিখে গ্রীকদের চিত্তহরণ করেন—এসব শোনা যায়, কিন্তু আমাদের এই 'পানের প্রভু' দেখলুম সত্যিই পেটে এলেম ধরে। দেখলুম হেন পানীয় নেই, যার ঠিকুজি-কুলজি তার বিদ্যাচৌহন্দীর বাইরে পড়ে। কবে কোন বৎসরে কোন গায়ের আঙ্গুরে এ জিনিস তৈরী, সে বৎসর আঙ্গুর পাকার সময় সেখানে বৃষ্টি হয়েছিল না মেঘ ও রৌদ্র না মোলায়েম মোলায়েম মিঠে রোস'দর ছিল, কার চাপযন্ত্রে তার রস বের করা হয়, তাই দিয়ে সবস'দ্য ক'বোতল তৈরী হয়েছিল, তার কটা গেল মার্কিন মদুদ্রকে কটা এল এ দেশে, এর 'বাড়ি' কি রকম, 'বুকে' (bouquet)-টাই বা রমণীয় কিনা—সব কিছুর জিজ্ঞাসা-মর্পণে এবং উভয়াথে।

'নগণ্য' ভারতীয় যে এই বিলিতি বিদ্যে এতখানি হাসিল করেছে তার কাছে ম্যাক্সম'লারের সংস্কৃতজ্ঞান শিশু।

শুধালুম, 'ভদ্রে, এ কর্মে কতদিন ধরে আছেন?'

সবিনয়ে বললে, 'আজ্ঞে, পঞ্চাশ বছর পূর্বে যখন এ রেস্টোর'টা খোলা হয় তখন থেকে। সে আমলের আর কেউ নেই।'।

তবে কি এসব জিনিস খেলে মানুষ দীর্ঘজীবী হয়? অর্থাৎ ওয়াইন—যে বস্তু আঙ্গুরের রস দিয়ে তৈরী হয়েছে, হুইস্কি বিয়ারের কথা উঠছে না।

জানি রসভঙ্গ হবে, তবু হুইস্কি ওয়াইন কোনো জিনিসই ভালো নয়। অতিশয় শীতের দেশে, কিংবা ডাঙ্কারের হৃদয়ে খাওয়া উচিত কিনা, সেকথা আমি বলতে পারবো না। অতখানি শীতের দেশে আমি কখনো বাই নি—

বিলেতে গরম দুধ, চা, কফি খেলেই চলে—আর অতখানি অসুস্থও আমি জীবনে কখনো হই নি। মদ্যপান করলে ভালো লেখা বেরোয় এ কথা আমি বিশ্বাস করি নে। মেঘনাদ কাব্য রচনার সময় মাইকেল ক্লাস্ট্রি দ্বারা করা অন্য অল্প খেতেন, শেষের দিকে যখন মাত্রা বেড়ে গেল, তখন দু'চার পাতা লেখার পরেই বেএজের হয়ে ঢলে পড়তেন—তারি গ্রন্থাবলী সে সব অসমাপ্ত লেখায় ভর্তি। এবং তার চেয়েও বড় কথা, আপনি আমি মাইকেল নই। একখানা মেঘনাদ লিখুন; তারপর না হয় মদ খেয়ে লিভার পচান—কেউ আপত্তি করবে না।

এবং সব চেয়ে মারাত্মক তত্ত্ব শুনছি কোনো কোনো কলেজের ছোকরার কাছে। বিয়ার নাকি মদ নয়, ওতে নাকি নেশা হয় না, ও বস্তু খেলে নাকি পরীক্ষার পড়া করার সুবিধে!

বটে! বিয়ারে নেশা হয় না? লন্ডন প্যারিসে রাস্তায় যারা মাতলামো করে তারা কি খায়? কোকা কোলা? অগা আর কারে কয়! ওদের পনেরো আনা বিয়ার খেয়েই মাতাল হয়। আমাকে ওসব বলো না; ঠাকুমাকে ডিম চোষা শেখাতে হবে না।

মূল ফার্সীতে আছে,

গর্-দস্ত দহদ-জ-মগ-জ-ই-গন-দ-ম-

নানি,

ওয়ার-ময় দো মন-ই জ-গোসফ-দ-ই

রানি,

ওয়ার-গাহ-মন-ওয়ার তো নিশ-স-তে

দর ওয়েরানি

আরেশ-ই বোদ-অন-ন-হদ-হর-

সদুলতানি

এর ইংরিজী—

Here with a loaf of bread

beneath the bough,

A flask of wine, a book of

verse—and Thou

Beside me singing in the

Wilderness—

And Wilderness is Paradise

enow.

(ফিটস্‌জেরাল্ড)

তার বাঙলা—

সেই নিরালা পাতায় ঘেরা বনের ধারে

শীতল ছায়,

খাদ্য কিছদ, পেয়ালা হাতে, ছন্দ গেঁথে
 দিনটা যায় !
 মৌন ভাঙি তার পাশেতে গুঞ্জে
 তব মঞ্জু সদর—
 সেই তো, সখি, স্বপ্ন আমার,
 সেই বনানী স্বর্গপদর ।
 (কান্দি ঘোষ)

কিংবা
 বনচ্ছায়ায় কবিতার পদার্থ
 পাই যদি একখানি
 পাই যদি এক পাত মন্দিরা আর
 যদি তুমি রানী
 সে বিজনে মোর পাম্বে বসিয়া
 গাহো গো মধুর গান
 বিজন হইবে স্বর্গ আমার
 তৃপ্তি লাভবে প্রাণ ।
 (সত্যেন দত্ত)

যার প্রাণে যা চায় তিনি সেই ভাবে অনুবাদ করেছেন । ঠেয়ামের খড়বাইয়ের কাঠামোর উপর যে যার আপন মানসমূর্ত্তি স্বপ্নপ্রতিমা গড়েছেন ; আসলে কিস্তু আছে,

উত্তম ময়দার তৈরি রুটি যদি
 হাতে থাকে,
 আর যদি থাকে দু'মণ মদ এবং
 বাচ্চা ভেড়ার আস্ত একখানা ঠ্যাং (রান),
 ঘুঘু-চরা পোড়ো বাড়িতে কাছাকাছি বসে
 তুমি আমি দু'জনা
 সে আনন্দ বহু সুলতানেরও ভাগ্যে
 জোটে না ।

ঠেয়াম এ কবিতায় 'কবিত্ব' করেন নি । তিনি সাধামাটা ভাষায় বলছেন, তাঁর কি কি চাই । মোলায়েম কবিতায় বিলকুল অচল হওয়া সঙ্গেও তিনি ভেড়ার একখানা আস্ত ঠ্যাং (রান্ কথটা আসলে ফারসী এবং তিনি ইটি এশ্বলে নির্ভর্যে ব্যবহার করেছেন) অর্ডার দিয়েছেন এবং পাছে নেশা জমাবার আগে মদ ফুরিয়ে যায় তাই পাক্ষা দু'মণ খাঁটি চেয়েছেন । এবং লক্ষ্য করার বিষয় তিনি কবিতার বই আদপেই চান নি । সে জিনিস যে পারে সেটা সে চায় না । মাটি থেকে পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে যে ঘড়ির উপর নাচতে পারে । সে প্রিয়াকে নিয়ে বোট-নিক্সে পিকনিক করতে যাওয়ার সময় ডান্ডা ঘাড় বগলে করে নিয়ে যায় না । এবং আসল কথাটা দুই বাঙালী অনুবাদকই ঘুলিয়ে ফেলেছেন । ঠেয়াম

বলেছেন, 'যা সব চাইলুম তা পেলে আমি জাহান্নামেও যেতে রাজী আছি, ওরকম 'জাহান্নাম' রাজা-বাদশার কপালেও জোটে না।'

যে ইরান-সন্তান চতুঃপদীটির ফরাসী অনুবাদ করেছেন তিনি মূল তথ্যটি ধরতে পেরেছেন বলে খৈয়ামের প্রতি অবিচার করেন নি।'

Pour celui qui possede un
morceau de bon pain.

Un gigot de mouton, un grand
flacon de vin,

Vivre avec une belle au milieu
des ruines,

Vaut mieux que d'un Empire
etre le souverain.

(এতেস্-সাম-জাদে)

কিন্তু আমার মূল বক্তব্য এখানে তা নয়।

আমি বলতে চাই, কবিতা বা অন্য কোনো বস্তু অনুবাদ করার সময় এ শূচিবাই কেন? কেন লোকে ধরে নেয় যে কাব্যে ভেড়ার ঠ্যাং চলতে পারে না? ইংরেজ এ শূচিবাই শিখেছে গ্রীকদের কাছে। তাদের 'ভিনাস' মূর্তি দেখে এক সরলা নিগ্রো রমণী শূধিয়েছিল, 'শরীরের নিচের আধা সম্বন্ধে মেয়েটার অত লজ্জা কেন? ওটা ছালা দিয়ে ঢেকেছে কেন?'

যুগে যুগে রুচি বদলায়। অনুবাদ করার সময় যদি আপন যুগের রুচি দিয়ে পূর্ববর্তী যুগের রুচির উপর সেনসর চালাই তবে কবির প্রতি তো অবিচার করা হয়ই, পরবর্তী যুগের রসিকজনের প্রতিও অমর্যাদা দেখানো হয়। কোনারকের মন্দির বহু সায়েবসুবোর রুচিতে বাধে। তাই বলে আমরা তো আর মন্দিরগুলোর মন্ডু বাইরে রেখে বাকি ধড় কম্বল চাপা দিয়ে রাখি নে।

ওমরের স্মরণে আমি একখানা পুরো রানই অর্ডার করতে চেয়েছিলুম, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল, পরশু রাতের শিক্ষা।

১ স্বরাজ লাভের পর দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে আমাদের কৌতুহল বেড়েছে। বিশেষ করে ইরান, আরব ভূখণ্ড যখন নানা রকম আন্দোলন-আলোড়নের সৃষ্টি করে তখন এদেশের বহুলোক জানতে চান, এর পিছনে তত্ত্ব কতটুকু? এমন কি এদেশের চিত্রকররা পর্যন্ত জানতে চান, ইরান তুরানে ছবি কিভাবে আঁকা হচ্ছে?—সেই পুরানো পর্শ্বিত, না মডার্ন প্রভাব তার উপর এসেছে? আমার কাছে তেহরানে প্রকাশিত যে সচিত্র খৈয়াম আছে তার ছবি দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, এর কলাকার প্রাক্ রবি বর্মী (আমাদের হিসাবে) যুগের। চিত্রকর ফিট্‌স্‌জেরাল্ডের স্মরণে খৈয়ামের হাতে একখানা কবিতার বই দিয়েছেন, পুরো রান না দিয়ে পেলেটে একখানা ছোট্ট মটন চপ রেখেছেন এবং মধের বোতলটি খড়ে মোড়া—ইতালিয়ান কিরান্টি বোতলের মত।

তখন সম্মুখে আটটা। দেশের হিসেবে রাত দেড়টা। সব এদেশে এসেছি ; শরীরটা এদেশের টাইমে খাভ হচ্ছে হয় নি। ভাতিজাকে বললুম, ‘বাবাজী, আমি আর বেরুচ্ছি। তুমি আলসেস্-ফেস্ট কিছু একটা নিয়ে এস—রুটি-মাখন ঘরেই আছে। তাই দিলে দিবা চলে যাবে।’

মুদ্রাসংস্কার মশাই যখন ফিরে এলেন তখন দেখি তাঁর হাতে এক ঢাউজ খলতে—বাঙাল দেশে বলে ঢোস্কা।

মিনির মত সরল চিন্তে শূদ্রালুম, ‘এর ভিতর কি হাতি?’

বললে, ‘সর্বনাশ হয়েছে, স্যার!’

এম্মে বলে রাখা ভালো, মুদ্রাসংস্কার ‘সর্বনাশ’টা খাস কলকাতাই। মোকামে পে’ছে যখন দেখলে তার বহু পয়সার মাল শান্তিনিকেতনের একটা ডকুমেন্টারি ফিল্ম বেমালুম গায়েব হয়ে গিয়েছে, তখন ‘টুথব্রাশমুদ্রাসংস্কার’ হাত বুলিয়ে বলে, ‘মাক গে’ আবার যখন পাতলুনের পকেট খুঁজে পায় না তখন বলে সর্বনাশ হয়েছে।

আমি তার সর্বনাশে বিলক্ষণ অভ্যস্ত বলে হাই তুলতে তুলতে নিশ্চিন্ত মনে শূদ্রালুম, ‘কি সর্বনাশ হয়েছে? দেশলাই খুঁজে পাচ্ছে না?’

‘কি করে জানবো বলুন, এদেশে মুদ্রাসংস্কার সাইজ হয় দেশের খাসির? আপনি তো আলসেস্ চেষ্টাছিলেন,—রেস্তোরাঁওলা বললে, ‘কাবার’। আমি বললুম, ‘আলসেস্ নেই তো নেই—চিকেনস্ দাও।’ ভার্গাস ‘হাফ-এ-চিকেন’ বলেছিলুম, তাই রফে। দেখুন।’

সেই চিকেন আমরা দুই পুরুষটু পাঠায় দেড়-বেলায় শেষ করি!

তারই স্মরণে অতখানি অভ্যাস না করে যৎসামান্যের হুকুম দিলুম।

চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখি, সবাই গোরার পাল। একটি মাত্র ভারতীয়ও নেই। মেনুর দিকে নজর যেতেই কারণটা বুঝতে পারলুম। এক-একটি পদের যা দাম তাই দিয়ে যে কোন লন্ডনবাসী ভারতীয় ছাত্রের আড়াইখানা পুরো লাগে হয়! মুদ্রাসংস্কার মত পিস্টন না থাকলে এরা এখানে আসতে পারে না।

বিলেতফের্তা বাঙালীদের নিয়ে দেশে বহু আলোচনা হয়ে গিয়েছে। এক-কালে এদের অনেকেই আর দিশী ভালভাত ধুতিচাদরে ফিরতেন না। তারপর বিশেষ করে চিত্তরঞ্জন দাস যে ভৌতিকবাজি দেখালেন তা দেখে আর বিলিতিয়ানা করার সাহস অল্প ‘সায়েরের’ই রইল। কিন্তু যে সব ইংরেজ এদেশে বহু বছর কাটিয়ে বিলেত ফিরে যায় তাদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু জানা নেই। তবে শুনছি, ড্রাইভার রাখার মত পয়সা ছিল না বলে লর্ড রোনাল্ড্-শেকে ট্রামেবাসে দেখা যেত। এদের সম্বন্ধে সবচেয়ে ভালো লিখেছেন উড্-হাউস্। তাঁর ধারণা এদের মাথায় ছিট ধরে। কেউ কেউ ন্যাক ডিনার আরম্ভ করে পুডিং দিয়ে ও শেষ করে সুপ দিয়ে!

তবে এ কথা বিলক্ষণ জানি এ দেশ থেকে তারা দুটো অভ্যাস নিয়ে যায়। স্নান করা ও মশলাদার খাদ্য খাওয়া। এই যে আজ ইংলন্ড-জার্মানিতে বাথ-রুমের ছড়াছড়ি না হোক, ব্যবস্থাটা অন্তত আছে (জার্মানিতে ম্যুনিচিপালিটির

আইন হয়েছে, কটা শোবার ঘর হলে কটা বাথরুম অবশ্য তৈরী করতে হবে। তার প্রধান বাহক চা-বাগানের ইংরেজ। আমার এক বন্ধুর কাছে শোনা, তাঁর সময়ে অর্থাৎ ১৯১৭ খৃস্টাব্দে সমস্ত অক্সফোর্ডে নাকি মাত্র দুটি বাথরুম ছিল। তাই নিয়ে এক বাগিচার সায়েবের ছেলে কর্তৃপক্ষকে ফরিয়াদ জানালে তাঁদের একজন বলেন, 'তোমরা তো এখানে একনাগাড়ে থাকো ছ' হপ্তা (তখন বোধ হয় এক টার্ম বলতে ঐ সময়ই বোঝাতো) ; ছুটিতে বাড়ি ফিরে চান করলেই পারো।'

অর্থাৎ ছ' সপ্তাহে একটা স্নানই ইংরেজ বাচ্চার জন্য যথেষ্ট। খেড়ের জন্য বোধ হয় ছ' বছরে একটা। ফরাসীরা তো শূন্যে চান করে নদীতে আত্মহত্যা করার সময়।

কেন? তারা তাদের কলনি ইন্দোচীনে চান করতে শিখল না কেন? এখনো তা ফ্রান্সের চোম্ব আনা বাড়িতে চানের ঘর নেই। বলতে পারবো না। তবে প্রশ্নেয় ক্ষতিমোহন সেন মহাশয়ের কাছে শুনছি, তিনি চীন দেশের বিরাট নদী দিয়ে জাহাজে করে গিয়েছেন কিন্তু কোনো চীনােকে নদীর জলে স্নান করতে দেখেন নি।

আর এদেশের মশলামাথা রাম্মা খেয়ে ইংরেজের স্বভাব এমনই বিগড়ে যায় যে, দেশে ফিরে তাকে যেতে হয় ভারতীয় রেস্টোরাঁতে। এদের পয়সাও প্রচুর; তাই বোধ হয় খাস করে এদেরই জন্য এই তালু-পোড়া দামের রেস্টোরাঁ।

ইংরেজের যে কটি প্যারা সস্—যথা উস্টার, এইচ বি—এগুলো নাকি সর্ব-প্রথম ভারতবর্ষেই তৈরী হয়েছিল। এগুলো বানাতে যে সব মশলার প্রয়োজন হয়, সেগুলো যে ইয়োরোপে গজায় না সেকথা ভালো করেই জানি। এমন কি আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে যে সব তরকারি গজায় সেগুলো আপন দেশে গজাতে পারে না সাউথ অ্যামেরিকা থেকে আনিয়ে খায়। ঠিক বলতে পারবো না, তবে বেগুন খেতে শিখেছে বোধ হয় মাত্র ত্রিশ বৎসর।

আবার বলছি, এসব ত্বের মাহাত্ম্য আমার বহু পাঠক দেবেন না। কিন্তু আমি সাধারণ জিনিসের খেই ধরে তদ্ব্যচিন্তা করতে ভালোবাসি। যেমন ইংরেজ বেগুন খেতে শিখেছে বটে, কিন্তু সেটা খায় সেম্ব করে যতদূর সম্ভব বিশ্বাস বানিয়ে। বেগুন-পোড়া যে তার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি, সে তব্ব এখনো আবিষ্কার করতে পারে নি। ঠিক তেমনি মার্কিন জাত রেড্ ইন্ডিয়ানের কাছ থেকে মর্দি খেতে শিখেছে বটে, কিন্তু তেল, পেঁয়াজকুচি (পাঁপরভাজা বাদ দিন) দিয়ে খেতে শেখে নি।

আমি শব্দ ভাবি ওসব 'সামান্য' জিনিস আবিষ্কার করতে মানুষের কত শত বৎসর লাগে।

ফার্পোতে যখন কেউ বাঁ হাতে ছুরি নেয় তখন তার কাবেল বন্ধুরা ফিস্-ফিস্ করে ভুল বাংলা দেয়। এখানে দেখি 'উল্ট-পরাণ'। পোলাও খেয়ে যাচ্ছে তো খেয়েই যাচ্ছে। মাংসের কারিটা পাশে পড়ে আছে। মেশাবার কথা মাথায় আসে নি। কাবাব যাচ্ছে তো যাচ্ছেই—পাশে চাপাতি পড়ে পড়ে

জুড়িয়ে হিম হয়ে গেল। ওঁকিব-হালরা তখন ফিস্ ফিস্ করে অ্যামেচারদের তালিম দিয়ে দরদস্ত করার চেষ্টা করছেন।

এইবারে রসভঙ্গ করতে হল। আর চেপে রাখতে পারলুম না।

রামা পছন্দ হল না।

মাদ্রাজী মশলা দিয়ে মোগলাই খানা এই আমি প্রথম খেলুম। এ যেন সেমেন্ট দিয়ে তাজমহল বানানো, কিম্বা মাইকেল অমিত্রাক্ষরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া, অথবা মাদ্রাজী মোগলাই মালমশলাই থাক—দক্ষিণের রাজগোপাল-আচার্যকে উত্তরের চোগাচাপকান পরানো।

কিন্তু তবু খেতে মন্দ না। এ তো হাড্ডিসার মৃগী ভেজাল দ্বালদা দিয়ে রামা নয়। মৃগীটা যেন চবিওলা খাসী আর যে মাখন দিয়ে রামা করা হয়েছে সেটা এদেশে সত্যযুগে পাওয়া যেত। দেশে থাকতে আমি তো একবার প্রস্তাব করেছিলাম, কোনোগতিকে একটুখানি খাঁটি গাওয়া ঘি ষোগাড় করে মিউজিয়ামে রাখার জন্য—যাতে করে ভবিষ্যৎশায়ীরা জানতে পারে এককালে বাঙলা দেশের লোকে কি খেত।

তখন প্রায় রাত দুপুর। রাস্তায় বেরিয়ে পিকাডেলি। সচরাচর যাকে পৃথিবীর সব চেয়ে পদ্রনো ব্যবসা বলা হয়, তার সঙ্গে সেখানে মৃত্যুমুখী মোলাকাৎ।

এ ব্যবসা সম্বন্ধে লিখবো কি না মনঃস্থির করতে পারছি নে।

শ্যামবাজারের মামা নাকি হেদো না পেরিয়ে দু'বছরে তিন লাখ টাকা ফুঁকে দেওয়ার পর বিলেতগামী ভাগনেকে সদৃপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'কোথায় যাবি বাবা, সেই জল, সেই ঘাস, সেই গাছ। ওগুলো দেখবার জন্য আবার বিদেশ যাবি কেন?'

আমাদের গ্রামের ভিতর যখন প্রথম ইঞ্জিন এসে রাতের বাসা বাঁধলো, তখন ছেলেবুড়ো সবাই হৃদয়মুগ্ধ হয়ে সেই কলের গাড়ি দেখতে গেল। ফিরে এসে সবাই যখন ইঞ্জিনের প্রশংসায় অষ্টপ্রহর পঞ্চমুখ তখন মৃদুস্বাী কলীমুল্লা বলেছিলেন, 'যা বলো যা কও, উই আমাদের আগুন উই আমাদের জল ছাড়া বাবুদের চলে না। আকান্টা পবনের নৌকোই বানাও, আর চিল্লীমারা "ইঞ্জিলই" বানাও সেই আগুন, সেই জল।'

এ তো সাধারণ লোকের কথা। স্বয়ং বাইবেল বলেছেন, সেই খবির মুখ দিয়েই, যিনি 'ইট, ড্রিক অ্যান্ড বি মেরি' হতে সদৃপদেশ দিয়েছেন 'যা ছিল তাই হবে, যা করা হয়ে গিয়েছে তাই আবার করা হবে; এ সংসারে নতুন কিছু নেই।'

বেশীর ভাগ লোক দেশত্যাগে যায় নতুন কিছু দেখবার জন্য। এবং গিয়ে দেখে সেই জল, সেই ঘাস।* আবার অন্য অনেক লোক বিদেশ গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দেশের সম্বন্ধে লেগে যায়। প্যারিস গিয়ে খবর নেন, সেখানে আপন দেশের

কেউ আছে কি না। তাকে খুঁজে বের করে শুধায়, ‘রাইস-কারি’ কোথায় পাওয়া যায়? সেই খেয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরোতে বেরোতে বলে, ‘চলো, দাদা, চট করে মোড়ের বদর দোকান হয়ে যাই।’—পাড়ার বদর পান বিখ্যাত!

আমি দেশক্রমে উপকারিতার চেয়ে অপকারিতাই দেখতে পাই বেশী। সে বিষয়ে অন্যত্র সর্বিস্তর আলোচনা করেছি। তবে এ বাবদে বলতে পারি, ভালো করে তাকিয়ে নেখলে বোঝা যায়, সব কিছুর পুরাতন হলেও নতুন। বিলেতের ঘাস ঘাস, কিন্তু সে ঘাস আমাদের ঘাসের মত ঘন সবুজ নয়, একটু-খানি ফিকে, কেমন যেন হলধে ভাগটা বেশী। গাছপালার তো কথাই নেই। জলের শব্দও অন্য রকম। একমাত্র আগুনে আগুনে কোনো পার্থক্য দেখি নি! তাই বোধ হয় পৃথিবীতে অগ্নি-উপাসকের সংখ্যা এখনো প্রচুর।

সেটা অবশ্য প্রথম যৌবনের প্রথম সফরে লক্ষ্য করি নি।

প্রথমবারের কথা বলছি।

একটানা জন্মনিতে থাকার পর অচেনা জিনিস দেখে দেখে যখন মন ক্রান্ত তখন গিয়েছি নেপলসে—জাহাজে করে দেশে ফিরবো বলে। জাহাজ লেট। দুদিনের তরে সেই নির্বাসিত বন্দরে আটকা পড়ে গেলুম। নিতান্ত কোনো কিছুর করার ছিল না বলে গেলুম পম্পেই দেখতে। (এম্বলে কিংবদন্তি অবাস্তুর এবং নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার হলেও বলি, আমি স্বেচ্ছায় কেবলমাত্র ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কখনো বাড়ি থেকে বেরোই নি—বেরিয়েছি প্রয়োজনের তাগিদে। মাত্র একবার আমি কাইরো থেকে স্বেচ্ছায় পূণ্যভূমি প্যাালেস্টাইন দেখতে গিয়েছিলুম। সেখানে ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানের সঙ্গম। ধর্মচর্চাতে (আচরণে নয়) আমার চিরকালের শখ।)

পম্পেই মধ্য কিম্বা দক্ষিণ ইতালিতেও বলতে পারেন। আবহাওয়া একটু-খানি গরম।

পম্পের টিলার নীচে বাস থামতে হঠাৎ দেখি সামনে একজন করবীগাছ।

ওঃ! সে কী আনন্দ হয়েছিল! এ-জীবনে প্রথম যে গাছ চিনতে শিখি সেটি করবী। আমাদের দেশ বলে ঘণ্টা ফুল। মা আমার চিনিয়ে দিয়েছিল। তারপর যখন তিনখানা বই পড়া শেষ হয়ে গিয়েছে, তখন চাচা বললেন, ‘করব’ আর ‘করবী’তে যেন গোবলেট না পাকাই! তারপর নিজের থেকেই শিখলুম, করবী পাঁচ রকমের হয়;—স্বেত, পীত, রক্ত, কৃষ্ণ এবং পাটল—কৃষ্ণকরবী এখনো দেখি নি। সর্বশেষে শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবস্থায় রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনলাম ‘যক্ষপূরী’। পরে তার নাম হল ‘রক্তকরবী’। এখন শিখলুম, ইতালির ভাষাতে ওলে-আন্দ্রো।

এ ফুলটি তাই কত স্মৃতি-বিস্মৃতিতে বিজড়িত। ‘বিস্মৃতি’ বলার কারণ সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলুম, ছেলেবেলায় নামদূরে চণ্ডীদাসের ভিটে দেখতে গিয়ে পেলুম ডাক-বাঙলোর একপাশে অঙ্গুর করবীগাছ—এই শূকনো খোয়াই-ভাঙার দেশ বীরভূমে।

কিন্তু করবীর সঙ্গে আমার পরিচয়ের দীর্ঘ ফিরিস্তিতে কার কোন

কোতুহল? কোতুহল তখনই হয় যখন কেউ সেই পম্পইতে হঠাৎ দেখা করবীকে নৈবাঁজিক স্তরে তুলে রস-স্বরূপে প্রকাশ করতে পারে। যেমন রবীন্দ্রনাথ দেশে বসেই গাইলেন,—

‘আবেশ লাগে বনে

শ্বেত-করবীর অকাল জাগরণে—’^১

সঙ্গে সঙ্গে রসের মাধ্যমে করবী এসে আমাদের হৃদয় দখল করে বসে। সার্থক ভ্রমণকাহিনী-লেখক তাই নতুন পুরাতন উভয় অভিজ্ঞতাকে সমাহিত চিত্তে স্মরণ করে রসস্বরূপ প্রকাশ করেন। ভ্রমণ উপলক্ষ মাত্র।

কিন্ধা হয়তো তথ্য পরিবেশন করেন। সেটা যদি রসরূপে প্রকাশিত হয়, তবে আরো ভালো। কিন্তু রস নেই, এবং তদুপরি যদি সে তথ্য কারো কোনো কাজে না লাগে তবে সেটা বলে কি লাভ আনিতিক বুদ্ধিতে পারি নে। কাবুলের অনৈসর্গিক মৌন সম্পর্কের কাহিনী এদেশে কেউ কেউ শুনছেন, সেখানে অকর্ষিত গণিকাবৃত্তিও আছে, কিন্তু সে-সব তথ্য কারো কোনো কাজে লাগবে বলে আমার মনে হয় নি। এই নিয়ে আমার চারবার ইয়োরোপ যাওয়া হল। গণিকাবৃত্তি চোখে পড়ার কথা। এ নিয়ে সে-দেশের ছাত্রসমাজে নানা আলোচনাও হয়ে থাকে। বিশেষ করে যারা আইন ও ডাক্তারি পড়ে। সেগুলো অনেক সময় শুনতে হয়। সত্যিথরা হয়তো বা জিজ্ঞেস করে বসে, ‘তোমাদের দেশে কি রকম?’

তবু এ সম্বন্ধে আমি কোন কিছু লেখার প্রয়োজন বোধ করি নি। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে, যার পর হয়তো অল্প কিছু বলার সময় এসেছে।

গত বৎসর হঠাৎ খবর এল সরকার সোনাগাছির (কথাটা আসলে ‘সোনা-গাজী’—হাতোমে আছে) গণিকাদের প্রতি আদেশ করেছেন, তারা যেন ওপাড়া ছেড়ে চলে যায়।

তাহলে প্রথম প্রশ্ন, তারা যাবে কোথায়? তারা যদি ভদ্রপাড়াতে একজন কিংবা দু’জনে মিলে ঘর ভাড়া নেয়, তবে সরকার কোন আইনে তাদের ধরবেন কিংবা যে বাড়ি ভাড়া দিয়েছে তার বিরুদ্ধে সরকার কোন মোকদ্দমা আনবেন কি না, এসব কথা খবরের কাগজে ভালো করে বেরায় নি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এরা উদ্ভাস্ত হয়ে বেশী ভাড়া দিতে রাজী হবে, এবং কলকাতাতেও লোভী বাড়িগুলার অভাব নেই। প্রায় ঠিক এই ধরনের একটা ব্যাপার ঘটে কিছুদিন পূর্বে দিল্লী শহরে। সরকার আইন করে রেস্তোরাঁ এবং মদের দোকানে মদ, অর্থাৎ প্রকাশ্যে মদ্যপান বারণ করে দিলেন, কিন্তু দোকানে মদ কিনে বাড়িতে গিয়ে খাওয়া নিষিদ্ধ করলেন না। ফলে যে পাপকর্ম সে বাইরে করতো, পদ্র

১ হেমন্ত ছাড়া অন্য কোনো সময় গাইতে হলে রবীন্দ্রনাথ এ-গানের ‘হেমন্তের বগলে’ ‘নিরুজ্জ’ ও ‘অকালে’র বদলে ‘হঠাৎ’ করে গাইতেন। তথ্যটি অন্য কোথাও ছাপাতে বোধি নি বলে উল্লেখ করলুম।

কন্যা জ্ঞানতে পারতো না, সেইটে অনেক বাড়ির ভিতরে আরম্ভ হয়ে গেল। ফলে পুত্র এবং কোনো কোনো স্থলে কন্যাও যদি মদ খেতে শেখে, তবে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আমি সমাজ-সংস্কারক নই তবু তখন কাগজে লিখেছিলাম মদ্যপান এদেশে এখনো এমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে নি, যার জন্য জুজুর্ ভয় দেখাতে হবে। আসল প্রয়োজন, যেন নতুন কনভার্ট না হয়, অর্থাৎ আজকের ছেলেছোকরারা যেন মদ খেতে না শেখে। যে রকম আফিগের বেলায় নতুন পারমিট না দেওয়ার ফলে আসাম থেকে আফিগ খাওয়া উঠে যাচ্ছে। দোকানে মদ না খেতে পেয়ে কতটা যদি বাড়িতে মদ খেতে আরম্ভ করেন, তবে তো কনভার্টের সংখ্যা বাড়বে! এ বাবদে বিধানবাবু সাউথ ক্লাব থেকে মদ তুলে দিয়ে অতি উত্তম কর্ম করেছেন। ছেলে-ছোকরারা সেখানে যেত টেনিস খেলতে। 'বারে' যেতো শরবৎ খেতে। শরবৎ থেকে শরাব প্রমাণ কঠিন কর্ম নয়—দুটো শব্দই আরবী 'শারাবা'—'পান করা' থেকে এসেছে।

এসব অবাস্তব নয়। সরকার যদি মনে করে থাকেন যে, সোনাগাঁছি-বাসিন্দাদের ভিটে ছাড়া করতে পারলেই সর্ব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, তবে তাঁরা মারাত্মক ভুল করছেন। ভদ্র গৃহস্থ উদাস্তদের নিয়েই আমরা কি রকম হিম্মতি খাচ্ছি—সেটা শেরালদাতে না নেমেও স্পষ্ট বোঝা যায়। এত সহজে এ সমস্যার সমাধান হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, 'দীর্ঘতম পন্থা অনুসরণ করলেই স্বল্পতম সময়ে পৌঁছানো যায়।' এটা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না বলা কঠিন, কারণ গোটেডন রুল ইজ দ্যাট দেরার ইজ নো গোটেডন রুল, কিন্তু সচরাচর যে ব্যবসাকে সংসারের প্রাচীনতম ব্যবসা বলে বহু পণ্ডিত স্বীকার করে নিয়েছেন তার ওষুধ একটি বাড়িতেই হয়ে যাবে এ-কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

আসলে আমরা বিলেতের অনুকরণ করছি। বিলেত প্রথমে বা গণিকালয় তুলে দিয়েছে, আমরাও দিয়েছি। ফলে লন্ডনের গণিকারা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে—আমাদের ছড়ায় নি। বোঝা গেল, ওষুধ না ধরাতেই আমরা উপকৃত হয়েছি বেশী।

এস্থলে একটি কথা না বললে কলকাতার প্রতি অবিচার করা হবে।

কলকাতার আপন জন না হলেও আমি তল্ল শত বোষ স্বীকার করি। কলকাতার শিশুরা সস্তায় খাঁটি দুধ পায় না, রুগীরা হাসপাতালে স্থান পান না, ওষুধ কালাবাজারে ঢুকেছে ভেজালের অন্ত নেই, এরকম অবর্ণনীয় নোংরা শহর ত্রিভুবনে নেই, ট্রামে বাসে পালোয়ানরাই শুধু উঠতে পারে, শেরালদা-হাওড়াতে ট্রেন যা লেট হয়, তাও পানক্চুয়ালি হয় না—অবস্থা অবর্ণনীয়।

কিন্তু এই যে কলকাতা শহরে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত—এত বেশী পুরুষ এবং এত কম মেয়ে—এ অনুপাত পৃথিবীর কোনো বড় শহরই দেখাতে পারবে না। এটা কিছু গর্বের বিষয় নয়, কিন্তু আমি বিদেশ থেকে ফিরে বার বার গর্ব অনুভব করেছি যে, এ শহরের লোক যৌন-স্বাধীন সম্বন্ধে কতখানি অচেতন, কিংবা তারা সন্যোগ পায় নি, সেটা কেন তৈরী করে নি, তা জানি নে।

ইয়োরোপে যখনই যুদ্ধের ফলে বা কোনো কারণে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায় এবং বিদেশী সৈন্যের মিত্র বা শত্রুভাবে আগমন হয়, সঙ্গে সঙ্গে জারজ সন্তানের সংখ্যা যে কী অসম্ভব রকম বেড়ে যায়, তা দেখে সমাজসেবীরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এবারে সে সংখ্যা এমনই হিসেবের বাইরে চলে গেল যে শেষটার পাদ্রীসান্নেবরাই প্রস্তাব করলেন জারজ শিশুদের যেন সমাজ ও ধর্মপ্রতিষ্ঠান আইনত ন্যায্য বলে স্বীকার করে নেয়।

শাস্তির সময়েও এরকম ধারা হয়। উত্তর ইয়োরোপের কোনো একটি দেশে অনুপাত অস্বাভাবিক হয়ে যাওয়ায় দেখা গেল বহু পুরুষ একটি স্ত্রী এবং একটি করে 'রক্ষিতা' পুষছে। 'রক্ষিতা' বলা ভুল, কারণ এ রমণী ভদ্রঘরের মেয়ে, বেশ্যাবৃত্তি কখনো করে নি, তার প্রতিপালকের সঙ্গে তার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, তার পুত্র-কন্যা আছে, সমাজে সে অপমানিত নয়। অনেক স্থলে তার আসল স্ত্রী এ রমণীর খবর জানেন, এবং কোনো স্থলে পালা-পরবে দুই পরিবার একত্র হয়ে আনন্দোন্মাস্ত করেন। বস্তুত আমাদের দেশে কোনো পুরুষের যদি দুই স্ত্রী থাকে এবং তারা যদি ভিন্ন ভিন্ন বাড়িতে থাকে তাহলে সচরাচর যা হয়ে থাকে।

কোনো কোনো বুদ্ধিমান সমাজসেবী তাই প্রস্তাব করেছেন, এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থার চেয়ে ঢের ভালো হয়, এই সব লোকদের আইনত দুটি বিয়ে করার অধিকার দেওয়া। কিন্তু খৃষ্টধর্মে এক স্ত্রীর জীবিতাবস্থায় দ্বিতীয় বিবাহ বেআইনী—তাকে তালাক না দিয়ে। ক্যাথলিক ধর্মে আবার ঠিক তালাকের ব্যবস্থাও নেই—সেখানে প্রমাণ করতে হয়, বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানের চুটি থাকায় বিয়েটা আদর্শেই হয় নি। ধর্মের অনুশাসন এড়াবার জন্যে কেউ কেউ তার সুবিধেও নিয়ে থাকেন।

অথচ ইয়োরোপে আমাদের বন্ধনামের অন্ত নেই—আমরা বহুবিবাহ বিশ্বাস করি, আমরা হারেম পুষি।

দুশমন সকলেরই থাকে। খৃষ্টের ছিল, সক্রাতেসের ছিল। আমাদেরও আছে। ইয়োরোপেও আছে।

তাদেরই কেউ কেউ আপনাকে অপ্রস্তুত করার জন্যে পাঁচজনের সামনে শূন্যবে, 'আপনাদের ঘেঁষে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে—না?'

আমি কোথায় না লজ্জা পাবো, উল্টে একগাল হাসি। যেন বঙ্গ দু'কান কাটা। বলি, 'বিলক্ষণ! একটা, দুটো, চারটে—মুসলমান হলে—যত খুশী। আর হিন্দু হলে তো কথাই নেই। এক মদুখুযের ছিল আটশ', বাড়ুখুযের ছ'শ', চাটুখুযের চারশ', বেচারী গাঙ্গুলীর মাত্র আশী—ঘোষালের ফদা জানা নেই।' কয়েতরা অতখানি না, তবে তাঁরাও ছেড়ে কথা কন নি। বার্নার্ড শ এ-ব্যবস্থার উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেছেন।

১ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ বইয়ে পুরো হিসেব আছে। আমি স্মৃতিশক্তি উপর নির্ভর করে বলছি। তবে হিসেবটা মোটামুটি এই।

সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী (৭ম)—২০

তারপর হঠাৎ অত্যন্ত গভীর হয়ে বলি, ‘এ-ব্যবস্থা অতি অসুপকাল স্থায়ী ছিল। আসলে ভারতের শতকরা নিরানব্বইজন লোক একটি মাত্র স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসে। যদিও একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অধিকার আইনত তার ঘোল আনা আছে।’^২

তারপর ধীরে ধীরে রসকসহীন অতি শূন্যকন্যা গলায় বলি, ‘এবারে আপনারা বন্ধুকে হাত দিয়ে বলুন তো, আপনাদের দেশে ক’জন লোক একদারনিষ্ঠ হয়ে, অর্থাৎ বিবাহের পূর্বে বা পরে অন্য কোনো কুমারী বা বিবাহিতের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে না এসে জীবন কাটায়? যদিও একাধিক স্ত্রীগমনের অধিকার আইনত আপনাদের নেই।’

যেন ফতেহপুর সিক্রির বুলন্দ দরওয়াজার নিচে দিয়ে যাচ্ছি। এই বিশাল উন্নতিশির দেউড়ি যেন স্থপতি ইচ্ছে করেই এমন ভাবে বানিয়েছেন যে, নীচে দিয়ে যাবার সময় মানুষ বৃষ্টিতে পারে সে কত নগণ্য।

কেন্সিংটন গার্ডেনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। গাছগুলো এমনি বিরাট, এমনি উঁচু যে, যেতে যেতে আমার মনে পড়ল বুলন্দ দরওয়াজার কথা। সেখানেও শীতের প্রভাবে কাঁপতে কাঁপতে ঢুকেছিলাম; এখানেও হেমন্তের শীতে জ্বলন্ত হয়ে সামনের দিকে এগোচ্ছি।

আকাশে একরঙা মেঘ নেই, বাতাসে এক ফোঁটা হিম নেই—স্বর্গদেব তাঁর ভাস্কর্য উজাড় করে স্বর্ণরৌদ্ৰ ঢেলে দিয়েছেন কিন্তু শীতের দাপট কমাতে পারেন নি। পার্ক থেকেই দেখতে পাচ্ছি, বয়স্করা ওভারকোট পরেছে। কাল বৃষ্টি নেমেছিল—তখন জোয়ানরা পর্যন্ত কাঁধে কাঁচিয়ে, মাথা নীচু করে, হ্যাট সামনের দিকে নামিয়ে দিয়ে হন হন করে চলেছিল গায়ের গরম বাতাসের জন্য। মেয়েরা কী করে হাঁটু পর্যন্ত ঐটুকু সিলেক্ট মোজা পরে শীত ভাঙায় সে এক সমস্যা। প্যারিসে দেখেছি, পেভমেন্টে ধারা পড়লো বই বিক্রি করে তাদের কোনও প্রকারের আগ্রহ নেই বলে দোকানের সামনে ঘন ঘন পাইচারি করে, আর দুই বাহু প্রসারিত, ডান হাত শরীরের বাঁ দিকে আর বাঁ হাত ডান দিকে খাষড়ায়। মাঝে মাঝে হাতের তেলো গরম করার জন্য দু’হাত আঁজলা করে মৃদু দিয়ে জোর ফুঁ দেয়।

কাল রাতের বৃষ্টি না আজ ভোরের হিমে গাছের পাতা সব ভেজা। সেগুন-গাছের পাতার মত তারা ওজনে ভারী—সারা গ্রীষ্মকাল রোদ আর জল খেয়ে খেয়ে তারা যেন পেটের অসুখ করে কেউ হলদে, কেউ ফিকে, কেউ বা কালো হয়ে গিয়েছে। আর কেউ টকটকে লাল—শুনছি, ঠিক মরার সময় কোনও কোনও মানুষের সব রক্ত এসে মূখে জড়ো হয়। টুপ করে কখনও এক ফোঁটা জ্বল এসে নাকের উপর পড়ে, কখনও বা হাতের উপর। কী ঠান্ডা! সঙ্গে

সঙ্গে অতি নিঃশব্দে দুটি লাল পাতা ।

দু'দিকে সবুজ ঘাসের লন । ঠিক সবুজ বলা চলে না । নীলের ভাগটা কম, হলুদেটাই বেশী । এখন না হয় হেমন্তের প্রথম শীতে তারা ফিকে হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ভরগ্রীষ্মকালেও আমি ইউরোপে কখনও দেশের কালো-সবুজ দেখি নি । আর ঘাসগুলোই বা কী অভদ্র রকমের লম্বা আর মোটা ! একে তো তাদের স্বভাব নেওয়া হয় প্রচুর, তার উপর বোধ হয় এদের মাড়িয়ে পাইচারি করা বাধার বলে কী রকম উত্তেজিত ভাবে মাথা খাড়া করে ধাঁড়িয়ে আছে । এরাও ভেজা । গায়ে হাত বুলোতে ইচ্ছে করে না । দেশে শীতের সকালে নৌকো দিয়ে যাবার সময় যে রকম ভিজ়ে সাপলা পাতায় হাত দিতে গা কির কির করে ।

দু'দিকের সবুজ লনের মাঝখানে কালো পিচের রাস্তা । ছোট্ট, এক ফালি । এ'কেবে'কে একটুখানি এগিয়ে গিয়ে ডান দিকে চলে গিয়েছে বিরাট হাইড্‌পার্ক, বাঁ দিকে গিয়েছে এ-বাগানেরই 'গোলদিঘি'র দিকে । সেই ফালি রাস্তা-টুকু আবার নিয়েছে নানা রঙের মোজারিক, কেটেছে ঝরা পাতার আলপনা । কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য আলপনা এক রকমের থাকে না । মুখে পাইপ, হলুদে গোঁপওলা বড়ো মালী এসে বাঁট দিয়ে সাফ করে যায় । সঙ্গে সঙ্গে দমকা বাতাসে আরেক 'প্রস্থ' রঙীন পাতা ঝরে পড়ে—আবার নতুন আলপনা আঁকা হয় ।

বেলা এগারোটো । সমস্ত পার্ক মেয়ে কেটে দশ-বারো জন লোক হয় কি না-হয় । শুনছি আরও সকালে, ছুটির দিনে এবং গ্রীষ্মকালে বেশী ভিড় হয় । লন্ডন শহরের লোক যে কাজ করে, ছুটির দিন ছাড়া আলসেমি করে না, এ-তব্বটা এদের ফাঁকা পার্ক দেখলেই বোঝা যায় । ইতালিতে অন্য ব্যবস্থা । তাদের পার্ক সব সময়েই ভর্তি—অবশ্য সে-দেশে টুরিস্টও যায় বেশী—এবং তাদের 'পাব'ও সব সময়েই গুলজার । সকাল দশটাই হোক আর বিকেল চারটাই হোক—জোয়ান মন্দেরা কাজকর্ম ছেড়ে ঘন্টার পর ঘন্টা সস্তা লাল মদ খায় আর 'ব্যাঙ্ক-গ্যামন্' খেলে । এ-খেলাটা আমি দেশে কখনও দেখি নি, অথচ ভূমধ্যসাগরের পারে পারে, ইতালি গ্রীস তুর্কি লেবানন প্যালেস্টাইন মিশর সর্বত্র প্রচলিত । তাই বোধ হয় এরা কেউ দাবা খেলাতে নাম কিনতে পারে নি ।

'ব্যাঙ্ক-গ্যামনের' সুবাদে একটা কথা বলে নিই । মিশরে ঐ খেলাতে পয়েন্ট গোনা হয় ফাসী'তে—আরবীতে নয় । আমরা যে রকম টেনিস খেলার সময় 'থার্টি ফিট', 'লাভ ফিফ্‌টিন', 'থার্টি অল্' বলি—'গ্রিশ-চাল্লিশ', 'ভালো-বাসার পনেরো' বা 'গ্রিশ সমস্ত' বলি নে । ফাসী'তে নম্বর গোনা থেকে বোঝা যায় খেলাটা আসলে ইরান থেকে মিশরে গিয়েছে । ঠিক তেমনি বাঙলা দেশের একাধিক গ্রাম্য খেলাতে দেখছি, নম্বর গোনা হয় কিহু-জানা-কিহু-অজানা ভাষায়—পুরোপুরি বাঙলায় নয় । এগুলো তবে কোন ভাষা থেকে এসেছে ? আমার বিশ্বাস, সত্যাকার রিসার্চ করলে তার থেকে বেরোবে আর্থ'রা

বাঙলা দেশে এসে কোনো জাতি-উপজাতির সংস্পর্শে এসেছিল। অনেক পশ্চিমত বলেন, সিন্ধুর সিন্ধুর আমরা সাঁওতালদের কাছ থেকে নিয়েছি। আমার বিশ্বাস, খেলার নশ্বরের অনুসন্ধান করলে আরও বেশী তথ্য এবং তথ্য বেরোবে। মমাগ্রজ গ্রামের অবাঙলা নাম নিয়ে বহু বৎসর খেটে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন আর্থ'ভাষীরা কোন্ কোন্ উপজাতির সংস্পর্শে এসেছিল। তাঁর ওসব লেখা কেউ পড়ে না। গবেষণা বলতে বাঙলা দেশে বোঝায়, তিনখানা বই পড়ে চতুর্থ বই লেখা। অর্থাৎ একখানা বই থেকে গাপ-মারা চুরি; তিনখানা বই থেকে চুরি-করা গবেষণা।

বেশী হাটাহাটি করলে পাছে ভগবান আসছে জন্ম-ডাকহরকরা বানিয়ে দেয় তাই গোলমিথির কাছে এসে একটা বেষ্টিতে বসে পড়লুম। পুকুরের জল স্বচ্ছ কালো। চতুর্দিকে অনেকখানি খোলা বলে জোর বাতাস শূন্য পাতা পুকুরের সব গুলি ছাড়িয়ে দিয়ে নিজেই ঢেউয়ে ঢেউয়ে এক পাড়ে জড়ো করেছে। মালী সেখানে দাঁড়িয়ে লম্বা আঁকশ দিয়ে টেনে এনে পুকুর সাফ রাখছে। একপাল পাতিহাঁস ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলছে। বাতাস হাড়ে হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে, স্বচ্ছ কালো জলের দিকে তাকিয়ে সে শীত যেন তার চরমে পৌঁছচ্ছে আর আহাম্মকের মত ভাবছি, হাঁসগুলো ঐ হিমে থাকে কী করে? উত্তর সরল; হিমালয়ের সরোবরে যখন থাকতে পারে তখন এখানেই বা থাকতে পারবে না কেন? কিন্তু চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না।

হঠাৎ একটা খেড়ে রাজহাঁস বিরাট দড়ো পাখা এলোপাতাড়ি খাবড়াথাবিড় করে পড়ি-পড়ি হয়ে ধপ করে নামল পাতিগুলোর মাঝখানে। তারা ভয় পেয়ে প্যাক প্যাক। এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ল। কী দরকার ছিল এদের এই শাস্তিভঙ্গ করার? রাজহাঁসটা ভেবেছে, পাতিগুলো এতক্ষণ ধরে ঐ কোণে যখন জটলা পাকাচ্ছে তখন নিশ্চয়ই ভাল খাবারের সন্ধান পেয়েছে।

তাই হবে। নিশ্চয়ই তাই। ইয়োরোপের পাতিজাতগুলো যখন এশিয়া আফ্রিকায় খাবার পেয়ে জটলা পাকাল তখন খেড়ে ইংরেজ তাদের তাড়িয়ে দিয়ে রাজ্য বিস্তার করল। সাথে কি আর বিষ্ণুশর্মা এসপ্ বলেছেন, পশুপক্ষীর কাছ থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করতে হয়। কিন্তু তাই করে কতকগুলো জাত যে পশুর মত আচরণ করলে, এবং এখনো করছে, তার কী?

আচ্ছা, যদি খুব শীত পড়ে আর পুকুরের জল জমে যায়—আমি স্বচক্ষে রাইনের মত নদী পর্যন্ত জমে যেতে দেখেছি—তাহলে এ হাঁসগুলো যায় কোথায়? কোথায় যেন পড়েছি, কবি দ্বংস করে বলেছেন, 'আমি মানস সরোবরের যেন ডানা-ভাঙা রাজহাঁস। চতুর্দিকে জল জমে গিয়ে বরফ হয়ে হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে, শেষটায় আমাকে পিষে মারবে। আমার সঙ্গী-সাথীরা অনেকদিন হল দক্ষিণে চলে গিয়েছে। আমার যাবার উপায় নেই।' হায়, আমাদের সকলেরই তাই। কারও পা খোঁড়া, কারও ডানা ভাঙা, কারও প্রিয় পালিয়ে গিয়েছে, কাউকে বা সরকার জেলে পুরে দিয়েছে—সবাই যেন বলছে, 'পিছিয়ে পড়েছি আমি, যাব যে কী করে!'

এদের জন্য নিশ্চয়ই কোনও ব্যবস্থা আছে। লন্ডন তো আর দেশেদে গ্ৰাম নয় যে, হাঁসগুলো গোলাবাড়ির খামারবরে গিয়ে আশ্রয় নেবে। পশুপ্রীতি ইংরেজের যথেষ্ট আছে। মিশর পরাধীন থাকাকালীন এক ইংরেজ হাকিম যখন এক মিশরী খচ্চরগুলোকে জরিমানা করে জন্তুটাকে পিটিয়ে আধ-মরা করে দেওয়ার জন্য—তখন সে মনের দ্বন্দ্ব বলেছিল, ‘আমি তো জানতুম না যে খচ্চর, আদালতে তোর এক দরদী ভাই রয়েছে!’

সামনে দিয়ে একটি মেমসায়েব চলে গেল। লম্বা লম্বা পা ফেলে—দেশের মা-মাসীরা দেখতে পেলেন বলতেন, ‘হুনোমুখো’। না পরনে সে শ্কাট নয় যা পরে বাসে উঠতে গেলে ছিঁড়ে যায়। এর পরনে হুবহু চীনা পাতলদুন। ক্লাইভ স্ট্রীটে বিস্তর দেখেছি। তবে চামড়ার সঙ্গে সে’টে টাইট, মেরে-কেটে পায়ের ডিম ছাড়ায় কি না-ছাড়ায়, আর লাল সবুজের মারাত্মক চেক। শিল-ওয়ার বুক, বড়ী মোরী—অর্থাৎ ঢিলে পায়জামা বুক, চীনে পাজামা বোঝাও অসম্ভব নয়, কিন্তু এই সৃষ্টিছাড়া পাজামা পরলে রমণীদেহের কোন সৌন্দর্যের কী যে খোলতাই হয় সেটা আদপেই বুঝতে পারলুম না। আর শরীরটাই না কী বাহারে! বার তিনেক না ঘোরালে বোঝা যায় না কোনটা সামনের দিক, কোনটা পিছন। যেন ‘মডার্ন পো’স্টিং’! গ্যালারিতে দেখে আমাদের মত বেকুবদের মনে সন্দ জাগে উল্টোটা টাঙায় নি তো?

ঘোবনে কুঙ্গুরী ধন্যা। সুবতী কখনও কুৎসিতা হয় না। তবে যার যেটা মানায় তাকে সেটা পরতে হয়। আজকাল তো আরও কত সব কল বোরিয়েছে শুনতে পাই। তা না হয় নাই বা হল। একটু ফোলা-ফাঁপার জামাকাপড়ও তো আছে। সাড়েবাইশ-গজী শিলওয়ার না-ই বা হল।

পিছনে আবার একটা কুকুর। মনিবের সেই মেলগাড়ির ভেজে চলার সঙ্গে পাল্লা রাখতে গিয়ে এই শীতে হাঁপিয়ে উঠেছে। অতিশয় অপ্রিয়দর্শন। ‘ডাকসুহুন্ট’ না কী যেন নাম। পিপের মত দেহ। মনে হয় যেন দূটো কুকুর জুড়ে একটা বানানো হয়েছে। অথচ আস্তে আস্তে চললে একেও হয়ত মন্দ দেখাত না।

সবসুন্দর জড়িয়ে মড়িয়ে থাকে বলে ‘কাল্ট অব দি আগর্নল’ অর্থাৎ ‘কুৎসিত ধর্ম’। মডার্ন কবিতা। যার বিষয়বস্তু, ডাস্টবিন, পচা ইঁদুর, মরা ব্যাঙ।

বিরক্তি হয় নি, দ্বন্দ্ব হয়েছিল। আসলে এরা তো কুৎসিত নয়। এসব গায়ে পড়ে করা। দেশকালপাত্র।

বাঁচালে। হাওয়াটা বন্ধ হয়েছে। ঐ হাওয়াটাই যত অনর্থের মূল। উর্নি বন্ধ হলে বেশ ওম-ওম ভাবটা জমে আসে। বেঞ্জির হেলানো মাথাটা চিত করে আকাশমুখো করলুম। ধূপ করে হ্যাটটা পড়ে গেল। তা পড়ুক। বন্ধ চোখে লাগল রোদের কুসুম কুসুম পরণ। বেশে গরমের দিনে চোখে ঠান্ডা জল দিলে যে রকম আরাম বোধ হয়। হাওয়া বন্ধ হয়েছে বলে পোড়া পেট্রলের গন্ধও নাকে আসছে না। এদেশের লোকের বোধ হয় অভ্যেস হয়ে গিয়েছে।

আমি তো সর্বক্ষণ হাতে গোঁফে চামেলী ঘষি। ভাগ্যিস খানিকটে আতঙ্ক সন্টকেসের পকেটে করে অজান্তে চলে এসেছে। এদেশের ও দ্য কলোন লেভেন্ডার ছিটোলে শীতটা যেন আরও ছমছম করে ওঠে।

এবারে হেমস্তুটা এই পোড়া লন্ডনেও হেমস্তু বলেই ঠেকছে। কাল গিয়েছিলুম মোটরে করে লন্ডনের উত্তরে, গ্রামাঞ্চলে মাইল বিশেক দূরে। তখন চোখে পড়েছিল সত্যকার হেমস্তু।

হেমস্তু নিয়ে এ-সংসারের সব কবিই বিপদগ্রস্ত হয়েছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় শব্দেড়েক গান রচাচ্ছেন বর্ষা নিয়ে। হেমস্তু নিয়ে পাঁচটি হয় কি না-হয়। কবিগদ্যরু কালিদাস পর্যন্ত ঋতুসংহারে হেমস্তের বর্ণনা করতে গিয়ে যা রচাচ্ছেন তার তুলনায় তাঁর বর্ষা-বর্ণন শতগুণে শ্রেয়ঃ। তবু তাঁর কলম জোরদার। হেমস্তু ঋতুতে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন তিনি মানসযাত্রীহংস ক্রৌঞ্চমথুন আর মাটির দিকে দেখেছেন পরিপক্ব শস্যে গ্রামের প্রত্যন্ত প্রদেশ পরিপূর্ণ। হেমস্তের সেই সফল শান্তির পূর্ণতা দেখে প্রার্থনা করেছেন :—

বহুগুণরমণীয়া যোষিতাং চিন্তহারী।

পরিণতবহুশালিব্যাকুলগ্রামসীমা।

সততমতিমনোজ্ঞঃ ক্রৌঞ্চমালাপরীতঃ

প্রদিশতু হিমবন্তঃ কাল এব সুখং বঃ ॥

হঠাৎ শূনি ধমকের শব্দ। রমনীকণ্ঠে।

শিক্ষিত ভদ্রোলোকের ইংরিজীই ভাল করে বুঝি নে, কক্‌নি বোঝা আমার কর্ম নয়। তাকিয়ে দেখি, আমার সামনে ডান দিকে একটি পেরেশ্বর্‌লেটর। তার পিছনে একটি ছোট্ট বাচ্চা। চল-চলি পা-পা করে গোলাদিঘিতে ক্ষুদ্রে একটি রবারের নোকা ভাসাবার চেষ্টা করছে। ঢেউয়ের ধাক্কায় সেটা বার বার কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে। ওদিকে তার আয়া অসহিষ্ণু হয়ে লাগিয়েছে তাকে এক বিকট ধমক। সে-ধমকের ধাক্কায় রাজ-পাতি সব হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে পালাচ্ছে, নোকাটা পর্যন্ত ডুবুডুবু।

শূর্নোছিলুম, এ-দেশে বাচ্চাদের ধমক দেওয়া হয় না। দেশের এক অতি আধুনিক পরিবারে। সেখানে অতিথি এলে এক ছেলে পিঠে পিন ফুটাত, অন্য ছেলে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে কাঁচি দিয়ে তার টাইটি কাটতে আরম্ভ করত। ধমক দিতে গেলে বাপ-মা অতিথিকে বিলেতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন।

ফের ঘাড় ঝুলিয়ে দিলুম বেষ্ট্রর হেলানে, মূখ তুলে দিলুম আকাশের দিকে। অক্ষুট কণ্ঠে বললুম, ‘হায় পেন্ডালংসি, হায় রে স্ল্যোবেল, কোথায় তুমি স্ক্রেট! এই কক্‌নি রমণীকে পর্যন্ত তালিম দিয়ে শাব্দ করতে পারো নি!’

এবারে শূনি বাঁ দিক থেকে ‘বেগি পান্’। মানে? ওঃ—‘বেগ ইয়োর পার্ডন’! হকচকিয়ে চোখ খুলে দেখি, আমার অজ্ঞানতে এক ভুল্ললোক বেষ্ট্রর অন্য প্রান্তে আসন নিয়েছেন।

সুন্দর চেহারা। ডেউ-খেলানো সোনালী রঙ চুল—হাওয়াতে অল্প উষ্ণ-শুষ্ক। নাকটি খাঁটি রোমান, রিজের চিহ্নমাত্র নেই। মুখের রঙ পুরানো হাতির দাঁতের মত। শুধু গাল দুটিতে অতি অল্প গোলাপীর ছোঁয়াচ লেগেছে। একটুখানি গোঁপ—মাথার চুলের চেয়ে এক পোঁচ বেশী সোনালী।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, ‘আজ্ঞে না। আমি কিছু বলি নি।’ তারপর আমতা আমতা করে বললাম, ‘আমি শুধু পেস্তালৎসির কথা স্মরণ করছিলাম।’

হাত দু’খানি জানুর উপর ভারী শাস্তভাবে রাখা, যেন রেমব্রাণ্টের ছবিতে আঁকা। সরু লম্বা লম্বা। নখে লালের আভাস। চমৎকার মেনিকোর করা। বয়স ৩০।৩৫। ঠিক বলতে পারব না। সায়েব-সুবোদের বয়স আমি অনুমান করতে পারি নে।

এবারে আমার পালা। সায়েব কী যেন বললে। বুদ্ধিতে না পেরে বললাম, ‘বৌগি পান্।’ সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বুদ্ধি গেলুম বলেছে, ‘থ্যাংক গড্’ ধরনের কিছু একটা। কিন্তু তখন তো আর ‘বেগ্ ইয়োর পাড’ন’টা ফের বেগ্ করে ফেরত নেওয়া যায় না।

পাশে বৌগির উপর অতৃষ্ণু শোবার হ্যাট, তার ভিতরে দু’খানা দস্তানা। পরনে হেরিং মাছের কাঁটার নক্সা-কাটা নতুন সূট। শক্ত কলার, ডোরা কাটা টাই—কোনো পাবলিক স্কুলের নিশান-মারা হতেও পারে—কাফের বোতাম কিন্নকের, মাঝখানে কী একটা ঝকঝক করছে। পায়ে ছদ্মচলো কালো জুতো। এবং বিশ্বাস করবেন না, তার উপর স্প্যাট !

দ্বিশ বৎসর পূর্বে এ-রকম বেশভূষা মাঝে-মধ্যে দেখেছি। বইয়ে বর্ণনা পড়েছি। এ কি বিংশ শতাব্দীর রিপ্ ভান্ উইনকল্ ?

তখন মনে পড়ল কেনসিংটন গার্ডেনের আশেপাশে থাকেন এদেশের খান-দানীরা। কাশ্মীরের বর্ণনা দিতে গিয়ে হিন্দী কবি গেয়েছেন,

‘স্বর্গী স্বর্গ সুরলোক

স্বর্গী সুরকানন সুন্দর।

স্বর্গী অমরোকা ওক,

স্বর্গী ক’হী বসত পুরন্দর ॥’

এইটেই স্বর্গসুরলোক, এইখানেই কোথাও পুরন্দর বাস করেন।

শুনছি, এরই আশেপাশে চার্চিল থাকেন, এপস্টাইন বাস করেন।

তবে ইনি খানদানী লোক। কাজকর্ম নেই। অবেলায় পাক্ রোধ মারতে বেরিয়েছেন।

ছিঃ ! তখন দেখি তাঁর বাঁ দিকে একটা ক্রাচ—খোঁড়ারা যার উপর ভর করে হাঁটে। নিজের মনকে কবে কান মলে দিলাম—উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ না করে মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য।

বলেন, ‘পেস্তালৎসি কিন্তু শেষ বয়সে আপন মত অনেকখানি পরিবর্তন করেছিলেন। বলতেন, বাচ্চাদের বড্ড বেশী বা-তা করতে দিতে নেই।’

আমি অবাক। আমি তো শুনছি ইংরেজ অচেনার সঙ্গে কথা নয় না।
ইনি আবার খানদানী।

ভদ্রলোক কিন্তু পাঁচমিকে সপ্রতিভ। কঙ্গদুস যে রকম চুনের কোটো থেকে
খুঁটে খুঁটে শেষ রক্ত বের করে, ইনি ঠিক তেমনি ঘুঁটি নীল চোখ দিয়ে আমার
চোখ ঘুঁটি খুঁটে খুঁটে শেষ চিন্তা বের করে নিচ্ছেন।

বললেন, ‘সে আমি বেশ জানি, প্রাচ্যদেশীয়দের সঙ্গে বিনা পরিচয়েই কথা
আরম্ভ করা যায়।’ মুখে অগপ অগপ হাসি-খুঁশির ভাব।

আমি শূধালুম, ‘আপনি কি অনেক প্রাচ্যদেশীয়দের চেনেন?’

বললেন, ‘আমিই না। আপনিই প্রথম।’

আমি বললুম, ‘সে কী? এখন তো লন্ডনে বিদেশীই বেশী বলে মনে হয়।
আমি তো ভেবেছিলাম পাছে এদের ঠেলায় খাস লন্ডনবাসীরা শহরছাড়া হয়
তাই ম্যাক্সিমিলানকে প্রস্তাব করে পাঠাব কাঁটার তার দিয়ে দিয়ে লন্ডনের
আদিবাসীদের জন্য (আমি ‘এবরোজিনালস্’ শব্দটি প্রয়োগ করেছিলাম)
আলাদা মহল্লা করে দেবার জন্য। সাইনবোর্ডে লেখা থাকবে, “প্রাণীদের
খাবার দেওয়া বারণ। হুকুম অমান্য করলে এক পোন্ড জরিমানা।” কী
বলেন!’

বললেন, ‘খাঁটি কথা। আমাদের পাড়া তো যায়-যায়।’

ইচ্ছে যাচ্ছিল শূধাই কোন পাড়া। কিন্তু ইনি যখন প্রাচ্য কায়দায় বিনা
পরিচয়ে আলাপ আরম্ভ করেছেন, তখন আমার উচিত প্রতীচ্য কারণে অনুসরণ
করা।

বললুম, ‘কলকাতায় তো তাই হয়েছে! আমরা কলকাতার আদিবাসীদের
কোণ-ঠাসা করে এনেছি।’

তিনি শূধালেন, “আমরা” মানে কারা?’

এ তো তোফা ব্যবস্থা। উনি প্রাচ্য পশ্চাতিত দ্বিবা প্রশ্নের পর প্রশ্ন শূধিয়ে
যাচ্ছেন, আর আমি নেটিভ ছুরি-কাটা নিয়ে আনাড়ীর মত কিছুই মুখে তুলতে
পারছি নে। ঠিকই তো। সেই কথামালার গল্প। বক তার লম্বা ঠোঁট
চালিয়ে কুঁজো থেকে টপাটপ খাবার তুলে নিচ্ছে আর আমি খেঁকশেয়ালটার
মত শূধু কুঁজোটার গা চাটছি। আর ব্যবস্থাটা করেছে বকই।

কিন্তু হলে কি হয়? ইংরেজের বাচ্চা। বেশীক্ষণ প্রশ্ন শূধোবে কী করে?
অনভ্যাসের ফাঁটা নয়, অনভ্যাসের লাল লংকা। খাবে কতক্ষণ!

আমি বললুম, ‘আমি শিক্ষাবিদ নই, তবু জানতে ইচ্ছা করে এ দেশের
শিক্ষিত পরিবারে বাচ্চারা কতটুকু যাচ্ছেতাই করার সুযোগ পেয়েছে!’

এবারে ইংরেজের ইংরিজীপনা আরম্ভ হল। অনেকগুলো স্বজনকৃতিভ
মুড ব্যবহার করতে পেরে ভদ্রলোক যেন বেঁচে গেলেন। ঐ মুডটাই
ইংরিজীতে সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করা হয়, কারণ এতে প্রকাশ পায়
অনিশ্চয়তা। ‘শুড’ উডের ছড়াছড়ি—‘আই শুড সে’, ‘ইট উড অ্যাপারার’,
‘ওরান মাইট থিনক্’ থাকলেই বদ্বতে হবে ইংরেজ পাকাপাকি কিছু বলতে

চায় না, কিংবা ভদ্রতা প্রকাশ করতে চায়—ফাউলার যা বলুন, বলুন। আমরা এ-জির্জিনসটেই প্রকাশ করি অতীতকাল দিয়ে। শ্বশুরমশাই যখন জিজ্ঞেস করেন, ‘তা হলে বাবাজী আসছ কবে?’ আমরা ঘাড় নীচু করে বলি, ‘আজ্ঞে আমি তো ভেবেছিলাম ভাদ্র মাসে এলেই ভাল হয়।’ আসলে কিন্তু বলতে চাই, ‘আমি ভাবছি...’ তা বলি নে; অতীতে ফেললে বিনয় প্রকাশ হয়, অনিশ্চয়তাও বোঝানো হয়, অর্থাৎ শ্বশুরমশাই ইচ্ছে করলেই আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা নাকচ করে দিতে পারেন।

ইংরেজ বললেন, ‘অন্য লোকে যে আমাদের “বীপবাসী” বলে সেটা কিছু মিথ্যে নয়! ঐ পেন্ডালৎসি, স্কোয়াবলের কথা বলছিলেন না? এদের তথ্যকথা সর্বজনমান্য হয়ে গেলেও আমরা সেগুলো গ্রহণ করি সঙ্কলের পরে। চ্যানেলের ওপার থেকে যা-কিছু আসে তাই যেন আমরা একটু সম্মেদের চোখে দেখি। আর গ্রহণ করলেও সমাজের সব শ্রেণী একই সময়ে নেয় না। আমাদের বাড়িতে—কিছু মনে করবেন না, একটু ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে—’

আমি বললাম, ‘প্রাচ্য পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত হওয়াটাই রেওয়াজ।’

‘দ্ব্যবাদ। আমাদের বাড়িতে এখনও প্রাচীন পন্থা চালু। দুনিয়ার আর সর্বত্র সেন্ট্রাল হীটিং কিংবা ইলেকট্রিক দিয়ে ঘর গরম করা হয়, আমাদের বাড়িতে এখনও “লগ্ ফাইয়ার”—কাঠের আগুন। ওঃ! একটা ঘটনা মনে পড়ল। আপনি জাওয়ারদুখ ডাক্তারের কথা শুনেছেন?’

যদিও লোকটি অতিশয় ভদ্র, মাত্রাধিক ভদ্র বললেও ভুল বলা হবে না, তবু একটু বিরক্ত হলুম। এই ইংরেজরা কি আমাদের এতই অগা মনে করে? বললাম, ‘সেই যিনি সব প্রথম ফুসফুসের অপারেশন আরম্ভ করেন?’

ইংরেজের তারিফ করতে হয়—মানুষের গলা থেকে মনের ভাব চট করে বন্ধ নেয়। ভদ্রলোক বার বার মাফ চাইতে আরম্ভ করলেন। আমিও একটু লজ্জা পেলাম।

বললেন, ‘হাজারটা ইংরেজের একটা ইংরেজও ও’র নাম জানে না। তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।’

আমিও ভদ্রতা করে বললাম, ‘আমিও জানতুম না—যদি না এক জার্মান ডাক্তারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না হত। তারপর কী বলছিলেন, বলুন?’

‘১৯২৮-এ যখন পঞ্চম জর্জের শক্ত ব্যামো হয়, তখন তার কাছে ইংরেজ ডাক্তাররা পাঠালে রাজার এক্স-রে ছবি। ও’র মতামত জানতে চাইলে—বুকে অপারেশন করা হবে, না শুধু ফুটো করলেই হবে, না ড্রেন করতে হবে, না কি? এবং একথাও জাওয়ারদুখ বুঝে গেলেন যে, আর যা হয় হোক, কোনও বিদেশী সার্জনকে দিয়ে রাজার অপারেশন করা চলবে না। ইংরেজ ডাক্তার-গোষ্ঠী তা হলে আপন দেশে মদ্য দেখাতে পারবে না।’

আমি বললাম, ‘আশ্চর্য! আমাদের গান্ধীকে তো ইংরেজ ডাক্তারই অপারেশন করেছিল।’

একটু চুপ থেকে বললেন, ‘গল্পটা এখানেই শেষ নয়। কয়েকদিন পর

ডাচেস অব কনোট না কেণ্ট, কার জ্ঞানি শক্ত ব্যামো হয়েছে। জাওয়ারবুথকে পেনে করে—এখন তো পেন ডাল-ভাত—লন্ডন আনানো হল। অর্থাৎ ডাচেসের বেলা জর্ম'ন ডাক্তার চললে চলতেও পারে, রাজার বেলা নয়।'

আমি বললাম, 'বা রে!'

বললেন, 'এখানেও শেষ নয়। জাওয়ারবুথ তো রুগীর ঘরে ঢুকে রেগে কাঁই। এ রুগী তো ভয়ে কাঁপছে না, কাঁপছে শীতে। রুগীর লেপ তো লেপ নয়, ভিজ়ে কাঁথা। বললেন, এ-ঘরে রুগীর চিকিৎসা চলবে না। বেশ চড়া গলাইতেই নাকি বলেছিলেন, মানুষ থাকার উপযোগী এবং ভদ্র (রিজনেবল) ঘরে ও'কে নাকি নিয়ে যেতে হবে। একে জর্ম'ন, তায় ডাক্তার—চড়া গলাতে বলবেই তো। তখন আরম্ভ হল তুলকালাম কাণ্ড। বহু হট্টগোলের পর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল অন্য ঘরে—সেখানে একটি ইলেকট্রিক হীটার কোনও গর্তকে লাগানো হল।

'ডাক্তার কী বললেন জানেন? বললেন, "কিছু হয় নি; কালই সেরে যাবেন।" এবং সেরে গেলেনও।'

আমি বললাম, 'আশ্চর্য!'

তিনি বললেন, 'এও শেষ নয়। পরদিন ড্যাক ছিলেন ডাক্তারকে বিরাত ভোজ। তাঁর পরিচিত লাট-বেলাট সবাইকে নেমস্কর করা হল। স্বয়ং ডাচেস সেরে উঠে ব্যানকুয়েটে বসলেন। চার্চিলও ছিলেন। তারপর কী কাণ্ড হল জানেন?'

'ভোজ খেয়ে হোটেলে ফিরে এসে জাওয়ারবুথ দেখেন সেখানে আরেক কাণ্ড। চেনা আধা-চেনা যে তাকে দেখে সেই মাথা নিচু করে বাও করে! ওয়েটার, ম্যানেজার সবাই তাঁর পিছনে পিছনে ছুটেছে! "হৃজ্জরের কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো, হৃজ্জরের কী চাই?" ডাক্তার তো অবাক! ডাচেসের জন্য গরম ঘরের ব্যবস্থা করেই এতখানি?'

'আসলে তা নয়। শোবার ঘরে গিয়ে ডাক্তার দেখেন, তাঁর টেবিলের উপর সম্মোহনকাণ্ডের কাগজ। তাতে মোটা মোটা হরফে লেখা: "জর্ম'নির ডাক্তার জাওয়ারবুথ রাজাকে আজ সম্মোহন অপারেশন করলেন।" খবরের কাগজ সব কিছু জানে কি না! জাওয়ারবুথ লন্ডনে, ঐ সময়ে, টায়টার।'

আমি আবার বললাম, 'আশ্চর্য! জাওয়ারবুথ প্রতিবাদ করলেন না?'

তিনি বললেন, 'পরের দিন ভোরেই তাঁকে পেনে তুলে দেওয়া হল—এয়ার-পোটো' ড্যাক ডাচেস সবাই উপস্থিত। হৈহে-ইরৈ। দেশে গিয়ে দেখেন, ইতিমধ্যে মার্কিন কাগজগুলো বলতে আরম্ভ করেছে, জাওয়ারবুথ অন্তর করার জন্য এক মিলিয়ন পৌণ্ড পেয়েছেন! জর্ম'ন কাগজরা আত্মশ্রীতির ফেটে বাবার উপক্রম। জাওয়ারবুথ এ'কে ও'কে জিজ্ঞেস করলেন, কী করা উচিত? সবাই বলে এই ডামাডোলের বাজারে কেউ তোমার প্রতিবাদ (দেমার্সি) শুনবে না চেপে যাও।'

'তারপর?'

ঠিক সেই সময়ে এক তাগড়া লম্বাচোড়া নাস' এসে উপস্থিত, তাঁকে তুলে ধরল। তিনি ক্রাচ তুলে নিয়ে এক দিকে ধরলেন, অন্য দিকে ভর করলেন নাস'। সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম বারোটোর ঘণ্টা। বললেন, 'ও রেভোয়া'—অর্থাৎ 'আবার দেখা হবে'। গুড্ বাই নয়। তার অর্থ অন্য।

কিন্তু আমার মনে প্রশ্ন জাগল, জাওয়ারবুথ কি জানতেন তাঁকে ডাচেসের বাড়িতে আনা হয়েছিল তাঁর অসুখের ভান করে! ঐ সময় তিনি যেন লণ্ডনের হাভের কাছে থাকেন। অপারেশনে যদি গণ্ডোগোল হয়, তাঁকে তথুর্নি ডেকে পাঠাবার জন্য।

যাগ্ গে। কালই তো জন্ম'নি যাচ্ছি। আমার বন্ধু পাউলকে শ্রুধাব। সে গুণী, সব জানে।

বহু চেষ্টা করেও লণ্ডনের সঙ্গে যোশুী জমাতে পারলুম না। পূর্বেও পারি নি। কারণ অনুসন্ধান করে আশ্চর্য বোধ হয়েছে, যে শহরকে দশ-এগারো বছর বয়স থেকে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের মারফতে চিনতে শিখিছি তার সঙ্গে স্রাব্যতা হয় না কেন? বোধ হয় ইংরেজ এদেশে রাজত্ব করেছে বলে। বোধ হয় বহুকাল ইংরেজের গোলামী করিছি বলে তার প্রতি রাগটা যেন যেতে চায় না। তার সর্দগুণ দেখলে রাগটা আরো যেন বেড়ে যায়। তখন মনে হয়, এর সঙ্গে দোস্তীটা জমাতে পারলে জীবনটা আরো মধুময় হতে পারতো।

কিন্তু আমি তো এ ফরিয়াদে একা নই। ফরাসীরা তো ইংরেজকে সোজা-সুজি অনেক কথা বলে। মাদাম টাবউই বই লিখেছিলেন—'পারফিডিয়াস এলবিয়ন অর আর্ভাৎ কর্ভিয়াল।' জন্ম'ন, হাজেরিয়ান এবং অন্যান্য জাত অত কড়া ভাবে কথাটা বলে নি বটে, কিন্তু ইংরেজের প্রকৃতি যে আর পাঁচটা জাতের মত নয় সে কথা সবাই স্বীকার করে নেয়। কেউ ব্যঙ্গ করেছে, কেউ সহিষ্ণুতার সদয় হাসি হেসেছে। এ শব্দ টুরিস্টদের সাধারণ অভিজ্ঞতা নয়, হাইনে, ভল-ভেনার, জোলার মত বিচক্ষণ মহাজনরা যা বলে গেছেন সে তো কিছু ঝেড়ে ফেলে দেবার মত নয়।

কিন্তু একটি কথা সবাই স্বীকার করেছেন। সেক্সপীয়রের মত কবি হয় না, ইস্টকিলাস, দান্টে, গ্যোটে এদের কারো চেয়ে ইনি কম নন। আর এ'র মহত্ব এমনই বিরাট যে, তাঁকে নকল পৰ্ব্বত করার সাহস কারো হয় না।

কিন্তু এ তত্ত্ব নিয়ে অত্যধিক বাক্যব্যয় আমি করতে যাবো কেন?

আমাকে যে জিনিস সব চেয়ে মৃদু করেছে সেইটে বলে গেনে উঠি।

ব্রিটিশ মিউজিয়মের পাঠাগার। অনেক বেশে বিস্তর পুস্তকাগারে ঢুকেছি। থানাতেও দু'একবার গিয়েছি। দুটোতে কোনো পাঠ্য লক্ষ্য করতে পারি নি। আমি যেন চোর। বই সরাবার মতলব ভিন্ন আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে এটা কেউই যেন বিশ্বাস করতে চায় না। কার্ড দেখানো থেকে আরম্ভ করে বই ফেরত দিয়ে বেরোবার পরও মনে হয় পিঠের উপর ওদের চোখ-

গুলো যেন সার্জের তুরপূনের মত কুরে কুরে ঢুকছে।

এর জন্য কে দায়ী বলা কঠিন। কিন্তু যেই হোক, কিংবা ধারাই হোন, এ বিষয়ে তো কোনো সম্বেহ নেই যে, চোর-পুন্ডলিসের বাতাবরণে আর যা হয় হোক, জ্ঞানসপ্তয় বিদ্যার্জন হয় না। তবে এর ব্যত্যয় আছে। এবং আমার বিশ্বাস, আমরা উন্নতির দিকেই চলছি।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে কাউকে যে সম্বেহের চোখে দেখা হয় না তার প্রধান কারণ প্রায় সবাই বয়স্ক, অনেকেই পণ্ডিতরূপে বিশ্ববরণ্য। এখানে কাজ করতে হলে সহজে অনুমতি পাওয়া যায় না। ব্রিটিশ মিউজিয়মের কর্তারা যে ‘ডগ অ্যান্ড দি ম্যানিজার’, অর্থাৎ আমি খাবো না, তোকেও খেতে দেব না নীতি অবলম্বন করেন তা নয়। তাঁদের বক্তব্য, সাধারণ রিসার্চ, যেমন মনে করুন, ডক্টরেটের কাজ করার জন্য লন্ডনে আরো বিস্তর লাইব্রেরী রয়েছে। সেখানে ভিড় কম, ও রিসার্চ একটি বিশেষ বিষয়বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে আপনি আপনার বই পেয়ে যাবেন তাড়াতাড়ি। যেমন মনে করুন, আপনি সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতেই আপনি আপনার প্রয়োজনীয় বই পেয়ে যাবেন। কিন্তু যেখানে গবেষণা একাধিক বিষয়বস্তু ছাড়িয়ে যায় সেখানে স্পেশালাইজড লাইব্রেরী কুলিয়ে উঠতে পারে না—তখন ব্রিটিশ মিউজিয়ম আপনাকে স্বাগতম জানায়।

এবং সব চেয়ে বড় কথা—পৃথিবীর সর্ব জায়গা থেকে এত সব নামকরা পণ্ডিত এখানে আসেন যে, মিউজিয়ম তাঁদের নিরাশ করে অপেক্ষাকৃত, কিংবা সম্পূর্ণ অজানা গবেষককে স্থান দিতে চায় না—কারণ পাঠাগারের সাইজ দশ ভুল করে দিলেও সে তার মোহাকুশ্ট গবেষকদের স্থানকুলান করতে পারবে না।

মিউজিয়মের চায়ের স্টলে একটি পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ হয়।

তিনি বললেন, ‘রীডিং রুমে ঢুকেই একটি নিগ্রো ভদ্রলোককে লক্ষ্য করেছেন কি? আবলগের মত রঙ আর বরফের মত সাদা চুল? নাগাড়ে বিশ বছর ধরে ঐ আসনে বসে কাজ করে যাচ্ছেন।’

আমি বললাম, ‘আপনি ক’ বছর ধরে?’

তিনি যেন একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, ‘সামান্য। পনেরো হবে। আমার চেয়ে ধারা ডের প্রবীণ তাঁদের কাছে শোনা।’

আমি শূদাললাম, ‘ইনি কি কাজ করছেন?’

‘হাবশী মূল্লকে খণ্ডধর্মের অভ্যুদয় কিংবা ওরই কাছাকাছি কিছু একটা। হীব্রু, আরাহমায়িক, আহমরিক, সিরিয়াক এসব তাবৎ ভাষায় লেখা বই ঘটিতে হলে এখানে না এসে তো উপায় নেই।’

আমি সামান্য যে ক’দিন কাজ করেছিলাম সে ক’দিন নিগ্রো ভদ্রলোকের নিষ্ঠা দেখে স্তম্ভিত হয়েছি। ন’টার সময় কাটায় কাটায় তাঁকে আসন নিতে দেখেছি, এবং উঠতে ছ’টার সময়। এর ভিতরে আসন ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকলে আমার অজ্ঞানতে। আর দেড়টা থেকে দুটো অবধি চেয়ারের হেলানে মাথা দিয়ে একটুখানি ঘুমিয়ে নিতেন।

লিখতেন অল্পই। পড়তেন বেশী। চিন্তা করতেন তারো বেশী। দু' একবার চোখাচুখি হয়েছে। তিনি যেন আমাকে দেখতেই পান নি। চোখ দুটি কোন অসমী ভাবনার গভীর অঙ্গে ডুবে আছে আমি জানবো কি করে? কিংবা তিনি হয়তো ছবি দেখছেন, সেই আদম আবির্ভাবসম্মত সমাজের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন খৃষ্টের দূত, শান্তির বাণী বহন করে। তখন তাঁদের সভ্যতা সংস্কৃতি কোন স্তরে ছিল, খৃষ্টের বাণী তাঁরা কি ভাবে গ্রহণ করেছিলেন—তারই ছবি দেখছেন। যেখানে ছবি অসম্পূর্ণ কিংবা ব্যাপ্সা সেটাকে সম্পূর্ণ সর্বজ্ঞসুন্দর করার জন্য এই সাধনা।

তাঁর বই লেখা শেষ হয়েছিল কি না, প্রকাশিত হলে ক'জন লোক সেটি পড়েছিল, বোঝবার মত শক্তি ক'জন পাঠকের ছিল তাও জানি নে। কারণ এরকম নিষ্ঠাবান সাধক পাঠাগারের অনেকেই।

এস্থলে পাঠক হয়তো ভাবছেন, আমি সেখানে ঠাই পেলাম কি করে? কারণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, আমি পণ্ডিত নই।

জন্মনিতে পড়াশোনা করার সময় আমার কয়েকখানা বইয়ের প্রয়োজন হয়। সেদেশে সেগুলো পাওয়া যাচ্ছিল না বলে অধ্যাপক বললেন, 'ব্রিটিশ মিউজিয়মে যাও; সেই সন্ধ্যোগে লন্ডনেও দেখা হয়ে যাবে।'

তিনি নিজে প্রায়ই লন্ডনে এসে কাজ করে যেতেন। মিউজিয়মের কতরা ভাঙা করেই জানতেন, পণ্ডিতসমাজে তাঁর স্থান কতখানি উন্নত। তিনি যখন পরিচয়পত্র দিয়ে পাঠালেন তখন এঁরা আর কোনো প্রশ্ন শ্রদ্ধালেন না।

কিন্তু বার বার লজ্জা অনুভব করেছি।

প্রথম মূর্খালি আসন নিয়ে। কোনো আসনে কেউ বসছেন বিশ বছর ধরে, কেউ ত্রিশ বছর ধরে। ঠিক সেদিনটাই হয়তো তিনি তখনো আসেন নি। আপনি না জেনে বসে গেলেন তাঁরই আসনে—কারণ কোনো চেয়ার কারো জন্য রিজার্ভ করা হয় না। তিনি খানিকক্ষণ পরে এসে আপনাকে ঐ চেয়ারে দেখে চলে গেলেন কিছ্র না বলে। অন্য জায়গায় বসে তিনি ঠিক আরাম পেলেন না। আপনি কিন্তু জানতেই পেলেন না।

পরের দিন গিয়ে দেখলেন, অন্য কে একজন—তিনিই হবেন—ঐ আসনে বসে আছেন। আপনি নতুন আসনের সম্মানে বোরোলেন।

এসব বদ্ব্যবহারে বদ্ব্যবহারে কেটে যায় বেশ কয়েকদিন। যখন বদ্ব্যবহার, তখন শরণাপন্ন হলাম এক কর্মচারীর। তিনি অনেক ঘাড় চুলকে আমাকে একটি আসন দেখিয়ে বললেন, 'এ চেয়ারটায় এক ভদ্রলোক বসছেন দশ বৎসর ধরে।'

আমি বললাম, 'থাক থাক।'

তিনি বললেন, 'তবে আসনখানেক ধরে তিনি আসছেন না।'

আমি বললাম, 'তা হলে উপস্থিত এখানেই বসি। কিন্তু তিনি এলে আমায় বলে দেবেন কি?'

বিরাট গোল ঘর। মাঝখানে চক্রাকারে সাজানো ক্যাটলগ। আর একে-বারে কেন্দ্র বসে কয়েকজন কর্মচারী। এঁদের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন বড়

একটা হয় না। বই আসে বার কলের মত।

কেন্দ্র থেকে সারি সারি হয়ে দেয়াল অবধি বেরিয়েছে পাঠকদের আসন-পঙ্ক্তি। উপরের কাঁচ দিয়ে যে আলো আসছে সেটুকু যথেষ্ট নয় বলে টেবিলে টেবিলে ল্যাম্প। পাঠকদের অনেকেই পরেছেন কপালের উপরে রবারে বাঁধা 'শেড'—টেনিস খেলোয়াড়দের মত। সামান্য পাতা উন্টোনোর শব্দ, পাশের ভদ্রলোকের কলমের অতি অল্প খসখস। আর কোনো শব্দ কোনো দিক দিয়ে আসছে না। অখণ্ড মনোযোগের পরিপূর্ণ অবকাশ।

এ-জায়গা মানুষকে কাজ করতে শেখায়। আপনি হয়তো এলেন ন'টা পনেরো মিনিটে। এসে দেখেন আপনার পাশের ভদ্রলোক যেভাবে কাজ করছেন তার থেকে মনে হয়, তিনি অনেকখানি এগিয়ে গেছেন। তারপর দশটা এগারোটা বারোটা একটা অবধি তিনি আর ঘাড় তোলেন না। আপনার ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছে। তাঁর পায় নি। আপনারও রোখ চেপে গেল। উনি না উঠলে আপনিও উঠবেন না। ইতোমধ্যে বাইরে গিয়ে বার বার সিগারেট খাবার ইচ্ছে হয়েছে—সেটাও চেপে গিয়েছেন। দুটোর সময় উনি উঠলেন। আপনি যখন সাততাড়াতাড়িতে চা-রুটি খেয়ে ফিরলেন, তিনি তখন ঘাড় গুঁজে ফের কাজে ডুব মেরেছেন। বোঝা গেল, বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি সঙ্গে-আনা দুখানা স্যান্ডউইচ খেয়েই কাজ সেরেছেন। তারপর তিনি উঠলেন পাঠাগার বন্ধ হওয়ার সময়।

এরকম যদি একটা লোক পাশে বসে কাজ করে তবে কার না মাথায় খুন চাপে! কিছুদিনের ভিতর দেখতে পাবেন, আপনিও দিব্য ন'টা ছ'টা করে যাচ্ছেন। কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, কোনো ক্লান্তি আসছে না।

একেবারে কেন্দ্রে বসতেন একটি অতিশয় ছোটখাটো বৃদ্ধ। পরনে মনিং সুট। লম্বা দাড়ি। আবার মাথায় টপ হ্যাট। ঘরের ভিতরে ইংরাজ হ্যাট পরে না। এঁকে কিছু কখনো হ্যাটটি নামাতে দেখি নি। বোধ হয় হ্যাটের সামনের দিকটা দিয়ে তিনি শেডের কাজ চালিয়ে নিতেন।

সিম্পী গুজরাতীতে মেশানো কয়েকখানি ধর্মগ্রন্থের সম্বধান না পেয়ে তাঁর কাছে গেলুম। তিন মিনিটের ভিতর তিনি ক্যাটলগের ঠিক জায়গা বের করে দিলেন, এবং এটাও বললেন, 'বোধ হয় ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে এ সম্বন্ধে আরো বই আছে।'

পরে এক ভারতীয়ের মদুখে শুনলুম, ছেন বই লাইব্রেরীতে নেই যার হাদিস তাঁর অজানা। মিউজিয়ামের চায়ের ঘরে কথা হচ্ছিল। লাইব্রেরীতে দেশ-বিদেশের পাকা গাহক কয়েকজন ঘাড় নাড়িয়ে সায় দিলেন।

এই অশাস্ত অজ্ঞপ্র পরিপ্রম আর নিষ্ঠার শেষ কোথায়, ফল কি? এঁদের সকলের বই কি জনসমাজে সম্মান পায়? বহু পরিপ্রমের পর যখন বই সম্মান পায় না তখন লেখকের মনে কি চিন্তার উদয় হয়? তিনি কি আবার নতুন করে কাজ আরম্ভ করেন, না ভগ্নস্থানে শয্যাগ্রহণ করেন?

এর উত্তর দেবে কে ?

শুধু এইটুকু জানি, মিউজিয়ম এ নিয়ে মাথা ঘামাক আর নাই ঘামাক সে সাদরে বংশপরম্পরাকে জ্ঞানের সম্মানে সাহায্য করছে, আর পাঠাগারের কেন্দ্রটি বিশ্বের সর্বজ্ঞানের কেন্দ্র না হোক, অন্যতম কেন্দ্র ।

ইংরেজকে এখানে নমস্কার ।

বিশ্বজ্ঞানের কাছে ভারতবর্ষ অপরিচিত দেশ নয় । প্রাচীন যুগে সে অপরিচিত ছিল না, এ যুগেও নয় । মাঝখানে কিছুদিনের জন্য অল্পসংখ্যক স্বার্থা-শেষী সাম্রাজ্যবাদী ভারতবর্ষের সম্বন্ধে প্রচার করেন যে, যদিও এ দেশ একদা সভ্যতা-সংস্কৃতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল আজ তার সর্বস্ব লোপ পেয়েছে এবং বৈদেশিক শাসন ভিন্ন এর পুনর্জীবন লাভের অন্য কোনও পন্থা নেই । একুশো প্রচারের ফলে প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয় মহাদেশেই বিস্তর কুফল ফলেছিল, এখনও কিছু কিছু ফলাছে । এর জন্য সর্বাপেক্ষা ক্রটিগ্নস্ত হয়েছে সেই স্বল্প-সংখ্যক সাম্রাজ্যবাদীদের দেশই । কিন্তু এ-স্থলে স্মরণ রাখা কর্তব্য সে-দেশের মনীষীগণও তাই নিয়ে প্রচুর ক্লোভ প্রকাশ করেছেন ।

মাত্র একটি দেশ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কখনও তার ভক্তিব্রত হারায় নি । সে-দেশ জার্মানি । এবেশের গুণীজ্ঞানীরা সে তত্ত্ব অবগত আছেন । আমাদের কবি মধুসূদন একশ' বছর পূর্বে লন্ডনে থাকাকালীন জার্মানপণ্ডিত গল্টস্ট্র-কারের সঙ্গে দেখা করতে যান ; এমন কি যে স্বল্প-সংখ্যক জার্মানপণ্ডিতের মতবাদ আমাদের সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রাম্যক বলে মনে করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি আপন যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেছেন । পরবর্তী যুগে আমাদের শিক্ষাচার্য রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় শাস্ত্র গবেষণার জন্য জার্মানপণ্ডিত উইনটোর-নিংসকে নিমন্ত্রণ করে বিশ্বভারতীতে নিয়ে আসেন ; তখনই অপরিচিতা শ্রীমতী ক্রামারিশ তাঁরই সৌজন্যে বিশ্বভারতীতে ভারতীয় কলাচর্চার সুযোগ পান ।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এদেশের জনসাধারণ জার্মানির খবর পেল দুই অশুভ যোগাযোগের ফলে । দুই বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে ভারতবাসী জার্মানি সম্বন্ধে নানা অতিরঞ্জিত কাহিনী শুনেন দ্বিধা পথভ্রান্ত হয়েছে সে সম্বন্ধে সম্বোধ নেই । এবেশের পণ্ডিতসমাজেও জার্মান ভাষা সুপ্রচলিত নয় বলে ভারতবর্ষীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা জার্মানিতে কি ভাবে হয়, তার কতখানি উন্নতি হয়েছে, সে বিষয় বাঙলায় অনুদিত হওয়ার সুযোগ পায় নি । যে-সব বাঙালী বিপ্লবী জার্মানিতে আশ্রয় পেয়েছিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতাও সুস্পষ্ট কারণবশত এবেশে প্রসারলাভ করতে পারে নি ।

ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান কলা-বর্শন সভ্যতা-সংস্কৃতি চর্চার জন্য ইয়োরোপে যে শব্দটি প্রচলিত তার নাম ইন্ডলজি—জার্মান উচ্চারণ ইন্ডলগী । শব্দটি অবশ্যচীন ও গ্রীক-গোত্রীয় (অবশ্য এর প্রথমাংশ 'ইন্ডস' শব্দটি মূলে ভারতীয়) এবং জার্মানির শিক্ষিতজন মাগ্নাই এটির বহুদল প্রয়োগ করে থাকেন ; ইংল্যান্ডের পণ্ডিতসমাজে এটি কখনও কখনও ব্যবহৃত হয়—এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা

শব্দটি নেই, জার্মান সাইক্লোপিডিয়ায় নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ আছে।

জার্মানিতে ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ইত্যাদির চর্চা অর্থাৎ ইন্ডলজি কতখানি প্রচার এবং প্রসার লাভ করেছে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা বাঙলাতে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। ভ্রমণকাহিনী তার জন্য প্রশস্ত স্থান নয়, কিন্তু এ সম্বন্ধে যৎ-কিঞ্চিৎ জ্ঞান না থাকলে জার্মান দেশ-বৃত্তান্তের একটা বিরাট মহৎ দিক অবহেলিত হয়, এবং দ্বিতীয়ত আমার ছাত্রজীবনের প্রায় চার বৎসর সেখানে কাটিয়েছি বলে একাধিক জার্মান-সংস্কৃতজ্ঞের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হয় এবং ভ্রমণ কাহিনীতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ইচ্ছা-অনিচ্ছায় প্রকাশিত হবে বলেই এ-সব পণ্ডিত এবং তাঁদের সাধনা সম্বন্ধে এই সুযোগে যা না বললে নিতান্তই চলে না সেইটুকু বলে রাখি। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি, ভবিষ্যতে আমি এ প্রলোভন সম্বরণ করব।

ইন্ডলজি আরম্ভ করেন ইংরেজরাই—অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে। জোনাস, কোলরুক, উইলসন-এর প্রতিষ্ঠাতা। এর পরই ফ্রান্সিসলিভেসনের দ্য সাসি এ চর্চা আরম্ভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে জার্মানিতে সেটা ব্যাপকতর ভাবে আরম্ভ হয়। জার্মানপণ্ডিত গ্নেগেলই সর্বপ্রথম এ চর্চার ব্যাপকতা এবং কী ভাবে এতে অগ্রসর হতে হবে তার কর্মসূচী তাঁর পুস্তক ‘মুন্সবার ডিস্প্রাখে উনট ভাইজ হাইট্‌ডের ইন্ডার’ (‘ভারতীয় ভাষা ও মনীষা’) ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। এর কয়েক বৎসর পরেই জার্মানপণ্ডিত বপ্‌ সংস্কৃত ধাতুরূপের সঙ্গে গ্রীক, লাতিন এবং প্রাচীন জার্মান ধাতুর তুলনা করে সমপ্রমাণ করেন যে, ভবিষ্যতে আর্যগোষ্ঠীর যে-কোন ভাষার মূলে পেঁছতে হলে সংস্কৃত ভাষা অপরিহার্য। বশুতঃ তিনিই প্রথম তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্বের কেন্দ্রভূমিতে যে সংস্কৃতকে স্থাপনা করলেন এখনও সে সেখানেই আছে। তারই দু’ বৎসর পরে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির বন’ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হয় এবং ঐ কর্মে নিয়োজিত হন পদবোঁল্লিখিত ক্রীড্রিস গ্নেগেলের ভ্রাতা ভিলহেল্ম গ্নেগেল। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে বপ্‌ বার্লিনে নিযুক্ত হলেন।

ভারতবর্ষে তখন সংস্কৃত চর্চার কী দৃদর্শন!

গ্নেগেল ভ্রাতৃত্ব, বপ্‌ যে শব্দ ভারতীয় ব্যাকরণ নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন তাই নয়, তাঁরা তখন সংস্কৃত সাহিত্যের রসের দিক অনুবাদের মাধ্যমে জার্মানিতে পরিবেশন করতে আরম্ভ করেছেন। ফলে তার প্রভাব গিয়ে পড়ল জার্মান সাহিত্যে। কবিগুর গোটে শকুন্তলার অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ। তিনি তখন যা বলেছিলেন তাই নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন প্রায় একশ’ বছর পরে। তিনি লিখলেন :

‘মুন্সবারের কবিগুরু গোটে একটিমাত্র শ্লোকে শকুন্তলার সমালোচনা লিখিয়াছেন, তিনি কাব্যকে খুঁজ খুঁজ বিচ্ছিন্ন করেন নাই। তাঁহার শ্লোকটি একটি দীপবর্তিকার শিখার ন্যায় ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহা দীপশিখার মতোই সমগ্র শকুন্তলাকে এক মৃদুতে উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইবার উপায়।’ তিনি এক কথায় বলিয়াছিলেন, ‘কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল, কেহ যদি মর্ত্য ও স্বর্গ একত্রে

দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।’

এবং প্রবন্ধ শেষ করতে গিয়ে লিখলেন :

‘গ্যোটার সমালোচনার অনুসরণ করিয়া পুনর্বার বালি, শকুন্তলায় আরক্তের তরুণ সৌন্দর্য মঙ্গলময় পরম পরিণতিতে সফলতা লাভ করিয়া মর্ত্যকে স্বর্গের সহিত সম্মিলিত করিয়া দিয়াছে।’

গ্যোটার মত কবি যখন সংস্কৃত নাটক পড়ে উচ্ছ্বসিত তখন অন্যান্য কবিরা যে উৎসাহিত হবেন সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। গীতিকাব্যের রাজা হাইনে তখন দঃখ-বেদনায় কাতর বলেই স্বপ্ন দেখতে লাগতেন সেই আনন্দ-নিকেতন, সেই স্বপ্নের ভুবন ভারতবর্ষ—শেলি কীটস বায়রন যে অবস্থায় স্বপ্ন দেখতেন গ্রীসের।

‘গঙ্গার পার—মধুর গন্ধ গ্রিভুবন আলো ভরা—

কত না বিরাট বন্যপতিরে ধরে

পূরুষ রমণী সূর্যের আর শাস্ত প্রকৃতিধরা

নতজান্দ হয়ে শতদলে পূজা করে।’

আম্ গ্যাঙেস্ ডুম্‌টেট্‌স লয়েস্টেট্‌স

উন্ট্‌ রীজেন্‌বয়মে র্যুয়েন,

উন্ট্‌ শ্যোনে স্টিলে মেনশেন্‌

ফর্ লটসরুয়েন রুয়েন।

গঙ্গানদীতে আমি পশ্চাৎ ফুটে দেখি নি। কিন্তু এ তো স্বপ্নরাজ্য। এর কিছুটা সত্য কিছুটা কল্পনা। তাই পূর্ব-বাঙলার কবিও মধ্য আরবের মরু-ভূমির ভিতর দিয়ে তার নায়িকা লায়লাকে যখন মজন্দের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন তখন তিনি যাচ্ছেন নোকোয় চড়ে! এবং শুধু কি তাই? তিনি বিলের জল থেকে—সেই আরব দেশে—কুমদকহনার তুলে তুলে ধোঁপায় গুঁজছেন।

হাইনে জাত-ধর্ম ইহুদী। তাঁর ধর্মনীতি আর্থ’রস্ত নেই। কিন্তু আর্থ’-জর্মনিতে তখন ভারতীয় আর্থ’র প্রতি যে সমবেদনা, গৌরবানুভূতির প্রাবল্য আরম্ভ হয়েছে তাতে তিনিও নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন। তাঁর বহু কবিতায় কখনও প্রচ্ছন্ন কভু বা প্রকাশ্যে ভারতের প্রতি আকুল ব্যাকুল হৃদয়াবেগ (জর্মন ভাষায় এই ‘হৃদয়াবেগ’ের নাম ‘শুয়েম’রাই’)।

ঐ সময়ে ভারতের প্রতি জর্মনির কতখানি শুয়েমে’রাই (ইংরিজীতেও এর প্রতিশব্দ নেই—‘ফেনাটিক এন্‌থ্রুসিয়েজম’-এর অনেকটা কাছাকাছি) তার আরেকটি উদাহরণ দিই।

ভারতবর্ষে যখন কেউ জর্মন ভাষা শিখতে আরম্ভ করে তখন সাধারণত তাকে যে প্রথম ক্ষুদ্র উপন্যাস পড়তে দেওয়া হয় তার নাম ‘ইমেন্‌জে’। আমিও এই বই পূর্বোক্তিতা গ্রীষ্মক্কা ক্রাম’রিবের কাছে পড়ি। তাতে জর্মন বাচ্চাদের খেলাধুলোর একটি বর্ণনা আছে। তারা সবাই মিলে একটা ঠেলাগাড়ি তৈরি করে তার উপর কেউ বা চাপছে, কেউ বা দিচ্ছে ঠেলা। আর সবাই মিলে

সৈয়দ মজতবা আলী রচনাবলী (৭ম)—২১

এক সঙ্গে প্রাণপণ চেঁচাচ্ছে :

“নাথ্ ইন্ডিয়েন, নাথ্ ইন্ডিয়েন !”

“ভারত চলো, ভারত চলো !”

ঠেলাগাড়ি চড়ে-চড়েই তারা ভারতবর্ষে পৌঁছবে !

কবিরা শিশুপ্রকৃতি ধরেন, এবং শিশুরাও কবিপ্রকৃতি ধরে । দৃজনারই বাস কল্পনারাজ্যে ।

কিন্তু প্রশ্ন, তারা ‘নাথ্ ইন্ডিয়েন, নাথ্ ইন্ডিয়েনই’ করছে কেন, ‘নাথ্ আমেরিকা’ কিংবা ‘নাথ্ চীনা’ চেঁচাচ্ছে না কেন ? জার্মানির কাক্সাবাচ্চাধের ভিতরও তখন এই শূয়েমে’রাই ছিড়িয়ে পড়েছে । এ বইয়ের প্রকাশ ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ।

এ সময় ইয়োরোপে যে সব পণ্ডিত বেদচর্চায় মত্ত তাদের তিনজনই জার্মান : বেন্‌ফাই, ম্যাক্সমুলার এবং ভেবার । ম্যাক্সমুলারকে সবাই চেনেন, ভেবারের লেখার সঙ্গে বীক্ষমচন্দ্র সুপরিচিত ছিলেন, কিন্তু বেন্‌ফাই সামবেদের অনুবাদ করেছিলেন বলেই বোধ হয় অতখানি খ্যাতি পান নি । তবে জার্মানির শিশুসাহিত্যে তিনি সন্নাট । তাঁর ‘পণ্ডতশ্চের’র অনুবাদ প্রাতঃস্মরণীয় ।

কাজ তখন এত এগিয়ে গিয়েছে যে একখানা সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্কৃত-জার্মান অভিধান না হলে আর চলে না । দুই জার্মানপণ্ডিত ব্যোটলিক ও রোট তখন যে অভিধান প্রস্তুত করলেন সেটি প্রকাশিত হল রুশ সন্নাটের অর্থসাহায্যে সাত ভলুমে, ১৮৫২-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ।

এ অভিধান অভুলনীয় । কিশ্বিন্দন পূর্বে পরলোকগত পণ্ডিতবর হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই আমার জানামতে একমাত্র বাঙলা আভিধানিক যিনি তাঁর ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ রচনাকালে এর পূর্ণ সাধ্যবহার করেছেন ।

“ওই শুন দিশে দিশে তোমা লাগি
কাঁদছে ক্রন্দসী”

এখানে ‘ক্রন্দসী’ শব্দের অর্থ কি ? ভাসা-ভাসা ভাবে অনেকেই ভাবেন, এ চতুর্দিকে “কান্নাকাটি” হচ্ছে, আর কি ?’ অন্যান্যটাই বা কি ? স্বয়ং নজরুল ইসলাম লিখেছেন, ‘কাঁদে কোন ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে ।’ জ্ঞানেন্দ্রমোহনের কোষ অনবধ্য । তাতেও দেখবেন, ‘সংস্কৃত অভিধানে পাই নাই, কিন্তু “রোদসী” পাইয়াছি । তার অনুকরণে অনুপ্রাসানুরোধে (!) ‘ক্রন্দসী’ । কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক উদ্ভাবিত (!) এবং বাংলায় প্রথম ব্যবহৃত । কিন্তু এতখানি বলার পর জ্ঞানেন্দ্রমোহন প্রকৃত কোষকারের ন্যায় অর্থটি খিঁচছেন ঠিক । ‘আকাশ ও পৃথিবী ; স্বর্গমর্ত্য ।’

ব্যোটলিক-রোটের সংস্কৃত-জার্মান অভিধানখানার প্রসঙ্গ উঠেছে বলেই এ উদাহরণটি প্রয়োজন হল । এ অভিধান জার্মান দেশ ও বাঙলার যোগসেতু ।

একটু ব্যক্তিগত হয়ে গেলে পাঠক অপরাধ নেন না ।

ছেলেবেলায় আমার মনে ধোঁকা লাগে ‘ক্রন্দসী’ শব্দ নিয়ে । সবে শাস্ত্র-নিকেতনে এসেছি । দূর থেকে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখেছি । শুনেন

ভিন্ন পেয়েছি, তিনি নাকি বিশ বছর ধরে একখানা বাঙলা অভিধান লিখছেন। বিশ বছর ধরে বাঙলা—সংস্কৃত নয়, গ্রীক নয়, বাঙলা অভিধান—বি...শ বছর ধরে। তখনো জানতুম না তারপরও তিনি আরো প্রায় বিশ বছর খাটবেন।

তাকে গিয়ে শুধাতে তিনি বড় আনন্দিত হলেন—আমি ভিন্ন পেয়েছিলাম, তিনি বিরক্ত হতে পারেন। একাধিক বাঙলা অভিধান দেখালেন যাতে শব্দটা নেই। তারপর ব্যোটলিঙ্ক-রোট পাড়তে পাড়তে বললেন, ‘এইবারে দেখো, জার্মানরা কি বলে।’ তাতে দেখি, ডি টোবেসেডেন প্লাখট্‌রাইয়েন, অর্থাৎ ‘যে দ্বাই সৈন্যবাহিনী হৃৎকার করছে।’ হরিবাবু বললেন, ‘ঠিক, অর্থাৎ “দ্বাই পক্ষ” —তার মানে উর্বশীর জন্য দু’পক্ষই কাঁদছে। কিন্তু তার পরেও এগোতে হয়। ঋগ্বেদের এই ২, ১২, ৮-এর টীকা দিতে গিয়ে সায়নাচার্য “ব্রহ্মসী” শব্দের অর্থ করেছেন “স্বর্গমত্য”।

উর্বশী কবিতায় রবীন্দ্রনাথও ব্রহ্মসী শব্দ ‘স্বর্গ ও মত্য’ এই মর্মে ব্যবহার করেছেন। কারণ স্বর্গের দেবতা এবং মত্যের মানব দুই-ই যে তাঁর প্রেমাকাঙ্ক্ষী, তার বর্ণনা তিনি এ কবিতায় দিয়েছেন।

এখানে আর এগোবার দরকার নেই। জার্মানিতে ফিরে যাবার পূর্বে উল্লেখ করি হরিচরণ তাঁর সকল শব্দকোষ ব্যোটলিঙ্ক-রোট কৃত অভিধানের প্যাটোনে নির্মাণ করেছেন।

এ অভিধান জার্মানিতে প্রসারলাভ করার ফলে সে-দেশে ভারতীয় জ্ঞান-চর্চা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চললো এবং তারই ফলে তার পরিমাণ এমনই বিরাট রূপ ধরলো যে, ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতদের হাতে সমর্পণ করতে হল। জার্মান পণ্ডিত বুলার তখন এক বিরাট পুস্তকের পরিকল্পনা করলেন। ‘আর্য-প্রাচ্যতত্ত্বের পরিকল্পনা’—গ্রান্টারিস্‌ ডের ইন্ডো-আরিশেন ফিললগি উল্ট্‌ আলটেরটুমস্‌কুন্ডে নামে এ-বই পরিচিত। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এর প্রথম ভলুম বেরোয়; এখাবৎ কুড়ি ভলুম বেরিয়েছে। প্রধানত কীলহর্ন, ল্যাডার্স, ডাকের-নাগেল এবং আরও অসংখ্য পণ্ডিত এতে সাহায্য করেন।

এর পর আর হিসেব রাখা যায় না।

কারণ এতদিনছিল ব্যাকরণ, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন নিয়ে চর্চা, তারপর আরম্ভ হল ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্র, নাট্য, নৃত্য, হস্তশিল্প, সঙ্গীত—আরো কত কী নিয়ে আলোচনা। স্মিট সায়েব তো একটা জীবন কাটিয়ে দিলেন কামসূত্র নিয়ে। ব্যোটলিঙ্কের অভিধানে কামসূত্রের টেকনিকাল শব্দ বাদ পড়ে গিয়েছিল—স্মিট সে অভিধানের প্রযোজন খুঁড় প্রণয়নকালে এত বেশী কামসূত্রীয় শব্দ প্রবেশ করিয়ে দিলেন যে, তাই নিয়ে পণ্ডিতমহলে নানা রকমের ‘শ্রুতিমধুর’ মন্তব্য শোনা গেল। কোটিল্য নিয়ে কী মাতামাতি! আর, আমি দেখছি আমারই চোখের সামনে এক জার্মান মহিলা সপ্তাহে তিন দিন করে তিনটি বছর এলেন অধ্যাপক কিফেলের কাছে অষ্টাদশের জার্মান অনুবাদে সাহায্যের জন্যে। তার পূর্বে তিনি মেডিকেল কলেজ পাস করে ঐ বিষয়ে বোধ হয় ডক্টরেটও নিয়েছিলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত ক’ বছর খেটেছিলেন বলতে পারবো না। যে

ডক্টর জাওয়ারহুসের কাহিনী পঞ্চম জর্জের অপারেশন প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি, তিনি পর্যন্ত ক্যানসারের গবেষণা আরম্ভ করার পূর্বে জর্মনি ইন্ডলজিস্টের কাছে থেকে শূন্যে নিয়েছিলেন, ভারতীয় বৈদ্যরাজ্যে এই মারাত্মক ব্যাধি সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, কোন চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছে।

ভারতীয় সঙ্গীত ও জর্মনি সঙ্গীত ভিন্ন ভিন্ন মার্গে চলে। তৎসঙ্গেও ভারতীয় বিষয়বস্তু একাধিক সঙ্গীতকারকে ভারতীয় 'লাইট-মোতীফ' জুটিয়েছে, তুলনা-রূপক আলোচনা প্রচুর হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জনৈক মজুমদার এ সম্বন্ধে একখানি উচ্চাঙ্গের পুস্তক লিখে ডক্টরেট পান। পরম পরিতাপের বিষয় এই যুদ্ধে তিনি তরুণ বয়সে প্রাণ হারান। বইখানির পাণ্ডুলিপি দেখে আমি মূগ্ধ হয়েছি। এযাবৎ সে বই কেন যে কোনো ভারতীয় বা ইংরিজী ভাষাতে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয় নি সে এক বিস্ময়।

মুচ্ছকটিক জর্মনিদের প্রিয় নাট্য। তার একাধিক প্রাজ্ঞল এবং মধুর জর্মনি অনূবাদ আমি দেখেছি। এ নাট্যের ঘটনাপর্যায়ের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত সেরকম জর্মনি মনকে চর্গুলিত করে, ঠিক তেমনি তার গীতিতরঙ্গ—বিশেষ করে অকাল বর্ষায় বসন্তসেনার অভিসার ও দ্বিতীয় 'দরিদ্র-চারুদত্ত'ের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর উভয়ের সে বর্ষণবর্ণন জর্মনি-স্বয়ংকে নাট্যগৃহে বহুবীর উল্লসিত উবেলিত করেছে। জর্মনি ভাষা ইংরিজীর তুলনায় অনেক বেশি গভীর ও প্রাচীনত্ব (আরকাটিক) ধরে বলে সে ভাষায় মূল সংস্কৃতির অনেকখানি স্বাদগন্ধ রক্ষা পায় এবং কাব্যরসান্বিত নাট্যরস সহজেই সে ভাষায় সঞ্চারিত হয়।

জর্মনি সাহিত্যদর্শন তথা জাতীয়জীবন—এ দুইয়ের উপর ভারতীয় সংস্কৃতি-বৈদেশ্যের প্রভাব কতখানি হয়েছে তার সিংহাবলোকন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথ জর্মনিতে যান। জর্মনি তখন মিত্রশক্তির পদাধীন, শব্দার্থে মর্মান্বিত। সেখানে রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন, 'পরাজিতের সঙ্গীত'। তখন তিনি জর্মনিতে বেরুপ হাটিক অভিনয়দল পেয়েছিলেন সেরকম অন্যত্র কোথাও পান নি। সে-কথার উল্লেখ তিনি নিজেই করে গিয়েছেন। আমি অন্যত্র একাধিকবার তাঁর প্রতি জর্মনিপ্রীতির নিদর্শন বর্ণন করার চেষ্টা করেছি। এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রায়জন।

এতদিন জর্মনিদের বিশ্বাস ছিল, ভারতবর্ষ একদা সভ্যতা-সংস্কৃতির উচ্চ শিখরে উঠেছিল বটে, কিন্তু বর্তমান যুগে সে দেশে শূন্য ম্যালেরিয়া, গোথরোফ এবং ইংরেজ। (যদিও অবাস্তব তবু বলে ফেলি ; শেষের দুটোর মধ্যে কোনটা বেশী বৈধমান সেটা পশুবিদরা এযাবৎ স্থির করে উঠতে পারেন নি।) রবীন্দ্রনাথের আগমনে এবং দু'তিন মাসের ভিতর তাঁর লক্ষাধিক পুস্তক জনসমাজে প্রচারিত হওয়ার ফলে তথা 'ডাকঘর' নাট্যরূপে দেখে তাদের এ ভুল ভাঙলো। নবীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাদের মনে কোতুহল জাগলো। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা শেখানোর ব্যবস্থা হল। প্রথম অধ্যাপক ভাগনার অবশ্য বাঙলা শিখেছিলেন নিজের চেষ্টাতেই। জর্মনিতে অনূদিত তাঁর 'বাঙলা-গণ-চরিত্র' 'বেঙ্গালিষে এরৎসেলুসেন' সম্বন্ধে আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি। বাঙলা

ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ প্রাধা এবং প্রগাঢ় প্রীতি সম্বন্ধে বার্লিনে প্রবাসী বাঙালী মান্নাই সচেতন ছিলেন। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর স্বরদটি কেমন যেন ভীতি-ভরা বলে আমার মনে হত। আমার মনে হত, বিশ্ব-সাহিত্যের অপরিচিত এই সাহিত্যের প্রতি তাঁর মান্নাভীরক্ত প্রীতি (প্রায় ‘শূন্য-মে’রাই’ বলা চলে) পাছে লোকে ভুল বোঝে, সেই ছলে পাছে সেটিকেও অন্যায় করে ফেলে—এই ছিল তাঁর ভয়। দুঃখিনী মা লাজুক ছেলেকে যে রকম পরের বাড়িতে নিয়ে যেতে ভয় পায়। শোকের বিষয় এই নিরীহ ভাবুকটিও মজুমদারের মৃত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রাণ হারান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং তার পরও জার্মানি অনেক ভারতীয় রাজ-দ্রোহীকে আশ্রয় দিয়েছে। এ সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানি নে। তার কারণ এর সব কিছুটাই ঘটতো লোকচক্ষুর অগোচরে। তবে শূন্যেই ইংরেজ যখন জার্মানির উপর চাপ আনতো কোনো ভারতীয় বিদ্রোহীকে সে-দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য, তখন জার্মানি পুলিশ তাকে কাতর কণ্ঠে বলতো, ‘কেন বাপু একই ঠিকানায় বেশী দিন ধরে থাকো? ইংরেজ খবর জেনে আমাদের উপর চোটপাট করে তোমাকে তাড়িয়ে দেবার জন্য। আজই বাড়ি বদলাও। আমরা বলবো, তোমার ঠিকানা জানি নে।’ এ কথাটি আমি শূন্যেই, নেতা লাল হরকিষণ লালের ছেলে মনো মোহনলাল গাওবার কাছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কিম্বা দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে আমার চেনার মধ্যে জার্মানিতে ছিলেন শ্রীযুক্ত সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা মহেন্দ্র পতাপ ও বীরেন সেন (এঁর পুরো নাম ও পদবী আমার ঠিক মনে নেই)। এ সম্বন্ধে এঁরা সবিস্তর বলতে পারবেন এবং কিছু কিছু বলেছেনও। আর ছিলেন পরলোকগত মানবেন্দ্র রায়।

ভারতের প্রতি হিটলারের প্রাধাভক্তি ছিল না। তবুপরি জাপানকে হাতে আনবার জন্য তিনি চীন ভারত তাকে (‘প্রভাবভূমি’ বা স্ফিয়ার অব ইনফ্লুয়েন্স রূপে) দান করে বসেছিলেন বলে সুভাষচন্দ্রকে বাইরে আদর দেখিয়েও ঠিক মত সাহায্য করেন নি। সুভাষচন্দ্র যে অতিশয় তেজস্বী মহাবীর এবং সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ বিচক্ষণ কূটনৈতিক ছিলেন সে-কথা আমার মত সামান্য প্রাণীর প্রশংসা গেয়ে বলার প্রয়োজন নেই। তিনি হিটলারের মনোভাব বদ্ব্যভিতে পেয়ে জাপান চলে যান। জাপানই যখন শেষমেষ ভারত আক্রমণ করবে, তখন জার্মানিতে বসে না থেকে জাপান চলে যাওয়াই তো বিচক্ষণের কর্ম। এ সম্বন্ধে বাকি কথা প্রসঙ্গ এলে হবে।

জার্মান সাহিত্যধর্শন তথা তার জাতীয়জীবন—এ দুয়েরই উপর ভারতীয় সংস্কৃতি-বৈদেশ্যের প্রভাব কতখানি হয়েছে, এ সম্বন্ধে আলোচনা করার অধিকার আমার নেই। আশা করি শাস্ত্রাধিকারী ভবিষ্যতে এ নিয়ে প্রামাণিক পুস্তক লিখবেন। উপস্থিত আমি মাত্র একটি উদাহরণ দিয়ে এ-স্থলে ক্ষান্ত হই—

ইংরিজী এনসাইক্লোপিডিয়ায় টেগোর শব্দ খুললে পাবেন, মান্না রবীন্দ্রনাথের

একটি অতি ক্ষুদ্র জীবনী। এবং তাঁর জীবনীকার হিসেবে একমাত্র টমসনের নাম।

জর্মন এনসাইক্লোপিডিয়া সাইজে তার ইংরিজী অগ্রজের অর্ধেক মাত্র। তবু তার প্রথমেই পাবেন, টেগোর অশ্বের অর্থ। অনুবাদ দিচ্ছি—

‘টীগোরে’, আসলে ঠাকুর (Thakur) [সংস্কৃত ঠাকুর, ‘প্রভু’, সম্মতির প্রভু], পদবী (অষ্টাদশ শতাব্দীর আরম্ভ থেকে, বর্তমানে পারিবারিক নাম। এ পরিবার দ্বাদশ শতাব্দীতে অযোধ্যা হতে বঙ্গে আগত রাক্ষসদের বাঁড়ুয়ে পদবীধারী। পূর্বপুরুষ সংস্কৃত নাট্যকার ভট্টানারায়ণ (অষ্টম শতাব্দী)।’

এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য তারপর একখানি পুস্তকের উল্লেখ আছে। নাম ‘আর্ষিভ ফ্যুর রাসেন উনট্ গেজেলশাফটস্-বিয়োলগী’ অর্থাৎ ‘আর্কাইভ ফর রেস এন্ড বায়োলজি অব্ সোসাইটি’—‘জাতি এবং সামাজিক জীববিদ্যার দলিলসম্ভাব্যেজ।’

এর পর আছে অবনীন্দ্রনাথের জীবনী, তার পর দেবেন্দ্রনাথের এবং বিস্তৃত বিবরণের জন্য তাঁর আত্মজীবনীর উল্লেখ আছে।

বর্ণানুক্রমে সাজানো বলে সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের জীবনী। অন্যান্য বিষয় উল্লেখ করে লেখক বলছেন, “১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তাকে যে ‘স্যর’ উপাধি দেওয়া হয়, সেটা তিনি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে অমৃতসরে রক্তগঙ্গা (জর্মনে রুট-বাট = রাড্-বাথ) প্রবাহিত হওয়ার পর বর্জন করেন।”

এবং সর্বশেষে যে জীবনীগুলোর উল্লেখ আছে সেটি লক্ষণীয়।

- (1) H. Meyer-Benfey ; Rabindranath Tagore (1921) ;
- (2) P. Natorp ; Stunden mit Rabindranath Tagore (1921) ;
- (3) W. Graefe ; Die Weltanschauung Rabindranath Tagores (1930) ; (4) R. Otto : Rabindranath Tagores Bekenntnis (1931) ; (5) M. Winternitz ; Rabindranath Tagore, Religion und Weltanschauung des Dichters (Prag 1936) অতি উৎকৃষ্ট ; এর বাংলা অনুবাদ হওয়া উচিত (লেখক) ; (6) Marjorie Sykes : Rabindranath Tagore (1943) ; (7) E. J. Thompson : Rabindranath Tagore, Poet and dramatist (1948) ; (8) J. C. Ghosh ; Bengali Literature (1948).

১। Encyclopaediaতে আছে : ‘He accepted a knighthood in 1915, but in 1919 resigned it as a protest against the methods adopted for the repression of disturbances in the Punjab. in later years, however, he offered no objection to the use of this title.’

কী দৃষ্ট বদ্বিধিতে শেষ বাক্যটি লেখা। কবি যথেষ্ট আপত্তি জানিয়েছিলেন, কিন্তু তখন আদালতে মোকদ্দমা করা ছাড়া অন্য কোনো পছন্দ ছিল না।

পাঠশালায় গুরুদ্বয়শায়ের কাছে প্রথম যে চড় খেয়েছিলুম সেটা আজও ভুলি নি। স্পষ্ট চোখের সামনে ভাসছে সে দৃশ্যটা—কিন্তু তার কথা এখন ভাবতে গেলে কেমন যেন সদয় হাসি পায়। অথচ বালিনে নেমে যে চড় খেয়েছিলুম সেটা তো ভুলি নি বটেই, তবু পরে এখনও সেটা স্বপ্নে দেখি এবং এক গা ঘেমে জেগে উঠি। প্রত্যেকটি ঘটনা ঠাস ঠাস করে টাইপরাইটারের মত গালে চড় মেরে যায়—এবং তার প্রত্যেকটি যেন মনের সাদা কাগজের উপর লাল রিবনের কালিতে এখনও জ্বলজ্বল করছে ?

প্রথমবারের অভিজ্ঞতা। কাবুল থেকে দেশ হয়ে বালিন পৌঁছেছি। কাবুলে অনেক মার খেয়ে অনেক কিছু শিখেছি, কিন্তু সেগুলো তো এখানে কোনও কাজে লাগবে না। বালিন মারাত্মক মর্ডান শহর। এখানে চলার ফরাসি কায়দাকেটা একদম অজানা।

প্ল্যাটফর্মে অসহায় আমি দাঁড়িয়ে। রবিনসন ব্রুশো নিশ্চয়ই এতখানি অসহায় অনুভব করেন নি। তিনি যে ভুলই করুন না কেন, তার জন্য তাঁকে কারও কাছ থেকে চড় খেতে হবে না, জেলে যেতে হবে না। তিনি উদ্যম হয়ে ঘুরে বেড়ালেও কেউ কিছু বলবে না। আমি মার্সেলস বন্দরে রাস্তার বাঁ দিকে চলতে গিয়ে প্রথম ধমক খেয়েছি। ফরাসী মাস্টার বলে দিয়েছিলেন বটে, কন্সটিনেন্টে ‘কীপ টু দি রাইট’—আমাদের দেশে খাল-বলেও মাঝরা চিংকার করে একে অন্যকে তর্ক করে ‘আপন ডা-ই-ন!’—কিন্তু বন্দরের ধর্ম্মমারের ভিতর কি অতশত মনে থাকে ?

স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যাকে মার্সেলস থেকে তার করেছিলুম, তিনি সে তার পান নি কিম্বা—সেগুলো আর বলে দরকার নেই। ভুলভোগীই জানেন, তখন সম্ভব অসম্ভব কত কারণই মনে আসে। আমি আসছি জেনে সে আত্মহত্যা করে নি তো ইস্তেক।

পোর্টারটি কিন্তু দেখলুম আমাদের কুলির মত ঘড়ি ঘড়ি তাড়া লাগালে না। আমার সেই বিরাট মাল-বহর—পরে দেখলুম বালিনে তার পনেরো আনাই কাজে লাগে না—ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে নির্বিকার চিত্তে পাইপ টানছে।

জার্মান ভাষা যে একবারে জানি নে তা নয়। ঝাড়া পাঁচটি বজ্র উত্তম উত্তম গুরুদ্বয় কাছে শান্তিনিকেতনে সে-ভাষার ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করেছি। কিন্তু বালিনের এই জীর্ণ শীতের সাঁঝে কোন জার্মান প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বিদেশীর মূখে তারই মাতৃভাষার শব্দরূপ—তাও ভুল উচ্চারণে—শুনতে বাবে ? হাওড়া স্টেশনে যদি কাবুলিওলা কোন বঙ্গসন্তানকে ধড়ি করিয়ে তার খাস কাবুলী উন্নয়ন সহযোগে লিট, লুঙ, আশীর্লিঙ শোনাতে চায় তবে অবস্থাটা হয় কী রকম ?

বুদ্ধি করে টেনে একটি ফরাসী-জাননেওলাই মহিলাকে শ্রদ্ধায় নিয়েছিলুম, স্টেশনে মালপত্র রাখার জায়গাটাকে জার্মানে কী বলে ? তিনি বলেছিলেন,

Gepaeckaufbewahrungsstelle

!!!

প্রথম ভেবেছিলুম তিনি মশকরা করছেন। তাই আমি সেটা টুকে নিয়ে-ছিলুম। মাসখানেক পরে বার্লিনে গোছগোছ করে বসার পর শব্দটিকে হামান-শব্দে দিয়ে টুকরো টুকরো করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তার অর্থ বের করছিলাম। উপস্থিত সেই চিরকুটটুকুন পোর্টারের হাতে দিলুম। সে একটা ‘হুম’ শব্দ করে গুম গুম করে ঠেলাগাড়ি চালিয়ে এগোল। আমি মেরির লিটল ল্যামের মত পিছনে পিছনে চললাম!

মাল সপে দিয়ে রাস্তায় নামলাম।

দেখি নি, কিছুই দেখি নি। রাস্তা, বাড়ি, দোকান, গাড়ি কিছুই দেখি নি। আমি ভাবছি, যাই কোথায়?

হুদো-হুদো কাড় থাকলে কিচ্ছটি ভাবনা নেই। ‘ট্যাক্সি’ এবং ‘হোটেল’ এ দুটি শব্দের প্রসাধাৎ স্পর্টনিক-সহযোগে চন্দ্রলোকে নৈমেও আশ্রয় মেলে। কিন্তু আমার বটুয়াতে তখন ছুঁচোর কেন্দ্র। শ্কেলারশিপের প্রথম কিস্তি না-পাওয়া পৰ্বন্ত মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে। তখনও অবশ্য জানতুম না, মাটি পেতে হলে পাথর-ঢাকা বার্লিন থেকে অন্তত বারো মাইল দূরে যেতে হয়।

হঠাৎ শুনি, ‘গুটেন্‌ আবেস্ট!’ তারপর ‘গুড্‌ ইভনিং’, তারপর ‘ব’ সোয়ার’। তাকিয়ে দেখি, আমার চেয়ে দু’-মাথা উঁচু এক পলিসম্যান, কিংবা সেনাইও হতে পারে।

পরিষ্কার ইংরিজীতে শুধালে, ‘আপনার কি কোনও সাহায্যের প্রয়োজন?’

ম্যাট্রিক ফেল বঙ্গসন্তান দু’শ টাকার চাকরি পেলেও বোধ হয় অভাবানি খুঁশী হয় না।

আমি ক্ষীর্ণকণ্ঠে বললাম, ‘হোটেল।’

লোকটা আমদে। চলতে চলতে বললে, ‘এ শব্দটা তো ইন্টারন্যাশনাল। আপনি অত অসহায় বোধ করছিলেন কেন?’

সত্যি কথা বলে দেব? প্রথম পরিচয়ের প্রথম জন্ম’নকে? বলেই ফেলি।

লোকটি দরদীও বটে। দাঁড়িয়ে বললে, ‘সে তো অত্যন্ত স্বাভাবিক। স্টুডেন্ট মানুষ। পয়সা থাকার তো কথা নয়। তা হলে হসপিৎসে চলুন।’

আমি শুধালুম, ‘সে আবার কী?’

‘ও! হসপিৎস্। ওটা তো ইংরিজীতেও চলে।’

হায় রে কপাল! শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রনাথ, অ্যান্ড্রুজ, কলিন্সের কাছ থেকে পাঁচ বছর ইংরিজী শিখেও যা জানি নে, জন্ম’ন পলিস সেটাও জানে। কলকাতার ভোজপুরী পলিস তা হলে একদিন আমাকে আরবী শেখাবে!

‘হোটেলেই মত। তবে ‘বার’, ‘বুফে’, ‘ডান্স হল’, ‘কাবারে’ নেই। খাবার-দাবার সাধাসিধে। ঘণ্টি বাজালেই ওয়েটার আসে না। তাই সন্তা পড়ে।’

অর্থাৎ হোটেল জিনিসটি ‘দ্য লুজ’—হসপিৎস্ তারই গাহ’ন্য সংস্করণ। ডাকবাঙলো আর চাঁটতে যে তফাৎ তাই।

এতদিন পরও আমার স্পষ্ট মনে আছে লোকটি সঙ্গে যেতে যেতে তার মনের মধ্যে আমাকে বলেছিল। তার ছেলেরিট ম্যাট্রিক পাস করেছে, কিন্তু পরসার অভাব বলে কলেজে ঢুকতে পারে নি।

আমি তো অবাক। তিন-তিনটে ভাষা জানে। শিক্ষিত লোক বলেই মনে হচ্ছে। ফিটফাট ম্যানিফর্ম না হয় সরকারই দিয়েছে, কিন্তু তেমন কিছু গরিব বলে তো মনে হচ্ছে না। তবে কি এদেশেও গরিব লোক আছে?

বাকী কথা পরে হয়েছিল। হসপিটল আছেই। পেঁছে গিয়েছি।

পুলিস মোকামে পেঁছে দিল এই তো বিজ্ঞর। কিন্তু এ-লোকটি শত্রু মিত্রে তফাত করে না। শত্রুর শেষ করতে হয়—শাস্ত্র বলে—এ-লোকটি মিত্রেরও শেষ ব্যবস্থা দেখে যেতে চায়। হোটেলগুলার সঙ্গে আলাপচারী করে সুব্যবস্থা করে দিল। আমি ভাবলুম, এবারে বোধ হয় আমার খাটের পাশে এসে ঘুমপাড়ানি গান গাইবে।

যাবার সময় আমি বললুম, ‘আপনার নাম কি?’

একখানা ভিজিটিং কার্ড বের করে দিলে।

পুলিসম্যানেরও ভিজিটিং কার্ড।

আমি শুধালুম, ‘এদেশের সব পুলিসই কি ইংরিজী ফরাসী বলতে পারে?’

বললে, ‘আপেই না।’ তারপর একটা ব্যাজ দেখিয়ে বললে, ‘যাধের গায়ে এই ব্যাজ থাকে তারা একাধিক ভাষা বলতে পারে। যার ব্যাজে ষটা ফুটক, সে ততটা ভাষা জানে। আমার ব্যাজে তিনটে।’

ধন্যবাদ দেবার মত ভাষা খুঁজে পাই নি।

পরে জানলুম, একাধিক ভাষা জানেনাওলা পুলিস বিরল—আমার কপাল ভাল যে প্রথম থাকতেই তারই একজন জুটে গিয়েছিল।

চাটুয্যে অতিশয় সুদর্শন পুরুষ। সুন্দর ঢেউ-খেলানো চুল। বর্ণটি উজ্জ্বল শ্যাম। চোখ দুটি স্বপ্নাল—ঘন আঁখিপল্লব যেন অরণ্যনীর স্নিগ্ধছায়া নির্মাণ করেছে। সাধারণ বাঙালীর চেয়ে কাঁধ অনেক বেশী চওড়া—বকের পাটা রীতিমত জোরদার। কোমরটি সরু—প্রায় মেয়েদের মত। পা দুটি সেই মাপে। তাই চলনটি ছিল চড়ুই পাখির মত। সেই চওড়া বুক নিয়ে চড়ুই পাখির চলনের মধ্যে যে একটা দৃষ্টি থাকত তাকে কখনো বলা যেতে পারে।

কিন্তু বার্লিনের ভারতীয়-মহল এবং তার রায়ত-প্রজাদের ভিতর সব চেয়ে বিখ্যাত ছিল তার আহনুলমিবত দুটি মোল্লায়েম আকুণ্ঠিত জুলাপি—খ্যাতিতে হিউডেনবুর্গের গোপের সঙ্গে এরা তাৎকালিক বার্লিনে পান্না দিত। জর্মন ভাষায় জুলাপিকে বলে ‘কাটলেট’। ‘হিন্দুস্থান হোস’ রেস্তোরাঁয় চাটুয্যে খাবার কাটলেটের অর্ডার দিলে আমাদের ঠিকে ‘বাম্নী’ রুজ করে বলত, ‘দুটো কাটলেটের জন্য একটা কাটলেট, প্রীজ!’ সেই বামনী থেকে আরম্ভ করে বার্লিন সমাজের মশাইমোড়ল সবাই তাঁর নামে অজ্ঞান। চেহারা ছাড়া তার

আরও দুটো কারণ ছিল। অতিশয় নম্র এবং স্বল্পপভাবী। হাক্কাম হুস্ফুজ অপছন্দ করতেন বলে দিনযামিনীর অধিকাংশ তাঁর কাটত ‘হিন্দুস্থান হোসের’ সুন্দরতম কোণের বৃহত্তম সোফার নিবিড়তম অংশে। ব্যাসনের মধ্যে ছিল অবরে-সবরে বিপ্লবী জনলিনী গুপ্তের সঙ্গে এক গেলাস অতি পানসে বিয়ার পান। এখানে বলে রাখা ভাল যে, বিয়ার পান বালিনে ব্যাসন নয়। খাঁটি খানদানী বালিনবাসী ডিরমি গেলেও তার গলা দিয়ে জল গলানো যায় না, এবং মৃতজনের মুখে বিয়ার পাঠ ধরলে সে চুকুস চুকুস করে দিব্য চাক্ষা হয়ে ওঠে। আর চাটুষ্যে ছিলেন মিঃ বালিন নম্বর ওয়ান।

খুব যে বিস্তালালী ছিলেন তা নয়, কিন্তু পরনে সব সময়ই সুন্দরচিসম্মত সুট টাই। ফরাসী মহিলাদের সঙ্গে সৌধক দিয়ে তাঁর মিল ছিল। শুনেনিঃ ইংরেজ রমণীর নাকি ফ্লোভ, ফরাসিনী কী করে এত অল্প খরচে এত সুন্দর জামাকাপড় পরে। কাঁচা বউ যে রকম পাকা শাদুড়ীর মত কম তেল-ঘিয়ে রান্না করা দেখে অবাক হয়।

তিনি ছিলেন ভারতীয় সমাজের বেসরকারী অনারারি পাবলিক রিলেশনস্ অফিসার। তাঁর অতিশয় অনিচ্ছাতে এ-কর্ম তাঁর স্বক্শে এসে পড়েছিল বলে হিন্দুস্থান হোসের টেলিফোন বাজলে তিনি ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাত নেড়ে কোফোনের কাছে বসে আছে তাকে বোঝাতেন যে তিনি অনুপস্থিত। অবশ্য বারমর্ক হলে শিভাল্লীর খাতিরে মাঝে-মাঝে ব্যত্যয় করা হত।

সোফার হাতায় ডান হাত ট্রেস দিয়ে তারই উপর গাল রেখে দিনরাত চিন্তা করতেন। কী চিন্তা করতেন জানি নে—খোঁচাখুঁচি করেও বের করতে পারি নি।

হোটেল বায়স-নিদ্রায় যামিনী-ধাপন করে পরদিন বোরোলুম বন্দুর সন্ধান। সে ঠিকানায় তিনি নেই। তারপর কলকাতার হিসেবে বলতে গেলে কখনও শেয়ালদা, কখনও আলিপুর, কখনও হাতিবাগান, কখনও টালিগঞ্জ করে করে বুরুলুম, বন্দুর যে-ঠিকানা আমার কাছে ছিল, সেটা অন্তত এক বছরের পরনো এবং ইতিমধ্যে তিনি প্রায় প্রতি মাসে বাড়ি বদল করেছেন। পাওনা-দ্বারের ভীতি তাঁর নেই, তবে যে কেন তিনি এই বালিন প্রদেশটার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবাধ চষেছেন পরে তাঁকে জিজ্ঞেস করেও সেটা জানতে পাই নি। ইতিমধ্যে আমি ভুল বাসে উঠে, ভুল জায়গায় নেমে, ট্রামের নম্বরের সঙ্গে বাসের নম্বর ঘুলিয়ে ফেলে, বিরাট বিরাট বাড়ির আগাপান্তলা ঠ্যাঙাতে ঠ্যাঙাতে শীতে জ্বদ-থব্দ হয়ে ককাতো ককাতো যখন নিতান্তই একটা বাড়ির সিঁড়িতে ভেঙে পড়লুম, তখন সন্ধান পেলাম সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মশায়ের। তিনি নিয়ে গেলেন চাটুষ্যের কাছে।

সেই শীতে আমি যেন মাঘের পানাপুরুষে চুবুনি খেয়ে দৌঁখ সমুখের আঙিনায় খড়ের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। এক লহমায় সর্বাঙ্গ ওমে এলিয়ে পড়ল। দু’লহমায় কুঞ্জে সমস্যার সমাধান হল। সাথে কি রাতভূমি বলে, ‘মদুজতাবা কুটিল অতি, বন্দো বটে সাধা, তার মাঝে বসে আছে চট্টো মহারাজা!’

পাঠান্তর প্রাক্ষিপ্ত ।

আমাদের 'বটতলা'তে বই বিক্রি হয়, কলকাতা-মাদ্রাসা অঞ্চলের নাম ভাল-তলা । সেখানে আরবী, ফার্সী, উর্দু বই বিক্রি হয় । এখানে 'লিভেনতলা'তে বালিন বিশ্ববিদ্যালয় । লিভেন মানে ইংরিজীতে 'লাইম', কিন্তু সে 'লাইম' আমাদের নেবু নয়, তাহলে ওটাকে স্বচ্ছন্দে নেবুতলা বলা যেত । বাঙ্গালীরা তৎসঙ্গেও বলত ।

আমাদের দেশ গরম । সেখানে না হয় পণ্ডিতমশাই অক্লেশে ক্লাস বসান । তারও বহু পূর্বে আরণ্যক হয়ে গিয়েছে । অরণ্যে পাঠ্য ব্রাহ্মণের অংশবিশেষ । কিন্তু এই শীতের দেশে গাছতলাতে ক্লাস বসবে কী করে ? নেবুতলা নাম তাহলে নিতান্তই কাকতালীয় । যেমন বেনেরা বটগাছতলায় বসত বলে ফিরিঙ্গিরা বট গাছের নাম দিল 'বানয়ান ট্রি' ।

হিটলার যখন তাঁর 'হাজার বছরের জন্য রাষ্ট্র' গড়তে গিয়ে তার রাজধানী বালিন শহরের সংস্কার করতে আরম্ভ করলেন, তখন প্রথমেই হুকুম দিলেন লিভেন বা লাইম গাছগুলো কেটে ফেলতে । শত্রুপক্ষ রটালে, 'ইনি আবার আর্টিস্ট !' আসলে কিন্তু তাঁর দোষ নেই ; গাছগুলো তখন অত্যন্ত বৃক্ষজরাজীর্ণ । সেগুলো কাটার ফলে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টগুলো বড় ক্যাটক্যাট করে চোখে পড়ল—শত্রু-মিত্র-নিরপেক্ষ সবাই মিলে রাস্তাটার নতুন নামকরণ করলে 'উনটার ডেন' ল্যাটেনে'ন' অর্থাৎ 'লণ্টনতলা' ! পরে অবশ্য হিটলার তামাম জার্মানি খুঁজে সব চেয়ে সেরা লিভেন চারা সেখানে পুঁতেছিলেন ।

দুশ বছরের পুরনো খানদানী রাজপথ । রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রায় এক মাইল অবাধি গিয়ে ব্রাউনবুর্গ গেট । বিরাট সুউচ্চ সেই তোরণের উপর রথাস্ব সহ 'বিক্সিয়ন' বা 'ভিক্টোরিয়া'র (ইংলেডের রানী না) রোজ প্রতিমূর্তি । হিটলার এ রাস্তা বাড়িয়ে দিয়ে শার্লটেনবুর্গ পেরিয়ে বহুদূর অবাধি টেনে নিয়ে তার নাম দিয়েছিলেন 'ইন্সট-ওয়েস্ট এক্সিস' । তাঁর আত্মহত্যা করার কয়েক দিন পূর্বে এ-রাস্তায় যান চলাচল যখন প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ তখন তাঁকে সাহায্য করার জন্য এখানে উড়োজাহাজ পর্যন্ত একাধিকবার ওঠা-নামা করোঁছিল । এয়ার-পোর্টগুলো তখন মিত্রশক্তির কক্ষজাতে চলে গিয়েছে বলে যারা বিশ্বাস করেন—হিটলারের পালাবার কোনও উপায় ছিল না, তাঁদের বিরুদ্ধে অন্যপক্ষ এই ইন্সট-ওয়েস্ট এক্সিস দৌখিয়ে দেন । আজ অর্থাৎ ১৯৫৯ সনে এ রাস্তার পূর্বার্ধ রাশার হাতে, পশ্চিমার্ধ মিত্রশক্তির । কিন্তু সে-সব অনেক পরের কথা ।

এ-রাস্তার দ্রুত জীবনের চরম গতিবেগের সঙ্গে শান্ত গ্রাম্য-জীবনের সূক্ষ্মগুণ অশুভ সমন্বয় । দুর্দিকে যান-চলাচলের রাস্তা ; মাঝখানে লাইম গাছের বিজীর্ণ এভিন্যু—চলেছে ত চলেছে, তার যেন শেষ নেই । এদিকে পেভমেন্টের উপর উর্ধ্ব্বাসে ছুটে চলেছে একাধিক লোক, বাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, স্টপেজে

ওটাতে চাপবে বলে, আর এদিকে এভিন্যার উপর দিয়ে যা চলেছেন পেরাম্ব-লেটর ঠেলে ঠেলে সপ্তপদী চলার গতিতে। দশ কদম যেতে না যেতে বসে পড়ছেন হেলানবার বোঁঙিতে। সেখানে পেনশনার চোখ বন্ধ করে পাইপ টানছেন, বৃদ্ধে বিকলাঙ্গ বোঁঙির গায়ে ক্রাচ খাড়া করে দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে, এ-বাড়ির আয়া ও-পাড়ার রুটিওলার সঙ্গে রসালাপ করছে, আর বোঁঙির হেলানে মাথা দিয়ে হেথাহোথা সর্বত্র ঘূমুচ্ছে অনেক লোক। এক বোঁঙিতে দুটি কলেজের ছোকরা মৃদুকণ্ঠে আলোচনা করছে। আরেক বেণ্ডে একজন আরেক-জনের পড়া নিচ্ছে।

দুই সারি বোঁঙির মাঝখান দিয়ে শিকপ করতে করতে চলে যাচ্ছে একটি মেয়ে। পেছনে ঠাকুরদা চলেছেন ‘প্র্যাম’টার চেয়েও মশ্মগতিতে। মেয়েটি উই—ওখানে—এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিকপ করছে; ঠাকুরদা গতিবেগ বাড়াবার প্রয়োজন বোধ করছেন না।

এরই এক পাশে দাঁড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়।

বেশী পুরনো দিনের নয়। একশ’ বছরের একটু বেশী। এর চেয়ে ঢের পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় জর্ম্মনিতে আছে। আসলে বার্লিন খুব সম্ভ্রান্ত শহর নয়। সে বাবড়ে রোম, প্যারিস, ভিয়েনা—এমন কি প্রাগ;—যাঁরা দেখেছেন তাঁরা ইস্তাম্বলেরও নাম করেন। বার্লিন অনেকটা লন্ডনের মত; বেশীর ভাগ জিনিসই নকল। সঙ্গীতের জন্য ভিয়েনা, চিত্রের জন্য প্যারিস, ডাক্ষের জন্য রোম। তবে কিনা বিজ্ঞান এ-খুঁগের কামনার ধন। সেখানে বার্লিনের নাম আছে, আর আছে জর্ম্মনীর রাজধানীরূপে। তারই প্রায় কেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত বলে ব্যবসাবাগি জ্যা এখানে প্রচুর। টোঁকিও না ওঠা পৰ্ব্বন্ত বার্লিন পৃথিবীর তৃতীয় নগরী ছিল।

রুনিভার্সিটির সামনেই প্রতিষ্ঠাতা ভিল্‌হেলম ফন হুম্বল্টের প্রতিমূর্তি। গ্যোটে’র বিশিষ্ট বন্ধু।

হায়, সে সত্যভুগ গিয়েছে।

ভারতবর্ষ, গ্রীস, আরব ভূখণ্ডে একদা জ্ঞানী বললে বোঝাত সর্বজ্ঞানে জ্ঞানী। সর্ববিষয়ে সমান জ্ঞান থাকবে এমন কোনও কথা ছিল না, কিন্তু সর্বজ্ঞানভান্ডার থেকে অণুপবিস্তর সম্ভ্র করে যিনি অখণ্ড সর্বাঙ্গসম্বন্ধের বিশ্বদর্শনে উপনীত হতে পারতেন তাঁকেই বলা হত পণ্ডিত। এ তিন ভূখণ্ডের পাঠ্য-নির্ঘণ্ট দেখলেই বোঝা যায়, আদর্শ ছিল মানবজীবনে পরিপূর্ণতায় পৌঁছানোর জন্য পরিপূর্ণ জ্ঞানের সম্ভ্রান। এক দিকে আয়ুর্বেদ অন্য দিকে যোগশাস্ত্র, এক দিকে ব্যাকরণ অন্য দিকে অলঙ্কার, একদিকে রসায়ন অন্য দিকে দর্শন, সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের প্রতি স্পর্শকাতরতা, নাট্যে প্রীতি, কোর্টিল্যের কুটিলতার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়, বসন্তসেনার নৃত্যগীতসঙ্গীতের সম্মুখে সহস্রের বিস্ময়।

বস্তুত, এ সবই বাহ্য। কিন্তু এদের সম্মিবেশের মাধ্যমে কোন কোন গুণী হঠাৎ পেয়ে যান অনিবচনীয়ের সম্ভ্রান। সে সম্ভ্রান ভ্রয়োদর্শনের ভূমানন্দে।

সবাই পেত তা নয়, কিন্তু না পেলেও তাঁরা সাধকসমাজে সম্মানিত হতেন। সর্ববিষয়ে তাঁদের সহানুভূতি থাকত বলে তাঁরা প্রাজ্ঞসমাজের পৃষ্ঠপোষক বলে খ্যাত হতেন।

জন্মনিতে এ স্বর্ণযুগ আসে অষ্টাদশ শতকের শেষে ও উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে। তার অন্যতম প্রতীক ভিলহেল্ম ফন হুম্বল্ট।

আসলে ইনি কবি এবং আলংকারিক। রসশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রামাণিক পুস্তক এবং গ্যোটার কাব্যালোচনা নিয়ে তিনি নামলেন আসরে। কিন্তু অল্পকাল যেতে না যেতেই তাঁর রাজনৈতিক প্রাধিকার ধরা পড়তেই তাঁকে ডাকা হল রাজসভায়। এদিকে তিনি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করতেন—সর্বোচ্চ আদর্শ বলে ধরে তুলেছিলেন মানবচরিত্রের স্বাধীন এবং সর্বাঙ্গীন বিকাশ। সেই আদর্শ যাতে ক্ষুদ্র না হয় তাই তিনি আজ ভিয়েনা কাল লন্ডনের রাজদরবারে যেতেন, কিংবা পরশু বার্লিনের শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে কাজ করে গেলেন। এ সময়েই তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে স্পেনের বাস্কুয়ের ভাষা নিয়ে আলোচনা করে দেখিয়ে দিলেন যে ভাষার মূলে ব্যাকরণ আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু ভাষার কাঠামো ভাল করে পরীক্ষা করলে পাওয়া যায় সে-ভাষাভাষীর পরিপূর্ণ পরিহাস। যে-কোন সমাজের সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস লুকনো থাকে তার ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের মাঝখানে। তাই এক সমাজ যেমন অন্য সমাজ থেকে ভিন্ন, ঠিক তেমনি এক ভাষা অন্য ভাষা থেকে। মূলে এক সমাজ হলেও তারা যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তাদের ভিন্ন ভিন্ন বিবর্তন তাদের আপন আপন ভাষাতে প্রতিবিস্তৃত হয়।

সেই সূত্রে তিনি উপনীত হলেন চরম মীমাংসায়—মানুষের মননবৃত্তির শ্রেষ্ঠতম বিকাশ হয়েছে আর্থ ভাষায়। মানব দেবতাত্মার পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় তার বাণ্যয় ভূবনে।

ভিলহেল্ম ফন হুম্বল্ট ভাষাতত্ত্বের সর্বপ্রথম দার্শনিক।

তাঁর অনূজ আলেক্সান্ডার ফন হুম্বল্টের পরিচয় দেওয়া আরও কঠিন। সেযুগের গুণীরা একব্যাক্যে স্বীকার করেছেন, নেপোলিয়নের পরেই খ্যাতিতে এঁর স্থান। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন শাখা-প্রশাখা ছিল না যাতে তিনি বিচরণ করেন নি। এদিকে ভূতত্ত্ব ঔষিদ্ধতত্ত্ব, এদিকে উত্তর মেরু থেকে আরম্ভ করে বিষুবরেখা অবধি চুম্বকের আকর্ষণশক্তি-বিবর্তন, মহাকাশে উল্কাপিণ্ডের বিশেষ দিনে প্রবলভর বর্ষণ—বিজ্ঞানের একাধিক নবীন ক্ষেত্র তিনি আবিষ্কার করলেন। মহাপুরুষ মুহম্মদ বলেছিলেন, জ্ঞানের সম্মানে যদি বেরুতে হয় তবে চীনও যেয়ো। আরবীভাষার কাছে চীনই সব চেয়ে দূরের দেশ। এ মনীষী জর্মনি থেকে চীন, এদিকে দক্ষিণ আমেরিকার সর্বোচ্চ পর্বত কিছই বাহ দেন নি। ষাট বছর বয়সে মানুস যখন খ্যাতির মকুটপরে সহাস্যবদনে জনগণের করতালিধ্বনি শোনে, তখন হঠাৎ অর্থানুকূল্য পেয়ে বেরোলেন রাশিয়া ভ্রমণে—আবিষ্কার করলেন উরালে হীরকচিহ্ন। অথচ প্রথম যৌবনে প্রকাশিত তাঁর দার্শনিক

রহস্যতত্ত্ব ও মাংসপেশীর স্নায়ু সম্বন্ধে রচনা তখনই পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রমথ্য আকর্ষণ করেছিল।

তারি 'কস্মন্স' বা সৃষ্টি এখনও আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে পড়া যায়। এ-ধরনের বই আজকাল আর লেখা হয় না। প্রাচীন দার্শনিক জ্ঞান ও সনাতন রসতত্ত্ব তিনি মিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন সে-যুগের নবাবিকশিত বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে এমন এক সংমিশ্রণে ঘাতে করে বিজ্ঞানের ক্ষুদ্রতম বিচ্ছিন্ন জ্ঞানবিন্দু ভ্রমোদর্শনের অসীম সিদ্ধান্তে স্থান পায়। পক্ষান্তরে দার্শনিকের কল্পনা-বিলাসের ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমা যেন বাস্তবের ধূলিকণাকে অবহেলা না করে।

তাই বোধ হয় নগণ্যজনের দৈন্য-বুদ্ধিগা সম্বন্ধে তিনি যৌবন-প্রারম্ভেই সচেতন হন। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার পশ্চাৎ দেখে উদ্ভত ভাষায় তার প্রতিবাদ জানিয়ে যে সংস্কার কর্ম আরম্ভ করলেন সে-কথা আজও জর্মনি ভোলে নি। পরবর্তীকালে দাস-প্রথার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়। তিনি তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন, এই যুগধর্ম-সম্মত প্রথার বিরুদ্ধে। এবং আজীবন তার প্রচেষ্টা ছিল, বিস্তহীন জ্ঞানার্থী বৃদ্ধ পণ্ডিত যেন সংসারের তাড়নায় তার সাধনার মার্গ বর্জন না করে।

তাই যখন কৃতজ্ঞ জর্মনিগণ বিস্তহীন জ্ঞানার্থীর জন্য 'রস্কোত্তর' বা 'ওয়াক্‌ফ' অর্থাৎ 'ট্রাস্ট' নির্মাণ করল তখন সেটিকে উৎসর্গ করা হল তারই নামে—'আলেকজান্ডার ফন্ হুম্বল্ট স্টিফটুঙ'। দেশে-বিদেশে এটি সুপরিচিত।

এদেশে রামেন্দ্রসুন্দর গ্রিবেদীকে এই ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ইনি এঁদের জীবনী ও কাব্যকলাপের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন।

সে সভায়ুগ গেছে। মহাকাবি গ্যোটে'কে গুরুত্ব বরণ করে তার চতুর্দিকে যে কেন্দ্র সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীর ইতিহাসে এমন আর কোথাও হয় নি। গ্রেগেল, ফিষটে, শিলার, হুম্বল্ট-ভ্রাতৃত্ব, একেরমান ইত্যাদি ইত্যাদি বহু পণ্ডিত, গবেষক, কবি তাঁদের জীবন-বাতায়ন উদ্ভাস্ত করে পূর্ব-পশ্চিমের জ্ঞান-দর্শন, উদ্‌-অধের বিজ্ঞান-বিশ্লেষণকে যে আবাহন করেছিলেন, তারই ফলে জর্মনির যে সর্বমুখী বিকাশ হল আজও সে বিশ্বজনের বিস্ময়।

লোকে শুধায়, যে জর্মনি ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পদদলিত, নিঃশব্দ, আজ সে বিশ্বের উত্তমর্গ হল কী প্রকারে?

এর বদনিয়াদ বড় দড়।

জীবনের সেই তিনটি সপ্তাহ কী করে কেটেছে তার বর্ণনা দেবার শক্তি আমার নেই। যেন পাহাড়ের চড়াই হঠাৎ কুয়াশা নামল। হাতড়ে হাতড়ে আমি এদিকে যাচ্ছি ওদিকে যাচ্ছি আর দৃশ্যবস্তুর বিভীষিকা দেখছি; হঠাৎ পায়ের তলার শক্ত জমি খসে পড়েছে আর আমি সর্বনাশের অতল গভীরে বিলীন হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছি। এবারে 'ভাষা-পরীক্ষার' শক্ত জমিতে পড়ার সঙ্গে সব কটা হাড়হাট্ট গর্দাড়ে যাবে।

'ভাষা-পরীক্ষা'টা কী?

চাটুয্যে নিয়ে গেছেন ডঃ গ্যোপেলের কাছে। বলে রাখা ভাল, ইনি হিটলারের প্রোপাগান্ডা-মাস্টার ডঃ গ্যোবেল্‌স্‌ নন। হুন্‌বল্ট ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি। অতিশয় নিরীহ লোক। ততোধিক সাদাসিধে জামাকাপড়—যত দূর সম্ভব হতে পারে। মোটামোটা মানুষ এবং হাসি-হাসি মধু। মিষ্টি সুরে এত নিচু গলায় কথা কন যে, টেবিলের এপারে এসে পেঁঁছয় না। দেশে থাকতে এর সঙ্গেই পট্টালাপ ছিল। ইনিই প্রাজল জর্মনে জানিয়েছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সীট তৈরী; আমি এলেই হল। এখন বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ সেই মিষ্টি গলাতেই বললেন, ‘অবশ্য একটা অত্যন্ত সরল মামুলী পরীক্ষা দিতে হবে যে, কলেজের লেকচার বোঝার মত জর্মন ভাষায় ক খ গ ঘ আপনি জানেন।’

বলে কী! পরীক্ষা দেব কী করে? ফেল মারব নিশ্চিত। পড়তে পারি—খানিকটা। কিন্তু কেউ কথা বললে সেটা বুদ্ধিতে তো পারি নে। না হলে চাটুয্যেকে, দোভাষী বানিয়ে আনব কেন?

আর এ তো বড় বিদকুটে ব্যবস্থা। পড়াশুনোর পর পরীক্ষা দিতে রাজ্যী আছি, কিন্তু এখানে বৃত্তি আগে পরীক্ষা, তারপর লেখাপাড়? আগে ফাঁস তারপর বিচার! হটেনটটের রাজত্বেও তো এরকম ধারা হয় না। হ্যাঁ, দার্শনিক শোপেনহাওয়ার নামকরা জর্মন লেখকদের ভাষাতে ব্যাকরণের ভুল দেখে একবার বলেছিলেন, ‘শুদ্ধ জর্মন আর হটেনটটরাই আপন মাতৃভাষা নিয়ে এরকম ছিনিমিনি খেলে।’

আমাদের রঙ কালো বলে মূখের ভাব-পরিবর্তন ইয়োরোপীয়রা চট করে ধরতে পারে না। তাই তারা বলে, আমরা দুর্জের, অবাধ্য। আমার চেহারা কিন্তু তখন এমনি ফ্যাকাশে মেরে গিয়েছে, শূকনো গলা-তালু থেকে এমনি চেরা বাঁশের শব্দে আওয়াজ বেরুচ্ছে যে, ভালমানুষ ডঃ গ্যোপেল পর্যন্ত সেটা লক্ষ্য করে আমাকে দিলাশা-সান্ত্বনা দিতে আরম্ভ করেছেন। পরীক্ষাটা নাকি একেবারে কিসসুটি নয়, ছেলেখেলা, এলিমেন্টারী, ছ’মাসের কোর্স, এখনও তিন সপ্তাহ রয়েছে, এস্তের সময় পড়ে আছে।

‘মানে?’

‘অর্থাৎ বিদেশীদের জন্য জর্মন ভাষার ক্লাস হয়। ছ’মাসের কোর্স। আর তিন সপ্তাহ বাদে পরীক্ষা। আপনি কাল থেকে ঢুকে যান—সব ঠিক হয়ে যাবে।’

অর্থাৎ ছ’মাসের কোর্স আমাকে তিন সপ্তাহ শেষ করতে হবে। ওঃ! কী সুখবর!

কিন্তু আমি আপত্তি জানাই কি করে? বৃত্তির জন্য দরখাস্ত পেশ করার সময় কবুল জানিয়েছি যে, আমি জর্মন জানি, প্রোফেসরের সার্টিফিকেটও সঙ্গে ছিল। এখন সেগুলো রদবদল করি কি প্রকারে?

গ্যোপেল মিষ্টি গলায় হাসিমুখে আমাকে আরও অনেক সান্ত্বনা দিলেন—তার অল্প অল্প ব্যবজ্ঞান। বাকিটা চাটুয্যে অনুবাদ করে দিলেন।

তার প্রত্যেকটি সামান্য-বচন আমার সর্বত্র কণ্ঠকিত করল। এ বেন ফাঁসির

আসামীকে বলা হচ্ছে, ঘড়িটাকে মাখন মাখিয়ে মোলায়েম করা হয়েছে, বে-টুলে দাঁড়াতে সেটা মখমলে মোড়া !

সায়েরের কথাই ফাঁকে এটাও বেরিয়ে গেল যে, পরীক্ষায় ফেল মারলে ভর্তি হতে পারবে না। আবার ভর্তি হওয়ার পালা ছ'মাস পরে। অর্থাৎ আমরা জার্মান-বাসের শেষের ছ'মাস কাটবে বিনা বৃত্তিতে—অনাহারী। সায়ের সেটা অবশ্য বলেন নি। তিনি পই পই করে বোঝাচ্ছিলেন ও-পরীক্ষাতে ফেল মারলে শতকরা একজন। কিন্তু সে একজন যে আমি হব না, তিনি জানেন কী করে ? লটারিতে হই না, সে আমি জানি।

আরবী ভাষায় বলে, আকাশে দু'খানা চাপাতি। একটি ঠান্ডা, আরেকটি গরম। চন্দ্র আর সূর্য।

রাস্তায় যখন বেরোলুম তখন দু'পদর। সূর্যটিও তখন আমার কাছে ঠান্ডা চাপাতি বলে মনে হল।

তাই বলছিলাম, 'ভাষা-পরীক্ষা'র শব্দ জমিতে পড়ে হাড়-হাড় চুরমার না হওয়া পর্যন্ত এখন শব্দ হুশ-হুশ করে নীচের দিকে পতন।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডরের ক্রসিঙে ক্রসিঙে ট্রাফিক পলিসম্যান রাখা উচিত। আমি ঢুকেছিলাম দু'পিরিয়ডের মাঝখানে ক্লাস-বদলাবদলির সময়। করিডরে করিডরে 'আপন ডাইন' রেখে তরুণ-তরুণীর জনস্রোত উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম পানে যাচ্ছে, কিন্তু ক্রসিঙে এসে লেগে যাচ্ছে শব্দমার। ঠিক ঐ সময়ই হয়ত খুলে গেল তারই পাশের বিরাট হলের দরজা। তার থেকে বেরোবার চেষ্টা করছে আরও শ' দুই ছাত্র-ছাত্রী। তখন লেগে যায় সত্যিকার হরিমুট। সবাই আবার চলতে চলতে ধাক্কা খেয়ে এদিক ওদিক ঠিকরে পড়ে তর্ক চালাচ্ছে নিজেরদের মধ্যে—এখুনি ক্লাসে অধ্যাপক যা পড়িয়েছেন তাই বিষয়বস্তু।

কিন্তু এত তাড়া কিসের ? পরে শুনলাম এবং দেখলামও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা এবং তার অনুপাতেরও বেশী ছাত্রসংখ্যা এত মারাত্মক রকমের বেড়ে গিয়েছে যে, এখন আর ক্লাসে জায়গা হয় না। আগে না গেলে রক্ষে নেই।

রোল কল এদেশে নেই। শব্দে বঙ্গসন্তান আমি বড়ই উল্লাস বোধ করেছিলাম। গাইড-বুক নিশ্চয়ই আছে। তাই মদুজত করে ঠিক পরীক্ষা পাস করে যাব—অবশ্য 'ভাষা-পরীক্ষা' নয়, ফাইনালটার কথা হচ্ছে। তখন শুনলাম, গাইড বুক নেই, অধ্যাপকরা বই লেখেন, সেগুলো পড়তে হয়। তাহলে ক্লাসে যাবার কী প্রয়োজন ? বিস্তার বই প্রকাশিত হওয়ার পরও অধ্যাপক সে-সব গবেষণা করেছেন সেগুলো বলেন ক্লাস-লেকচারে। পরীক্ষার সময় প্রশ্ন করেন তার থেকে। তার উত্তর দিতে না পারলে নম্বর পাওয়া যায় না—শব্দ মাত্র বইয়ের জোরে মেরেকেটে পাস-নম্বর পাওয়া যায় মাত্র।

এসব পরের কথা।

এ-জলতরঙ্গ ভেদ করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপারে পেয়ে আমি মোকা পেয়ে একটা ফাঁকা ক্লাসে ঢুকে পড়লাম। খানিকক্ষণ পরে ঘণ্টা

পড়ল, নেক্সট পিরিয়েডের। করিডরগুলো মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করতে লাগল।

মেশে থাকতে কত রকম কথাই না শুনোঁছিলুম—জার্মান পণ্ডিতদের দেশ, সেখানকার সবাই ইংরিজি জানে। রাস্তা সোনা মোড়া। গায়ের লোক যে রকম ভাবে শ্যালদায় পেঁছিলেই তার জন্যে হুদো হুদো চাকরি ‘অপিলে’ করে বসে আছে।

অনেক কষ্টে ‘বিদেশীদের প্রতিষ্ঠানটি’ আবিষ্কার করলুম। আশা করেছিলুম, বিদেশীদের নিয়ে এদের যখন কারবার তখন অন্তত এরা ইংরিজী বলতে পারবে। পারে। তবে আমি যতখানি জার্মান পারি তার চেয়েও কম।

বুঝলুম, বিদেশী রাজত্ব না হওয়া পর্যন্ত কোনও দেশের লোক ব্যাপকভাবে বিদেশী ভাষা শেখে না। আমরা এককালে ফার্সী শিখেছিলুম; তারপর ইংরিজী শিখলুম।

মনকে সাম্বনা দিলুম, এরা সবাই ইংরিজী বলতে পারলে আমার আর জার্মান শেখা হত না।

ইতিমধ্যে এক সদুপদ্রুপ কাউন্টারে এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন। ওঁকে দেখেই যে-মহিলাটি আমার তদারক করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি খুশিভরা মুখে অনর্গল জার্মান বলে যেতে লাগলেন। বার বার ‘প্রফেসর’ কথাটি আঁসছিল বলে অনুমান করলুম, ইনি আমাকে জার্মান শেখাবেন। আমিও খুশিমনে ভাবলুম, এবারে আমার ভাঙা-নৌকা কুল পেল। একে আমার হৃদয়-বেদনা সমুচিত ভাষায় বুঝিয়ে বলতে পারব।

ইয়াল্লা! ইনিও তথ্য। পরে জানলুম, পাছে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই আপন আপন মাতৃভাষায় তাঁর সঙ্গে কথা বলে বলে জার্মান অবহেলা করে তাই তিনি একাধিক ভাষা জানা সত্ত্বেও জার্মান ভিন্ন অন্য ভাষা বলেন না।

নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ভাঙা নৌকোটা দ’য়ের দিকে ঠেলে দিয়ে অতল জলে ডুব দিলুম। মা গঙ্গাই জানানেন, বস্ত্র নেই—গামছাখানা পর্যন্ত গেছে। মনকে ধমক দিয়ে বললুম, ‘ইংরিজীর প্রতি তোমার এত দরদ কেন? ওটা কি তোমার বোনপোর ভাষা? জার্মান কি সতীনের ভাষা? ব্যস, হয়েছে, আর মনস্তোষনে বেনা বোনবার প্রয়োজন নেই।’

প্রফেসর আদর করে প্রায় হাতে ধরে ক্লাসের দিকে নিয়ে চললেন। আবার চতুর্দিকে জনসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ। এবারে কিস্তু ভয় নেই। প্রফেসর কান্ডারী। ইনি যদি এ দরিয়ায় আমাকে না বাঁচাতে পারেন তবে ব্যাকরণ পারাবারের কুমার-হাসর কৃৎ-তর্কিতের পুচ্ছ-দস্ত থেকে পরিচালন করে ভাষা-পরীক্ষার ওপারে নিয়ে যাবেন কি করে? সেই পাত্রী সায়েবের গরু মনে পড়ল। বদলি হয়ে এসে অচেনা গ্রামে নেমেছেন। রাস্তায় দুটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন গায়ের গির্জের পথ।

তারা বাতলে দিলে তিনি খুশি হয়ে বললেন, ‘আজ তোমরা আমাকে গায়ের পথ বাতলে দিলে; আসছে রববারে যদি গির্জায় আস তবে স্বর্গে যাবার সৈন্য মজতবা আলী রচনাবলী (৭ম)—২২

পথ আমি তোমাদের বাতলে দেব ।’

তখন একটা ছেলে অন্য ছেলেটার পাজিরে খোঁচা মেরে বললে, ‘শুনলি ? গায়ের পথ জানে না—সে বাতলে দেবে স্বর্গে’ যাবার পথ !’

উপস্থিত দেখলুম, জার্মানি দেশের আমার প্রথম গুরু, অন্তত গায়ের পথটা জানেন ।

সে কী ক্লাস ! চীনেম্যান থেকে আরম্ভ করে নিগো পর্যন্ত ! টের টের চিড়িয়াখানা দেখেছি, কিন্তু এ-রকম তাজ্জব চিড়িয়াখানা পূর্বে দেখি নি পরেও দেখি নি । এরা যদি কোট-পাতলুন না পরে আপন আপন দেশের পোশাক পরত তাহলে অন্যায়সে পৃথিবীর যে-কোন ফ্যান্সি ড্রেস, কস্টুম্ বন্ধে হারাতে পারত । দুনিয়ার চিড়িয়া জড়ো হয়েছে জার্মান বুনিল শিখে, এদেশের এলুম রপ্ত করে দেশে ফিরে নরী তালিমের ছয়লাপ বইয়ে দেবার জন্য । আর বয়েসেরই বা কত রকমফের ! আঠার থেকে চল্লিশ অবধি ছেলেবুড়ো, মেয়ে-মন্দ ।

আমরা যখন ক্লাসে ঢুকলুম তখন একটি আঠার-উনিশের খাপসদরং চিংড়ি প্রায় চল্লিশ-বিরিয়ালিশের রগে-পাক-ধরা চুলের চীনা ভদ্রলোককে ব্লাকবোর্ডের উপর কী একটা ধাঁধা বোঝাতে গিয়ে খিল-খিল করে হাসছে, আর চীনা প্রোটাট গান্ধীজীর স্মিতহাস্যের সঙ্গে বোকা-বনে-বাওয়ার ভাবটা মিশিয়ে ঘন ঘন সামনে পিছনে দুলে দুলে দুলে ভাঁজ হচ্ছেন—ভদ্রতা আর ধন্যবাদ জানাতে হলে চীনারা যে রকম ‘কাওটাও’ করে ।

প্রফেসর হেসে বললেন, ‘চলুক । আমি বাধা দিতে চাই নে । ধাঁধাটা কী ?’

চিংড়ি আড়াই লক্ষ ডেস্কে পেঁছে তারই উপর মোলায়েমসে বাঁ হাত রেখে অর্ধ লক্ষের আধা চক্কর খেয়ে ডেস্কে টপকে গুপুস করে বসে পড়ল আপন সীটে । আমি শব্দ দেখতে পেলুম, একগাদা বাদামী-সোনালী মেশা টেউ-খেলানো চুল আর বেগুনি হলদেতে ডোরা-কাটা ঘাঘরার ঘুর্নি ।

ক্লাসের লটবর—পরে জানলুম গ্রীক—বললে, ‘শাবাশ !’

ত্রৈতা

সেই যে সন্দ্বর্ষী মেয়েটি এক লক্ষ ডেস্ক ডিঙিয়ে আসন নিয়েছিল তারপর ঝাড়া বিয়াল্লিগটি বছর কি করে যে হুশ করে মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল তার জমা খরচ আমি কখনো নিই নি। এই চাঁল্লিগ বৎসরের ইতিহাস লেখা আমার শক্তির বাইরে। তবে মনে মনে আশা পোষণ করেছিলুম ল্যানগুইজ পরীক্ষায় পাস করে আমি যে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছিলুম তার বয়স, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপদ্ধতি, সেখানকার ছাত্রজীবন, তারপর বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন, এদিকে বন্ শহর ওদিকে সপ্তকুলাচল, মাঝখানে বিশাল প্রশস্ত রাইন নদ, গোডেসবের্গে জীবন-যাপন, হিটলারের অভ্যুদয়, তার একচ্ছত্রাধিপত্য, ইতিমধ্যে হাজার হাজার বৎসরের প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মিশরে বৎসরাধিক কাল বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সম্ভব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, (এ সময়টাই আমি অবশ্য জর্মনিতে ছিলাম না কিন্তু হিটলারের তাবৎ বক্তৃতা এবং গ্যোবেল্‌স্-এর অনেকগুলো বেতার মারফৎ শুনিয়েছিলাম) হিটলারের পতন, যুদ্ধশেষের কয়েক বৎসর পর পুনরায়—একাধিকবার—জর্ম-ভ্রমণ, বন্ধু মিলন এবং যারা যুদ্ধ থেকে ফেরে নি তাদের বিধবা, পুত্র-কন্যার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ—আরো কত কি—এসবের বর্ণনা লিখে দিই দেব। কিন্তু বিধাতা বোধ হয় সেটা চান নি। আমি যাতে অকরুণ অকারণে নিরীহ বঙ্গ-পাঠকের মস্তকোপরি অষ্টাদশ ভলুম নিক্ষেপ না করি তাই তিনি এই চাঁল্লিগ বৎসর আমাকে ননস্টপ তুর্কীনাচন নাচিয়েছেন এবং তার ডানস্‌স্‌র কন্যাকুমারী থেকে সিমলে, মসৌরী, পিণ্ডিডাদনখান থেকে কামাখ্যা! আর সব বাদ দিন—অষ্টাদশপদী এ খট্টাঙ্গ পুরাণ রচনা করার জন্য নিদেন মৌটুকু দেশকালপাত্রের তথা অবকাশের প্রয়োজন তার একরত্তিও তিনি আমাকে দেন নি। তাঁকে বার বার নমস্কার।

“পাগলা” রাজা মুহম্মদ তুগলক সর্বদাই তাঁর প্রজাদের মঙ্গল কামনা করতেন। কিন্তু অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন বলে মাত্রাবোধ ছিল তাঁর কম এবং প্রায়ই লঘু অপরাধে মারাত্মক গুরু দণ্ড দিয়ে বসতেন—অনেক স্থলে মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষী পিতা যে রকম পুত্রকে তস্য উপকারার্থে মাত্রাধিক লাঠোষধি সেবন করান। তাই পরলোক গমনের কয়দিন পূর্বে তিনি আপসোস করেছিলেন, “আমি প্রজাদের কল্যাণার্থে যে-সব আদেশ দিই তুমি তারা সেগুলো অমান্য তো করতই, তবুপরি আমার পুণ্য উদ্দেশ্যও তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো না।” তাঁর মৃত্যুর পর রাজ-ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন লিখলেন, প্রজা-সাধারণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মহারাজ আনন্দিত হলেন ও প্রজাসাধারণও হৃদয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল!

অষ্টাদশী খট্টাঙ্গ পুরাণ লোষ্ট্র চিরসহিষ্ণু বঙ্গীয় পাঠকের শীর্ষদেশে নিক্ষেপ না করতে পেয়ে আমি হর্ষোৎফেলিত কণ্ঠে শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ আমেন আমেন জপ করছি এবং আচঁডাল গোড়জনও সেই বিকট মধুচক্র পান না করতে পেয়ে ঘন ঘন স্তম্ভের নিশ্বাস ফেলছেন।

কিন্তু ঠাকুর গ্রীরামকৃষ্ণ আপ্তবাক্য রূপে বলেছেন, “যে-লোক মূলো খেয়েছে তার ঢেকুরে মূলোর গম্ব থাকবেই।” তাই এই চর্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞতা যে আমার লেখাতে কিছু না কিছু বেরিয়ে যাবেই যাবে এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু যে-ইঙ্গিত পাবেই দিয়েছি তারই পূর্ণার্থ প্রকাশ করে বলি, সে-সব অভিজ্ঞতা সুসংলগ্ন ভাবে কালানুক্রমে লিখে উঠতে পারি নি। কিন্তু আমি ভরসা রাখি যে সূচতুর পাঠক আমার প্রকাশিত পুস্তক থেকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত টুকিটাকি ছিঁটেফোঁটা জুড়ে নিয়ে একটি জিগশো পাজ্‌ল সমাধান করতে পারবেন—অর্থাৎ একটি মোজাইক^১ নির্মাণ করতে পারবেন, তদর্থ : মোটা-মুটি একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি পেয়ে যাবেন। যদিও তার আউট লাইনগুলো সুস্পষ্ট শার্প হবে না, বহু ডীটেল বাদ পড়ে যাবে কিন্তু তাতে করে কিছু আসে যায় না। তদুপরি ভারতের প্রায় সর্বশেষ আলাকারিক বলেছেন, সব কিছু সর্বিস্তর বর্ণনা করো না ; পাঠককে ইঙ্গিত দেবে ব্যঞ্জনা দেবে মাত্র যাতে করে সে তার কল্পনাশক্তির স্বাধ্বহার করার সুযোগ পায়। তাই কবিগুরুদুও আপ্তবাক্য বলে গেছেন :

“একাকী গায়কের নহে তো গান,

মিলিত হবে দুইজনে ;

গাইবে একজন খুলিয়া গলা

আরেকজন গাবে মনে।”

যে দেশে বার বার গিয়েছি তারই এক গুণী বলেছেন, “যে সব কথা সর্বিস্তর বলতে চায়, তার কোনো কথাই বলা হয় না।” “অনেক কথা যাও যে বলি কোনো কথা না বলি। (তাই) তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলজলি।”

বলেছেন পদ্রনপি ভাষার জহুরী বিশ্বকবি।

মোম্বা কথা : কোনো পুস্তকের সব ছত্রই যদি আন্ডার-লাইন করো তবে কোনো ছত্রই আন্ডার-লাইন করা হয় না।

শ্রম্বেয় সূচনীতি চট্টোপাধ্যায় একথানা বিরাটাকার বাংলা ব্যাকরণ লেখার

১ অধুনা বঙ্গীয় পাঠক লেখক মোজাইক বলতে হাইলি পলিশট; অতিশয় মনুণ এবং সচরাচর একরঙা মেঝেকেই বোঝেন, বোঝান। আমি শব্দটি মূলার্থে ব্যবহার করেছি। পাথরের ছোট ছোট রঙবেরঙের টুকরো এমনভাবে সাজানো হয় যে তার থেকে একটি ছবি ফুটে ওঠে। মোজাইক তাই চিহ্ন মনুণ তো হয়ই না বরং তার বৈশিষ্ট্য ঠিক বিপরীত। যে কোনো দুটি পাথরের টুকরো বা কুচি ঠায় ঠাঠ অঙ্গাঙ্গি একজোড় হতে পারে না বলে সে অসমতল। তাই অতিশয় মনুণ মেঝেতে (যাকে আজকের দিনে মোজাইক বলা হয়) মানুধের পা হড়কায় মোজাইকে সেটা প্রায় ১০০% অসম্ভব ; অনেকে মনে করেন যে পা যেন না হড়কায় এই নিত্যন্ত প্র্যাকটিকাল উদ্দেশ্য নিয়েই মোজাইকের গোড়া পত্তন হয়।

পন্ন অনুভব করলেন, “হয়ত বস্ত্র বেশী বলা হয়ে গেছে।”^১ তাই রচনা করলেন একটি ক্ষুদ্র ব্যাকরণ। পথে দেখা হতে বললেন, “এবারে একটা সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ লিখেছি; আগেরটা ছিল ক্ষিপ্ত ব্যাকরণ!” আমার এ-লেখাটাতে তাঁর ইরশাদ-নির্দেশ মস্তকাভরণ হয়ে রইল।

আরেক গুণী আরেকটি সরেস উপদেশ দিয়েছেন : “শ্বেচ্ছায়। সজ্ঞানে লেখাতে কিছ্ কিছু ভুল রেখে দিয়ো। পাঠক সেগুলো ধরতে পারলে বিমলানন্দ আপিচ আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। মনে মনে বলে, “আমিই বা কম যাই কিসে! ব্যাটা লেখক যতই বড়ফাটাই করুক না কেন আমি, হ্যাঁ, আমি তার সব কটা বমাল ধরতে পারি।” হয়তো বা কাগজে “ভ্রম” সংশোধন করে চিঠি লিখবে। ছাপা হলে তারে আর পায় কেডা? পাড়ার সবাইকে সেটা দেখাবে। সে শংকরের কান মলতে পারে, অবধূতের নাসিকা কতর্ন-কর্মে সিদ্ধহস্ত। আপনার বইয়ের আরো তিন কপি সে কিনবে। সে যে কেরামতি মেরামতি করেছে সেগুলো সহ বিয়ে-সাদীতে প্রজেক্ট করবে। আপনার অন্যান্য তাবৎ বই গ্যাটের কাড়ি খচাঁ করে বাড়িতে তুলবে—ভুলের স্থানে, আত্মপ্রসাদ লাভের জন্য।

আমাকে অবশ্য সজ্ঞানে শ্বেচ্ছায় ভুলের কলংক লেখার উপর ছিটোতে হয় না। সদাপ্রভু আমার হাত দিয়ে নিত্য নিত্য তামাক খান আর আমি খাই পাঠক পড়িতের কানমলা।

ঈশ্বর সদগুরু জগদগুরু মহ্মাহ জগন্নাথ আচার্য ক্ষতিমোহন সেন পরলোক গমনের দিন দুই পূর্বে তাঁরই সম্মুখে তাঁর চিকিৎসক তাঁর সহধর্মীণীকে বলেন, “আর দুখটাতে একটু জল দিয়ে সেটা পেতলে নেবেন—উঁন তাহলে সহজেই হজম করতে পারবেন।” ক্ষতিমোহন জ্ঞানতেন তাঁর মৃত্যু আসন্ন। কিন্তু যে লোক আজীবন রসিকতা করেছে মৃত্যুভয় তাকে স্বধর্মচ্যুত করতে অক্ষম। মৃদু কণ্ঠে বললেন, “সিডা আর হাসপাতালে^২ করুন লাগবো না। গয়লাই আপন বাড়িতে কইরা লয়।”

বিধাতা বলদন, নলরাজের অন্তরে প্রাবল্ট কলিই বলদন, তিনি ঐ গয়লার মত আমার রচনাতে অনবরত জল মেশাচ্ছেন। অধম এ লেখককে আমার গুর্বীর মত আর জল মেশাতে হয় না।

আগাতা ক্রিস্টি বিয়ে করেন এক আর্কিয়োলজিস্ট বা প্রত্নতাত্ত্বিককে। ক্রিস্টি যখন বার্বাকো উপনীত হলেন তখন এক দরদী যুবতী তাঁকে শ্রুদোন, “আপনি বড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার স্বামী আপনাকে অবহেলা করছেন না তো! আফটার অল—পদ্রুয়ের মন।”

মাদাম শ্যানা হাসির ঝিলিক খেলিয়ে বললেন, “তোমরা তো বিয়ে করার

২. ঘটিরা কেন “হাঁস” পাতাল লেখেন, এ-বাঙালবর্ধিধর সেটা অগম্য। ইংরেজীতে তো “Hos” (pita)-এ কোন অনুনাসিক নেই। ঠিক সেরকম “হুঁশ”। ফার্সীতে অনুনাসিক নেই।

সময় অগ্রপাশাৎ বিবেচনা না করে দ্রুত করে খুলে পড়ো ! আশ্মা প্রথম বারে তাই করেছিলুম। দ্বিতীয় বারে নির্বাচনটি হৃদয়ের হাতে ছেড়ে না দিয়ে দিলুম হেডাপিস অর্থাৎ ধূরন্ধর রেন বক্সটিকে। সে ফরমান দিলে বিয়ের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করাটাই শ্রেয়তর প্রস্তাব। কিন্তু নিতান্তই যদি করতে হয়, তবে কোনো প্রত্যাশিককে।”...খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর মাদাম শেষ তত্ব, গভীরতম তত্ব প্রকাশ করে বললেন, “জানো তো, যে জিনিস যত বেশী প্রাচীন হয়, প্রত্যাশিকের কাছে তার মূল্য তত বেশী। ‘কাজিটো এর্গো সুমে’র ছকে ফেলে অতএব আমি যত বড়োচ্ছি ততই ও’র কাছে আমার মূল্য বাড়ছে।”

বিধাতা গয়লা আমার লেখাতে যেমন যেমন শব্দে শব্দে ব্যাকরণের ভুল বাড়াচ্ছেন, শৈলীর শিরদাঁড়া আর ভাষার পঞ্জির কটা মট মট করে ভাঙছেন, আমার বইয়ের কাটাতে তেমন তেমন হৃদয় হৃদয় করে বেড়ে যাচ্ছে। পূর্বে যে-স্থলে আড়াই শ’ বইয়ের এক সংস্করণ কাটাতে ঝাড়া কুড়িটি বছর কেটে যেত এখন মাত্র উনিশটি বৎসর !

হরি হে তুমিই সত্য।

এই যে হনুমানী লক্ষ দিয়ে আমি মবলগ চঞ্জিগণটি বছর অতিক্রম করলুম নানা-বিধ প্রবন্ধ গণপরিষদ, এ-চঞ্জিগণ বৎসরের একটা সাদামাটা বোঁচাভেঁতা মোজায়িক গড়ে তুলেছি, যার উল্লেখ পূর্বেই করেছি, এবং এটাকে দ্রুতগতির সেতুবন্ধ স্বরূপ বিবেচনা করা যেতে পারে সে-সম্বন্ধে এবং বর্তমান লিখন সম্বন্ধে একটি সাবধান বাণী আমাকে চতুর্থ বা পঞ্চম বারের মত পাঠকের দরবারে পেশ না করলে আমি গুরুত্বহীন তথা ধর্মহীন হব।

সেই এই :

১৯৪৪ সালে যখন স্বরাজ কোন্ শূভাশুভ লগ্নে অবতীর্ণ হবেন, কি রূপ নিয়ে অবতীর্ণ হবেন, বামন অবতার না এক আজব নয়া ক্লীব শিখাশি অবতার—এবং সেও অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলি পরিমাণ অংশাবতার হয়ে (আজ তো অহরহ চতুর্দিকে সেই নপুংসকাবতারই দেখতে পাচ্ছি) এই দিলীপ ভগীরথের (একদা) প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হবেন—সে যুগে আমাদের মনে স্বরাজ সম্বন্ধে স্পষ্টাঙ্গপট কোন ধারণাই ছিল না। ১৯২০।২১-এ গান্ধীজী এক বৎসরের ভিতর (ভাগ্যিস দশ মাস দশ দিন বলেন নি) স্বরাজ আনবেন বলে দিলাশা দেন। কবিগুরু তখন তাঁকে মখোমুখি বলেন, এক বৎসরের ভিতর যদি না আসে তবে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জনগণমনে যে নৈরাশ্য-জ্বলিত কর্মবিমুখ জড়ত্ব এনে দেবে সেকথা ভেবেছেন কি ? মহাত্মাজী বলেন, আমি মরালী হিরানন্দ্র যে প্রত্যেক ভারতীয় যদি আমার কর্মসূচী গ্রহণ করে তবে এক বৎসরের ভিতর আমরা স্বরাজ লাভ করবই করবো। (এর মাত্র আঠারো বৎসর পর হিটলারও রণশ্রেণী ফুৎকার দেবার পূর্বে বলেন, প্রত্যেক জার্মান সৈন্য যদি সূচ্যগ্ৰেণ সূতীক্ষেপে ভিত্যে যা চ মোদিনী পরিত্যাগ করে পশ্চাৎপদ না হয় অপিচ শত্রুকে নিধন করতে করতে প্রকৃতবীরের ন্যায় সে ভূমিতে দণ্ডায়-

মান সেখানেই মৃত্যুবরণ করে তবে আমার জয়লাভ অনিবার্য। অতিশয় হক কথা—সাধু, সাধু। উত্তম, উত্তম। কিন্তু জিজ্ঞাস্য : আমাদের যখন অজানা নয় যে প্রত্যেক মানুষেরই কর্মক্ষমতা, আত্মোৎসর্গপ্রবৃত্তি, শৌর্ষবীর্য পরিচয়-দানের একটা সীমা আছে তখন প্রত্যেকটি লোক শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করে করে ধূলিশয্যা গ্রহণ করবে এহেন আশা করাটা পূর্বাভিজ্ঞতাসম্মত নয়—এটাকে বরণ ধর্মরাজের দ্যুতক্রীড়ার সময় “এবারে আমি জিতব, এবারে আমি জিতবই জিতব” দুরাশা দুরাশায় গড়া পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করে যেতে পারে। তদুত্তরে হিটলার অবশ্যই বলতে পারতেন, নিয়তি (হিটলার ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন না, বটুর নাস্তিকও না, কিন্তু নিয়তির অদৃশ্য লিখনে দৃঢ় বিশ্বাস ধরতেন) কখনোই কোন মানুষের ক্ষমতা সে বোঝা চাপান না যেটা সে বইতে পারবে না।

তা সে যাই হোক যাই থাক, কর্মক্ষেত্রে দেখা গেল গাধীজীর প্রতিশ্রুত এক বৎসর অতি সরেস রবারের মত—বলতই ইলাস্টিক, বিলম্বিত—উভয়ার্থে—হওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা ধারণ করে। যতই মারিবে টান ততই যাবে বেড়ে।

এস্থলে আমাকে বাধ্য হয়ে কিছুটা জীবনস্মৃতি মন্বন করতে হবে। পাঠক, অসংখ্যবার আমার অপরাধ মার্জনা করেছে। আরেকবার করলে হয়তো একশতে পৌঁছে তুমি রক্তাকরের মত মোক্ষলাভ করে যাবে। আর কথায় বলে যাহা বাহান্ন তাহা তিরনন্দাই (হায় হায় পাঠক, দ্যাখ তো না দ্যাখ, বিধাতা গয়লা আমার হাত দিয়ে কি কৌশলে তামাক খেয়ে নিলেন, অতি সাধারণ একটি প্রবাদ গুবলেট করে দিলেন)। কিন্তু আমার জীবনস্মৃতি লিপিবদ্ধ করার মত দুর্য্যুতি আমার কখনো হবে না সে আমি জানি। ওদিকে আবার আমার চেয়েও পারিপৃষ্ঠজন ইহসংসারে আছে। তারা সর্বক্ষণ আমাকে টুইয়ে টুইয়ে অনুযোগ বিনয় করে, আমি যেন আমার আত্মজীবনী লিখি, কারণ আপনার মত বিচিত্র অভিজ্ঞতা ক’জনের আছে (অর্থাৎ খুনখারাবী করে পৃথিবীতে কোন দীনতম দেশের কারাগারের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন আমি করি নি ?), পৃথিবীর কোন দেশ আমি চষি নি (অর্থাৎ কোন দেশের পদূলি আমাকে “গুন্ডা আইনে” ফেলে—যে আইনানুযায়ী নগরপাল যেকোন গুন্ডাকে চাঁদাষ ঘটীর ভিতর শহর ছেড়ে অন্যত্র যাবার মোক্ষম আদেশ দিতে পারেন—সেদেশ থেকে বের করে দেয় নি ?)। মোক্ষম কথা আমি অকপটে সত্যবর্ণন করলে তেনারা বগল বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে বলবেন, “বলোছিলুম তখনই বলোছিলুম।” হয়তো বা একটি ছড়াও সঙ্গে জুড়বেন :

‘বাইরে তোমার লম্বা কোঁচা
ঘরেতে চড়ে না হাঁড়ি,
খেতে মাখতে তেল জোটে না,
কেরোসিনে বাগাও তেড়ি।

যাও হে, যাও হে, কালাচাঁদ
 আর এসো না আমার বাড়ি
 এবার এলে আমার বাড়ি
 দেব তোমায় খ্যাণ্ডরার বাড়ি ॥

পক্ষান্তরে এবার আমার জীবন সম্বন্ধে নির্বিকার উদাসীন পাঠক বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই, কোন দৃষ্ট, পরশ্রীকান্তর, বিঘ্নসঙ্ঘোষী জুগুৎসা দ্বারা তাদ্যমান হয়ে এনারা আমাকে জীবনস্মৃতি লিখতে বলেন।

কিন্তু ভবদীয় সেবককে তার কিছুটা, সামান্যতম অংশটা এস্থলে নিবেদন করতেই হবে। নইলে (১) সে-পটভূমি নির্মিত হবে না দ্বার সাহায্য বিনা পাঠক আমার তাবৎ বক্তব্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

অপরন্তু (২) পূর্বলিখিত চল্লিগ বৎসর যে মৃদুটিষোগ প্রসাদাৎ আমি ডুবসাঁতার ঘেরে মোজ্জায়িক নির্মাণ করেছিলাম এস্থলেও তত্ত্ব। সেই পশ্চাতিই অবলম্বন করবো।

১৯৪৪-এর কাছাকাছি আমি বে-car (বে-কার) তো বটিই, এবং নিজ'লা বেকার। শ্যামপেন বরগাউ মাথায় থাকুন জল এস্ট্রক জোটে না। মাথার উপরে ছাতখানাও যদি না থাকে তবে ট্যাপই বা কোথায় ক'জোই বা কই? কাজেই রাস্তার কল থেকে অঁজলা অঁজলা জল খেতুম। তব'গাবে পার্কের পুকুর কিংবা মাগজার স্তন্যরসই ছিল আমার সম্বল।

অবস্থা যখন চরমে তখন শ্রীমান কানাই (ভজু-কানাই) সরকারের সঙ্গে দেখা। তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, (আমি যখন শান্তিনিকেতন কলেজে পড়তুম সে তখন ইন্সকুলে) যে আমি তখন ইন্সকুলের সাহিত্যসভায় বেনামীতে কয়েকটি রচনা পেশ করি। সেগুলি এমনই ওঁচা যে আমি স্বয়ং পড়লে “সাধু-সু সাধু-সাধু” রব ওঠার পরিবর্তে “দুয়ো দুয়ো দুয়ো” ধ্বনি সভাস্থলের চতুর্দিকে মুখারিত হত। ওঁষিকে মহারাজ শ্রীমান ভজু-কানাই সাহিত্যসভার সেক্রেটারি (আমরা আড়ালে বলতুম “সাঁকা রুটি”), তারে মারে কেডা।^১

সেই কানাইয়ের সঙ্গে দেখা কলকাতায়। ছেলেবেলায় বিস্তর কচিকাঁচারায় একটুখানি সিনিয়র ছাত্রদের হীরো ওয়ারশিপ করে। আমার রচনা পড়ে সে যে বিস্তর “সাধু-সু-সাধু” কুড়িয়েছিল তার থেকে তার একটা অশ্ব ধারণা হয়ে গিয়েছিল আমি কালে রীতিমত ডাকসাইটে কেউকেডা লেখক হব। তাই দেখা

৩ শ্রীমান কানাই যখন শান্তিনিকেতনে এলেন তখন অন্য এক কানাই সেখানে বর্তমান। গু'বলেট এডাবার জন্য তখন তার দ্বাৰা ‘ভজুর’ সঙ্গে তার নাম জুড়ে দিয়ে “ভজু-কানাই” নাম রাখা হল। আরেকটি উদাহরণ চমৎকার; একটি এমনি ছোটখাটো একমুঠো ছেলে এল যে সবাই তার নাম দিল “সিকি”। ওমা, পরের বৎসর সে তার ছোট ভাইকে নিয়ে এল—সে আরো ক্ষুদ্র, একদম মাটির সঙ্গে কথা কয়। তার নাম রাখা হল “দুয়ানী”।

হওয়া মাত্রই আমাকে পকড়কে নিয়ে গেল স্বর্গাত সুদ্রেশ মজুমদার মহাশয়ের সমীপে।

আহা ! এ-রকম আরেকটি সংবাদপত্র কণ্ঠধার আমি চিভুখন চেষ্টা পাই নি ! কিন্তু আজ না, মোকা পেলে আরেকদিন তাঁর দেহ, মন ও সর্বোপরি তাঁর হৃদয়ের সবিস্তর বর্ণন দেব। তিনি আড়নম্বনে আমার দিকে একবার মাত্র তাকিয়েই কানাইয়ের দিকে তাকিয়ে কি যেন একটা মূদ্রা দেখালেন। এরকম বিনা মেহনতে আমি কোনো পরীক্ষা পাস করি নি।

“সত্যপীর” ছদ্মনামে সপ্তাহে দু'বার দুই কলাম, আফটার এডিট লিখতুম। সে কাহিনী দীর্ঘ। শৃঙ্খল দুঃখের সঙ্গে বলি সে-আমলে যারা সব সাবালক হতে যাচ্ছেন সেই আমি আজ হয়ে গেলুম তাঁদের পেট-রাইটার, অর্থাৎ আমি তাঁদের ফ্যান। হায়, আজ তাঁদের দরবারে কলেক পেতে হলে আমাকে রীতিমত কসরৎ করতে হয়। সব সময় পাই নে। এখন যদি সেই প্রায় ত্রিশ বৎসরের পুরনো ‘সত্যপীর’ নাম দিয়ে কিছু লিখি—অতিশয় সত্বে বৃদ্ধ বরজলালের মত ক্ষীণকণ্ঠে অর্থাৎ গ্লথ অক্ষম হস্তে লিখিত যৎকিঞ্চিৎ পাঠাই তবে সেটা ছাপা হয়—ইংরেজীতে যাকে বলে অন্ এ রেনি ডে। রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ বয়সে একাট কবিতা নিয়ে কটি ছত্র দিয়ে আরম্ভ করেন :—

“ডাক্তারেতে বলে যখন মরেছে এই লোক

তাহার তরে বৃথাই করা শোক।

কিন্তু যখন বলে জীবন্মৃত

তখন শোনায় তিতো

আমার হ'ল তাই—”

পরে কবি বুঝলেন, গোড়ীয় পাঠক মাত্রই তাঁর এ-বিনয় অটুহাস্যসহ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে। তাই পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় এ-ছত্র কটি তিনি নাকচ করে দিলেন।

আর আমার বেলা ?

জীবন্মৃত না। “খাবি-থেকো, গঙ্গাযাত্রার আস্ত জীবন্মৃত।”

সে-কথা থাক্।

ঐ সময় অন্যান্য শাবতীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে আমার একটি বক্তব্যে আমি বার বার ফিরে আসতুম। বলতুম, “স্বরাজ আমাদের দ্বিবলয় চক্রের মতই নিয়ে বা উর্ধ্ব দৃষ্টির বাইরে থাকুন না কেন এই বেলাই তার জন্য কিছু কিছু প্রস্তুতির প্রয়োজন। ২। স্বরাজলাভের সঙ্গে সঙ্গেই ভারত পৃথিবীর সর্বদেশের এম্বেসি, লিগেশন, কনসুলেট, ট্রেড কমিশন নিষ্কৃত করবে। ৩। সে-সব দফতরের জন্য বিদেশী ভাষা জাননেওলা লোকের প্রয়োজন হবে। ৪। বাঙালী ভাষা শেখার জন্য বিশেষ বৃদ্ধি ধরে। অতএব এইবেলাই সাততাত্ত্বিতা কলকাতা-তেই ভিন্ন ভিন্ন ভাষা শিখবার ব্যবস্থা করা অতীব প্রয়োজনীয় জরুরী কাজ। কারণ প্রথম থাকতেই যারা ফরেন সার্ভিসে ঢুকতে পারবেন তাঁরা দেশদেশান্তরে

ঘুরে বেড়াবেন এবং ফলে তাঁদের ছেলে এমনকি মেয়েরাও একাধিক ভাষা ইচ্ছা অনিচ্ছায় শিখে নেবে। তখন আমাদের কলকাতার মেধাবী ছেলেরাও এদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। ফলে ভালো ভালো চাকরি, যারা প্রথম ধাক্কায় ঢুকেছিল, বংশানুক্রমে তাদের গোষ্ঠীপরিবারের একচেটে সম্পত্তি হয়ে যাবে। এ-কিছু আজগুবী নয় হাল নয়। বিসম্মার্ক এমনি কি তাঁর পূর্বেও যেসব খানদানী পরিবার ফরেন অফিসে প্রথম ধাক্কাতেই প্রবেশ করেছিল তাদের বংশ-ধরগণকে গণতান্ত্রিক ভাইমার রিপাবলিক কমিয়ে দিয়ে মেধাবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোককে ঢোকাতে পারেন নি। এমন কি হিটলারও এঁদের বিশেষ কাবু করতে পারেন নি। এঁরা মশকরা করে বলতেন, নাৎসীদের দিয়ে এসব কাজকর্ম করানো যায় না; আমাদের মত স্পেৎসি (স্পেৎসিয়ালিস্ট = স্পেশালিস্ট = ওয়াকফহাল) না থাকলে তাবৎ ফরেন আপিস এবং সঙ্গে সঙ্গে ওদের নিষ্কৃত ভিন্ন ভিন্ন দেশের দূতাবাসগুলো তখনই বানচাল হয়ে যাবে।”

আমার এসব সাবধান বাণীতে খুব কম লোকই তখন কান দিয়েছিলেন। একাধিকজন আমাকে বলেন, “আরে মশাই, আগে স্বরাজ ফলটি পেকে মাটিতে পড়ুক!”

আমার পেটেন্ট উত্তর ছিল, “রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না?”

আজ আমাদের কানে জল গেছে। আজ ম্যাক্সমুলার ভবনে, রুশ পাঠ-চক্রে ভিড়—এমন কি কোনো কোনো বাড়ির বৌ-ঝি-রা এদের মধ্যে আছেন। গ্রীষ্মক মনোজ বসুর ধর্মপত্নী ও পূর্ববধূ কয়েক বৎসর আগে একই রুশ ক্লাসে পড়াশুনো করতেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে বোড়া পালিয়েছে। আস্তাবলে এখন চাঁবি মারাটা বশ্য-গমনের ন্যায় নিষ্ফল। সংস্কৃত সুভাষিত কয়, প্রতীপ নির্বাচিত হয়ে যাওয়ার পর তেল দিয়ে কি লাভ, ঘোবনান্তে বিবাহ করে কি ফল পাবে!

সেই ১৯৪৪ থেকে কানমলা খেয়ে খেয়ে—অর্থাৎ এ-সব বাবদে লেখা সাধারণ জ্ঞানের কোতুল উদ্বেক না করাতে—আমি অন্য সব বিষয়ে নিয়ে লিখতে আরম্ভ করলাম। যারা “দেশ” পত্রিকায় (এ পত্রিকাতে ১৯৪৮-৪৯-এ আমার সর্বপ্রথম পুস্তক “দেশে-বিদেশে” ধারাবাহিকরূপে বেরোয় এবং সে-সম্বন্ধে “দেশ” পত্রিকার সুযোগ্য একনিষ্ঠ সম্পাদক শ্রীমান সাগরময় ঘোষ তাঁর অনবদ্য “সম্পাদকের বৈঠক” পুস্তকে কীর্তন করেছেন।) সে যুগ থেকে—বস্তুত ১৯৪৪ থেকে—

৪ “দেশে-বিদেশে”ই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা, এটা প্রায় সর্বজনসম্মত অভিমত। আমাকে যখন কেউ প্রশ্ন করেন, আমার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা কি? আমি উত্তরে বলি, বার বার চেষ্টা দিয়েছি, কিন্তু এখনো “সর্বশ্রেষ্ঠ” রচনা লিখতে সক্ষম হই নি। জনৈক ফরাসী লেখককে একই প্রশ্ন শুধোলে পর তিনি দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে (শ্রাগ করে) বলেন “লা, লা! আপনি কি জানেন না, আমার প্রত্যেকটি রচনাই সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা।” স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বিনয় প্রকাশ বাবদে এই মহাত্মাকে ভৃগুপদলাঞ্ছিত কৃষ্ণবাসুদেবের সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

আমি কয়েক মাস, কখনো বা দু'এক বৎসর বাদ দিয়ে—তাকের বাদ্যি থেমে গেলেই ভালো শোনায়—‘দেশ’ পত্রিকায় প্রধানত “পঞ্চতন্ত্র”ই লিখে আসছি) আমার এই “পঞ্চতন্ত্র” মাঝেমধ্যে পড়েছেন তঁরাই জানেন আমি এখন প্রধানত “অজগর আসছে তেড়ে । /আমটি আমি খাব পেড়ে।” কিংবা ঔজ্জ্বল্য পঙ্খভিত্তে “ক’-রে কমললোচন শ্রীহরি / । করেন শঙ্খচক্রধারী” ধরনের নির্বিঘ্ন অজাতগম্ভীর রচনাতে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখি ।

কিন্তু ইতিমধ্যে মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গিয়েছে । আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘূমের ঘোরে । স্বরাজ্য লাভের সঙ্গে (১) ভারতীয় রাষ্ট্রদূতরা মদন-ভাস্কর মত বিশ্বময় ছাঁড়িয়ে পড়লেন । তাঁরা যে-সব দেশে অবস্থান করছেন তাদের সমস্যা, ভারতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ইত্যাদি ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় সম্বন্ধে বিবৃতি দিতে লাগলেন ; কখনো স্বেচ্ছায় কখনো পার্লি’মেন্টে তাড়া খেয়ে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মারফৎ । তাদের দ্বারাপত্রপরিবারও এ-সব দেশকে কেন্দ্র করে সাহিত্য নিম্ন-সাহিত্য প্রকাশ করলেন । (২) দলে দলে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, জনলিষ্ট, সাহিত্যিক, ছাত্রছাত্রী, টুরিস্ট, সরকারী কর্মচারী গরুর নিত্য নিত্য দুনিয়াটা চষে ফেলতে লাগলেন । তাঁদের অনেকেই গান্য থেকে অল-আলেমীন সাদী অল-বররাণী, পানামা থেকে তাকশকেন্দ ভল্লাদভস্তক সম্বন্ধে এস্তের এস্তের প্রবন্ধ কেতাব লিখলেন । অনেক সময় অগ্রপশ্চাৎ সম্যক বিবেচনা না করে । পরে সে-বইয়ের কয়দংশ সানুষ্ঠানে ভস্মীভূত করা হল । চার্বাক বলেছেন ভস্মীভূতস্য বেহস্য পুনরাগমনং কৃতং ? কিন্তু এস্থলে পুনরাগমন আদৌ অসম্ভব নয় । বিশাখাপটনমে যখন জাপানী বোমা পড়ে তখন সরকারের হুকুমে ট্রেজারি অফিসার জমায়েৎ কারেনসি নোট পুড়িয়ে দিল্লীতে খবর দিলেন তিনি সাকুল্যে তাবৎ নোট ভস্মীভূত করেছেন । উত্তম । দু’বৎসর যেতে না যেতে তার কয়দংশ গুড়ি গুড়ি কি করে যে হাটবাজারে মদ্যালয়ে ক্লাবে আত্মপ্রকাশ করল কেউ জানে না ।...এবং সব চেয়ে মোক্ষম তত্ত্ব (৩) ইংরেজ আমলে আমাদের বৈদেশিক নীতি কি হবে সে নিয়ে আমাদের কোনো শিরঃ-পীড়া ছিল না । এখন ঐ বিষয় কান্দু ভিন্ন গীত নেই । অধুনা ডিহি পৌরালিয়া ২/১ক/ক নং থাড’ বাইলেন শালপাতা ঠোঙা-বিতরণীর সহ-শাখা-কর্মিটির রক থেকে আরম্ভ করে টাটা-বিড়লা-লীভার ব্রাদারজের গোপনতম আলোচনা কক্ষে ঐ এক কান্দুর গীত । যেমন মনে করুন এই যে ইংরেজ কমন মার্কেটে ঢোকায় জন্য বেহায়া বেশরম হ্যাংলামোর চুড়াশ্বে পেঁচেছে, টা-পনি হে-পনি লুক-সুমবেগ’ বেলজিয়ামের মত দেশের পা চাটছে সর্ব ইঞ্জং সর্ব ইমান আর দু’বার্কাংহাম প্রাসাদস্থ স্কেটিং করার পুকুরে গলায় পাথর বেঁধে বিস্ হাথ পানীয়ে’ ডুবিয়ে দিয়ে—ব্য গলের প্রেতাঙ্কারূপী বর্তমান সরকার তাদের পশ্চাদ্বেশে দু’চার-খানা সবুট সরেস কিক্ কসাবে না তো—গোষ্ঠ-সময় যে রকম পেনালটি পেলে, কালী (মোলা) আলী ফোকটে বেমকা নাহকো পেনালটি পেলে যে-রকম কালী আলীর (কালীঘাট মোলা আলী) কাছে পুজো শিরণী মানং করে ।

এই সব এবং অন্যান্য নানাবিধ কারণে—ট্রেনজিসটারের সুলভতা ভুলবেন না—দেশের লোক, রকের রকফেলার এস্টেক পাড়ার পর্দাপিসি পর্যন্ত নানা বিষয়ে এমনই গুণাকিবহাল হয়ে গিয়েছেন যে ১৯৪৪ সনে যা ছিল কঠিন বিষয়-বস্তু, স্পেশালাইজড তত্ত্বতথ্য, আজ তার অনেক কিছু হয়ে গিয়েছে কম ন ন-লেজ। যেমন ধরুন ১৯৪৪—চূর্যাল্লিগ কেন প্রায় ১৯৫২/১৯৫৩ অর্থাৎ যত দিন না নাপাক সরকার উভয় বণ্ণের ষাতায়াতের জন্য “ভিজা”-প্রথা প্রচলন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বণ্ণসন্তান চোখের জলে নাকের জলে শিখলো, ভিজা করে কম এবং প্রথম আপন সরকার—ভারতীয় হলে ভারত সরকার পার্কিস্তানী হয়ে পাক সরকারের কাছ থেকে যে সর্বপ্রথম দশ টাকা না পনেরো টাকা খর্চা করে একখানি পাসপোর্ট যোগাড় করতে হয়। তার জন্যে কিউয়ে দাঁড়াও, ফর্ম বের করো এবং বিরাটতম চার পৃষ্ঠাব্যাপী তিন দফে (ইন্ট্রিপলিকেট!) সেগুলো ফিল আপ করো। পাক্ষা দেড়ঘণ্টা থেকে দু'ঘণ্টা লাগে, মশয়।

এই ফর্ম যদি আপনি শ্বয়ং ফিল আপ করেন তবে আন্তর্জাতিক প্রাথমিক আইনকানুন সম্বন্ধে আপনার বেশ খানিকটে জ্ঞান হয়ে যাবে।

কিন্তু দোহাই ধর্মের, আপনার নিরাপত্তার জন্যে তথা পাসপোর্ট আপনি আথেরে যেন পান তার জন্যে আপনি সে-ফর্ম শ্বয়ং ফিল আপ না করে করাবেন ঐ আপিসের আশেপাশে যে সব প্রফেশনাল ফর্ম ফিল আপ করেনগুলারা আছে। অপরাধ নেবেন না; বেহারী ভাইয়ারা যে রকম ইটালিয়ান ব্দারোতে, অর্থাৎ ইন্টের উপর বসে প্রফেশনালকে দিয়ে মনিঅর্ডার ফর্ম ফিল আপ করায়। হুবহু সেই রকম। অ। আপনি ব্দুঝি ইংরিজীতে এম এ ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট, পি এচ ডি, ডি লিট। তাই আপনার দেমাক। কোনখানে ব্লক ক্যাপিটেল হরফে লিখবেন আর কোনখানে সাদামাটা হরফে, যে সব জায়গা দফতর ফিল আপ করবে, করে ফেললেন আপনি, যে জায়গাটা সন্দ্বদমাত্র খালাসীদের (যারা একদা পার্কিস্তানী ছিল কিন্তু অধুনা ইন্ডিয়ান, আবার কখন রঙ বদলাবে তার স্থিরতা নেই এবং ইতিমধ্যে বেআইনী কায়দায়—যার জন্য তিন মাসের তরে শ্রীঘর শ্বশুরালয়—যে যোগাড় করেছে তিন-তিনখানা পাসপোর্ট : প্রথমটাতে সে ভারতীয় নাগরিক, দ্বিতীয়টাতে সে পাক্ষা ব্রিটিশ, তৃতীয়টাতে সে পার্কিস্তানী। পদলিস সনেহ করে শূদ্রোলে সে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলবে সে ভারতীয় এবং ভারতীয় পাসপোর্ট তার ছিল কিন্তু সেটা খোয়া গেছে : তার মতলব আরেকখানা পাবার। পেলে এটা বা আগেরটা বিক্রী করে দেবে। এই কলকাতাতেই যারা নোট জাল করে তারা স্পেন্সার টাইমে করে পাসপোর্ট জাল। এরা সে পাসপোর্ট কিনে নিয়ে অত্যাৎকৃষ্ট কেমিকাল দিয়ে খালাসীর ফোটোগ্রাফ সেই পাসপোর্ট থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। যে ব্যক্তি গুন্ডা বা ফেরার বলে পাসপোর্ট যোগাড় করতে পারে নি তার ফোটো ছাপা হবে সেখানে—জায়গাটায় নতুন ফোটো কেমিকাল লাগিয়ে।...এতে বেশ কাঁচা দু-পয়সা আমদানি হয়। খাঁদিরপুর অঞ্চলে নাকি একটা “প্রাইভেট” লিমিটেড কোম্পানী হয়েছে—ভাবছি কিছু শেন্নার কিনবো) সেটা ফিল আপ করে

বসলেন আপনি। সে ভুলটা ধরিয়ে দেবে আপনারই এক ভাগ্নে—“উনিশটিবার ম্যাট্রিক সে/যায়েল করে খামলো শেষে।” তখন ছিঁড়ে ফেলুন সেই তিনপ্রহু ফর্ম, ফের দাঁড়ান কিউয়ে—ফের, ফিনসে। আর সব চেয়ে মারাত্মক অদৃশ্য ফাঁদ যেটি সদাশয় সরকার, অবশ্য অতিশয় অনিচ্ছায় কিন্তু সরকারী পয়সার ষাতে অপচয় না হয় সেই শূভ রত গ্রহণ করে আপনার জন্য পেতেছেন। “অদৃশ্য” কেন বললুম এখুনি বুঝতে পারবেন। আমরা তথা পাকিস্তানীরা বিলেত জ্বাশের তুলনায় তো সব স্বরাজ পেয়েছি। আমাদের সরকারকে কোন-কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হয় সে-সম্বন্ধে খুব একটা স্পষ্ট ধারণা নেই। ইংরেজ একদা যে সব প্রশ্ন শূদ্ধোত তার বেশ-কিছু বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে—মহারাজার রাজত্ব যেন হিটলারের “সহস্রবর্ষের রাইচ”-এর মত অজরামর হয়ে থাকে। মহারাজার রাজত্ব যেন কাম্বিন-কালেও—মহাপ্রলয়ে তাবৎ মণ্ডলসমূহ তথা অর্গণত নক্ষত্ররাজি লোপ পাওয়ার পরও সূর্য কখনো অস্তমিত না হয়। ৫০০০ তা সে যাক গে। এখানে পাসপোর্ট ফরম তৈরী করার সময় ভারতীয় হুজুরদেরই স্থির করতে হয় আমরা কোন কোন প্রশ্ন শূদ্ধবো। পয়লা ঝটিকাতেই সব প্রশ্ন হুজুরদের মনে আসে না। পরে হঠাৎ চিংকার করে ওঠেন, “ঐশ্ব্য! অমুক প্রশ্নটা তো শূদ্ধনো হয় নি।” কিন্তু হায় তখন তো আর তাবৎ ছাপা ফর্ম বাতিল করে দেওয়া যায় না। তাই বের করলেন এক নয়া কৌশল। নূতন প্রশ্ন রবর স্ট্যাম্পের বানিয়ে নিয়ে চাপরাসীকে দিলেন হুকুম, “প্রত্যেক ফর্মে মারো এই ইস্টাম্পো।” চাপরাসী ভটাভট সেই কর্ম করতে লাগলো ফর্মের এক সংকীর্ণ কোণে। এখন হয়েছে কি, আপনি পেলেন ৩৭০৮৫ নম্বরের ফর্ম। ততক্ষণে রবর স্ট্যাম্পের হরফগুলো সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে সেটি হয়ে গিয়েছে নখের মত পালিশ। তখন ফর্মে একটা ঝাপসা ঝাপসা ফিকে বেগুনী রঙের কুয়াশা-কুয়াশা মাত্র দেখা যায়—অবশ্য আপনি যদি সেটি সাতিশয় মনোযোগসহ নিরীক্ষণ করেন। সেটা দেখে আপনার মনে কিছতেই সন্দেহ হবে না যে এটা খয়ে যাওয়া রবর স্ট্যাম্পের অবদান—আপনি যতই সন্দেহ-পিচেশ হোন না কেন? অ! ভুলে গিয়েছিলুম আপনি ইংরিজীতে ডি. লিট কিংবা বাই হোন না কেন, যেখানে কোনো অক্ষরের চিহ্নমাত্র নেই তার পাঠোদ্ধার করবেন কি করে? তাই আপনি নিশ্চয় মনে ফর্ম পাঠিয়ে দিলেন হেড আপিসে। এক মাস পরে সেটি এল ফেরত। এবং সঙ্গে লেখা আছে “আপনি অমুক নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেন

৫ এই বেস্তুমীজ বড়ফাটাই শূনে এক ফরাসী বলোছিল, “কিছু ভয় কোরো না, মিঞা। করুণাময় পরমেশ্বর তোমাদের কসাইসুলোভ “করুণ” হস্তে ভারতীয় তথা অন্যান্য “কালো আদমী”দের তুলে দিয়ে ডাইনীর হাতে পুত্র তুলে দেওয়ার মত জবরদস্ত গুণা করার পর হুজুরের হৃদয় হল। তিনি তোমাদের হাতে অধিকারে কালো-পীলা আদমীদের কোন ভরসায় এখন ছাড়েন। তাই তিনি সূর্যাস্ত একদম বন্ধ করে দিয়েছেন।

নি কেন?" আপনি খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে যাবেন সে প্রশ্নটা কোথায়? শেষটায় হার মেনে যাবেন সেই প্রফেশনালের ইন্টার পাজাতে। সে লেটেস্ট খবর রাখে। সে সেই বেগনী কুয়াশার মাধ্যমানে সঠিক জায়গায় উত্তরটি লিখে দেবে। শব্দ কি তাই! আপনি যে সব উত্তর দিয়েছেন আপনার জ্ঞান আপনার বিবেক অনুযায়ী সেগুলো চেক্ অফ করতে করতে সে বিষম খাবে, আঁতকে উঠবে আর গোঙরাতে গোঙরাতে বলবে, “এসব কি উত্তর দিয়েছেন। বরং আপনার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হলেও হতে পারে কিন্তু এসব উত্তর দিলে পাসপোর্ট-প্রাপ্তি হবে না।” সে জানে, হুজুররা কি উত্তর শুনতে চান এবং শব্দ তাই নয়, আজ কি উত্তর শুনতে চান, মত পালটে পরশু দিন ফের কোন উত্তর শুনতে চান। সে নতুন ফর্ম তার বাস্তু থেকে বের করবে—আপনাকে ফের কিউয়েতে ধরা দেবার ‘গম্বহস্তনা’ থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে—এবং এমন সব আকাশকুসুম, সোনার পাথরবাটি উত্তর লিখবে যে এবারে আপনার বিষম খাবার, আঁতকে ওঠবার পালা।

কিন্তু আপনি পাসপোর্ট পেয়ে যাবেন। যদিচ না পান তবে জানবেন অন্য কোনো ব্যাপারে আপনার জীবন “নিষ্কলংক” নয়। পুলিস আপনার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে, কিংবা আপন ফাইল (দাঁসিয়ে) থেকে আবিষ্কার করেছে, আপনি ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রুশ লেখক গর্কির “মাদার” পড়েছিলেন, কিংবা—ওয়েল নেভার মাইন্ড—“কিছু একটা” আছে।

এমন সময় আপনার এক উকীল বন্ধু আপনাকে বললে, “সংবিধানে প্রত্যেক ভারতীয়কে জন্মগত অধিকার দিয়েছে, যন্ত্রতন্ত্র গমনাগমনের স্বাধীনতা। ঠোকো মোকদ্দমা। পেত্যয় যাবেন না, আপনার চেয়েও শতগুণে তালেবর এক খলিফে ব্যক্তি সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত লড়ে বিদেশ যাবার পাসপোর্ট পেয়েছিলেন। তিনি বগল বাজিয়ে প্লেনের টিকিট কাটতে ধাওয়া করেছিলেন কি না জানি নে, আমরা হুঁশিয়ার করছি,

ঘুঘু দেখেই নাচতে শুরু

ফাঁদ তো বাবা দেখোনি।

কিংবা “না আঁচিয়ে” ভরসা কই! কিংবা সুরুমার রায়ী ভাষায়

কেই বা শোনে কাহার কথা

কই যে দফে দফে।

গাছের পরে কাঁঠাল দেখে

তেল দিয়ে না গোঁফে ॥

পাসপোর্ট পাওয়ার পর একটি

বৈষ্ণব হইতে মনে গেল বড় সাধ।

তুণাধিপি শোলোকেতে ঘটালো পরমাদ ॥

সে তৃণটি এখানে ‘পী ফরম’। বিদেশের হোটেলেরে তো আপনাকে মফতে থাকতে হবে না, রেস্টোরাঁতে মাগনা খেতে হবে না, অতএব আপনার বিদেশী মদ্যের প্রয়োজন। সে মদ্য ক্রয় করার তরে আপনি দিশী মদ্য দিতে প্রস্তুত,

কিন্তু “পী ফর্মের” পীঠস্থান রিজার্ভ ব্যাংক সন্নিবন বলবে, “এমানীর বিদেশী অর্থের বড়ই অনটন। সরি!” কথাটা খুবই সত্য, সে-কথা আমি কোনো স্বাক্ষণ বন্ধুর কাছ থেকে পৈতে ধার করে সেইটে ছুঁয়ে কসম খেতে রাজী আছি।

সবই জানি। শূদ্ধ জানি নে, পাসপোর্ট না পেলে যে-রকম মোকদ্দমা করা যায় রিজার্ভ ব্যাংক বিদেশী কাড়ি না দিলে তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করা যায় কি না।

এ পর্যায়ে কিন্তু একটি শেষ কথা না বললে অন্যায় হবে। কতরা যে স্বাক্ষকে তাকে চট করে বিদেশে যেতে দেন, তার প্রচুর কারণ আছে! কিন্তু সে-কথা আরেক দিন হবে।

মোন্দা কথায় ফিরে যাই।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে এই সব বহুবিধ যাবতীয়, হরেকরকম্বা সমস্যা সম্বন্ধে সবাই ছিল উদাসীন। মার খেয়ে খেয়ে, এবং তার চেয়েও নির্মমতর অভিজ্ঞতা—পয়সাওয়ালা কি করে সর্ববাধা অতিক্রম করে সর্বত্র যাতায়াত করেন বিজনেস-মেন দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বিদেশে যাবার তরে সর্ব ছাড়পত্র সংগ্রহ করে ড্যাংড্যাং করে রওয়ানা দিলেন, আপনি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন, সে তো বৃষ্টি, কিন্তু সঙ্গে তাঁর বিরাটকলেবরা ভামিনী গোটা দস্তিন বালক পুত্র এবং কন্যা—এনারা যাচ্ছেন দেশের কোন্ “সম্পদ বৃদ্ধি” করতে, এবং এনারেই একজন

উনিশটিবার ম্যাট্রিকে সে
ঘায়েল করে চললো হেসে
বিলেত কিংবা ওয়াশিংটন
মুদ্রা মেলা, হাজার টন।

এ তো বিদেশের কথা। কটা লোকই বা বিদেশে যাবার মত রেক্স ধরে। দেশের ভিতরকার সমস্যাই বা কিছু ছেড়ে কথা কয় নাকি? একদা, ভূমিকম্প হলে, যথেষ্ট বৃষ্টিপাত না হলে, টাইগার হিল থেকে কুয়াশার দরুন কাশনজংঘার দর্শন না পেলে, বাঁজী পাঠি বাচ্চা না বিয়ালে অন্যথা বউ সাত নম্বরের বাচ্চা বিয়ালে, পরীপ্ত পরিমাণে কচ চুকুস চুকুস করে না চাখতে পারলে, গন্ডায় গন্ডায় রামমোহন রবি ঠাকুর না জন্মালে আমরা “বণিকের মানদণ্ড”-র উত্তরাধিকারিণী মহারাণীর (পাড়ার ঘোষাল বলতো, ব্যাটা দের ঘনিপিতও নেই—বেনের এটো গরগর করে খেল রাজার বেটা-বেটি) বাজার সরকার বড়লাটের খুলিতে ডবল বম্ ফাটাবার চেষ্টা করতুম—অবশ্য সজোপনে মনে মনে।

সুদৃষ্টবশ্য কিন্তু সেই মনেই অতিশয় বেয়াদব প্রশ্ন শূদ্ধতো এসব বর্ণীদের “খাজনা দেব কিসে?”

গুরু বড় দৃষ্টে বলেছিলেন, “মশান থেকে মশান থেকে ঝোড়ো-হাওয়ায় হা হা করে উত্তর আসে আরু দিয়ে, ইচ্ছা দিয়ে, ইমান দিয়ে—বৃকের রক্ত দিয়ে।”

একই নিঃশ্বাসে গদ্যরূপে সেই ভবিষ্যৎ বাণীর সঙ্গে আমার পরবর্তী যুগের অক্ষম সাবধান বাণীর কথা তুলি কোন পাপমুখে ? কিন্তু পাঠক ক্ষণতরে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন, এটা আমার দৃষ্ট নয় । ঝাড়া তিনটি মাস মেসের ভাত না খেলে (কিংবা উপস্থিত আমি যে নাসিৎ হোমের ঘুঁটে খাচ্ছি যে বস্তুর অভিজ্ঞতা না থাকলে) মায়ের রান্নার প্রকৃত মূল্য কে কখন বুঝতে পেরেছে ? যুধিষ্ঠিরকে যে নরক দর্শন করানো হয়েছিল সেটা বিধাতার কোন উটকো খামখেয়ালী নয় । নইলে স্বর্গপূরীর অসুরাদের সঙ্গে দু'দু'ড রসলাপ বিপ্রশালাপ করার পূর্ণানন্দটা তিনি তারিয়ে তারিয়ে চাখতেন কি প্রকারে ? গব গব করে গিলতেন, আমরা যে-রকম মেসের রান্না হড় হড় করে গিলে রেকর্ড টাইমে পাপ বিবেক করি । ..এইবারে শ্যানা পাঠক নিশ্চয় বুঝে ফেলেছেন, আমার প্রবন্ধ সাতিশয় মনোযোগ সহকারে পঠন কেন অবশ্য কর্তব্য, একান্ত অবজ্ঞানীয় । তার চেয়েও ইম্পর্টেন্ট প্রবন্ধ : তার চেয়ে আরো ইম্পর্টেন্ট কর্তব্য. আমার বই কিনুন —চাই পড়ুন, চাই না বা পড়ুন ।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমি পুনঃ পুনঃ বলেছিলুম, “আরো কঠোরতর, আরো নির্মমতর খাজনা দিতে হবে স্বরাজ লাভের পর ? এইবেলাই যদি সে-খাজনার সম্বন্ধ না নাও তবে তোমার কপালে বিস্তর গর্দিশ আছে । এই দেখুন না আজ পূর্বে বাঙলার হাল । কাল যে পশ্চিম বাঙলায় হবে না তার আশ্বাস দেবেন কোন গলিটিকাল গোঁসাই ?—আমি অবশ্য এসব দুর্যোগের ভবিষ্যৎ বাণী আপ্তবাক্য রূপে প্রকাশ করি নি । কিন্তু যা-কিছু নিবেদন করেছিলুম সেটা কেউ কান পেতে শোনে নি । (বলতে ইচ্ছে করছে এখন তবে খাও কানমলা, “কান টানলে মাথা আসে” সেটা যেমন সত্যি, ঠিক তেমনি সত্যি “কান না পাতলে কানমলা খেতে হয় ”) ।

ওঁরা বলতেন বা ভাবতেন, আমার বস্তব্য স্পেশালাইজ্‌ড নলেজ ; এসব এখন তকলীফ বরদাশ্ত করে আমরা পড়বোই বা কেন, বুঝতে যাবোই বা কেন ? আগে স্বরাজ আসুক তারপর অন্য কথা । আমি সিবিনয় বলেছিলুম, “রাধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না ?”

মার খেয়ে অপমান সয়ে সয়ে আমরা এখন অনেক কিছু শিখে ফেলেছি— এই যেমন খানিকক্ষণ আগে পাসপোর্ট কি প্রকারে পেতে হয়, সেটা পাওয়ার পরও আপনার কপালে আর কোন কোন গর্দিশ আছে সে সম্বন্ধে অতিশয় যৎকিঞ্চিৎ সাতিশয় সংক্ষেপে নিবেদন করেছি ।

তারই ফলে একদা যে সব তথ্য নিয়ে শূদ্ধ স্পেশালিস্টরা আলোচনা করতেন, যেগুলো নিছক “স্পেশালাইজ্‌ড নলেজ” ছিল—এখন সেগুলো হয়ে গিয়েছে ডাল-ভাত “কমন নলেজ” । একদা যেমন বিশেষজ্ঞরাই শূদ্ধ মাথা ঘামাতেন, পৃথিবী ঘোরে না সূর্য ঘোরে, পরবর্তী যুগে সেই সমস্যার সমাধান কমন নলেজ হয়ে দাঁড়াল !

চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বঙ্গসন্তান “আমার যুরোপ ভ্রমণ”, “লন্ডনে বঙ্গ মহিলার ঘরকন্না”, “নরওয়েতে প্রথম বঙ্গরমণী” উৎসাহ ও কৌতুহল সহকারে

পড়তো। এখন এত শত লোক নিত্য নিত্য বঙ্গো ইন্ কংগ্রেসে উইক এন্ড কাটাতে যার, জবল্ অল্ অল্ বীর্যে হানিমুনের প্রথমার্ধ চুষে আসে যে “ক্লাস্ সমর্থ” কিংবা “মস্তে কাল্ দর্শন” শিরোনামে এখন সে অবজ্ঞার চোখে দেখে, লেখক পরিচিতজন হলে গেরেমভারি মদ্রুদ্বীর মত তাকে পেট্রোনাইজ করে পিঠ চাপড়ে বলে, “লেগে থাকো ছোকরা; এখনো হাদ্রামুৎ অন্তরে অমদ্রুসলমানকে ঢুকতে দেয় না বটে কিন্তু তুমিই হয়তো একদিন সেখানকার সেই বিরাট প্রাসাদের ভগ্নাবশেষে যেখানে একদা শেবার রানী বাস করতেন সেইটে সজলের পরলা দেখে এসে তাবৎ গোড়জনকে তাক লাগিয়ে দেবে।”

একদা আমি “দেশে-বিদেশে” নাম দিয়ে কাবুল সম্বন্ধে একখানা পুস্তক রচনা করি। প্রকাশকালে বইখানা কিছু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শুনছি, এখনো নাকি কেউ কেউ বইখানা পড়ে। আমি জানি, কেন? তার একমাত্র কারণ যদিও কাবুল পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে অবস্থিত নয়, এবং উত্তর মেরুতে অভিযান করার মত বিপজ্জনকও নয়, তবু একাধিক কারণে—প্রধানতম কারণ অবশ্য এই যে আফগান সরকার চট করে সম্বাহিকে ও-দেশে যাবার অনুমতি-লাহন ভিজা-পারমিট মঞ্জুর করে না, এবং এই একটি কারণই পূর্বে উদ্ধৃত “তৃণাধিপ শোলকের” মত কাবুলগামীর সম্বন্ধে অলংঘ্য প্রতিবন্ধন; কাবুলী প্রবাদও বলে—“সিংহের এক বাচ্চাই বাস (মথেষ্ট)।” বইখানি তাই এখনো লিকলিক্ করে টিকে আছে।

গোড়জনের কমন নলেজ এ-কালে এতই সদূদ্রবিস্তৃত—ভয়ে ভয়ে বলি, কুলোকে বলে শব্দ বিস্তারই আছে—গভীরতা আদৌ নেই এবং সে-বিস্তারও নাকি বহু পল্লবগ্রাহী—যে তাদের মন পাওয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শব্দতে পাই, বিকৃত যৌনজীবন, এমনরমাল সেক্স, সমকাম, সাদিজম্, মাসোখিজম্, পিকচার পোস্টকার্ড, রু ফিল্ম ইত্যাদি ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়বস্তু বেহুশ রগরগে ভাষায়, সববিধ অসম্ভব অসম্ভব ফোটোগ্রাফ-সহ পরিবেশন করলেও তাঁরা যে শব্দ নাসিকা কুণ্ঠিত করেন তাই নয়, বাঁ দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে, ডান ভুরু ইঞ্জিটাক উত্তোলন করে বলেন, “ছোঃ ! চাঃ !! পঃ !!! এগুলো আবার কি ? ক-অ-অ-বে কোন আদ্যিকালে এ-সব তো কমন নলেজেরও নিচের স্তরে নেমে গিয়েছে। পদ্রিসের নাকের সামনে পেভমেন্টে বিক্রী হয়, জলের দরে। শোনো নি বন্ধি—‘থাকো কোন ভবে কোন দুনিয়ায়?’—যবে থেকে ডেনমার্ক এসব মালের উপর থেকে ব্যান তুলে দেওয়া হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তার বিক্রি দশ আনা পরিমাণ কমে গিয়েছে ! তাবৎ বস্তু, সাকুল্যে বিষয় ব্যান তুলে দেওয়ার ফলে যখন তিন দিনের ভিতর কমন নলেজ হয়ে গেল, তখন আর ওসব মাল কানা কাড়ি দিয়েও কিনবে কে ? শুনছি, এখন নাকি দিনেমার প্রকাশক ওসব মাল তালুক দিয়ে ধর্মগ্রন্থ ছাপবে ! সেক্স যখন স্পিরিচুয়াল লেভেলে উঠে গিয়েছে তখন স্পিরিচুয়াল বই অর্থাৎ গ্রন্থ ছাপানোই প্রশস্ততর।”

হ্যাঁ, তদুপরি আরেকটি খবর আমি কাগজে পড়েছি। তখটি আমি কাল্য-সৈয়দ মজতবা আলী রচনাবলী (৭ম)—২৩

কালেই শুনেনিছলুম। “পরিপূর্ণ স্বাধ পেতে হলে চুবনীট চুরি করে নিতে হয়।” “এ কিস টু বী দি সুইটেনস্ট হ্যাজ টু বি স্টোলেন।” সম্মানিত মার্কিন কাগজে পড়লুম, নাম ছিল “লৌড চ্যাটারলিজ স্লারজ” — “লাভারজ” নয় — অর্থাৎ কি না মার্কিন মনুষ্যকে যখন লৌড চ্যাটারলি কেতাবখানা অশ্লীল কিংবা কাব্য-রসের অত্যাশ্রুত উদাহরণ কি না ঐ নিরে মোকদ্দমা উঠলো তখন এক বাঘা উকিল বিচারগৃহ প্রকটিপত করে ওজস্বিনী ভাষায় তাঁর সুদীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করে আবেগোচ্ছল কণ্ঠে বললেন, “ধর্মবিত্তার তথা সম্মানিত জুরি মহোদয়গণ। লৌড চ্যাটারলি পুস্তকে গ্রন্থকার যে অপূর্ব কলাইনপূর্ণ ও সত্য শাস্বত সাহিত্যরস সৃষ্টি করেছেন তাই নয়, যৌনজীবনকে তিনি স্পিরিচুয়াল লেভেলে (আধ্যাত্মিক স্তরে, তুলে নিয়েছেন, তুলে ধরেছেন।”

এই শেষ অভিমতটি শুনে এক পরিপক্ব সমাজে সম্মানিতা ফরাসী নাগরী মৃদু মৃদু মেয়ের স্মিত হাস্য হেসে বললেন, “সর্বনাশ! আমি তো এ্যাশ্বিন জানতুম যৌন সম্পর্কটা নিষিদ্ধ পাপাচার। এখন থেকে ঐ আনন্দের অধেঁকটাই মাঠে মারা গেল।”

নিষিদ্ধ হোক, কিংবা পুলিসসিদ্ধ তথা শাস্ত্রসম্মত হোক আর নাই হোক বিবশ গোড়ীর পাঠক এখন চান কড়াপাকের মাল, তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত—একথা যে রকম “নৃত্যসম্বলিত” গ্রামফোন রেকর্ড সাদামাটা রেকর্ডের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল। অর্থাৎ পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগে আমি যে সপ্তগাণ পরিবেশন করেছিলাম তাঁরা অধুনা সেই বস্তু চান।

কিন্তু আমি পোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরাই।

ইতিমধ্যে আবার অন্য দিক থেকে আরেক বিপরীত বারু বইতে আরম্ভ করেছে। জীবনসংগ্রাম কঠোরতর হয়েছে, পাপাচারের উদ্ভাল তরঙ্গ গিরিচূড়া লঙ্ঘন করে উধামুখে উৎক্লিষ্ট, দিনান্তে বলীবর্ধের ন্যায় কর্মক্লান্তজন স্বগৃহে পৌঁছবে না টিয়ার গ্যাসে অস্থ হবে এবং/কিংবা গুলি খেয়ে পঞ্চভূতে লীন হবে সেই দৃষ্টিভঙ্গ্য সে স্তিমমাণ মোহমান।

ঠিক এই একই অবস্থাতে ফরাসী সাহিত্যের তদানীন্তন গ্রাঁ মেংগ (থ্যাড মাস্টার) কি উপদেশ দিয়েছিলেন সেটি অবহিত চিত্তে প্রবণ ক’য়ে কণ্ঠ সার্থক তথা পুণ্যার্জন করুন।

প্যারিসের এক অসহিষ্ণু “গবি” অর্থাৎ বিনি অবোধ্য মডার্নস্য মডার্ন গবিতা লেখেন আনাতোল ফ্রাঁকে প্রায় শাসিয়ে হুঁশিয়ার করে তালিম দেন, “কবিতা পড়াটা কিছু ছেলেখেলা নয়, যে ছাফলামো এ্যাশ্বিন ধরে চলে আসছে। “মডার্ন” কবিতা আগাপাত্তলা সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু।” এ “কবিতা”-দেউলের প্রতি

৬ পঞ্চাশাধিক বৎসর পূর্বে যখন মডার্ন কবিতা (গবিতা) তার বিজয়া-ভিমানের উত্তর শিখরে তাড়ব নৃত্যে নিমগন তখন কতিপয় গুণীজ্ঞানী লন্ডনে একটি বিতর্ক সভা আহ্বান করেন। বিষয়বস্তু “আধুনিক কবিতা বনাম প্রাচীন (রোমান্টিক, সাংকেই) কবিতা। দুই পক্ষ আপন আপন বক্তৃতা শেষ করার

পাঠককে তীর্থযাত্রীর ন্যায় অবনত মস্তকে 'অগ্রসর' হতে হয়। ভক্তিশ্রদ্ধা তথা (সুচাশ্রয়ে সুভীক্ষণ) একাগ্রতা সহ 'মডান' পোয়েটের স্বাক্ষর হতে হয়। ("মডান' পোয়েট শব্দ' বি এপ্রোচট উইথ ডিভোশন অ্যান্ড কনসানট্রেশন")

এ-উদ্ভূতি বেওয়ার পর ক্রীস যেন দ্বিবার্ষিকপ্রহরে সাক্ষ্যে বসন্তের দর্শন পেয়ে সাত্ত্বিক ভগবানকে স্মরণ করছেন—যে ক্রীস আর্সোবন প্রকাশ্যে একাধিক-বার তাঁর নাস্তিকতা প্রচার করেছিলেন; এর থেকেই সর্ব আন্তিক সর্ব নাস্তিক অনায়াসে বৃদ্ধে ঘাষেন সেই 'গবির আপ্তবাক্য' শুনে তাঁর হৃদয়ে কী মারাত্মক গগনচুম্বী পাতালস্পর্শী ভীতির সৃষ্টি হয়েছিল। উচ্চকণ্ঠে সৃষ্টিকর্তাকে আবাহন জানিয়ে প্রার্থনা করছেন :

"হেভ'ন্ ফরবিড!" দেবভাষায় বলা হয় "ঈশ্বর রক্ষতু", মুসলমান বলে "লা হাওলা কুরোতি ইল্লা বিল্লা।" বাঙলায় এখানে ঠিক কি বলা হয় জানি নে। ভূত দেখলে লোকে রাম নাম স্মরণ করে অবশ্য। কিন্তু এখানে প্রার্থনা রয়েছে, নাস্তিক ক্রীস বলছেন, "ঈশ্বররাধেণে এ-হেন অপকর্মে যেন বিরত হয়।"

এর পরই ক্রীস বলেছেন, "আমি জানি বেচারী (সাধারণ) ফরাসীকে সমস্ত দিন সামান্য রুটি-মাখমের জন্য কী রকম মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়।"

এখানে এগোবার পূর্বে পাঠককে ফের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, "গ্রেতা" যুগটি আমি লিখছি ("ধাপরের" পরে। কেন, সেটা যারা তাপসী অহল্যার কাহিনী পড়েছেন তাঁরাই জানেন) হাসপাতালে। (যদিও খানদানী ভাষায় এটি "নার্সিং হোম" বা "মেডিকাল সেন্টার" নামে সর্গোরবে প্রচারিত, তথাপি আমার সামান্য অভিজ্ঞতা প্রতিবাদ জানিয়ে অজ্ঞজনকে হংশিয়ার করে বলে, এটা 'হোম' তো নয়ই, এবং আচার আচরণ, প্রাচীন যুগীয় সাজসরঞ্জাম দেখে মনে হয়, 'মেডিকাল সেন্টার'-এর নাম পালটে এটাকে 'মেডীসিভাল—মধ্যযুগীয়—কাস্তার' নাম দিলেই এর প্রতি সত্য বিচার করা হয়, কিংবা 'মেডীসিভাল হাস্টার'ও বলতে পারেন,

পর সভাপতি গ্র্যান্ড মাস্টার এডমাণ্ড গস্ (ইনিই বোধ করি তরু দ্বন্দ্বের ইংরিজী কবিতা পুস্তকের অবতরণিকা বা এবং শ্রীমতীর পরিচিত পত্রিকা লিখে দেন। ইনি সাহিত্যরস আশ্বাদনে এবং তার মূল্যায়নে অধিতীয় ছিলেন) বলেন, "কবিতা মাত্র দু'রকমের হয়; উত্তম কবিতা ও নিকৃষ্ট কবিতা। মডান (অর্বাচীন) কবিতা ও ওল্ড (প্রাচীন) কবিতা এ রকম কোনো ভাগ্যভাগি বা শ্রেণীবিন্যাস করা যায় না।

৭ এ তত্ত্বও এমন কিছু "আমরি আমরি মার্কা শিক্ (chic), ধের্নেরে ক্রী (dernier cri), আ লা মদ (a la mode) অভিনয় নয়। চার্লস ল্যাম্ (lamb) বহু পূর্বেই বলেছেন, আহার আরম্ভের পূর্বে আমরা যে রকম প্রার্থনা করি (গ্রেস পিড) উত্তম কাব্য পাঠের পূর্বেও সে-রকম উপাসনা করা কর্তব্য। এবং ভিন্ন ভিন্ন কাব্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা। ল্যাম্ অবশ্য সুপ্রতিষ্ঠিত বশলক্স কাব্যের জন্যই—যে-সব কাব্য সেগুরি এগজামিনেশন পাস করেছেন (শতাব্দী বিজয়ী কাব্য) -এই নবীন ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন।

এবং এখানে কি ‘শিকার’ হয় তার আলোচনা করে অসদৃশ শরীর নিয়ে আসামীর কাঠগড়ায় ঝাঁপাতে চাই নে)। সবসদৃশ মিলিয়ে এখানকার কতৃপক্ষই স্মৃতিভ্রষ্ট হন, আমি যে আনাতোল ক্রাসকে উদ্ধৃত করার সময় পবিত্রপ্রমাণ ভুলক্রান্তি করবো সেটা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং ‘কাসিৎ’ (প্রুফরীডার মশাই, আমি ‘কাসিৎ’ ‘অভিসংপাত’ ‘অভিশপ্ত’-ই লিখেছি—সজ্ঞানে; ‘নাসিৎ’ লিখি নি) ‘বম্’ বাবদে ষাঁদের সমান্যতম অভিজ্ঞতা আছে, অর্থাৎ এ-পদ্যী থেকে সদৃশ অস্থি নিয়ে নিতান্তই ভগবৎকৃপায় বেরুতে পেরেছেন তাঁরা যে আমাকে ক্ষমাসদৃশ চক্ষে দেখবেন সেটা ততোধিক স্বাভাবিক।

ক্রাস বলেছেন, “বেচারী ফরাসী যখন ক্লান্ত দেহে শ্লথ পথে বাড়ি পৌঁছে একখানা পদ্রুতক হাতে তুলে নেয় (অর্থাৎ, অত্যধিক মদ্যপান করে বউকে না ঠেঙিয়ে, কিংবা ঝটপট জুয়ো খেলতে বসে বউ বাচ্চার জন্য দ্রুতমুঠো অন্ন কেনার রেষ্ট উড়িয়ে না দিয়ে—লেখক) তখন, ঈশ্বর রক্ষতু, আমি তার কাছ থেকে ‘সগ্রন্থ একাগ্রতা’ (ডিভোশন অ্যান্ড কনসানট্রেশন) মোটেই কামনা করি নে—” বলেছেন ক্রাস। তারপর তিনি যেন নিবেদন করছেন : “আমি যা দিতে চাই, এবং সেই আমার উজ্জোড় করে দেওয়া, (অল্ আই উয়োট টু গিভ) তার যেন একটুখানি প্রাপ্তি বিনোদন হয়, তার যেন একটুখানি ফ্রুইট জাগে (রিলেকসেশন, এন্টারটেনমেন্ট, এম্বাজমেন্ট হয়)। এবং যেদিন ঐ সবের ফাঁকে ফাঁকে ঐ বেচারী ফরাসীকে কোনো প্রকারের কোনো ইনফরমেশন দিতে পারি, সেদিন আমার আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকে না (মাই জেএ নোজ নো বাউন্ড্জ)।”

দশী মসিয়ো মরিসকে,—আমার পাঠকদের মধ্যে দশী কেউ নেই, কিন্তু যদি সত্যি কোনো উটকো দশী মাল ছিটকে এসে গোলে হরিবোল দিয়ে থাকেন তবে তাঁকে বলছি, অবহিতচিত্তে প্রণিধান করো, যে-ক্রাসকে ফরাসীদেশের লোক গ্রা মেয়র, গ্যান্ড মাস্টার, গুরুদেব বলে একব্যাক্যে স্বীকার করে সাহিত্যের ময়ূর সিংহাসনে বসিয়েছিল তিনি কতখানি বিনয় সহকারে বলছেন, তাঁর “নগণ্য” অর্থাৎ কি ? এবং সেটা এমন যৎসামান্য অকিঞ্চিৎকর যে তার জন্য কোনো পাঠকের কাছ থেকে কোনো প্রকারের ডিভোশন বা কনসানট্রেশন তিনি চান না।

এবং সর্বশেষে মসিয়ো মরিসকে একটুখানি ধূলি পরিমাণ উপদেশ দিচ্ছেন : “তদ্দূর্গার সর্বোপরি, হে মসিয়ো মরিস, তুমি যদি শতাব্দীর পর শতাব্দী ভ্রমণ করতে করতে পেরিয়ে যেতে চাও তবে হাল্কা হয়ে ভ্রমণ করো।” (ইফ্ ইউ উয়োট টু ট্র্যাভেল থ সেম্‌দ্রিজ, ট্র্যাভেল লাইট !)

কী মহান আগ্রবাক্য ! মরিস, তুমি যদি চাও যে তোমার রচনা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লোকে পড়ুক, তবু সে-রচনার ঘাড়ে বিস্তর বিস্তর ভারি মাল চাপিয়ে না। অর্থাৎ যে-মাল কনসানট্রেশন চায়, ডিভোশন চায়।

ব্যাসদেব এ-ভাটটির প্রথম আবিস্কারক। গণপতিকে যখন তিনি মহাভারতের ডিকটেশন নেবার জন্য মনোনীত করেন তখন তাঁর মাত্র একটি শর্ত ছিল, তুমি নিজেকে না বৃদ্ধে কোনো ব্যাক্য লিখতে পারবে না।” গণপতি ‘গণে’র অর্থাৎ সাধারণজনের, mass-এর প্রতিভূ। অতএব তিনি লিখবেন সব কিছু নিজে

প্রথমটায় বন্ধে নিয়ে যাতে করে জনগণও সব কিছু বুঝতে পারে। তাই বোধ হয় কাব্যতত্ত্ববিদগণ তলস্তয় মন্তব্য করেছিলেন, মহাভারতের মত কাব্য ইহসংসারে আর নেই।

আনাতোল ফ্রান হুবহু এই আদর্শটিই গ্রীষ্মান মরিসের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

অবনত মস্তকে, করজোড়ে, দাঁতে দাঁতে কুটো কেটে স্বীকার করছি, প্রাগদুস্ত তত্ত্বটি আবিষ্কার করতে এবং সেটা হুবহু মস্তক করতে আমার অনেকখানি সময় লেগেছিল। অবশ্য মরিসো মরিসের মত “সম্প্রদায় একাগ্রতার” প্রত্যাশা করার মত হিমালয় বিনিমিত উত্তর দিক আমার কর্মসময়কালেও ছিল না। আমি ভুল করেছিলাম অন্য ক্ষেত্রে। আমি মনে করেছিলাম দেশবিদেশ ঘুরে আমি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, একাধিক ভিন্ন দেশে বাধ্য হয়ে যে দু’একটি ভাষা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, বহুবিধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ এবং তার নির্যাস গলাধঃকরণ করেছি, নানান ধরনের নানান চিড়িয়ার সঙ্গে মোলাকাৎ-সহবাসের ফলে যে আদর-অনাদর, দাগা-মহাবৎ পেয়েছি, প্রবাসের নিরানন্দ দিন, নিজস্ব ত্রিষমা শব্দরীতে আকাশকুসুম চয়ন করেছি, দীর্ঘ, দীর্ঘকাল ধরে মাতৃবিরহের অসহ কাতরতা এবং তার চেয়েও নিষ্ঠুর উপলব্ধি যে পুত্রবিরহণী আমার মা-জননী আমার চেয়ে কত লক্ষ গুণে কাতর নিরানন্দ নিরালোক দিনযামিনী যাপন করছেন আমার প্রত্যাগমন প্রত্যাশা করে—এর মধ্যে অসাধারণ অলৌকিক এমন কোনো সৃষ্টিছাড়া উপাদান-উপকরণ নেই যেটা আমার মত নিতান্ত সাধারণজনসুলভ সাধারণ ভাষার প্রকাশ করলে গোড়ীয় পাঠকের বোধগম্য হবে না, তাঁর দিকচক্রবাল অতিক্রম করে মহাশূন্যে বিলীন হবে না।

আমি জানতুম, এবং এখনো দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করি যে, হাড় আলসে, রক্ত-বাজীতে দ্বিগুণিত ফোকটে টু পাইস কামাবার তরে বাপের কামানো ফোর পাইস ঝটসে ঝেড়ে দিতে প্রস্তুত, এবং পাড়ায় একটি সর্বজনসেবী পাঠাগার নির্মাণের জন্য হোক কিংবা নির্মাণান্তে দলদল বশতঃ সেটিকে বীরবর্পে ভস্মীভূত করাই হোক, উভয় মহৎ কর্মের জন্য, তথাভাবে সর্বকর্মের জন্য, তথাভাবে কর্মহীন “কর্ম”র জন্যই হোক, চাঁদা তোলাতে যে বাঙালী অধিতীয়, অপরাধের, যে বাঙালী গত বিশ্ববদ্বৈতের সময় ঐ মহৎ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য হিটলারে স্থালিনের চাঁদা তোলার প্রয়াস পৃথিবী বর্ণনা শব্দে “শিশু ! শিশু !!” বলে অট্টহাস্য দ্বারা গোরশয্যাশয়ী ঐ দুই মহাপ্রভুকে লজ্জা, আত্মজগদুন্মাদ ঘন ঘন ঘূর্ণায়মান করাতে ডানদমতী বিদ্যার, সেই বাঙালী, আবার বলছি, সেই বাঙালী—অন্য জাত যারা ভ্রমণব্যপদেশে কলকাতাতে এসে সভরে, আমাদের রক্তভূমি থেকে সম্মানিত ব্যবধান রক্ষা করে, আমাদের কীর্তিকলাপের খুশবাইটুকু মাত্র পেয়েছে তারা কিছুতেই প্রত্যয় যাবে না যে বাঙালী বই পড়ে।

হ্যাঁ বই পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবৈধ কিন্তু মার্জনীয় পৃথিবীতে। কিন্তু পড়ে।

তাই আমি হয়েদরে ধরে নিয়েছিলাম, আমার বক্তব্য কিন্তু বতই হ'ব বল ল মার্কা হোক না কেন সেটা তার কাছে কিছতেই সম্পূর্ণ অপরিচিত হতে পারে না—নিত্যন্ত ব্দ' একটি উৎকট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া। কারণ প্রকৃত পাঠকের কাছে কোনো বিষয়ই সম্পূর্ণ অজানা নয়, আবার কোনো বিষয়ই সম্পূর্ণ জানা নয়। তাই এক আরব গুরুণী বলেছেন, “পুস্তক, সে যেন একটি ছোট্ট বাগান, যেটি তুমি অনায়াসে পকেটে পুড়ে সর্বত্র নিয়ে যেতে পারো।” যখন খুঁশি তাতে ছব মেয়ে স্মরণগুঞ্জন কোকিলের কণ্ঠ, বসরাই গোলাপের খুশবাই, সারা দিনমান স্মরণ গান সব কিছই পেতে পারো। তেমন বই যদি বেছে নাও তবে সে বাগিচার মিশরের পিরামিড, হিমালয়ের গিরিশ্রেণী, পাভলোভা—পাভলোভাই বা কেন—উর্বশী মেনকার নৃত্যও দেখতে পাবে। এমন কি এমন বই অর্থাৎ এমন বাগিচাতেও তুমি প্রবেশ করতে পারো যে বাগিচা তোমাকে আরো লক্ষ লক্ষ বাগিচার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে। যেমন ধরো, প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে একখানি প্রামাণিক পুস্তক। কত লক্ষ বাগবাগিচার সঙ্গে সে যে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবে সেটা নির্ভর করে শুধু তোমার কৌতুহলের উপর।

আরেক স্ত্রানী বলেছেন, “একখানা পুস্তক যেন একখানা ম্যাজিক কার্পেট; তারই উপর আরামসে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে তুমি যত্রতত্র যেতে পারো, যা ইচ্ছা তাই এমন কি তোমার সেরকম ‘রুচি’ হলে ‘যাচ্ছেতাই’ দেখতে পারো।”

তবে হ্যাঁ, আমার মনে ধারণা ছিল, ম্যাজিক কার্পেট রাজারাজড়ার মিনার, অধুনা মার্কিন মুল্লুকের চন্দ্রশশী প্রাসাদাদির থেকে গা বাঁচিয়ে বহু উর্ধ্বলোক দিয়ে উত্তীর্ণমান হয় বলে পাঠক সব কিছ পুষ্ট দেখতে পায় না। আমার রচনা হবে যুগ-মানানসই হেলিকপ্টার,—অনেক নিচু দিয়ে যায় বলে, অনেক মস্তুরে চলে বলে পাঠক হয়তো অনেক আশ-চেনা জিনিসের চোন্দ্র আনাচিনে নেবে।

কিংবা বলি, ম্যাজিক কার্পেটের ক্ষণে অতদূরে যাই কেন? এই কাছেই তো “বাঙলাদেশ”, নিত্য নিত্য বার ক্রমবর্ধমান আমাদের কানে আসছে, কিন্তু সে-কথা থাক। সেই বাঙলাদেশের ঢাকায় এক কুটি ফেরিওয়ালা আম বেচতে এসে বাড়ির সামনের লন-এর উপর খুড়টা রেখেছে। বাবু উপরের বারান্দা থেকে আমগুলোর দিকে চোখ বুলিয়ে ঈষৎ তাকিল্যের সঙ্গে বললেন, “কি আম আনছো, মিয়া, বড় যে ছোড় ছোড় (ছোট ছোট)।” কুটি এক গাল হেসে উপরবাগে তাকিয়ে বললে, “ছোড় তো লাগবই, কতী—উচা খনে ছোড় তো লাগবোই। লাম্যা আহেন মহারাজ, তখন লেখবাইন অনে, বরো বরো।”

কিন্তু হায়, আমার পাঠক মহারাজা নেমে এলেন না। আমগুলোর সত্য রূপ তাঁরা নিকটে এসে দেখতে রাজী হলেন না। সেটা হয়ে যেত “স্পেশা-

৮ উন্মাসিক দার্শনিক বলেন, কাছের থেকে দেখাটাই সব চেয়ে সত্য দেখা তার তো কোনো প্রমাণ নেই। হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়োর উচ্চতা সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান উপলব্ধি করতে হলে তার ডগায় উপর বসে সেটাকে দেখতে হয়, এমন নির্দেশ দেন কোন অর্বাচীন! বরঞ্চ সূর্যের দার্জিলিঙ থেকে সেটাকে দেখলে

লাইজড নলেজ”। তখন তারা চাইডেন “কমন নলেজ”। এখন তারা চান “সেপালাইজড নলেজ”।

কিন্তু অর্থম এ-থলুট, ইন্সলুস্টজন আর বিতরীয়াব বিলদব্ কনিয়ে গমনাগমন “কলিবক” না।

এখন থেকে আমি স্বেচ্ছামাত্র অতিশয় সাধামাটা, সাতিশয় নির্জলা “কমন নলেজ” পরিবেশন করবো।

কিন্তু না, পুনরাপি না। স্বর্গ্যাপ উমানিক সম্প্রদায় উচ্চৈশ্বরে চিংকার করে বারংবার বলছেন সেক্স্ “কমন নলেজ” হয়ে গিয়েছে, এবং আমিও এইমাত্র যে প্রতিজ্ঞাপাঠ লিপিবদ্ধ করলুম তার কালি একনো শৃঙ্খল নি, এবং আর অর্থ, আমি এখন থেকে শৃঙ্খ “কমন নলেজ” নিয়ে লিখব তার অর্থ এই নয় যে আমি ইহুসংসারের তাবৎ “কমন নলেজ”-এর বিশ্বকোষ রচনা করতে বসে যাবো। সংসারের বিস্তর পোড়-খাওয়া এক ধনী বাপ মৃত্যুকালে অন্যান্য উপদেশ দিতে দিতে বলেছিল, “আর হ্যাঁ, প্রতি গ্রাসে পাঁচটা করে মাছের মড়ো খাবি।” পরস্যা-ওলা সে বাড়িতে পাকা রুই বাঘা কাংলা গোস্তের বড় মাছের মড়ো ভিন্ন অন্য কোন মাছের মড়ো কস্মিনকালেই প্রবেশলাভ করে নি। ছেলে বেচারী একই গ্রাসে পাঁচটা রুই মাছের মড়ো খেতে গিয়ে দমবদ্ধ হয়ে মৃত পিতার “অনুজ্ঞা” হওয়ার উপক্রম। বাবা বলতে চেয়েছিল চুনোপাঁট কেঁচকি পোনার মন্ডু খেয়ে সম্ভার আহাৰ্য্য সমাপন করবি। আমি কমন নলেজের চুনোপাঁটির মন্ডু গিলতে রাজ্যী আছি কিন্তু রাঘব বোয়ালের বাঘা মন্ডু এক গরাসে গেলবার চেষ্টা করতে রাজ্যী নই। যদিও মন্ডু তো দুটোই। সেক্স্ কমন নলেজ আবার পুরাতন ভূত্যও কমন নলেজ।

বিতরীয়াত, “এ যৌবন জলতরঙ্গ রুধিবে কে রে? হরে মুরারে হরে মুরারে” আত্নাঘ করছিলেন কবি আকুল কণ্ঠে। এখন “এ যৌবন বটতলা প্রাবন রুধিবে কে রে? আই জি রে, পি সি রে?” আমি বাস করি একতলায়। খুব বেশী ঘিনের কথা নয়, তেড়ে নেমেছে কলকাতার বর্ষা। গৃহিণী ধরু ধরু বৃকে চৌকাটে দাঁড়িয়ে দেখছেন, রাস্তা থেকে পেভমেন্টে জল উঠেছে। এইবারে পেভ-মেন্ট ছাড়িয়ে ঘরের ভিতরে জল ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার আবর্জনা ময়লাও অপঘাঁপ্ত পরিমাণে। (পৌর পিতারা নিশ্চয়ই উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করছিলেন এবং মার্কিন টুরিস্টদের দাওয়াৎ করেছিলেন দেখে যেতে, আমাদের কলকাতা কী সন্দ্বর, কী সাফ, কী সুবুৎ) এবং তার পর কেলেকারি কাণ্ড। ডারু সি-তে জল ঢুকে, না জানি কোন বৈজ্ঞানিক কারণে উজান বাইতে আরম্ভ করল কোথা

তার সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান জন্মায়। বিস্তৃত ব্লেস্কা পেনটিং সম্বন্ধে সেটা আরো বেশী প্রযোজ্য। আর কে বললে আপনি আম দেখছেন! এটা স্বপ্ন, মায়ী, মতিভ্রম অনেক কিছুই হতে পারে। এবং সর্বশেষে শৃঙ্খোবেন, ফেরিওলাই বা কে, বাবুই বা কে? উজরে শঙ্করাচার্য কপচে বলবেন, “নখু নাহম্ নয়ম লোকঃ। তুমি নেই, আমিও নেই, এই পৃথিবীও নেই। আমি তেন্ নাহম্ ছার!

থেকে নানাবিধ স্রোত, ভেসে আসতে লাগল নানাবিধ “জবদান”। বাঁতবস রস এতলেই সমাপ্ত হোক।

হুবহু এককম সেই প্রক্সারই পুনরাবৃত্তি হল বোন-‘সাহিত্য’ মারফৎ। প্রথম ছেয়ে গেল পেভমেন্ট, তারপর হুড় হুড় করে ঢুকলো ঘরের ভিতরে। কিন্তু সত্যিকার রগড় তো শব্দ হল তার পর। বোন জীবনের যে-সব আবজ্ঞা না আমরা ডারু সি দিয়ে, স্যারারেজ দিয়ে বাড়ি থেকে নগর থেকে বের করে দিয়েছি সেগুলোকে কোন এক পিচেশ মার্কা উচাটন মস্তে আবাহন জানালো বাইরের সেই আবজ্ঞা, সেই বিদেশ থেকে আমদানি বোন-বটতলীয় ‘মাল’ যা ধীরে ধীরে ছেয়ে ফেলেছিল কুঞ্জ পেভমেন্ট, তাবৎ ফুটপাথ—পুলিসের নাকের ডগায় সড়সড় দ্বিতে দ্বিতে) আমি পুলিসের ঘাড়ে কুঞ্জ বেলেজাপনার বালাই চাপাতে চাই নে; দেশের লোক যদি এ-মাল চায় তবে পুলিস আর কতখানি ঠেকাবে? (দেশ-বিদেশের একাধিক ডাঙর ডাঙর কর্ণধার কখনো সোল্লাসে, কখনো বা মর্চাক হেসে, কখনো বা বক্রোক্তি করে ‘আপুবা’কে ঝেড়েছেন, “এ নেশন (কান্ট্) বি রং।”

এই হে-হুল্লোড়, জগৎপ বাঁহায় মধ্যধানে কে কান দেবে, মশাই, আপনার গুণগুনানি পানপ্যানিতে। আপনার বক্তব্য যতই অসুস্থতাই হোক না কেন তাকে দেখতে হবে সুস্থ মাথায়, অধ্যয়ন করতে হবে শাস্তিচক্রে অথবা উত্তেজিত না হয়ে। কিন্তু তাতে কোনো ফায়দা হবে না, এখন থেকে বলে দিচ্ছি। এই যে সেদিন শ্যামাপুঞ্জের সাক্ষ থেকে ভোর অবধি বেধড়ক, আচমকা, নানাবিধ কর্ণপটহ বিদায়ক বাজী ফাটালে কলকাতাইরা,—সে অস্ত্রে আপনি পাকা সুরেলা হাতে বাঁগামস্তে দরবারি কানাড়া বাজালে কান দিত না যেদো-মেধো কেউই। তাই কবি শাবাশ শাবাশ রব ছেড়ে বলেছেন

ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিল জলদাগমে

বর্ষাকাল এসেছে। এখন মন্ত দাদুরী পাগলা কোলা ব্যাঙের পালা। কোকিল যে মৌনতা অবলম্বন করলো সেটা অতিশয় ‘ভদ্র’ কর্ম (বিচক্ষণেরও বটে)। জন্ম-অভিজাত জাতভদ্রই এ-আচরণ ভিন্ন অন্য আচরণ কল্পনা করতে পারে না।

তা আমি যতই কমন নলেজ নিয়ে পড়ে থাকতে চাইনে কেন, আমার একদল হাউফমাসিক (হাফ-গেরস্ত তুলনীয় নয়, থুড়ি থুড়ি, এই দেখুন, খরাছোয়ার বাইরে থেকে যতই সম্ভরণে আপনি যৌনের প্রতি সামান্যতম ইঙ্গিত দিয়েছেন কি, না, অমনি দ্যাখ-তো-না-দ্যাখ-ঐ খাটালের বোটকা গম্ভীর অধ্যান্য্য বখরাটি আপনি পেয়ে যাবেনই যাবেন) - হ্যাঁ, কি বলছিলাম, এক দল অর্ধ-উন্মাসিক পাঠক আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন বহু বৎসর ধরে। কেন, বলতে পারবো না। কখনো ভেবেছি, অনুকম্পা বশতঃ। লক্ষ্য করেন নি এই তর্কটি, পথে যেতে যেতে দেখলেন দুই অজানা টীমে ফুটবল খেলা হচ্ছে, তার একটি স্পষ্টত দুর্বল; আপন অজানতে দেখবেন, আপনার দরদখানি আ—স্তে আ—স্তে ঐ দুর্বল টীমের পাল্লার উপর ভর দিচ্ছেন। কখনো ভেবেছি, হয়তো আমার “মুসলমানী চিন্তাধারা, ভাষার শাবানিক কায়দা-কোতা” তার নুতনত্বের জন্য

কোনো কোনো একঘেরেমি-ক্লান্ত পাঠককে আকৃষ্ট করেছে। আমি অবশ্য সে-সম্বন্ধে অল্পই সচেতন ছিলুম; আমি জানত এমন কোনো বিষয় এমন কোনো ভাষা ব্যবহার করি নি যা সুদৃঢ়তার স্বাভাবিকতা দ্বারা “নিত্যনবীন”ের সম্মানী-জনের পাজরে কাত্তুকৃত্ব দিয়েছে, জড় রসনায় চুলবুল জগাবায় চেষ্টা করেছে। স্বাভাবিক জিনিস আমি আলিঙ্গন করেছি, পাঠকের সম্মুখে পেশ করেছি তখনই, যখন অনুভব করেছি সে স্বাভাবিকতার মধ্যে বিশ্বজনীন ভাব সঞ্চারিত আছে, যে স্বাভাবিকতা দেশকালপাত্র উত্তীর্ণ হয়ে শাস্বত হবার অধিকার লাভ করেছে। “কোণের প্রদীপ মিলায় যথা জ্যোতিঃ সমুদ্রেই।” বলা বাহুল্য খৃষ্টীয়, অখৃষ্টীয়, জনপদসুলভ ভাবধারা, আমার আবাল্য পরিচয়ের খাসিয়া সাঁওতাল সভ্যতার প্যাটার্ন আমি ঠিক সেই ভাবেই গ্রহণ করেছি যে ভাবে আমি স্বাভাবিক চিন্তামার্গকে হ্রসবে স্থান দিয়েছি।...এই পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পম্পা অতিক্রম করার সময় কিছ্ পাঠক সর্বদাই আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন, বিশেষ করে দুর্দিনে

দুর্দিনে বলা, কোথা সে সজ্জন যে তোমার সাথী হয়?

আঁধার ঘনালে আপন ছায়াটি সেও, হয়, হয় লয়।

তঙ্গদন্তীমে কোন কিসকা সাথ দেতা হৈ?

কি ছায়া ভী জুড়া হোতা হৈ ইনসাঁসে তারীকীমে”।

এঁদের ব্যেস হয়েছে। এঁদের অনেকেই এখন গভীরে প্রবেশ করতে চান।

আমি তাই একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করবো। দয়া করে আমার সহৃদয় পাঠক সমুদয় তাঁদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ এই অধম লেখককে তার মধ্যপন্থা অবলম্বনের প্রদোষে, তার ধূসর জীবনের গোধূলিতে তাকে আশীর্বাদ করবেন।

আমার অনুরোধ, আমার মূল লেখাটি পড়ার সময় যদি কৃপালু পাঠক অসুপাধিক নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লহরীতে দোলা খেতে খেতে এগিয়ে যান, সে-রস-স্রোতে যদি আদৌ রসসুশ্টিতে আমি কণ্ঠগুণ সক্ষম হই) ভেসে ভেসে সমুদ্রপানে চলতে থাকেন তবে হঠাৎ সে-স্রোত থেকে সরে গিয়ে ফুটনোটের গভীরে ডুব দেবেন না।

আর যারা ফুটনোটের গভীরে গিয়ে কিছ্ কণ সে-গভীরে অবগাহন করার পর ডুবসাঁতার দিয়ে পুনরায় ভেসে উঠে স্রোতোপরি অন্যান্য পাঠকদের সঙ্গে সম্মিলিত হন তাঁরা তখন নিশ্চয়ই আমাকে সস্নেহ আশীর্বাদ জানাবেন।

ছাপর

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে রাতদুপুরেই হোক আর দিনদুপুরেই হোক চট করে বলতে পারবেন না, আপনি যে হোটেলের শুরুরে আছেন সেটা কোন শহরে। টোকিও ব্যাংকক, কলকাতা, কাবুল, রোম, কোপেনহাগেন যে কোনো শহর হতে পারে। আসবাবপত্র, জানালার পর্দা, টেবিল ল্যাম্প স্বাভাবিক বস্তু এমনই এক ছাঁচে ঢালা

যে স্বয়ং শালক হোমসকে পর্যন্ত তাঁরা সব কটা পুরু পুরু আতসী কাচ মার তার জোরদার মাইক্রোস্কোপটি বের করে ওয়াটসনকে কাপের্টের উপর ঝোড়া বানিয়ে, নিজে তার পিঠে ঝাঁড়িয়ে, ছাতের উপর তাঁর স্বহস্তে নির্মিত আলা হেমস প্রে ছাড়িয়ে—বাঁকটা থাক, ব্যোমকেশ ফেলদার কল্যাণে আজ 'ইস্কুল বার'ও সেগুলো জানে—তবে বলবেন, "হয় মস্ত কালোঁর রেজিনা হোটেল নয় স্লোহানেসবর্গের অল হোয়াইট হোটেল।" বর-পাল্লার এ্যারোপ্লেনের বেলাও আজকের দিনে তাই। একবার তার গর্ভে ঢুকলে ঠাঠর করতে পারবেন না, এটা সুইস এয়ার, লুক্ট, হান্জা, এয়ার ইন্ডিয়া না কে এল এম। তিনি পেরেটে ঢুকে নোয়া কি আর আমেজ-আমেশা করতে পেরেছিলেন এটা কোন জাতের কোন মল্লুরকের তিমি ?

ইন্ডিয়ান মানেই নেটিভ, মানে রম্ধী। আস্তে আস্তে এ ধারণা কমছে। নইলে জর্মনি এ-দেশের সেলাইয়ের কল, রুশ কলকাতার জুতো কিনবে কেন ?

অতএব এয়ার ইন্ডিয়া কোম্পানির এ্যারোপ্লেনকে একটা চান্স দিতেই বা আপত্তিটা কি ? অন্য কোম্পানিগুলো তো প্রায় সব চেনা হয়ে গিয়েছে। অবশ্য আরেকটা কথা আছে। ঐ কোম্পানির এক ভদ্রলোক বৃষ্টি খাটিয়ে তথ্যরত্নারক করে আমার সুখ-সুবিধার যাবতীয় ব্যবস্থা না করে দিলে হয়তো আমার যাওয়াই হত না। তাঁর নাম বলবো না। উপরওলা খবর পেলে হয়তো কৈফিয়ৎ তলব করে বসবেন, কোনো একজন ভি আই পিকে সাহায্য না করে একটা থান্ডা কেলাস 'নেটিভ' রাইটারের পিছনে তিনি অপিসের মহামূল্যবান সময় নষ্ট করলেন কেন ? তবে কি না তাঁর এক ভি আই পি মিত্রও আমাকে প্রচুরতম সাহায্য করেছিলেন। তাকে না হয় শিখড়ীরাপে খাড়া করবেন।

ভাষাছিলদে চুঙ্গী ঘরের (কাসটমসের) উৎপাত থেকে এই দুই দোস্তো কতখানি বাঁচাতে পারবেন। ইতিমধ্যে এক কাস্টমিয়া আমার কাগজপত্র পড়ে আমার দিকে মিটমিটিয়ে তাকিয়ে শুধোলে "আপনিই তো আপনার বইয়ে চুঙ্গী ঘরের কর্মচারীদের এক হাত নিয়েছেন, না ?"

খাইছে। এযাত্রায় আমি হাজতবাস না করে মানে মানে কলকাতা ফিরতে পারলে নিতান্তই পৃষ্ঠপিতার আশীর্বাদেই সম্ভবে। কে জানে, এই কাস্টমিয়াই হয়তো হালে কয়েকজন ডাঙর ভি আই পি-কাম সরকারী কর্মচারীকে বেআইনীতে মাল আনার জন্য নাজেহাল করেছিলেন।... এত দিন কলকাতা করপরশনের অভ্যুৎসাহ ও মাত্রাধিক কর্মতৎপরতা বশতঃ জলের কল খুললে যে রকম জল না বেরিয়ে শব্দ বেরতো সেই রকম আমার র্টিং পেপারের লাইনিংওলা গলা দিয়ে কথা না বেরিয়ে বেরোল ঘস ঘস খস খস চোঁ-ও'-ও'-ও' ধরনের কি যেন একটা বদখৎ আওয়াজ।

নাঃ। এ-লোকটির রসবোধ আছে কিংবা এ'র বাড়িতে মাসে একদিন করপয়ে-শনের কলের জল আসে বলে ঐ ভাষা বাবদে তিনি সন্ধানীতি চাটুঘো মশাইকে তাক লাগিয়ে উত্তম ধনিতত্ত্ববাদের কেতাব লিখতে পারবেন। বললেন, "নিরুদ্ধ মনে ঐ আরাম চেয়ারটা বসুন। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।" তারপর ডাইনে

বারে তারিয়ে কী এক অশ্রুত টেরেটকার সংকেত করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে জনাচারেক বাঙালী কার্টামিয়া আমাকে ঘিরে যা আদর-আপ্যায়ন অদারুণ করলেন যে হৃদয়সম করলুম, বেশীর প্রসাদে মূক যে-রকম বাচাল হয়, আমি কেন, হরবোলাও মূক হতে পারে।

প্রতিজ্ঞা করলুম, চুসীঘর লেখাটি আমিই ব্যান্ করে দেব। কার যেন দৃশ্যে টাকা ফাইন হয়েছে। অবশ্য অন্য অকারণে, কিন্তু জরিমানা ইজ্ জরিমানা। আপনার কারণ ভিন্ন বলে আপনি তো আর মোক টাকা দিয়ে শোধবোধ করতে পারবেন না।

কিন্তু এত সব বাখানিয়া বলছি কেন ?

শুনুন। জীবনে ঐ একদিন উপলব্ধি করলুম, সাহিত্যিক—তা সে আমার মত আটপোরে সাহিত্যিক হওয়ার মধ্যেও একটা মৰ্যাদা আছে।

*

*

*

এসব যে বাখানিয়া বলছি তার আরো একটা কারণ আছে।

আমার নিজের বিশ্বাস, প্লেনের-পটের ভিতরকার তুলনায় এয়ারপোর্টের আজব আজব তাম্বব চিঁড়িয়া দেখতে পাওয়া যায় ঢের বেশী। পাসপোর্ট, কাস্টমস, হেলথ অফিসে, রেস্টুরায় তাদের আচরণে কেউ বা সংকোচের বিহীনতায় অতীব স্তম্ভিত, কারো বা গড্ ড্যাম্ ডোন্টো কেয়ার ভাব—ওঁহিকে একটি বিগতযৌবনা মার্কিন মহিলা এ্যারোপ্লেনে অধিনিদ্র যামিনী কাটিয়ে আলুখাল-কেশ, হাত-পাউডার-রুজ, এঞ্জিনের পিস্টন বেগে পলস্তারা পলস্তারা স্ট্রীম-পাউডার-রুজ মাখছেন, ওঁহিকে তাঁর কত প্লেনে সস্তায় কেনা স্কচ স্যাটি স্যাটি করছেন; আর ঐ সুন্দরতম প্রান্তে দেখুন,—দেখুন বললুম বটে, কিন্তু দেখার উপায় নেই—কালো বোরকাপরা জড়োসড়ো গডা দুই মকাতীথে হজ যাত্রিনীর গোঠ। এঁরা নিশ্চয়ই চলতি ফ্যাশানের ধার ধরেন না। বেশীর ভাগ আঁকড়ে ধরে আছেন পর্দুটলি—হ্যাঁ বেনের পর্দুটলি। গোরুর গাড়িতে গমনার নৌকায় ওঠার সময় যে পর্দুটলি সঙ্গে নেন। ওঁরা ভাড়া বাবদ কয়েক হাজার টাকা দিয়েছেন নিশ্চয়ই। অনায়াসে হালকা স্নাটকেস কিনতে পারতেন। দু-একজনের ছিলও বটে। কিন্তু ওদের কাছে গোরুর গাড়ি যা, হাওয়াই জাহাজও তা—এদের মক্কা পেঁছলেই হল। হয়, এঁরা জানেন না, প্লেনে ভ্রমণ—তা সে যে কোনো কোম্পানিই হোক না কেন—গোরুর গাড়িতে মুসাফিরী করার তুলনায় ঢের বেশী তকজীফদায়ক। এমন কি প্লেনে এঁদের সঙ্গে হায়া-শরম বাঁচিয়ে চলাও কঠিন। কলকাতার বস্তিতে কি হয় জানি নে, কিন্তু এঁদের যখন প্লেনে করে যাবার রেষ্ট আছে তখন এঁরা নিশ্চয়ই সেখানকার নন। আর গ্রামাণ্ডলে কেউ কখনো প্রাতঃকৃত্যের জন্য কিউ দেয় না। অথচ প্লেনে প্রাতঃকৃত্যে জন্য এঁদের কিউয়ে দাঁড়াতে হবে—মেয়েমশে লাইন বেঁধে। সে-কথা পরে হবে। তবে হজ যাত্রীদের জন্য স্পেশাল প্লেনে যদি স্পেশাল ব্যবস্থা থাকে তার তথ্য জানি নে। কোনো কোম্পানী অপরাধ নেবেন না।

*

*

*

“শুদ্ধকণে দূর্গা স্মরি প্লেন ছিল ছাড়ি

বাঁড়িয়ে রিহল পোর্টে সব বেরাদরুই শুদ্ধক চোখে।”

পূর্বেই নিবেদন করেছি প্লেনের ভিতরে দেখবার মত কিছুটি নেই। থেরা-পারে রেলগাড়িতে যা দেখতে পাওয়া যায় তার চেয়েও কম। আর সর্বকণ আপনার চোখের তিন ফুট সামনে, সমুখের দুটো সীটে দুটো লোকের ঘাড়। তারো সামনে সারি সারি ঘাড়। ঘোস্ত আমার এ প্লেনের ‘মালিক’। অতএব আমার জন্য উইন্ডো সীটের ব্যবস্থা করেছেন—অর্থাৎ বাঁদিকে তাকালে বাইরের আকাশ দেখা যায় মাত্র, বলতে গেলে পৃথিবীর কিছুই না। একে রাত্রি, তদুপরি আন্ডার মালুম, বিশ হাজার না পাঁচিশ হাজার ফুট উপর দিগ্লে প্লেন যাচ্ছে। কিছু দেখতে চাইলে তিনয়নের প্রয়োজন। উপরেরটা হয়তো কিছু বা দেখতে পায়। তবে ভারতীয় প্লেনে একটা বড় আরাম আছে। যদিও অধিকাংশ যাত্রী ভারতীয় নয়—বিদেশী, এবং প্রধানতঃ ইয়োরোপীয়। তারা জানে, ইন্ডিয়ানরা বেলেক্সাপনা পছন্দ করে না। কাজেই অতিরিক্ত কলরোল, এবং ছাগলের দরে হাতি কেনার মত স্কেচ ভোদকা সেবনজনিত মাঝে-মাঝে তর্জিতরিক্ত কলহরোল থেকে নিশ্চিন্ত মনে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

এ-বাবদে এখানেই থাক। কারণ প্রম্ভেয় শ্রীযুক্ত তারাকশঙ্কর, সন্মানীয় শ্রীযুক্ত বৃন্দধেব, ভদ্র প্রবোধ ও অন্যান্য অনেকেই প্লেনের ভিতরকার হাল সর্বিস্তর লিখেছেন।

জাগরণ, তন্দ্রা, ঘুম সবই ভালো। কিন্তু তিনটিতে যখন গুবলেট পাকিয়ে যায় তখনই চিন্তির। এ-ঘেন জরুরের ঘোরে দুদিন না তিনদিন কেটে গেল বোঝ-বার কোনো উপায় নেই।

চিংকার চেঁচামেচি। রোম ! রোম !! রোম !!!

২

ক্যাভলিকদের তো কথাই নেই। প্রটেস্টান্টদের ঈশ্বর সংযত কৌতুহল। বিশেষ করে মার্কিনদের। দেশে ফিরে বড়ফাটাই করতে হবে, হ্যাঁ তেমন কিছু না, তবে কি না, হ্যাঁ, বেয়ালের আর গম্বুজের ছবিগুলো ভালো। কী যেন নাম (ভামিনীর দিকে তাকিয়ে) মাইকেল-রাফাএল, না, হল না। লেওনার্দো দা বিন্সিচেঞ্জি। ও ! সেটা বুদ্ধি মোনালিসার লীনিং টাওয়ার ?”

বললে পেত্যয় যাবেন না, আমি স্বকর্ণে শুনছি, তাজমহলের সামনে বসে একই বেস্টে-বসা এক মার্কিনকে তার মিসিসেস উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধোতে শুনছি, “কিন্তু আশ্চর্য, এই ইন্ডিয়ানরা এ-সব তৈরী করলো কি করে—ফরেন সাহায্য বিনা, অর্থাৎ আমাদের সাহায্য না নিয়ে।”

রোমে নামতেই হল। সেখানে আমার এক বৃন্দ বাস করেন। কিন্তু তার

ফোন নম্বর জানা ছিল না বলে যোগসূত্র স্থাপনা করা গেল না। একখানা পত্রা-
ঘাত, তৎক্ষণাৎ স্টাম্প যোগাড় করতে না করতেই এয়ার কোম্পানির লোক রাখাল
ছেলে মেরকম গোরু খেঁচিয়ে খেঁচিয়ে জড়ো করে গোয়ালে তোলে সেই কায়দার
প্যাসেঞ্জারদের প্লেনের গর্ভে ঢোকালে। প্যাসেঞ্জারদের গরুর সঙ্গে তুলনা করাটা
কিছুমাত্র বৈশাখ্য নয়। মোটা, পাল্টা ঠিক বয়স্ক গরুরই মত লাউজের মধ্যখানে
একজোট হয়ে বসেছে বটে কিন্তু বাছুরের পাল, অর্থাৎ চ্যাংড়া চিংড়িরা যে কে
কোন দিকে ছিটকে পড়েছে তার জন্য হুঁলিয়া শমন বের করেও রক্তভর ফায়দা
নেই। কেউ গেছেন কিওরির দোকানে। কাইরোর মত এখানেও খাঁটি ভেজাল
দুই বস্তুই সুলভ—এস্তর পড়ে আছে—কিন্তু দুর্লভ, কলকাতার ঘাছের বাজার-
কেও হার মানায় গাহকের কান কাটতে। কেউ বা গেছেন বিনম্যাসুলের (ট্যাক্স
ফ্রী) দোকানে। হয়তো ইতালীর নামকরা একখানা আস্ত ফিয়াৎ (মোটামুটি,
ফা (F) রিকার্ডসিয়োনে; ই (i) ইতালিয়ানা; আ (a) ওতোমোবিলে; তু (T)
রিনো—এই চার আদ্যাক্ষর নিয়ে FIAT, একুনে, ফার্মকেশন (মেড ইন) ইতালি-
য়ানা (of Italy) অটোমবীল (of) তুরীনো। তুরীনো সেই শহরের নাম যেখানে
এই স্বতন্ত্রলগত নিৰ্মিত হয়, ফিয়াৎ শব্দ আবার আরেক প্রাচীন অর্থ ধরে—
“ফরমান”, “তাই হোক”)। গাড়ি কিনে নিয়ে আসেন! একটি হাফাহাফি আধা-
আধি, অর্থাৎ পাতে দেওয়া চলে মার্কিন চিংড়ি ঐ হোথা বহু দূরে বার-এ বসে
চুটিয়ে প্রেম করছেন একটি খাবসুদর ইতালিয়ান চ্যাংড়ার সঙ্গে। খাবসুদর বলতেই
হবে—এই রোম শহরে ছবি এঁকে মূর্তি গড়ে যিনি নাম করছেন সেই মাইকেল
এঞ্জেলো যেন এই সদ্য একে গড়ে ‘চরে খাওগে, বাছা’ বলে ছেড়ে দিয়েছেন। আর
ইতালিয়ান যুদ্ধ-যুদ্ধবতীর প্রতি মার্কিন যুদ্ধের যে-পীরিত সেটা প্রায় বেহা-
য়ামীর শামিল। চিংড়িটা চরে খাবে না কেন? সবশেষে বলতে হয়, ইতালির
কিরাস্তি মধ্য দুনিয়ার কুঞ্জে সন্ধান সঙ্গে পাল্লা দেয়। সেটা ও মেয়েটা পাওয়া যাচ্ছে
ফ্রী, গ্রেটিস অ্যান্ড ফর নাথিং। মৃফৎ মে।

প্লেনে ঢুকে দেখি, সীতা সেটা গোয়ালঘর। মশা খেদাবার তরে গায়ের চাচার
বাড়িতে ধ্বংসকাম স্যাতিসেতে খড়ে আগুন ধরানো হত এখানেও সেই প্রতিষ্ঠান।
তবে হ্যাঁ, এটা বিজ্ঞানের যুগ। নানা প্রকারের ডিসিনফেকটেন্ট, ডিঅডরেন্ট
স্প্রে করা হয়েছে প্রেমসে। সায়েবদের যা বী ও—বাঁড়ি ওড়ার—গায়ের বোটকা
দুর্গন্ধ!!

সকালবেলার আলো দিব্য ফুটে উঠেছে। ইতিমধ্যে প্লেনে পাক্সা সাড়ে পনেরো
ঘণ্টা কেটেছে। দমদমা ছেড়েছি রাত ন’টায়; এখন সকাল আটটা। হওয়ার কথা
তো এগারো ঘণ্টা! কি করে হলো? বাড়ির কাক্সাক্সাধর শ্রুত্বান।

প্লেন যখন রোম ছাড়ল তখন অপ্রশস্ত দিবালোক।

দিবালোকের সঙ্গে সময়ের সম্পর্ক আছে। যে-বেশে যাচ্ছি, সেই জর্মনির
বাম্বা দার্শনিক কাণ্ট নাকি বলেছেন কাল এবং স্থান ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর
নির্ভর করে না। (টাইম অ্যান্ড স্পেস আর অ্যাপ্রিয়ারি কনসেপশন)।

কাজের বেলা কিন্তু দেখলুম, তব্বটা আরো সরল সহজ নয়।

বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি, যেন দেশের সকালবেলার সাতটা-আটটা। কিন্তু হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে নজর পড়তে দেখি, সেটি দেখাচ্ছে সাড়ে বায়েটা। কি করে হয়? আমার ঘড়িটি তো পরলো নব্বই এবং অটোমেটিক। অবশ্য একথা আমার অজানা নয়, অটোমেটিক বেশী সময় কোনো প্রকারের কাকুনি না খেলে মাঝে-মাঝে থেমে গিয়ে সময় চুরি করে। কিন্তু কাল রাতভর যা এ-পাশ ও-পাশ করেছি তার ফলে ওর তো দম খাওয়া হয়ে গেছে নিদেন দ্বিদিনের তরে। আমার পাশের সীটে একটি চার-পাঁচ বছরের ছোট মেয়ে। তার পরের সীটে এক বর্ষীয়সী—বাচ্চাটার ঠাকুরমা দ্বিদিমার বয়সী। তার দিকে ফুঁকে শব্দধলুম, “মাদাম, বেজেছে কটা, প্রীজ?” মাদামের উল্কাখুন্স্কা চুল, সকালবেলার ‘ওয়াশ’, মূখের চুনকাম, ঠোঁটের উপর উষার লালবাতি জ্বালানো হয়নি। শব্দকনো মূখে যতখানি পারেন শ্রান হাসি হেসে বললেন, “পারবো, মিসরো, জুন্ পাল পা নেদুস্তানি।” অর্থাৎ তিনি ‘হিন্দুস্থানী’ বলতে পারেন না। ইয়াল্লা। সরলা ফরাসিনী ভেবেছেন, পেনেটা যখন হিন্দুস্থানী, আমি হিন্দুস্থানের কলকাতাতে পেনে উঠেছি, চেহারাও তব্ব, অভাব আমি নিশ্চয়ই হিন্দুস্থানীতে কথা বলেছি। আমি অবশ্য প্রগটি শব্দিয়েছিলাম আমার সবস্বয় সংরক্ষিত অতিশয় নিজস্ব ‘বাঙাল’ ইংরিজীতে। ওঁদিকে এ-তব্বও আমার সবিশেষ বিদিত যে ফরাসীরা নটোরিয়াস একভাষী—ফরাসী ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা শিখতে চায় না। তাদের উহ্য বস্তব্য, তাবল্লোক যখন হিন্দুস্থান হয়ে ক্রাস্বে আসছে, বিশেষ করে কাড়ির দেমাক, বন্দুক-কামানের দেমাক, চন্দ্রজয়ের দেমাকে ফাটো ফাটো মার্কিন জাত এস্টেক প্যারিসে এসে ফরাসীর মত নাজুক জবানু শেখবার ব্যর্থ চেষ্টায় হর-হামেশা হাবুডুব খাচ্ছে তখন ওদের আপন দেশে আপোনে তারা যে কিচির-মিচির করে সেগদুলো শেখার জন্য খামোখা উত্তম ফরাসী ওয়াইনে সন্নির্মিত নেশাটি চটাবে কেন? তব্ব মহিলাটির উক্তি শব্দে আমরা দ্বিৎ ন্যাজ মোটা হল। দ্বর-দ্বনিয়ার ভারতীয় পেনে সার্ভিস না থাকলে মহিলাটি কি করপনাও করতে পারতেন যে হিন্দুস্থানীও আন্তর্জাতিক ভাষা হতে চলেছে—খলিফে মূসাফির যে-রকম এয়ার ক্রাস্বে ফরাসী, কে এল এমে ডাচ্, বি ও এ সি-তে ইংরিজীর জন্য তৈরী থাকে।

তখন পুনরাপি আপন ঔন অরিজিনাল ফরাসীতে প্রগটির পুনরাবৃত্তি করলুম। “আ—আ! বুকোছি, বুকোছি। কিন্তু এই সময়-সমস্যাটি ভারি ‘কম্প্লিক’ অর্থাৎ কম্প্লিকেটিভ, জটিল। আমি ওটা নিয়ে মাথা ঘামাই নে।”

“তব্ব?”

“সব বেশ তো আর একটাইম মেনে চলে না। ভোয়াল্লা!—নয় কি? প্যারিসে যখন বেলা বায়েটা তখন রেজুনে—আমি সেখানে বাস করি—বিকেল পাঁচটা-ছটা। কিন্তু আপনাকে ক্ষের বলাছি, ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনো লাভ নেই। আমি টাইম কত জেনে বাই আমার অতিশয় বিশ্বাসী মিনিস্‌ব্র্যা লেভেঁয়রর’কে (হোম সেক্রেটারি, অর্থাৎ ভিতরকার ‘ইন্টেরিয়ের’ ‘এ’ভেরিয়র’কে) শব্দিয়ে।

সোজা কথার পেটটিকে। ওখানে যখন লামাসে ইয়েজ সঙ্গীত (বাঙলার 'পেটে যখন হলধরন') বেজে ওঠে তখন সেটা লাগের বা ডিনারের সময়। উপস্থিত আমার 'এভেরিগেরেতে' সে-সঙ্গীত ক্রেসেডতে (তার সপ্তকের পঞ্চমে)। তাই এখন রেকর্ডনে নিশ্চয়ই কেঁদুটা-বুদুটা।"

আমি সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের বললুম, "তা এখনই বোধ হয় লাগে হবে।"

মাদাম যদিও বলেছেন তিনি টাইম নিয়ে মাথা ঘামান না, কিন্তু দেখলুম তার প্র্যাকটিকাল দিকটা খাসা বোঝেন। আপত্তি জানিয়ে বললেন, "রেকর্ডনে যখন লাগে তখন এই মিরোপাতে (মিৎ=মিডল্ ;—রোপা, ইয়োরোপা-য় শেষাংশ অর্থাৎ মধ্য-ইয়োরোপে) ব্রেকফাস্ট। জাপানে যারা এ প্রেনে উঠেছে তাদের তো এখন ডিনারের সময় হয় হয়। সুতরাং কোন্‌ দ্বন্দ্বী কোথায় উঠেছে, কার পেট কখন ব্রেকফাস্ট/লাগে/ডিনারের জন্য কামাকাটি শুরু করে সে-হিসেব রেখে তো আর কোম্পানি ঘড়িঘড়ি কাউকে লাগে, কাউকে সাপার, কাউকে স্যানউইচসহ বিকেলের চা দিতে পারে না। তবে কিনা, এরা ব্রেকফাস্টে যে পরিমাণ খেতে বেশ সেটা কলেবরে প্রায় লাগের সমান। তাই বলছি, এসব টাইমফাইম নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। ট্রেনেও যদি ঘড়ি ঘড়ি ঘড়িটার দিকে তাকান তবে সে-জর্ন' দীর্ঘতর মনে হয় না? আমি তো প্যারিসে পৌঁছতে পারলে বাঁচ। 'ব' দিয়ে' (দেখলুম স্বর) খস্টা দেড়েকের ভিতর পৌঁছিয়ে দেবেন। নাতনীটা নীতিয়ে গিয়েছে।"

মহিলাটি যে-ভাবে সবিস্তর গুঁছিয়ে বললেন সেটা ধোপে টে'কে কি না বলতে পারবো না, কারণ আমি যতবার এসেছি গিয়েছি, আহারাধি পেয়েছি, তখন ঘড়ি মিলিয়ে দেখি নি কোন্‌টি লাগে কোন্‌টা কি? এবং আজকের দিনে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন টাইমের সালংকার সটীক ফির্গারিত দেবার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে করি নে। ব্রিডমো গ্রানজিস্টারের কল্যাণে এখন বাড়ির খুঁকু-মাণি পর্বস্ত জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দেয়, বদ্বিগ্নে বলে গ্রানচ মীন টাইম, ব্রিটিশ সামার টাইম, সেন্সরাল ইয়োরোপীয়ান টাইম, কোন্‌টা কি? তবু যে এতখানি লিখলুম, তার কারণ ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন টাইম যে কি ভাবে কসরৎ বিন্ মেহমৎ আয়ত্ত করতে হয় সেটা ফরাসী মহিলাটি আমাকে শিখিয়ে ছিলেন অতি প্র্যাকটিকাল পদ্ধতিতে। সেটা কি? রাজা সলমন যেটা গুরুগম্ভীর ভাবে, ধর্মনীতি হিসেবে আগুবাচারুপে হাজার তিনেক বছর পদবে' প্রকাশ করে গিয়েছেন—'নো দাইসেলফ্' 'নিজেকে চেনো (চিনতে শেখো)'! শ'বছর আগে লালন ফকিরও বলেছেন, 'আপন চিনলে খুঁদা চেনা যায়।' ফরাসী মহিলাটিও সেই তত্ত্বটাই, অতিশয় সরল ভাষায় প্রকাশ করলেন 'আপন পেটটিকে বিশ্বাস করো। তার থেকেই লোকাল টাইম, স্ট্যান্ডার্ড টাইম, সব টাইম জানা হয়ে যাবে। ঐটেই মোক্ষমতম ক্রনোমিটার। বরঞ্চ ক্রনোমিটার মাঝে-মাঝে বিগড়োয়। আলবৎ, পেটও বিগড়োয়। কিন্তু বিগড়নো অবস্থাতেও সে লাগে ডিনারের সময়টায় নিগেটিভ খবর দিয়ে জানিয়ে দেয়, তার ক্ষিধে নেই।

ইতিমধ্যে ব্রেকফাস্ট না কি যেন এসে গেছে। মাদাম বলছিলেন, "সেটা কলেবর" আমি মনে মনে বললুম "বন্দ"। এ্যাযড়া বড়া ভাজা, সসিজ,

পর্বতপ্রমাণ ম্যাশ্‌ট্‌ পটাটো, টোস্ট-মাখম, মাম'লেড্‌, টমাটো ইত্যাদি কাঁচা জিনিস, আরো যেন কি কি। তখন ঘোঁষ, বেশ খাচ্ছি। অতএব পেটের ক্রনোমিটার বলছে এটা কলকাতার লাগু, অর্থাৎ বেলা একটা-দুটো। যদি মিথ্যেবাদী, বলছে ন'টা !

৩

অজগাইয়া যে রকম ওয়াকিফ হবার চেষ্টা না দিয়েই ধরে নেয় দিল্লী মেলও তার খেধুখেড়ে গোবিন্দপুত্র ক্যাগ ইস্‌টিশানে দাঁড়াবে এবং চেপে বসে নিশ্চিন্দ মনে তামুক টানে, আমার বেলাও হয়েছিল তাই। আমার অপরাধ আরো বেশী। আমি জেনেশুনেই অপকর্মটি করেছিলুম। আমি ভালো করেই জানতুম, যে প্লেনে যাচ্ছি সেটা যদিও জর্ম'নির উপর দিয়ে উড়ে যাবে, তবু সে দেশের কোনো জায়গায় ধানাপানির জন্যও নামবে না। অবশ্য এয়ার-ইন্ডিয়ায় মদ্রাসবী আমার এক গাল হেসে আমায় বলেছিলেন, “এ প্লেনটা কিন্তু প্যারিসে নামে। আপনি সেখানে চলে যান।” মদ্রাসবীন ফ্রুটি'ফ্রুটি' করে চলে যাবেন জর্ম'নি। খর্চা একই। আর প্যারিস—হে'হে'হে'হে'—” সঙ্গে যে মিঠটি ছিলেন তিনিও মদ্রাসবী হেসে সায় দিলেন। মদ্রাসবীনই বয়স এই তিরিশ-পঁয়ত্রিশ। মনে মনে বললুম, ক্লাব কাবারে তার চেয়ে বেশী আর কি ভৌতিকবাজি দেখাবে? তবুপরি বানপ্রস্থে যাবার বয়সও আমার বহুকাল হল তামাদি হয়ে গিয়েছে। এ বয়সে ‘নির্বাণদীপে কিম্বদ্বৈতলদান?’ তাই আখেরে স্থির হল আমি এয়ার-ইন্ডিয়া প্লেন থেকে সুইটজারলেণ্ডের জুরিচে (স্থানীয় ভাষায়ৎসুরিখ্‌) নামবো। হোথায় চেষ্টা করে ভিন্ন প্লেনে মৌকামে পৌঁছব—অর্থাৎ জর্ম'নির কলোন শহরে। তাই সই। ফরাসিনীকে বিস্তর ব' ডোয়াইয়াজ (গুড জর্নি, গুড ক্লাইট) বলে জুরিচের এয়ার পোর্টে নেমে পাসপোর্ট দেখালুম। তারপর গেলুম খবর নিতে কলোনে যাবার প্লেন কখন পাবো। উত্তরে শুনে আমি স্তম্ভ, জড়। দেশে বলে,

“অল্প শোকে কাতর।

অধিক শোকে পাথর।”

তখন বেজেছে সকাল ন'টা। রামপটক বলে কি না, কলোন যাবার প্লেন বিপ্রহরে। বিগলিতার্থ আমাকে নিরেট তিনটি ঘণ্টা এখানে বসে বসে আঙুল চুষতে হবে।

শুনোঁছি, ষে-রুগী দশ বৎসর ধরে পক্ষাঘাতে অসাড় অবশ সে নারিক মৃত্যুর সময় অকস্মাৎ বিকট মূখভঙ্গি করে, তার সর্বাত্ম খিঁচোতে থাকে, হঠাৎ দশ বৎসরের টান-টান-হাঁটু যেন ইলেক্ট্রিক শক খেয়ে খাড়া হয়ে থুতনির দিকে গোস্‌তা মারতে চায় এবং মূখ দিয়ে অনর্গল কথা বেরোতে থাকে।

আমার হল তাই। আমি হয়ে গিয়েছিলুম অচল অসাড়। ‘স্তম্ভিত’ বললুম না, কারণ আজকের দিনের পরলা নম্বরী এয়ার পোর্টে স্তম্ভ জার্বী থাকে-

না। যাই হোক যাই থাক, আমার মদ্য দিয়ে বেরুতে লাগল আতশবাজির ঝটকা, তুবড়ির পর তুবড়ির হিংস্র হিস্ হিস্ আর পটকা, বোমার দুশ্বাড বোম্ বোম্। আর হব্বেই বা না কেন? যে জুরিচের কাউন্টারের সামনে ঘাঁড়িয়ে কর্ণপট্টবিহারক তথা নগ্ননাশ্চকারক আতশবাজি ছাড়ছি সেই আতশবাজিকেই আপন জন্মনি ভাষায় বলে 'বেঙ্গালিশে বেলোয়েষ্টু' অর্থাৎ 'বেঙ্গল রোশনী'; এবং এ-দেশের ফরাসী অংশে বলে 'ফা দ্য বাঙাল' অর্থাৎ 'ফায়ার অব বেঙ্গল'।^১ তদুপরি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, ফরাসী ভাষায় বঙ্গদেশকে 'বাঙাল' রূপে উচ্চারণ করে। আমি বাঙাল বঙ্গসন্তান। আমি আমার 'জন্মনি, জন্মনি' অধিকার অর্থাৎ বার্থরাইট ছাড়বো কেন? ফায়ার ওয়াক'ম চালাবার যদি কারো হক থাকে তবে সে আমার। হুহুকার ছাড়লুম :

কি বললে? ঝাড়া তিনটি ঘণ্টা আমাকে এই এয়ার পর্টে বসে কলোনের প্লেনের জন্য তাঞ্জিম-মার্জিম করতে হবে? আমার দেশ যে-ভারতবর্ষকে তোমরা অন্ডয় ডিভাল্যাপ্টে করিষ্ট—সাদামাটা ভাষায় অসভ্য দেশ—বলো সেখানেও তো তিন-তিনটি ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় না, কনেকশনের জন্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি রেলগাড়ির কথাই বলছি। আমি যদি আজ ভারতের যে-কোনো ডাকগাড়িতে করে যে-কোনো জংশনে পৌঁছাই তবে আধ ঘণ্টার ভিতর কনেকশন পেয়ে যাই। না পেলে—সেটাও সাতিশয় কালে-কস্মিনে—খবরের কাগজে জোর চেম্বাচেল্লি করি (মনে মনে বললুম—অস্বদেশীয় রেলের কর্তারা তার থোড়াই কেয়ার করেন), এ্যারোপ্লেনের তো কথাই নেই। সে তো আরো তীড়ঘাড়ি কনেকশন দেয়। আমাকে ষত তাড়াহুড়ো করে মোকামে পৌঁছে দিতে পারে, ততই তার লাভ। অনাথ অন্য প্যাসেঞ্জারের সেবার্থে যেতে পারলে তার আরো দু'পয়সা হয়।...অ! তোমাদের বিস্তর ধনদৌলৎ হয়ে গিয়েছে বলে তোমরা আর পয়স কামাতে চাও না? আর শোনো, রাবার, এ তো হল ট্রেন প্লেনের কাহিনী। গোরুর গাড়ির নাম শুনেন? বুলক কার্ট? সেই গোরুর গাড়িতে করে যদি আমি দশ-বিশ মাইল যাই তবে সেখানে পৌঁছেও সঙ্গে সঙ্গে কনেকশন পাই। বোলপুর থেকে ইলামবাজার গিয়ে নদীর ওপারে তম্বুডেই অন্য গোরুর গাড়ির কনেকশন হামেহাল তৈরী। বস্তুত তখন ওপারের গাড়োয়ানরা গাহককে পাকড়াও করার জন্য যা হৈ-হুজুড় লাগায় তার সামনে আশ্চর্যাত্মক পাণ্ডা

১ আমার এক সদুপাশ্চিত মিশ্র বহু গবেষণার পর স্থির করেছেন : এদেশে গুড় তৈরী হত বলে এর নাম গোড় (এবং গুড় থেকে 'রাম' মদ তৈরী হত বলে তার নাম গোড়ী—মহাভারতেও এর উল্লেখ আছে—যেমন মধু থেকে মাধবী মদ)। এবং এই গুড় সর্বপ্রথম চীনদেশে রিফাইনড হয়েছিল বলে এর নাম চিনি (পরে মিশরে তৈরী চিনির নাম হল মিসুরি বা মিস্ত্রী)। তাঁর মতে বারুদ প্রথম আবিষ্কৃত হয় বাঙলা দেশে—আতশবাজীর জন্য। চীনদেশে সেটা সর্বপ্রথম আগ্নেয়াস্ত্রে ব্যবহৃত হয় বলে চীনদেশকে বারুদের আবিষ্কারক বলা হয়—এবং সেটা ভুল।

সৈয়দ মজুতবা আলী রচনাবলী (৭ম)—২৪

প্রতিষ্ঠানের জেরুজালেম-পাণ্ডারা পর্বস্তু নতমস্তক হন। এ-নিম্নে আমি অষ্টাবশ পর্ব মহাভারত—খুঁড়ি, পাঁচখানা ইলিয়াড দশখানা ফাউস্টে লিখতে পারি। কিন্তু উপস্থিত সেটা স্থগিত থাক। আমার শেষ কথা এইবারে শুনে নাও। এই যে আমি কণ্টিনেন্টে এসেছি তার রিটার্ন টিকিটের জন্য কত খেঁজিছি জানো? এক-একটা টাকা যেন নাক ফুটো করে করে বেরিয়েছে—তোমরা যাকে বলো, পেইং থ্রু দি নোজ্। রোস্কা ছ'হাজার পাঁচশটি টাকা। তারপর ফরেন এক্সচেঞ্জ্ গয়রহ হিসেবে নিলে দাঁড়ায় প্রায় সাড়ে সাত হাজারের মত। এ ভুখণ্ডে থাকবো মাত্র তিনটি মাস। এইবারে হিসেব করো তো বসে, তবে বুঝি তোমার পেটে কত এলেম, এই যে কনেকশনের জন্য আমার তিনটি ঘণ্টা বরবাদ করলে তার মূল্যটা কি? সে না হয় গেল। কিন্তু সে-সময়টা যে বশ্বদ্বাশ্ববীর সামিধ্য থেকে বঞ্চিত করলে তার জন্য তোমার স্বয়ংবনে কোনো সম্ভাবনাল প্রজ্জলিত হচ্ছে না? তাহা—”

ইতিমধ্যে আমার চতুর্দিকে একটা মিনি মাক্সিসর মধ্যস্থানের মিড সাইজের ভিড় জমে গিয়েছে। ক্রী এনটারটেনমেন্ট। আমার সোক্রোতেস-পারা, কিংবা দ্রৌপদী যে-রকম রাজসভায় আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিলেন সেই ধরনের যুক্তিঞ্জাল বিস্তার এদের হৃদয়-মনে যেন মলয়বাতাসের হিঞ্জোল, দে দোল দোল খেলিয়ে গেল। এদের বেশীর ভাগই আমার বেদনাটা সহানুভূতি সহ প্রকাশ করছে। “গ্যা গ্যা”, “উই উই”, “সি সি” যাবতীয় ভাষায় আমাকে মিডিসমর্থন জানাচ্ছে। আমি ফের তেড়ে এগুতে যাচ্ছি এমন সময়—

এমন সময় সর্বনাশ! একটি কুড়ি-একুশ বয়সের কিশোরী, আমি যাকে কেচে-মুছে ইন্সি মেরে ভাঁজ করে পকেটে ঢোকাতে যাচ্ছি, কাউটারের পিছনের কুঠার থেকে বেরিয়ে এসে তাকে বললে, “আপনার টেলিফোন।” তৎমুহূর্তেই সেই মহাপ্রভু তিলবাজ না করে, যেন সসেমিরে দে ছুট দে ছুট। লোকটা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের “আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে” গানটি জানে।

কিশোরী এক গাল হেসে আমাকে শূধোলে, “আপনার জন্য কি করতে পারি, সার?”

দুস্তোর ছাই! আধ-ফোটা এই চিংড়ির সঙ্গে কি লড়াই দেব আমি?

“নাথিং বাট্ ইয়োর লভ্।” বলে দম্-দম্ করে লাউজের সুদূরতম প্রান্তে আসন নিলুম।

সোফাটা মোলায়েম। সামনে ছোট্ট একটি টেবিল।

বেজার মূখে বসে আছি। এমন সময় দোঁখ একজন বয়স্ক ভদ্রলোক দূ'হাতে দুটি ভর্তি ওয়াইনগ্রাস নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঠিক যতখানি নিচু হয়ে অপরিচিত জনকে বাও করাটা কেতাদুরস্ত তাই করে শূধোলেন, “ভূ পেরমেতে, মিসমো”—অর্থাৎ “আপনার অনুমতি আছে, সার?” “নিশ্চয়, নিশ্চয়।” যদিও সোফাটির যা সাইজ তাতে পাঁচজন কিংকং অনারাসে বসতে পারে তবু ভদ্রতা দেখাবার জন্য ইন্সটাক সরে বসলুম। ভদ্রলোক ফের কান্ধা-

মাফিক বললেন “ন ভু বেরাঁজে পা, জ ভু প্রী”। এর বাঙলা অনুবাদ ঠিক কি হবে, অতখানি ফরাসী জানি নে, বাঙলাও না। মোটামুটি “না, না, ব্যস্ত হবেন না। ঠিক আছে, ঠিক আছে।” উদ্ভূত বরণ খানিকটে বলা যায় তকল্পদ্বয় ন কীজীয়ে” এই ধরনের কিছু একটা। ‘তকল্পদ্বয়’ কথাটা ‘তকল্লীফ’ (বাঙলায় কিছুটা চালু) অর্থাৎ ‘কষ্ট’! মোম্বাঃ “আপনাকে কোনো কষ্ট দিতে চাইনে।”

সেই দুটো গ্রাস টেবিলে রেখে একটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আরেকটা নিজে তুলে নিয়ে বললেন, “আপনার স্বাস্থ্যের মঙ্গলের জন্য।”

চেনাশোনা কিছুই নেই। খোদার খামোখা এ-লোকটা জ্বিৎক দিচ্ছে কেন? তবে কি লোকটা কনফিডেন্স ট্রিকস্টার? আমাদের হাওড়া শ্যালদাতে যার অভাব নেই! ভাবসাব (কনফিডেন্স) জমিয়ে বলবে, “দাদা, তা হলে আপনি টিকিট ধুটো কিনে আনুন। এই নিন আমার লিলুয়ার পরমা, আমি মালাগদুলো সামলাই।”...টিকিট কেটে ফিরে এসে দেখলেন, ভৌ ভৌ। আপনার মালপত্র হাওয়া।

কিন্তু এ-লোকটা আমার নেবে কি? সুকুমার রায় (?) একদা একাটি ব্যক্তিগত আঁকেন। বিরাট ভূঁড়িওলা জমিদার টিঙটিঙে দারওয়ানকে শাসিয়ে শূধোচ্ছেন, “চোর ভাগা কি’ও?” দারওয়ান বললে “মেরা এক হাতমে তলওয়ার দুসরেমে ঢাল। পকড়ে কেসে?”—আমার এক হাতে তলওয়ার, অন্য হাতে ঢাল। ধরি কি করে?

আমার এক পাশে আমার মিত্রের দেওয়া এটাচি, অন্যদিকে এ্যার ইন্ডিয়ার দেওয়া ছোট্ট একটি বাক্সো। দুটোই তো বগলদাবা করে বসে আছি। লোকটাকে দেখে তো মনেও হচ্ছে না, ও স্বর্গাত পি সি সরকার (এ স্থলে বলে রাখা ভালো সরকার কখনো এহেন অপকর্ম করতেন না) যে আমার দুটি বাস্তব সিরিয়ে ফেলবে। এবং সব চেয়ে বড় কথা, এ-রকম রুচিসম্মত পোশাক-আশাক আমি একমাত্র ডিউক অব উইন্ডসরকে (উচ্চারণ নাকি উইনজার) পরতে দেখেছি জীবনে একবার। ডিউকের জীবনে একবার নয়, আমার জীবনে একবার। সে বেশের বর্ণনা অন্যত্র দেব।

একখানা কার্ড এগিয়ে দিলেন। তার নাম আন্দ্রে দুমপোঁ। তারপর এক গাল হেসে শূধোলেন, “যদি অপরাধ না নেন তবে একটি প্রশ্ন শূধোই, আপনি কি কস্টিঙে বিশেষজ্ঞ?”

আমি থতমত খেয়ে শূধোলুম, “কস্টিঙ? সে আবার কি?”

ভুললোক আরো থতমত খেয়ে কিন্তু চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, “সে কি মশাই! এই মাত্র আপনার অনবদ্য লেকচারটি শুনলুম, আপনি ক’ হাজার টাকা ঝেড়ে কলকাতা থেকে এ-দেশে আসার রিটার্ন টিকিট কেটেছেন, এবং কনেকশন না পেয়ে তিন ঘণ্টাতে আপনার কি পরিমাণ অর্থক্ষয় হল তার পদ্যোপাঙ্ক, করেক্ট টু দি লাস্ট সীতিম, ব্যালানস শীট। একেই তো বলে কস্টিঙ। আমি ব্যবসাবাণিজ্য করি। এই নিয়ে নিত্য নিত্য আমার ভাবনা

চিন্তার অন্ত নেই। কিন্তু সে কথা থাক। আমি আপনার কাছে এসেছি একটি প্রস্তাব নিয়ে। আপনার স্বখন তিন ঘণ্টা বরবাদ যাচ্ছে তখন এক কাজ করুন না! মিনিট পনেরো পরে এখান থেকে একটা প্লেন যাচ্ছে জিনীভা : আমি সে প্লেনে যাচ্ছি। আপনি চলুন আমার সঙ্গে জিনীভায়। আমার সামান্য একটি বাড়ি আছে সেখানে। আপনার খুব একটা অসুবিধে হবে না। বেডরুম, বাথরুম, ডাইনিংরুম, স্টাডি সব নিজস্ব পাবেন। (আমি মনে মনে মনকে শূদ্ধালাম, একেই কি বলে ‘সামান্য একটি বাড়ি’?) আমাদের সঙ্গে আহালাদি, দু’দু’ রসলাপ করে জিরিয়ে জুরিয়ে নেবেন। তারপর আপনাকে আপনার মোকাম, কলোনগামী প্লেনে তুলে দেব।” তারপর একটু ইতিভীতি করে বললেন, “কিছু মনে করবেন না। আমি এ-প্রস্তাবটা নিজের স্বার্থেই পাড়ছি। আমার একটি ছেলে আর দু’টি মেয়ে। যোল, চোদ্দ, দশ। আপনার সঙ্গে আলাপচারী করে তারা সত্যি উপকৃত হবে। এদেশে চট করে একজন ইন্ডিয়ান পাওয়া যায় না। পেলেও তিনি ফরাসী জানেন না। আর আমার বীবী খাসা রাঁধতে পারেন—”

আমি বাধা দিয়ে বললুম, “কিন্তু এই দশ মিনিটের ভিতর আপনি আমার জন্য জিনীভার টিকিট পাবেন কি করে?”

মসিয়ো দ্যুপোঁ মুচকি হেসে বললেন, “সেই ফরমুলা, ন ভু দেৱাজে পা’— আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। এটা ওটা ম্যানেজ করার কিণ্ডিং এলেম আমার পেটে আছে; নইলে ব্যবসা করি কি করে! কাচ্চা-বাচ্চারা বড় আনন্দ পাবে। প্লেনের ভাড়াটার কথা আপনি মোটেই চিন্তা করবেন না—”

আমি ফের বাধা দিয়ে বললুম, “আপনি ও-বাবদে চিন্তা করবেন না। এ্যার-ইন্ডয়ার আমার টিকিটটি অর্মানবাস, অর্থাৎ যেখানে খুশী সেখানেই যেতে পারি; তার জন্য আমাকে ফালতো কাড়ি ঢালতে হবে না।” (পাঠক, এ ধরনের মোটর অর্মানবাসকে কার্বগদরু নাম দিয়েছেন বিশ্বব্ধহ। এবং তদীয় অগ্রজ হিজেন্দ্রনাথ মোটর গাড়ি, অটমবিলকে, যেটা আপন শক্তিতে চলে, তার নাম দিয়েছিলেন স্বতঃচলকট। অতএব এ স্থলে আমার যানবাহন প্লেনের টিকিটকে ‘স্বতঃচল বিশ্বব্ধহ মূল্য পত্রিকা’ অনায়াসে বলা যেতে পারে।)

একটু থেকে বললুম, ‘আমি এখন্দুনি আসছি।’ অর্থাৎ যে-স্থলে যাচ্ছি, যেখানে রাজাধিরাজও ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারেন না, অর্থাৎ শৌচাগার।

সেদিকে যাইনি। যাচ্ছিলুম অন্য পথে। এ্যাটাঁচি বাক্সো সোফাতেই রেখে এসেছি। এরকম সহস্রয় সঞ্জনকে বিশ্বাস করে আমি বরঞ্চ ও দুটো হারাবো, অবিশ্বাস করতে ঘেন্না ধরে। গেলুম ‘বার’-এ। সেখানে মসিয়ো যে ওয়াইন এনেছিলেন তারই দু’গ্রাশ কিনে ফিরে এলুম সোফায়। একটা গ্রাস তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে তাঁর স্বাস্থ্য কামনা করে বললুম, “আপনার আর্থরিক আমন্তণের জন্য আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমার একটা বড়ই অসুবিধে আছে। কলোন এ্যারপোর্টে আমার বন্ধুবান্ধবরা অপেক্ষা করছে। তারা খবর নিয়ে নিশ্চয়ই বড় গিয়েছে, আমি তিন ঘণ্টা পরে কনেকশন পাবো। আমি আপনার সঙ্গে জিনীভা-গেলে দেরি হয়ে যাবে। তারা বড় দুঃখিতাগ্রস্ত হবে।”

আর মনে মনে ভাবছি, ইহ সংসারে, এমনকি ইয়োরোপেও, সেই বাগদাদেবর আব্দ হোসেনও আছে যারা রাস্তায় অতিথির সম্মানে দাঁড়িয়ে থাকে। সে একা খেতে পারে না।

মসিয়ো বড্ডই দৃষ্টিত হয়ে প্রথম বললেন, “কিন্তু আপনি আবার আমার জন্যে জ্বিৎক আনলেন কেন? এ কি দেনা-পাওনা!”

আমি মাথা নিচু করলুম। দ্যুপৌ বললেন, “তা হলে বেশে ফিরে যাবার সময়ে আমার ওখানে আসবেন?”

তারপর একটি পকেট-বই বের করে বললেন, “কিছু একটা লিখে দিন। ছেলেমেয়েরা খুশী হবে।” আমি তৎক্ষণাৎ লিখলুম:

“কত অজানারে জানাইলে তুমি

কত ঘরে দিলে ঠাই

দুরকে করিলে নিকট বন্ধু,

পরকে করিলে ভাই।”

হায়! ফেরার পথেও দ্যুপৌর বাড়িতে যেতে পারি নি।

৪

জুদ্রিকের মত বিরাট এয়ারপোর্টে কী করে মানুষ একে অন্যকে খুঁজে পায় সেটা বোঝবার চেষ্টা করে ফেল মেরেছি। তাহলে নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে এখানকার কর্মচারীদের পেটেপটে এলম আছে। তাদেরই একজন আমার সামনে এসে বললে, “আপনার জন্যে একটা মেসেজ আছে, স্যার।” আমি সত্যিই বিস্মিত হলুম। আমাকে এই সাহারা ভূমিতে চেনে কে? বললুম, “ভুল করেন নি তো?” “এস্কে না। আমি জানি।” সঙ্গে সঙ্গে ছোকরা আমার পুরো নামটি বলে দিল। যদিও সে এদেশেরই লোক তবু আমার মনে হল সে ‘দেশ’ পরিষ্কার ‘পণ্ডিত’ নিত্য সপ্তাহে পড়ে এবং তারই মারফত আমার তোলা নামটি পুরো পাক্ষা রপতো করে নিয়েছে। হয়তো ডাকনামটাও জানে। হয়তো ‘ভোম্বল’ ‘কাবলা’ জাতীয় আমার সেই বিদ্যকুটে ডাকনামটা যে পাণ্ডজন্য শঙ্খধ্বনিতে প্রকাশ করতে চায় না কিন্তু এসব ভাববার চেয়ে ঢের বেশী জানতে চাই, কে আমাকে স্মরণ করলেন!

অ। ফ্লাইন ফ্রিড বাওমান! কিন্তু ইনি জানলেন কি প্রকারে যে আমি আজ সকালে এখানে পৌঁচি? তাঁর মেসেজ খুলে জিনিসটে পরিষ্কার হল। কলকাতা ছাড়ার পূর্বে এয়ার ইন্ডিয়ায় ইয়াররা শূন্য হয়েছিলেন, জুদ্রিকে আমার কোনো পরিচিতজন আছেন কিনা, কেননা ওখানে আমাকে কনকশনের জন্যে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। খবর পাঠালে ওঁরা হয়তো এয়ারপোর্টে এসে আমাকে স্বাগত দিবেন। আমি উত্তরে বলিচ্ছিলুম, জুদ্রিকে নেই, তবে সেখান থেকে ট্রিশ-চাঁদ্রশ মাইল দূরে লুৎসেন শহরে একটি পরিচিতা মহিলা আছেন এবং

তার নামঠিকানা দিয়েছিলুম। এ কথাটা ভুলে গিয়েছিলুম বেবাক। “দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি” “গাড়ের পাটালি; কিছু খুনো নারিকেল; দুই ভাণ্ড সরিষার তেল; আমসস আমচুর—” এর মাঝখানে কবিগুরু যদি তাঁর প্রিয় কন্যাকে ভুলে যান তবে সাতাশটা হাবিজাবির মাঝখানে আমি যে এটা মনে রাখি নি তার জন্য সদয় পাঠক রাগত হবেন না।

কিন্তু এই সুবাদে সেই খাঁটি জাত সুইস মহিলাটির সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করে দিতে চাই। ফ্রিডি বাণ্ডমান। ১৯৪২/৪৩-এ ইনি সেই মহারাজা সন্ন্যাসী রাণের বরোদা প্রাসাদে প্রবেশ করেন। আজকের দিনে ক্রিকেট কিংবা/এবং পলিটিকসের সঙ্গে যাদেরই সামান্যতম পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন বরোদার শ্রীযুত ফতেহ সিংরাও গায়কোয়াড়কে। এই ফ্রিডির হাতেই তিনি পৃথিবীতে পদার্পণ করেন। অথবা মস্তকাবতীর্ণ করেন। কিন্তু তার উপর আমি ‘জোর’ দিচ্ছি নে। রাজা মহারাজা ভিখারি আতুর পৃথিবীতে সবাই নামেন একই পৃথিবীতে।

আসল কথা, ফতেহ সিং রাও মানুষ হন ফ্রিডির হাতে। তিনি অসাধারণ শিক্ষিতা রমণী—সেই ছাব্বিশ বছর বয়সেই। জর্ম্মান, ফরাসী, স্প্যানিশ, ইংরাজী সব কটাই বড় সুন্দর জানতেন। এ-দেশে এসেছিলেন বেকারীর জন্য নয়। রোমান্টিক স্বপ্নঃ ইণ্ডিয়াটা দেখতে চেয়েছিলেন। গ্যোটে তাঁর প্রিয় কবি। গ্যোটে’র ভারতপূজা তাঁর মনে গভীর দাগ কেটেছিল। ওদিকে তাঁর উত্তম উত্তম পুস্তক পড়ার অভ্যাস চিরকালের। রাজপ্রাসাদের কাজকর্মও গুরুভার নয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি যে কি করে তাঁর প্রিয়সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বাণীর মর্ম্মস্থলে পেঁঁছে গেলেন সেটা বুলুলাম যেদিন তিনি আমাকে বললেন যে ছেলেবেলা থেকেই তিনি সেন্ট ফ্রানসিস আর্সিসির ভক্ত। এবং সকলেই জানেন, এই সমষ্টির সঙ্গেই ভারতীয় শ্রমণ, সম্মাসী, সাধুসন্তের সব চেয়ে বেশী সাদৃশ্য। একদিকে যেমন দরদ্রনারায়ণের সেবা, অন্যদিকে ঠিক তেমনি পরমাশ্রয় ধ্যানে মগ্ন হয়ে প্রভু খৃষ্টের সঙ্গে একাত্ম বোধ করতে তিনি এদেশের মরমীয়া সাধক, ইরাণ-আরব-ভারতের সুফীদের সঙ্গে এমনই হরিহরআত্মা যে অনেক সময় বোঝা কঠিন কার জীবনবৃত্তান্ত পড়ছি। খৃষ্টানের, ভক্তের না সুফীর?

কিন্তু আমার কী প্রগলভতা যে আমি তাঁর জীবনীর সংক্ষিপ্ততম ইতিহাসও লিখতে পারি! ‘দেশ’ পত্রিকার প্রিয়তম লেখক শ্রীযুত ফাদার দ্যাতিয়েন যদি বাঙলায় তাঁর জীবনী লেখেন তবে গোড়জন তাহা আনন্দে করবে পান সুধা নিরবধি।

*

*

*

কুমারী ফ্রিডীর কথা পুনরায় লিখব। কনটিনেন্ট সেরে, দেশে ফেরার পথে, লুৎসেনে শ্রীমতীর বাড়িতে সপ্তাহাধিককাল ছিলুম—সেই সুবাদে। উপস্থিত ফ্রিডি লিখেছেন, তিনি আমার (এয়ার-ইণ্ডিয়া মারফত) টেলেক্স পেলেন কাল রাত্রে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জুঁরিকের এয়ারপোর্টে ট্রাঙ্ক-কল করে জানালেন, আমি জুঁরিকে নেবেই যেন তাঁকে ট্রাঙ্ককল করি। বরাবর তিনি বাড়িতেই থাকতেন।

মনে হয় কত সোজা। কিন্তু যারা দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াতে চান তাঁদের

উপকারার্থে এম্বুলে কিণ্ডিং নিবেদন করে রাখি।

প্রথমত আপনাকে টেলিফোন বৃথ থেকে ফোন করতে হবে। সে বৃথ আবার সম্ভ্রান্ত। আপন বেশজ খাদ্য ভিন্ন অন্য খাদ্য পান না। অর্থাৎ তাঁর বাক্সে আপনাকে ছাড়তে হবে এদেশের আপন সুইস মদ্রা। অতএব গো-খোঁজা করুন, সে সাহারাতে, কোথায় সে পদ্যভূমি যেখানে আপনার ডলার বা পৌন্ডের বদলে সুইস মদ্রা দেবে। সবাই তো ইংরিজী বোঝে না। ভুল বোঝে অনেকেই। তারা কেউ বলে ঐ তো হোথায়, কেউ বলবে তার জন্য তো শহরে যেতে হবে। শেষটায় পেলেন সেই কাউন্টার পদ্যভূমি—আমি অতি, অতি সংক্ষেপে সারাছি। পেলেন সুইস বস্তু। তখন আবার ভুল করে যেন শব্দ কাগজের নোট না নেন। কারণ ফোন বৃথ কাগজার্থাশা নন; তিনি চান মদ্রা। সেই মদ্রা আবার ঐ সাইজের হওয়া চাই। ঠ্যাঙস ঠ্যাঙস করে চলুন ফের ঐ পদ্যভূমিতে। আরো বহুবিধ ফাঁড়া-গর্দিশ আছে। বাদ দিচ্ছি।

আহ! কী আনন্দ!! কী আনন্দ!!!

“কে বলছেন? আমি ফ্রিডি।”

“আমি সৈয়দ।”

ঐ য়া! ট্রাঙ্ক লাইন কেটে গেল। পাবলিক বৃথ থেকে ট্রাঙ্ক-কল করা এক গম্ভ্যস্তন্য। আমি যে দুটি মদ্রা মেসিনে ফেলে লুৎসেন' পেয়েছিলুম, তার ম্যাদ ফুরিয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আর দুটো না ফেলার দরুন লাইন কাট অফ। ফের ঢালো কড়ি।

অতি অবশ্য সত্য, ফোন যন্ত্রের বাক্সে সুইটজারল্যান্ডে প্রচলিত তিন তিনটি ভাষা—ফরাসী, জার্মান এবং ইতালীয়—লেখা আছে কোন গদ্য সরল পদ্ধতিতে যন্ত্রটি ব্যবহার করতে হয়। লেখা তো অনেক কিছুই থাকে। ধর্মগ্রন্থে তো অনেক কিছুই লেখা থাকে। সেগুলো পড়লেই বুঝি মোক্ষলাভ হয়? জিম-নাস্টিকের কেতাব পড়লেই বুঝি কিছু সিঙ-এর মত মাস্‌ল্‌ গজায়? প্র্যাকটিস করতে হয়। এবং তার জন্য খেসারতিও দিতে হয়। উপযুক্ত গদ্য বিনা যোগাভাস করতে গিয়ে বিস্তর লোক পাগল হয়ে যায়। আমি ইতিমধ্যে প্রায় দেড় টাকার মত খেসারতি দিয়ে “হ্যালো হ্যালো” করছি। আর, এ খেসারতির কোনো আন্তর্জাতিক মূল্য নেই। কারণ জার্মান, ফ্রান্স, ইংলন্ড প্রায় প্রত্যেক দেশই আপন আপন কায়দায় আপন আপন মেসিন চালায়। আর সেখানেই কি শেষ? তিন মাস পরে যখন ফের সুইটজারল্যান্ডে আসবো, তখন দেখব, বাবুদা এ-ব্যবস্থা পালটে দিয়েছেন। নতুন কোন এক আবিষ্কারের ফলে যন্ত্রটির ব্যবহার নাকি ‘সরলতর’ করেছেন। ‘সরলতর’ না কহ! তাই যারা এসব ব্যাপারে ওয়াকিফ-হাল নন, যারা এই হয়তো পল্লাবাবের মত কণ্টিনেন্ট যাচ্ছেন, তাঁদের প্রতি আমার ‘সরলতর’ উপদেশ, বিন্‌গদ্রন্‌ এসব যন্ত্রপাতি ঘ্যাটাতে যাবেন না। অবশ্য গদ্য পাওয়া সবটাই কঠিন; এখানে আরো কঠিন। যে যার ধাম্বা নিয়ে উধর্শ্বাসে হস্তদস্ত। কে আপনাকে নিয়ে যাবে সেই বৃথ-গদ্যহাস, শিথিয়ে দেবে সে-গদ্যহাস নিহিতং ধর্মস্য ভঙ্ঘং।

যাক্ ! ফের পাওয়া গিয়েছে লাইন।

“তুমি লুৎসেনে’ কখন আসছো?”

“অপরাধ নিয়ো না। আমি উপস্থিত যাচ্ছি কলোন। তারপর হামবুর্গ ইত্যাদি। তারপর লন্ডন, নটিংহাম—সেখান থেকে ফেরার পথে লুৎসেন”। তুমি খেঁদিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তোমার বাড়িতে।”

“দ্যাং। কিন্তু তব্বদনে এখানে যে বস্তু শীত জমে যাবে। গরম জামাকাপড় এনেছো তো? মাখ্‌ট্‌ নিষ্‌ট্‌স্‌ (নেভার মাইন্ড—আসে যায় না), আমার কাছে আছে।”

“তুমি এখনো ফ্রান্সিস আসিসারই শিষ্যা রয়ে গিয়েছে—কী করে কাতর জনকে মদ্য করতে হয়, সেই তোমার প্রধান চিন্তা। আমি কি তোমার স্কার্ট ব্লাউজ পরে রাস্তায় বেরবো? সে-কথা থাক্‌। আমাকে এয়ারপোর্টে আরো তিন ঘণ্টাটাক বসে থাকতে হবে। চলে এসো না এখানে। আজ তো রববার। তোমাকে আফিস দফতর করতে হবে না।”

“রববার। সেই তো বিপদ। বাড়ি থেকে যেতে হবে লুৎসেন’ স্টেশন। সেখান থেকে ট্রেনে করে জুরিক। প’ল্লিগিশ মাইল। সেখান থেকে বাস-এ করে তোমার এয়ারপোর্টে। রববার বলে আজ টের কম সাভি’স। সব কটা উঠতি নাবতিতে টায়-টায়, কোথায় পাবো কনেকশন—”

আমি মনে মনে বললুম, হঁ। ফের সেই কনেকশন! ইলামবাজার রাম-পূরহাট ॥

“ফ্রিড বললে, “আচ্ছা দেখি।”

আমি বললুম, “কতকাল তোমাকে দেখি নি।”

*

*

*

ফ্রিড যদি এখানে আসে-ই তবে তার বাস্‌ দাঁড়ায় কোথায়? আমি বসে আছি ট্রানজিট প্যাসেজারের খোঁয়াড়ে। এখানে তো ফ্রিডের প্রবেশ নিষেধ। অবশ্য সে এদেশের রীতিমত সম্মানিতা নাগরিক (সংস্কৃত অর্থে নয়) সিট্‌জেন্‌। কাজেই সে স্পেশাল পারমিট যোগাড় করতে পারবে। তবে সেটা যোগাড় করতে কতক্ষণ লাগবে, কে জানে? আম আনতে দুধ না ফুরিয়ে যায়। ততক্ষণে হয়তো আমার কলোন-গামী প্লেনের সময় হয়ে যাবে।

বাসস্ট্যান্ডে যেতে হলে আমাকে খোঁয়াড় থেকে বেরোতে হয়। কিন্তু আমাকে বেরুতে দেবে কি? খোঁয়াড়ের বাইরেই স্বাধীন, মদুস্ত সুইটজারল্যান্ড। তার জন্য ভিজার প্রয়োজন। আমার সেটা নেই। তবু চেষ্টা করে দেখাই যাক না, কি হয় না হয়। সুকুমার রায় বলেছেন, “উৎসাহে কি না হয়, কি না হয় চেষ্টায়।” সেইটে পড়ে আমার এক সখা ডার্কপিয়নকে বলেছিল, “আমার কোনো চিঠি নেই? কি যে বলছো? ফের খুঁজে দেখো। উৎসাহে কি না হয়, কি না হয় চেষ্টায়।”

খোঁয়াড়ের গেটে গিয়ে সেখানকার উদীপরা তদারকম্বারকে অতিশয় সবিবদন নিবেদন কললুম, “স্যার! আমি কি একটু বাইরে ঐ বাসস্ট্যান্ডে যেতে পারি?”

“আপনি তো ট্রান্সজিট। না?”

আমি সরাসরি উত্তর না দিয়ে বললাম, “বাস্-এ করে লংসেন’ থেকে আমার একটি বাস্ধবী—”

হায় পাঠক, হুমি সেই তদারকদারের প্রতিক্রিয়া যদি তখন দেখতে। “বাস্ধবী! বাস্ধবী!! সেরতেন’মা (সার্টন’লি) চেরংমান’তে (ইতালিয়ানে, সার্টন’লি)” এবং তার পর জর্মনে “জিয়ার জিয়ার” (শিওর, শিওর) এবং সর্বশেষে, যদি না কুল পায়, মার্কিন ভাষায় “শি’য়েরি, শি’য়েী।”

আমি জানতুম, আমি যদি বলতুম, আমার বস্ধু আসছেন, সে বলতো, “নো।” যদি বলতুম আমার বীবী, উত্তর হত তবৎ। যদি বলতুম, বস্ধা মাতা তখনো হত, “না”—হয়তো কিঞ্চৎ ধতমত করে। কিন্তু বাস্ধবী! আমার সাতখন্দ মাক!

৫

কলোনের নাম কে না শুনেছে? বিশেষ করে হেন ফ্যাশনেবল মহিলা আছেন কি যিনি কস্মিনকালেও প্রসাধনার্থে ও-দ্য-কলোন—জর্মনের কার্লনিশ ভাসার—কলনের জল ব্যবহার করেন নি। বিশ্বজোড়া খ্যাতি এই তরল স্গগ্ধটির। ‘৪৭১১’ এবং ‘মারিয়া ফারীনা’ এই দুইটিকেই সব চেয়ে সেরা বলে ধরা হয়। এ-দেশেও কলোন জল তৈরি হয় কিন্তু ওটা বানাতে হলে যে সাত-আট রকমের স্গগ্ধি ফুলের প্রয়োজন, তার কয়েকটি এদেশে পাওয়া যায় না—সর্বোপরি ‘প্রাক প্রণালী’ তো আছেই। বিলেতেও কলোন জলের এতই আদর যে, হিটলারের সঙ্গে দেখা করার জন্য চেম্বারলেন যখন সপরিষদ কলোন থেকে মাইল বিশেক দূরে গোডেসবের্গ-এর মূখোমুখি, রাইন নদীর ওপারে যে বাড়িতে ওঠেন, তার প্রতি ঘরে কলোন জল, কলোন জলের স্গগ্ধ দিয়ে নির্মিত গায়ে মাখার সাবান, বাড়ি কামাবার সাবান, ক্রীম, পাউডার—বস্তুত প্রসাধনের তাবৎ জিনিস—রাখা হয়েছিল হিটলারে আবেশে। চেম্বারলেন এই স্গগ্ধ বিবন্ধ আতিথেয়তা লক্ষ্য করেছিলেন কি না জানি নে। কারণ তখন তাঁর শিরঃপীড়া তাঁর এ-অভিসার তাঁর দেশবাসী কি চোখে দেখবে। তাঁর আপন ফরেন অফিস যে সেটা নেকনজরে দেখছে না, সেটা তিনি জানতেন, কারণ ইতিমধ্যেই তারা একটা প্যারিডি নির্মাণ করে ফেলেছে :

“ইফ অ্যাট ফার্ট’ ইউ কানট সাকসীড

ফ্লাই ফ্লাই ফ্লাই এগেন।”

বলা বাহুল্য, চেম্বারলেন ফ্লাই করে গিয়েছিলেন। আর আমি তো সেই গোডেসবের্গ-এর উপর দিয়ে কলোন-পানে ফ্লাই করে যাচ্ছিই। সেই স্গগ্ধে প্যারিডিট মনে পড়ল।

জর্মনে খ্রিড়ির সঙ্গে মাত্র কুড়ি মিনিট কথা বলার স্গগ্ধোগ পেয়েছিলুম। মনটা খারাপ হয়ে আছে।

কলোন শহরের সঙ্গে আমার চাক্ষুশ বছরের পরিচয়।

এখান থেকে প্রায় চৌদ্দ মাইল দূরে বন। সেখানে প্রথম বোবনে পড়াশুনা করেছিলুম। ট্রামে, বাস-এ, ট্রেনে, জাহাজে করে এখানে আসা অতি সহজ। আমার একাধিক সতীর্থ কলোন থেকে বন ডেলিপ্যাসেন্সারী করতো। তাদের সঙ্গে বিস্তর উইকএন্ড করেছি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শহরটাকে দেখেছি।

সে-সব সবিস্তর লিখতে গেলে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি হবে। আর লিখতে যাবোই বা কেন? জার্মান টুরিস্ট ব্যুরো যদি আমাকে কিণ্ডিং 'ব্রাঙ্কশ-বিদায়' করতো তবে না হয়—

যদি নিতান্তই কিছু বলতে হয়, তবে প্রথম নম্বর সম্বন্ধে বলি যে, সেটি আপনি চান কি না চান, কিছুতেই এড়াতে পারবেন না। কলোনের বিরাট গগনস্পর্শী গির্জা। প্যারিসে যে-রকম যেখানেই যান না কেন, এ্যাফ্যাল টাওয়ারটা এড়াতে পারবেন না, কলোনের এই কেথিড্রেলটির বেলাও তাই। তবে এ্যাফ্যাল স্তম্ভ বদখদ, কিন্তু কলোনের গির্জাচুড়ো তস্বঙ্গী সুন্দরী। যেন মা-ধরণী উর্ধ্বপানে দৃ বাহু বাড়িয়ে পরমেশ্বরকে তাঁর অনন্ত অবিচ্ছিন্ন নমস্কার জানাচ্ছেন।

এ গির্জা আবার আমাদের কাছে নবীন এক গৌরব নিয়ে ধরা দিয়েছে।

বছর দুইদিন পূর্বে কলোনবাসী প্রায় শ' দুই তুর্কী ও অন্যান্য মুসলমান ঐ গির্জার প্রধান বিশপকে গিয়ে আবেদন জানায়, “এ-বছরে ঈদের নামাজ শীতকালে পড়েছে। বাইরে বরফ; সেখানে নামাজ পড়ার উপায় নেই। হুজুর যদি আপনাদের এই গির্জার ভিতরে আমাদের নামাজ পড়তে দেন, তবে আল্লা আপনাকে আশীর্বাদ করবেন।” বিশপের হৃদয়কন্ডরে কণামাত্র আপত্তি ছিল না—কিন্তু...? এ শহরের লোক খুশ্চান। তাদেরই বিত্ত দিয়ে, গরিবের কড়ি দিয়ে এ-গির্জা সাতশ' বছর আগে গড়া হয়েছে। এখনো ওদেরই পয়সাতে এ-মন্দিরের তদারকি দেখভাল চলে। সেও কিছু কম নয়। এরা যদি আপত্তি করে? কিন্তু এই বিশপটি ছিলেন বড়ই সমুদ্রপ্রকৃতির সজ্জন। এবং তার চেয়েও বড় কথা : সাহসী। তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন। মা-মেরী মালিক। তিনি সর্বসম্মানের মাতা।

কিমাৎস্বমতঃপরম। তাঁর কাছে কোনো প্রতিবাদপত্র এল না। খবরের কাগজেও এই অভাবনীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ বেরুলো না। অবিশ্বাস্য! অবিশ্বাস্য!! অবিশ্বাস্য!!!

কিন্তু মার্কিন 'টাইম' কাগজে বেরিয়েছে ও বিলেতেও বেরিয়েছে। তারপর সন্দ করে কোন্ পিচেশ!

*

*

*

কলোন এয়ারপোর্টে নেমে দেখি, দুটো সন্ধ্যাকেসের একটা আমার নেই। ছুট ছুট যে ছুট,—সেই ঘরের দিকে যেখানে 'হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্ধেশ' সম্বন্ধে তড়িঘড়ি ফরিয়াদ জানাতে হয়। নইলে চিন্তার। অবশ্য এরা নিভের থেকেই হয়তো দু-পাঁচ দিনের ভিতরই আমার বেওয়ারিশ জাদুকে খুঁজে পাবেন, কিন্তু

আমি কোন মোকামে আস্তানা গাড়বো, তার ঠিকানাটা এদের না দিলে মাল হস্তগত হবে কি করে? সেটা তখন তার মালিককে হারাবে! কোনো এক গ্রীক দার্শনিক নাকি বলেছেন, “একই নদীতে তুমি দুবার আঙুল ডোবাতে পারবে না একই শিখায় দুবার আঙুল পোড়াতে পারবে না। কারণ প্রত্যেকটি বস্তু প্রতি মূহুর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে।” মানলুম। কিন্তু একই সন্টকেস নিশ্চয়ই দুবার, দুবার কেন দশ’ বার হারাতে কোন বাধা নেই। অতি অবশ্য কবিগুরু বলেছেন, “তোমায় নতুন করে পাব বলেই হারাই ক্ষণেক্ষণ/ও মোর ভালবাসার ধন!!” কিন্তু প্রশ্ন, এটা কি হারানো বাস্তবের বেলাও খাটে?

আপিস ঘরটি প্রমাণ সাইজের চেয়েও বৃহদায়তন। ভিতরে ফুটফুটে মেমসারয়েব বসে আছেন। আমার লাগেজ টিকিট দেখাতেই তিনি মূর্চক হেসে বললেন, “নিশ্চিন্ত থাকুন, ওটা খোওয়া যাবে না। কিন্তু বলুন তো, ওটার ভিতর কি কি আছে?”

সর্বনাশ! সে কি আমি জানি? প্যাকিং করছে আমার এক তালেবর ভাতিজা মদুখুযো। তার বাপ প্রতি বৎসর নিদেন তিনবার ইয়রোপ-আমেরিকা ঘেতেন। সে নিখুঁত প্যাকিং করে দিত। আমার বেলা এ-বারে করেছে—নিখুঁততর। কোন্ বাস্তবে কি মাল রেখেছে কি করে জানবো!

কিন্তু মিস, বাবা সদয়া। পীড়াপীড় করলেন না। আমার ঠিকানাটি টুকে নিলেন। আর ইতিমধ্যে বার বার বলছেন, “এয়ার ইন্ডিয়া বলুন, লুফট-হানজা বলুন, সুইসএয়ার বলুন কোনো লাইনেই কোন লাগেজ খোওয়া যায় না। আপনি পেয়ে যাবেনই যাবেন।”

আমি মনে মনে বললুম, “বট্টে!” বেরোবার সময় তাকে বিস্তর ধন্যবাদ জানিয়ে সর্বিনয়ে বললুম, “গ্রেডিগেস ফ্লাইন (সদয়া কুমারী)! একটি প্রশ্ন শূদ্রোতে পারি কি?”

সুমধুর হাস্যসহ, “নিশ্চয়, নিশ্চয়।”

আমি বললুম, “তাবৎ হারানো মালই যদি ফিরে পাওয়া যায়, তবে এ-হেন বিরাট আপিস আপনারা করেছেন কেন? আমি তো শূন্যেছি, কলোন এয়ার পোর্টের প্রতিটি ইঞ্চির জন্য দশ-বিশ হাজার টাকা ছাড়তে হয়।”

প্রত্যুত্তরে প্রতীক্ষা না করেই এক লক্ষ দফতর থেকে বেরিয়ে মালসামান নিয়ে উঠলুম বিরাট এক বাস-এ।

*

*

*

বাঁচলুম, বাবা, বাঁচলুম। প্লেনের গর্ভ থেকে বেরিয়ে খোলা মেলায় এসে বাঁচলুম। বাসটি যদিও পর্বতপ্রমাণ, সাগর করিবে গ্রাস হয় অনূমান, তবু চলছে যেন রোলস রইল—রইম খানদানী গতিতে, মৃদু মধুরে। কবিগুরু গেয়েছিলেন, ‘কাদালে তুমি মোরে ভালোবাসার ঘায়ে’—আমি গাইলুম, ‘বাঁচালে তুমি মোরে ভালো বাস-এর ছায়ে।’

আহা কী মধুর অপরাহ্নের সুবর্নিম্ব। কখনো মেঘমায়ায় কখনো আলো-ছায়ায়। দু-দিকের গাছপাতার উপর সে-রশ্মি কভু বা মেঘের ভিতর দিয়ে

আলতো আলতো হাত বুলিয়ে যায়, কতু বা রুদ্রদীপ্ত হয়ে প্রচণ্ড আলিঙ্গন করে। ঐ হোথায় দেখছি, বড়ো চাষা ঘাসের উপর শুয়ে আছে, চোখের উপর টুপি ঢেকে। তার সবুজ পাতলদূন যেন ঘাসের ঝিলিমিলির সঙ্গে ‘একতালে যায় মিলি’। এদেশের নবাব হতে এখনো বেশ কিছুদিন বাকি আছে। চতুর্দিকে অল্পবিস্তর ফসল কাটা হচ্ছে। আজ রববার। রাইনল্যান্ডের লোক বেশির ভাগই ক্যাথলিক। তাদের অধিকাংশই সেদিন সব’কর্ম’ ক্ষান্ত দেয়। তাই ক্ষেত-খামারে তেমন ভিড় নেই।...আমিও মোকামে পৌঁছতে পারলে বাঁচি। ইংরাজীতে প্রবাদ ‘এ সিনার হ্যাঙ্গ নো সনডে।’ ‘পাপীর রববার নেই।’ আমি তো তেমন পারিপাশ্ঠ নেই !!

বাস মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রামের ভিতর দিয়ে যায়। সেখানেও রাস্তা নিজন। বাচ্চাকাচ্চারা কোথায়? তারা তো ক্লাইপে বা সুদ্যালয়ে যায় না— সেখানে অবশ্যই আজ জোর কারবার, বেজায় ভিড়। আমার পাশের সীটে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাঁকে অভিবাধন জানিয়ে বললুম, “সার, গ্রিশ-চল্লিশ বছর আগে আমি এসব গ্রামের ভিতর দিয়ে গিয়েছি। তখন তো ছেলে-মেয়েরা রাস্তার উপর রোল-স্কেটিং করতো, দাঁড়ি নিয়ে নাচতো, এমন কি ফুটবলও খেলতো। ওরা সব গেল কোথায়?”

বৃদ্ধ বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, “একাধিক উত্তর হয়তো আছে। চট করে যেটা মনে আসছে সেটা বলতে গেলে বলি; বৃদ্ধ ঘরে টেলিভিশন দেখছে।”

আমি একটু ঘাড় চুলকে বললুম, “কিছু যদি অপরাধ না নেন, সার, তবে শ্রদ্ধা, এটা কি সর্বাত্মক ভালো? ফাসীতে একটি দোহা আছে :—

হর্ চে কুনী, ব্ খুদু কুনী

খা খুদু কুনী, খা বদু কুনী ॥

যা করবে স্বয়ং করবে

ভালো করো কিংবা মন্দই করো।

এই যে প্যাসিভভাবে বসে বসে টেলি দেখা, তার চেয়ে রাস্তায় অ্যাক্টিভভাবে খেলাধুলো করা কি অনেক বেশী কাম্য নয়?”

গুণী এবারে চিন্তা-না করেই বললেন, “নিশ্চয়ই। অবশ্য ব্যত্যয়ও আছে। যেমন মনে করুন, আমরা যখন মোৎসার্ট বা শপার্ড শুনিন তখন তো আমরা প্যাসিভ। আর তাই বা বলি কি করে? বেটোফেনকে গ্রহণ করা তো প্যাসিভ নয়। ভেরি ভেরি অ্যাক্টিভ কর্ম। কী পরিমাণ কনসানট্রেশন তখন করতে হয়, চিন্তা করুন তো। কিন্তু বাচ্চাদের কথা বাদ দিন—কটা বয়স্ক লোকই বা সে জিনিস করে?”

বৃদ্ধলুম লোকটি চিন্তাশীল। একে খুঁচিয়ে আরো অনেক তত্ত্বকথা জেনে নিই। বললুম, “তা টেলিতে প্রোগ্রাম কিছুই দেয় না?”

“তা হলে শুনুন, আপনাকে পুরো ফিরিস্তি দিচ্ছি। যদিও আমি ঐ যন্ত্রটির পুজোরী নই। পুরনো ফিল্ম, নয়া থিয়েটার, গভ’পাতের সেমিনার আলোচনা, পাব্লিকের বক্তৃতা (এ দৃষ্টো তিনি ঠিক পর পর বলেছিলেন সেটা আমার এখনো

স্পষ্ট মনে আছে), রাজনৈতিকদের সঙ্গে ইংটারভ্যু, খেলা, কাবারে, ইটালী ভ্রমণ, চন্দ্রাভিযান, জিয়েটনাম থেকে প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদন, পালামেণ্টে হ্যার ভিলি রাষ্ট্র ও হ্যার শেলের বক্তৃতা—এবং সত্যাহার পর সত্যাহার ধরে ঐ একই কেচ্ছা, একই অন্তরীণ খাড়াবাড়িখোড়খোড়বাড়িখাড়া (তিনি জরমনে বলেছিলেন ‘একই ইতিহাস’—ডী জেল্বে গেশিষ্টে—)। সর্ববস্তু কুচি কুচি করে পরিবেশন। পরের দিনই ভুলে যাবেন, আগের দিন কি দেখেছিলেন—মনের উপর কোনো দাগা কাটে না। পক্ষান্তরে দেখুন, বই পড়ার ব্যাপারে আপনি আপনার রুচিমত বই বেছে নিচ্ছেন।”

ইতিমধ্যে আমাদের বাস কতবার যে কত ট্রাফিক জামে কত মিনিট বাঁড়িয়েছে তার হিসেব আমি রাখি নি। অথচ এদেশে রিকশা, টালা, গোরুরগাড়ি এমন কোনো কিছুই নেই যে-সব হযবরল আমাদের কলকাতাতে নিত্য নিত্য ট্রাফিক জ্যাম জমাতে কখনো স্বেচ্ছায় কখনো অনিচ্ছায়—বিস্ববিজয়ী প্রতিষ্ঠান।

ভদ্রলোক বাইরের দিকে আঙুল তুলে বললেন, “ঐ দেখুন, আরেক উৎকট নেশা। মোটর, মোটর, মোটর। প্রত্যেক জরমনের একখানা মোটরগাড়ি চাই। জরমন মানুষই মোটরের পূজারী।”

আমার কেমন ঘেন মনে হল, আমরা বোধ হয় বন শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে গিয়েছি। কিছুটা চেনা-চেনা ঠেকছে, আবার অচেনাও বটে। অথচ একদা এ শহর আমি আমার হাতের তেলোর চেয়ে বেশী চিনতুম। আমি ভদ্রলোককে আমার সমস্যা সমাধান করতে অনুরোধ জানালে তিনি বললেন, “এটা বনই বটে। তবে এ অঞ্চলটা গত যুদ্ধে এমনই বোমারু-মার খেয়েছিল যে এটাকে নতুন করে গড়া হয়েছে। তবে শহরের মাঝখানটা প্রায় পূর্বেরই মত মেরামত করে বানানো। আসল কথা কি জানেন, বমিঙের ফলে ঘিঞ্জি পাড়াগুলো যে নষ্ট হয়ে গেল সেগুলোকে ভালো করে, নতুন করে প্ল্যান মাফিক বানাবার চান্সটা আমরা মিস করেছি। তবে এই যে বললুম, শহরের মাঝখানটা মোটামুটি আগেরই মত—হার্ট অব দি সিটি—আর জানেন তো পুরানো হার্টের জায়গায় নতুন হার্ট বসানো মূশকিল। এই ধরুন লুর্টভিষ্ ফান বেটোফেন—”

আমি বললুম, “ওই নামটার ঠিক উচ্চারণটা আমি আজো জানিনে।”

হেসে বললেন, “ঐ তো ফেললেন বিপদে। মাঝখানের Vanটা যে খাঁটি জার্মান নয় তা তো বুঝতেই পারছেন। ওঁরা প্রাচীন দিনের ক্যাপিটাল। তখন তারা ‘ভান’ না ‘ফান’ উচ্চারণ করতো কে জানে—অন্তত আমি জানি নে—”

আমি বললুম, “থাক, থাক। এবারে যা বলছিলেন তাই বলুন।”

“সেই বেটোফেনের বাড়ি যদি বোমাতে চুরমার হয়ে যেত তবে সেখানে তো একটা পিরামিড গড়া যেত না।”

“এমন কি তাজমহলও না।”

*

*

*

ধুম্ করে গাড়ি থেমে গেল। এ কি? ও! মোকামে পৌঁছে গিয়েছি। অর্থাৎ বন শহরে। এবং সব চেয়ে প্রাণাভিরাম মননানন্দদান দৃশ্য—যে পরিবারে

উঠবো তারই একটি জোয়ান ছেলে ভিটারিষ্, উলানোফস্কি প্রবলবেগে হাত নাড়াচ্ছে। মদুখে তিন গাল হাসি। পাশে দাঁড়িয়ে তার ফুটফুটে বউ। সে রুমাল দুলোচ্ছে।

৬

লক্ষ্মী ছেলে ডীটারিষ। তার মাঝারি সাইজের মোটরখানা এনেছে। আমার কোনো আপত্তি না শুনে বললে, “আমি মালপত্রগুলো তুলে নিচ্ছি। তুমি ততক্ষণ বউয়ের সঙ্গে দুটি কথা করে নাও। ও তো আপনাকে চেনে না।” মেয়েটিকে বাড়ির কুশলাদি শুধোলদুম। কিন্তু বড় লাজুক মেয়ে—কয়েকদিন আগে ‘দেশ’ পত্রিকায় যে সিগারেট-মুখী ‘মর্ডান মেয়ে’র ছবি বেরিয়েছে তার ঠিক উল্টোটি। কোনো প্রশ্ন শুধোয় না। শুধু উত্তর দেয়। শেষটায় বোধ হয় নেটা আবছা-আবছা অনুভব করে একটিমাত্র প্রশ্ন শুধোলে, “বন্ কি খুব বদলে গেছে? আমি অবশ্য প্রাচীন দিনের বন্ চিনি নে। আমার বাড়ি ছিল ক্যোনিষবেগে।”

সবনাশ। এবং পাঠক সাবধান।

ক্যোনিষবেগ শহরটি এখন বোধ হয় পোলাণ্ডের অধীনে। এসব অঞ্চল থেকে লক্ষ লক্ষ নয়নারী বাস্তবহারা সর্বহারা হয়ে পশ্চিম জর্মনিতে এসেছে। তাদের বেশীর ভাগই সে-সব দুঃখের কাহিনী ভুলে যেতে চায়। কাজেই সাবধান! ওসব বাবদে ওদের কিছু জিজ্ঞেস করো না।

তবে এ তত্ত্বও অভিশয় সত্য যে মৌকামাফিক দরদ-দিলে যদি আপনি কিছু শুনতে চান তখন অনেক লোকেই, বিশেষ করে রমণীরা অনর্গল অবাধ গতিতে সব কিছু বলে ফেলে যেন মনের বোঝা নামাতে চায়। বিশেষ করে বিদেশীর সামনে। সে দুদিন বাদেই আপন দেশে চলে যাবে। ও যা বলোছিল সেটা নিয়ে খামোখা কোনো ঘোটলার সৃষ্টি হবে না। আমি তাই বেমালদুম চেপে গিয়ে বললুম, “ও ক্যোনিষবেগ! যেখানে এ-যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কান্ট জন্মেছিলেন? এবং শুনেছি তিনি নাকি ঐ শহরের বারো না চোদ্দ মাইলের বাইরে কখনো বেরোন নি! শহরটাকে এতই ভালোবাসতেন!”...

ইতিমধ্যে ডীটারিষ স্টিয়ারিং বসে গেছে এবং আমার শেষ মন্তব্যটা শুনেছে। বললে, “ভালোবাসতেন না কহু! আসলে সব দার্শনিকই হাড়-আলসে।”

আমি বললুম, “সে-কথা থাক। তোর বউ শুধোচ্ছিল, বন্ শহরটা কি খুব বদলে গেছে? তারই উত্তরটা দি? বদলেছে, বদলায়ও নি—”

“তুমি, মামা, চিরকালই হেঁয়ালিতে কথা কও—”

আমি বললুম, “থাক, বাবা থাক। বাস্—এ এক বৃদ্ধ বিষয়টির অবতারণা করতে না করতেই মোকামে পৌঁছে গেলাম। আর এ-তাবৎ দেখেছিই বা কি?”

বন শহরের নাম করলেই দেশী-বিদেশী সবাই বেটোফেনের নাম সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করে বটে, কিন্তু এ বৎসরে বিশেষ করে। কারণ তাঁর দ্বিষত জন্মশত-বার্ষিকী সম্মুখেই। ডিসেম্বর ১৯৭০-এ। এ-শহর তাঁকে এতই সম্মান করে যে তাঁর স্মৃতির প্রতিমূর্তিটি তুলেছে তাদের বিরাটতম চত্বরে, তাদের বৃহত্তম এবং প্রাচীনতম না হলেও তারই কাছাকাছি প্রাচীন মন্দিরস্টোর গির্জার পাশে। হয়তো তার অন্যতম কারণ, বেটোফেন ছিলেন সর্বাস্তরকরণে ঈশ্বরবিশ্বাসী। শ্রদ্ধা তাঁর সঙ্গীত নয়, তাঁর বাক্যালাপে চিঠিপত্রে সবাই তাঁর ঈশ্বরে পরিপূর্ণ বিশ্বাস, প্রভুর পদপ্রান্তে তাঁর ঐকান্তিক আত্মনিবেদন বার বার স্বপ্রকাশ।

সেখান থেকে কয়েক মিনিটের রাস্তা — ছোট্ট গলির ছোট্ট একটি বাড়ির ছোট্ট একটি কামরায় যেখানে তাঁর জন্ম হয়। বাড়ির নিচের তলায় বেটোফেন মিউজিয়াম। সেখানে তাঁর বাবহৃত অনেক কিছুই আছে, যেমন ইয়াসনা পলিয়ানাতে তলস্‌তয়ের — হস্তর, সম্পূর্ণতর, কারণ সেটা দেড়শ বছর পরের কথা এবং অসম্পূর্ণতম রবীন্দ্রনাথের উক্তরায়ণে, যদ্যপি সেটা তলস্‌তয়ের প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে।

কিন্তু সেখানে সব চেয়ে মর্মস্পর্শী বেটোফেনের কানের চোঙাগুলো। ব্রিটিশ বৎসর বয়স থেকেই তিনি ক্রমে ক্রমে কালা হতে আরম্ভ করলেন। বিধাতার এ কী লীলা! বীণাপাণির এই অংশাবতার আর তাঁর বীণা শব্দনতে পান না। তখন তিনি আরম্ভ করলেন ঐ সব কানের চোঙা ব্যবহার করতে। পাঠক, দেখতে পাবে, তাঁর বর্ধিত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বাড়তে লাগলো সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোঙার সাইজও বাড়তে লাগলো। তাতে করে তাঁর কোনো লাভ হয়েছিল কি না বলা কঠিন। তবে এটা জানি, তার কিছুকাল পরে, যখন তাঁর সঙ্গীতপ্রেমী কোনো সহচর বলতেন, ‘বাঃ! কী মধুর সুরেলা বাঁশী বাজিয়ে যাচ্ছে রাখাল ছেলেটি’, আর তিনি কিছুই শব্দনতে পেতেন না তখন বেটোফেন বলতেন, তিনি তখনই আত্মহত্যা করতেন যদি না তাঁর বিশ্বাস থাকতো যে সঙ্গীতে এখনো তাঁর বহু কিছু দেবার আছে। আমাদের শ্রীরাধা যে রকম উদ্ধবকে বলেছিলেন, ‘যদি না আমার বিশ্বাস থাকতো, প্রভু একদিন আমার কাছে ফিরে আসবেন, তাহলে বহু পূর্বেই আমার মৃত্যু হয়ে যেতো।’ এবং সকলেই জানেন, বৃন্দ কালা হয়ে যাওয়ার পরও বেটোফেন মনে মনে সঙ্গীতের রূপটি ধারণ করে বহুবৈধ স্বর্গীয় রচনা করে গেছেন, যেগুলো তিনি স্বকর্ণে শব্দে যেতে পান নি। আমি যেন কোথায় পড়েছি, তিনি সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে করুণ আবেদন জানাচ্ছেন, প্রভু যেন তাঁকে একবারের মত তাঁর শ্রুতিশক্তি ফিরিয়ে দেন যাতে করে তিনি মাত্র একবারের তরে আপন সৃষ্ট সঙ্গীত শব্দে যেতে পান। তারপর তিনি সধন্যাস্তঃকরণে পরলোকে যেতে প্রস্তুত।

চিন্তাস্রোতে বাধা পড়লো। ডীটারিশ শব্দলো, “মামা, কথা কইছ না যে!”

বললুম, “আমি ভাবছিলাম বেটোফেনের কানের চোঙাগুলোর কথা। ওগুলো সত্যি কি তাঁর কোনো কাজে লেগেছিল?”

ডীটারিশ বললে, “বলা শক্ত। কোনো কোনো আধাকাল একখানা কাগজের

টুকরো দু'পাটি দাঁত দিয়ে চেপে ধরে কাগজের বেশীর ভাগটা মদুখের বাইরে রাখে। ভাবে, ধর্নিতরঙ্গ ঐ কাগজকে ভাইরেট করে দাঁত হয়ে মগজে পেঁচিয়েছো, কিংবা কান হয়ে। কেউ বা সামনের দু'পাটির চারটে দাঁত দিয়ে লম্বা একটা পেনসিল কামড়ে ধরে থাকে। কি ফল হয় না হয় কে বলবে? আচ্ছা, মামু, তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, কী রকম অশুভ, প্রিমিটিভ মিনি সাইজের বস্ত্র দিয়ে তিনি তাঁর বিচিত্র সঙ্গীত রচনা করেছিলেন? আমার কাছে ভারি আশ্চর্য লাগে!”

আমি বললুম, “কেন বৎস, ঐ যে তোমার ছোট পিসি, যার সঙ্গে আমার চাঁল্লিশ বছরের বন্ধুত্ব, লীজেল—দেখেছো, ঝড়িত-পড়িত কয়েক টুকরো লেটিসের পাতা, আড়াই ফোঁটা লেবুর রস আর তিন ফোঁটা তেল দিয়ে কি রকম সরেস স্যালাড তৈরী করতে পারে? মদুখে দিলে যেন মাখম !!...আর তোর আমার মত আনাড়ীকে যাবতীয় মশলাসহ একটা মোলায়েম মদুগী’ দিলেও আমরা যা রাখবো সেটা তুইও খেতে পারবি নি, আমিও না। পিসি লীজেল কি বলবে, জানি নে। অথচ জানিস, ঐ অভুজ মদুগী’টি তাঁকে তখন দিয়ে দে। তিনি সেটাকে ছোট ছোট টুকরো করে থাকে ফরাসীরা বলে রাগদু ফ্যাঁ, রা ফ্রিকাস্ অর্থাৎ লম্বা লম্বা ফালি-ফালি করে কেটে, মদুগী’টাতে আমরা যে-সব বড়-রান্নার ব্যামো চাপিয়েছিলুম সেগুলো রাইনের ওপারে পাঠিয়ে গ্র্যামন একটি রান্না করে দেবেন যে, প্যারিসের শ্যাফতক্ আমরা আমরা বলতে বলতে তারিয়ে তারিয়ে খাবে।... প্রকৃত গদুগীজন যা-কিছুর মাধ্যমে যা-কিছুর সৃষ্টি করতে পারেন। আমাদের দেশে একরকম ষাড্যাম্প্র আছে। ‘একতার’ তার নাম। তাতে একটি মাত্র তার। তার দু’দিকে দু’টি ফ্লেক্সিবল বাঁশের কৌশল আছে। সে দুটোতে কখনো জোয় কখনো হাল্কা চাপ দিয়ে তার মাঝখানের তারটাকে প্লাক করে নাকি বিয়াল্লিশ না বাহামোটা নোট বের করা যায়। তবেই দ্যাখ। বেটোফেনের মত কটা লোক পৃথিবীতে আসে—আমাদের দেশেও গন্ডায় গন্ডায় তানসেন জন্মায় না। যদিও আমাদের দেশ তোদের দেশের চেয়ে বিস্তর বিরাটতর, এবং সেখানে কলাচর্চা আরম্ভ হয়েছিল অন্তত চার হাজার বছর পূর্বে। এবং আমাদের কলাজগতে আমরা এখন সাহায্যে। এবং—”

ডীটারিষ বললে, “তুমি আমাদের পাল’গমেন্ট হাউসটা দেখে না? রাইনের পারে। আমি একটু ঘোরপথে যাচ্ছি। সোজা পথে গেলে দু’পাচ মিনিট আগে বাড়ি পেঁছতুম।

“দ্যাখ ডীটারিষ, তোর পিসি নিশ্চয়ই বিস্তর কেক-পেসটি আমাদের জন্য বানিয়ে বসে আছে—”

ডীটারিষের বউ বললে, “মামা, শুধু কেক-পেসটি বললেন। ওঁদিকে পিসি কি কি বানিয়ে বসে আছেন, জানেন? কোনিংসবের্গের রূপসে (ক্যানিসগবের্গ শহরের একরকম কোফ্‌তা), ফ্রাঙ্কফুর্টের সসিজ, হানোফারের ষাডের ন্যাজের শূরুয়া—”

আমি বাধা দিয়ে বললুম, “সে তো জানি। কিন্তু লীজেল পিসি আমার

জন্যে কি ক্যান্ডার ন্যাজের শূরুরা তৈরী করেছে ?”...

দুজনাই তাম্বল। আমি বললাম, “বাঁড়ের ন্যাজের ভিতর থাকে চাঁব’ এবং মাংস। তার একটা বিশেষ স্বাদ থাকে। কিন্তু বাঁড়ের ন্যাজ আর কতটুকু লম্বা ? তার চেয়ে ক্যান্ডার ন্যাজ ঢের ঢের বেশী। ওটা যদি পাঁচজনকে খাওয়ানো যায় তবে বিস্তর কড়ি সাগ্রয় হয়।”

ছ্যাঁচ করে গাড়ি ধামলো।

“এটা কি রে ? মনে হয়, গোটা আন্টেক বিরাট বিস্কুটের টিন একটার উপর আরেকটা বসিয়ে দিয়েছে। বললুম আমি।

ডাটরিশ বললে, “এটাই আমাদের পাল্লামেন্ট।”

৭

যাকে বলে মর্ডান আর্ট, পিকাসসো উপস্থিত যার পোপস্য পোপ, সেই পদ্ধতিটি জার্মানরা কখনো খুব পছন্দ করেনি। কাইজার দ্বিতীয় ভিলহেল্ম যাকে এখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী করে তিনি ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আর্ট এবং আর্টের আদর্শ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তব্য ছিল : আর্ট হবে সৃষ্টির, আর্ট হবে সমাজসেবক, রাষ্ট্রসেবক, আর্ট মানুষের স্বার্থবোধের ছবি না এঁকে আঁকে এমন ছবি, কম্পোজ করবে এমন সঙ্গীত, রচনা করবে এমন সাহিত্য যাতে মানুষ আপন পীড়াদায়ক পরিস্থিতি ভুলে গিয়ে আনন্দসায়রে নির্মজ্জিত হবে। আজকের দিনে আমরা এটাকে নাম দিয়েছি এসকোপজম—পলায়ন-মনোবৃত্তি। বলা বাহুল্য জার্মান আর্টিস্ট—সাহিত্যিক সঙ্গীতস্রষ্টা—কাইজারের এই পথনির্দেশ খবরের কাগজে পড়ে স্তম্ভিত হন। তাহলে আর্টিস্টের কোনো স্বাধীন সত্তা নেই। সে তার আপন সৃষ্টিশক্তি, আপন বিচিত্র অভিজ্ঞতা, আপন স্বল্পে উপলব্ধি ভবিষ্যতের আশাবাদী চিত্র অঙ্কন করতে পারবে না ! সে তাহলে রাষ্ট্রের ভাড়, ক্লাউন ! তার একমাত্র কর্তব্য হল জনসাধারণকে কাতুকুতো দিয়ে হাসানো !

কিন্তু জার্মান জনসাধারণ কাইজারের কথাই মেনে নিল। এটা আমার ব্যক্তিগত মত নয়। এই পরিস্থিতিটা বোঝাতে গিয়ে প্রখ্যাত জার্মান সাংবাদিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক গ্রীষ্মকৃত্ত যোখিম বেসার বলেছেন, জার্মানরাই উপরের দিকে তাকায় ; রাজা কি হুকুম দিলেন সেই অনুযায়ী কাব্যে চিত্রে সঙ্গীতে আপন রুচি নির্মাণ করে।

১৯১৮-এ কাইজার যুদ্ধে হেরে হল্যান্ডে পলায়ন করলেন।

তখন সত্য সত্য আরম্ভ হল ‘মর্ডান আর্টের’ যুগ। যেন কাইজারকে বৃথা হুঁচকান প্রদর্শন করার জন্য আর্টিস্টরা আরম্ভ করলেন রঙ নিয়ে নিত্য নব উদ্ভাবন নৃত্য, ধ্বনি নিয়ে সঙ্গীতে তাড়ব একসপেরিমেন্ট, ভাস্কর্যে বিকট বিকট মূর্তি যার প্রত্যেকটোতেই থাকত একটা ফুটো (তার অর্থ বোঝাতে গেলে পদলিঙ্গ

সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী (৭ম)—২৫

আমাকে জেলে পড়বে)। আমি ঐ সময়ে জর্মনিতে ছিলাম। মডার্নদের পাল্লায় পড়ে একদিন একটা চারুকলা প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে এক লক্ষ্য পুনরাপি বেরিয়ে এসেছিলাম। একদা যে-রকম কোন এক জুড়ে বোকা পাঠার খাচার সামনে থেকে বিব্রাণ গতিতে পলায়ন করেছিলাম। নেটিকা গুপ্তে।

তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে সেখানে উত্তম দ্রষ্টব্য কিছুই ছিল না। নিশ্চয়ই ছিল। রাস্তার ডান্টারিন খঁজলে কি আর খান দুই লাঠি, একটা আলদার চপ পাওয়া যায় না? কিন্তু আমার এমন কি দায় পড়েছে!

এরপর ১৯৩০-এ এলেন হিটলার। তাঁর কাহিনী সবাই জানেন। কিন্তু আর্ট সম্বন্ধে তাঁর অভিমত সবাই হয়তো জানেন না; তাই সংক্ষেপে নিবেদন করছি। হিটলার সর্বক্ষণ কাইজারকে অভিসম্পাত দিতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, কাইজার যদি কাপড়ের মত হার না মেনে লড়ে যেতেন তবে জর্মনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করতোই করতো।... অথচ আর্ট সম্বন্ধে দেখা গেল হিটলার কাইজার সম্পূর্ণ একমত পোষণ করেন। তিনি কঠিনতর কণ্ঠে উচ্চৈশ্বরে বারংবার বলে যেতে লাগলেন, ‘আর্ট হবে সমাজের দাস অর্থাৎ নাৎসীদের দাস। সুতরাং এই পৃথিবীতে তারা যে ন্যায়সম্মত আসন খঁজছে তারই সেবা করবে আর্টিস্টরা।’

কাইজারের চরম শত্রুও বলবে না তিনি অসহিষ্ণু লোক ছিলেন। তাঁর আমলে তাঁর নির্দেশ সশ্বেও যারা মডার্ন ছবি আঁকতেন তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি কোনো প্রকারেরই কোনো কিছু করেন নি।

কিন্তু হিটলার চ্যানসেলার হওয়ার পর আরম্ভ হল এঁদের উপর নিষেধাজ্ঞা। উত্তম উত্তম ছবি, নব নব সঙ্গীত ব্যান করা হল। সেরা সেরা পুস্তক পোড়ানো হল—কারণ এগুলো নাৎসী সঙ্গীতের সঙ্গে এক সুরে এক গান গায় না। আমি দূর থেকে এরকম একটা অগ্নিযজ্ঞ দেখেছিলাম। কাছে যাই নি। পাছে প্রভুরা আমার রক্ত দেখে আমাকে ইহুদী ঠাউরে আমার নাকটা না কেটে দেন। যদিও আমার নাকটি খাঁটি মঙ্গোলীয়ন। খাটো, বেঁটে, হুস্ব। কিন্তু বলা তো যায় না।

হিটলার তাঁর সাধনোচিত ধামে গেছেন। এখন জর্মনিরা উঠে পড়ে লেগেছেন ‘মডার্ন’ হতে। চোখতলা বাড়ি ভিন্ন অন্য কথা নয়।

তাই এই বিস্কুটটিনপারা পার্লিমেন্ট।

ডাউটারসকে বললাম, ‘জানো, ভাগিনা, আমাদের দেশেও এ ধরনের স্থাপত্য হ্রদ হ্রদ করে আকাশপানে উঠছে। তারই এক আর্কিটেকট্ এসেছেন আমাদের সঙ্গে তাস খেলতে। ভদ্রলোক সিগার খান। বর্ষাকাল। সিগার গেছে মিইয়ে। ঘন ঘন নিভে যায়। ভদ্রলোক দেশলাই খোঁজেন।... খেলা শেষ হল। তখন কেন জানি নে তিনি তাঁর দেশলাই আর খঁজ পান না। আমাদের এক রসিক বন্ধু বসে বসে খেলা দেখছিল। সে ধরনী কণ্ঠে বললে, ‘দাদাদের কাছে আমার অনুরোধ, আর্কিটেকট্ মশায়ের মডেলটি তোমরা কেউ গাপ্ মেরো না। দেশলাইটির মডেল থেকেই তো তিনি হেথাহোথা সর্বত্র বিয়াল্লিশতলার বিল্ডিং

হাঁকাচ্ছেন ! ' ওটা গানের হলে ও'য়ার রুটি মারা যাবে যে ! ”

ডাটরিষ বললে, “জানো, মামদা, আমাদের বিশ্বাস প্রাচ্যদেশীয়রা কতই সীমিত-
বিশ্বাস । সর্বক্ষণ গুমগুমো গুম্বু করে, লর্ড বৃদ্ধের মত আসন নিয়ে শব্দ আত্মচিন্তা
মোক্ষানুসন্ধান করে । তারাও যে রসিকতা করে এ কথা ৯৯.৯% জার্মান
কিছুতেই বিশ্বাস করবে না । অথচ তোমার এই বৃদ্ধটির রসিকতাটি শব্দ যে
রসিকতা তাই নয় । ওতে গভীর দর্শনও রয়েছে । মডার্ন আর্কিটেকচার সম্বন্ধে
মামদা, এই একটি দেশলাই দিয়ে তিনি তাঁর তাজিল্য সিনিসিজমসহ প্রকাশ করলেন
কী সাতিশয় সঙ্কে পঞ্চাতিতে ! ভুললোক কি তোমার মৃত লেখেন-টেখেন—
লিভেনোতোয়ার ? ”

আমি বললুম, “তওবা, তওবা ! ভুললোক ছিলেন আমাদের ফরেন অফিসের
ডেপুটি মিনিষ্টার ; পণ্ডিত নেইরুর সহকর্মী । খুব বেশী দিন কাজ করেন
নি । এই সব দার্শনিক সিনিক্ রসিকতা তিনি সর্বজনসমক্ষে প্রকাশ করতেন
তাঁর ভিন্ন ভিন্ন সহকর্মী মন্ত্রীদের সম্বন্ধে । ঠিক পপুল্যার হওয়ার পঞ্চা এটা
নয়—কি বলো ? . কাজেই তিনি যখন ফরেন অফিস থেকে বিদায় নিলেন তখন
আমি বলেছিলুম তিনি মন্ত্রিমন্ডলী থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বিদায় নেবার সময়
উল্লাসে নৃত্য করলেন এবং মন্ত্রিমন্ডলীও তাঁর থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে উল্লাসে নৃত্য
করলেন । ”

ডাটরিষ চুপ । আমি একটু অবাক হলাম । সে তো সব সময়ই জুংমাফিক
উত্তর দিতে পারে ।

সে বললে, “আমার অবস্থাও তাই । যে অফিসে আমি কাজ করি সেটা
থেকে বেরতে পারলে আমিও খুশি হই ; ওরাও খুশি হয় । ”

৮

এ তো সামনে গোডেস্বেগ । ডাটরিষ শব্দধোলে, “মামদা, পিসি বলছিল তুমি
নাকি এই টাউনটাকে জার্মানির সর্ব জায়গার চেয়ে বেশী ভালোবাসো ? কেন,
বলো তো ? ”

আমি মূঢ়চকি হেসে কইলাম, “যদি বলি তোর পিসির সঙ্গে হেথায় আমার
‘প্রথম প্রণয়’ হয়েছিল বলে ? ”

ডাটরিষ ! “যাত ! আমি ছেলেবেলা থেকেই লক্ষ্য করছি, লীজেল পিসির
ধ্যানধর্ম শব্দ কাজ আর কাজ । ফাঁকে ফাঁকে বই পড়া । এবং সে-বইগুলোও
দারুণ সিরিয়স । বড় পিসি বরণ মাঝে মাঝে হালকা জিনিস পড়তো । কিন্তু
ছোট পিসি ওসবের ধার ধারতো না । সে যেতো প্রতি প্রভাতে ট্রামে চড়ে বন্-
শহরে—যেখানে সে চাকরি করতো—”

আমি । “সেই সন্দেশে তো আমাদের পরিচয় । আশ্মা এই সকাল আটটা
পনেরোয় ট্রামে বন্-যেতুম । আমরা আর সবাই দু’তিনটে সিঁড়ি বেয়ে ট্রামে

উঠতুম। আর লীজেল পিসি ডান হাতে একখানা বই আর বাঁ হাতে ট্রামের গায়ে সামান্যতম ভর করে সিঁড়িগুলোকে ‘তাচ্ছিলি’ করে এক লক্ষ্যে উঠতো ট্রামের পাটাতনে। উঠেই এক গাল হেসে ডাইনে বাঁয়ে সমুখপানে তাকিয়ে বলতো, ‘গুটেন্ মরগেন্’ ‘সুপ্রভাত’। ওর ঐ লক্ষ্যে মেরে ওঠার কৈশল্য দেখে আমি মনে মনে বলতুম একদম ‘টম বয়’! ওর উঁচত ছিল মার্কিন মনুস্ককে ‘কাউ বয়’ হয়ে জন্ম নেবার। অথবা ‘ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেবুইন’—গুরুদেবের ভাষায়।”

গোডেসবের্গ তখন অতি ক্ষুদ্র শহর। সবাই সবাইকে চেনে। কিন্তু আসল কথা, ঐ আটটা পনেরোর ঘ্রামে থাকতো পোনেরো আনা কাচাবাচ্চা। ইন্সকুলে যাচ্ছে বন্ শহরে। এরা সবাই জানতো যে লীজেল পিসির, অবশ্য তখনো তিনি ‘পিসি’ খেতাব পান নি, কাছে আছে লেবেনচুস্, দু’একটা আপেল, হয়তো নবাগত মার্কিন চুইংগাম, মাঝে-মধ্যে চকলেট। কাজেই বাচ্চারা সম্ভবরে, কোরাস কণ্ঠে বলতো, অন্তত বারাতিনেক “সুপ্রভাত—”। তার পর সবাই তার চার পাশে ঘিরে দাঁড়াত। সবাই বলতো, “প্রীজ, এজ্জ, এজ্জ, এই এখানে বসুন।”

আমি বললাম, “বুঝলি ডাটীরষ, তোর পিসি লীজেল ছিল আমাদের হীরইন অব্ দ প্লে। তবে তুই ঠিকই বলেছিস ও কখনো প্রেম-জ্বের ধার ধারতো না। আমি দু’একবার তার সঙ্গে হাফাহাফি স্লার্ট করতে গিয়ে চড় খেয়েছি। অথচ আমাদের মধ্যে প্রীতিবন্ধু ছিল গভীর। আমাকে কত কী না খাইয়েছে—ঐ অল্প বয়সেই বেশ দু’পয়সা কামাতো বলে। তখনকার দিনে ছিল—এখনো নিশ্চয়ই আছে—একরকমের বেশ মোটা সাইজের চকলেট—ভিতরে কন্যাক্। বহু আক্কা। কিন্তু খেতে—ওঃ! কী বলবো—মুখে ফেলে সামান্য একটু চাপ দাও। ব্যস হয়ে গেল। ভিজ্জ ভিজ্জ চকলেট আর তরল কন্যাকে মিশে গিয়ে, দ্যাখ তো না দ্যাখ, চলে গেল একদম পেটের পাতালে। কিন্তু যাবার সময় ঐ যে কন্যাক্—তোরা যাকে বলিস ব্র্যানট্-ভাইন, ইংরেজীতে ব্র্যান্ডি, নাড়িভূঁড়ির প্রতিটি মিলিমিটার মধুর মধুর চুলবুলিয়ে বুঝিয়ে দিতো, যাচ্ছেন কোন মহারাজ!...আর মনের মিলের কথা যদি তুলিস তবে বলবো, লীজেল ছিল বহুই লিব্-রেল। তাই যদিও নাৎসীরা তখনো ক্ষমতা পায় নি কিন্তু রাষ্ট্রাঘাটে দাড়াতে আরম্ভ করেছে—পিসি সেটা আদৌ পছন্দ করতো না। আমিও না। কিন্তু সত্যি বলতে কি, ইংরেজ যে ইতিমধ্যেই হিটলার বাবদে সম্ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে সেটা আমার চিন্তে পল্লক জাগাতো। পিসিও সেটা জানতো। ভারতবর্ষের পরাধীনতার কথা উঠলেই সে ব্যথা পেত। বলতো, ‘ও কথা থাক না।’ ওরকম দরদী মেয়ে চিনতে পারার সৌভাগ্য আমি ইহসংসারে অতি অল্পই পেয়েছি।”

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, ভাগিনা ডাটীরষ কেমন যেন অনামনস্ক হয়ে গিয়েছে। শুধোলাম, “কি হল রে? তুই কি পরশুদিনের হাওয়া খেতে চলে গিয়েছিস?”

কেমন যেন বিষন্ন কণ্ঠে ভেজা-ভেজা গলায় সে বললে, “মামা, তুমি বোধ হয় জানো না, আমার বাবা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে ওপারে চলে গেল কি করে।”

ডাউটারের এখন যৌবনকাল। তার বাপ কেন, ঠাকুন্দাও বেঁচে থাকলে আশ্চর্য হবার মত কিছু ছিল না। বললুম, “আমি তো জানি নে ভাই। কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, আবার হচ্ছেও না। কারণ তোমার গলাটা কি রকম যেন ভারী-ভারী শোনাচ্ছে—”

“তুমি এইমাত্র বললে না, তুমি পিসি দুজনাই নাৎসীদের পছন্দ করতে না। বস্তুত পিসি-পরিবারের কেউই নাৎসী ছিল না। যদিও আমি তোমার বাম্‌ধবীকে পিসি বলে পরিচয় দিয়েছি, আসলে তিনি আমার মাসি। তারা তিন বোন। আমার মা সকলের ছোট। তিনি বিয়ে করলেন এক নাৎসীকে—কটর নাৎসীকে। কেন করলেন জানি নে। প্রেমের ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিল। বাড়ি গিয়ে তোমাকে তার ডাইরিটি দেখাবো। আর চেহারাটি ছিল সুন্দর—”

বাধা দিয়ে বললুম, “সে তোর চেহারা থেকেই বোঝা যায়।”

“থ্যাংকউ। আর বাবা ছিল বড়ই সদয়-হৃদয়—”

“ভাগিনা, কিছু মনে করো না। আমি মোটেই অবিশ্বাস করি না যে তোর পিতা অতিশয় করুণ হৃদয়, শান্ত স্বভাব ধরতেন—তোমার দুই মাসিই সে-কথা আমাকে বারংবার বলেছে। কিন্তু আবার বলছি কিছু মনে করো না, তাহলে তিনি নাৎসীদের কনসানট্রেশন ক্যাম্প সয়ে নিলেন কি করে?”

ডাউটার চুপ ঘেরে গেল। কোন উত্তর দেয় না। আমি এবার, বহুব্যয়ের পর আবার, বললুম যে আমি একটা আশু গাড়ো। এরকম একটা প্রশ্ন করাটা আমার মোটেই উচিত হয় নি। বললুম, “ভাগিনা, আমি মাফ চাইছি। আমি আমার প্রশ্নটার কোনো জবাব চাই নে। ওটা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি।”

ডাউটার বললে, “না, মামু। তুমি যা ভেবেছো তা নয়। আমি ভাবছিলাম, সত্যি তো, বাবা এগুলো বরদাস্ত করতো কি করে? এবং আরো লক্ষ লক্ষ জর্মেন? এই নিয়ে আমি অনেকবার বহু চিন্তা করছি। তুমি জানো, মার্কি-নিংরেজ রুশ-ফরাসী ন্যারেনবের্গ মোকদ্দমায় বার বার নাৎসীদের প্রশ্ন করেছে, ‘তোমরা কি জানতে না যে হিটলার কনসানট্রেশন ক্যাম্পে লক্ষ লক্ষ ইহুদীকে খুন করছে?’ উত্তরে সবাই গাইগুই করেছে। সোজা উত্তর কেউই দেয় নি। জানো তো যুদ্ধের সময় কত সেনসর কত কড়াকড়ি! কে জানবে কি হচ্ছে না হচ্ছে! আমার মনে হয়, আবার জাতি জানি নে, বাবার কানে কিছু কিছু পৌঁচেছিল। কিন্তু বাবা তখন উন্মত্ত। তিনি চান জর্মেনি সর্বাধিকার। তাঁর ডাইরিতে বার বার বহুব্যব লেখা আছে, ইংরেজ কে? সে যে বিরাট বিশ্ব শুষে খেতে চায় তাতে তার হস্তো কি? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মানি, তারা যদি আমাদের কিংবা ফরাসীদের মত কল্‌চরড জাত হত তবে আমরা এ-নিম্নে কলহ করতুম না। কিন্তু ইংরেজ জাতটাই তো বেনের জাত। তারা কালচারের কি বোঝে? ওদের না আছে মাইকেল-এঙ্গেলো, না আছে বেটোফেন। আছে মাত্র শেকসপীয়র। ওদের না আছে স্থাপত্য, না আছে ভাস্কর্য, না আছে—” হঠাৎ বললো, “ঐ তো বাড়ি পৌঁছে গিয়েছি।”

“হু হালুৎক”—সোজাসে হু হুৎকারে সব ছাড়লো প্রীমতী লীজেল। “তুই গু’ডা—”

আমরা সেরকম কোনো দুরন্ত ছোট বাচ্চাকে আদর করে ‘গু’ডা’ বলে থাকি ‘হালুৎক’ তাই। শব্দটা ঢেক ভাষাতে জার্মানে প্রবেশলাভ করেছে। গল্প চল্লিশ বছর ধরে দেখা হলেই লীজেল এইভাবেই আমাকে ‘অভ্যর্থনা’ জানিয়েছে।

তারপর আমাকে জাবড়ে ধরে হু’গালে হুটো চুমো খেল।

ডীটার্ব মারফত পাঠককে পূর্বেই বলেছি লীজেল ছিল ন’-সিকে ‘টম-বয়’। এবং হু’একবার তার সঙ্গে হাফাহাফি ক্লার্ট করতে গিয়ে চড় খেয়েছি। তবে এটা হল কি প্রকারে? শূচিবায়ুগ্রস্ত পদীপিসীরা ক্ষণতরে ধৈর্য ধরুন। বদ্বিয়ে বলছি। এই ষাট বছর বয়সে তার কি আর ‘টমবয়স’ আছে? এখন আমাকে জাবড়ে ধরে আলিঙ্গন করাতে সে শূধু তার অন্তরতম অভ্যর্থনা জানালো।

আমি মনে মনে বললুম, চল্লিশ বছর ল্যাটে, চল্লিশ বছর ল্যাটে। এই আলিঙ্গন-চুম্বন চল্লিশ বছর পূর্বে দিলেই পারতে, সুন্দরী। পরে তাকে খুলেও বলেছিলাম।

ইতিমধ্যে ডীটার্ব আমতা আমতা করে বললে, “আমরা তা হলে আসি। রাত্রে পাটি’তে দেখা হবে।”

ওরা পাশেই থাকে। তিন মিনিটের রাস্তা। ওদের ভাব থেকে বুদ্ধিম, ওরা মনে করছে বিদ্যা ও সুন্দর যখন বহু বৎসর পর সন্মিলিত হয়ে গেছেন তখন ওদের কেটে পড়াই ভালো। আমাদের প্রেমটি যে চিরকালই নির্জলা জল ছিল সেটি হয়তো তারা গলা দিয়ে নাবাতে পারে নি—হজম করা তো হরের কথা।

লীজেল আমাকে হাতে ধরে ডুইংরুমের দিকে নিয়ে চললো। আমি বললুম, “এ নীক আদিকেন্তা! চল্লিশ বছর ধরে যখনই এ বাড়িতে এসেছি তখনই আমরা বসেছি বাবা, মা, বড়দি, তুমি, ছোড়দি রান্নাঘরে। অবিশ্যি মা রান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আজ কেন এ ব্যত্যয়? তদ্‌পরি ঐ বিরাট ডুইংরুম! বাপস্—” তুই যদি এক কোণে বসিস আর আমি অন্য কোণে, তা হলে একে অন্যকে দেখবার তরে জোরদার প্রাশান মিলিটারি দরবানের দরকার হবে; কথা কইতে হলে আমাদের দেশের ডাকহরকরা, নিশ্চয় একটা ট্রাংককল-ফোন ব্যবস্থা, আর—”

লীজেল সেই প্রাচীন দিনের মত বললে, “চোক্কোর চোক্কোর। তুই চিরকালই বড্ড বেশী বকর বকর করিস্।”

গীত পরিবর্তিত হল। আমরা শেষ পর্বস্ত রান্নাঘরেই গেলুম।

কিচেনের এক প্রান্তে টেবিল, চতুর্দিকে খান ছয় চেয়ার। অন্য প্রান্তে হুটো গ্যাসউনুন, তৃতীয়টা কয়লায় (সেটা খুব সম্ভব প্রাচীন দিনের ঐতিহ্য রন্ধার্থে)। দুই প্রান্তের মাঝখানে অন্তত দশ কদম ফাঁক। অর্থাৎ কিচেনটি তৈরী করা

হয়েছে দরাজ হাতে। কিন্তু লীজেলের মা যখন রাখতেন তখন এ-প্রান্ত থেকে আমাকে কিছু বলতে হলে বেশ জলা উঠিয়ে কথা কইতে হত।

লীজেল একটা চেয়ার দেখিয়ে বললে, “এটার বস্।”

সত্য বলছি, আমার চোখে জল এল। কি করে লীজেল মনে রেখেছে যে, চম্পিশ বৎসর পূর্বে তিনি গত হয়েছেন বছর আটত্রিশেক হবে। তার পিতা আমাকে ঐ চেয়ারটার বসতে বলতেন। আমি জানতুম, কেন। জানলা দিয়ে, ঐ চেয়ারটার থেকে দূর-দূরান্তের দৃশ্য সব চেয়ে ভালো দেখা যায়। পরে জানতে পেরেছিলাম, তিনি স্বয়ং ঐ চেয়ারটিতে বসে আপন ক্ষেতখামারের দিকে এবং বিশেষ করে তাঁর বিরাট আপেলবাগানের দিকে নজর রাখতেন—(মুশিহাবাদ জুগলে আমাদের যে রকম আমবাগান)। অবশ্যই তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে ভালোবাসতেন। নইলে আমাকে তাঁর আপন আসন ত্যাগ করে, আপন অভ্যস্ত আসন ছেড়ে দিয়ে ওখানে বসতে বলবেন কেন? আমি তো সেখান থেকে তাঁর ক্ষেতখামার, আপেলবাগান তদারকি করতে পারবো না—যারা ঘোরাঘুরি করছে তারা তাঁর আপন ‘মুনিব’ না ভিন্-জন আমি ঠাহর করবো কি প্রকারে? আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ? সেদিকে আমার কোনো চিন্তাকর্ষণ নেই। একদিন ঐ শেষ কথাটি তাঁকে আস্তে আস্তে ক্ষীণ কণ্ঠে বলতে—যাতে অন্যরা শুনতে না পায়—তিনি বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে অতিশয় সন্দেহের স্মিতহাস্যে বললেন, “তোমরা ইন্ডিয়ান। তোমাদের দেশে এখনো কল-কারখানা হয় নি। তোমরা এখনো আছে প্রকৃতির শিশু। শিশু কি মায়ের সৌন্দর্য বোঝে? না। সে শুধু তার মায়ের স্তনরস চায়—সেই স্তনরসের সৌন্দর্য কি সে বোঝে? যেমন তার বাপ বোঝে? ঠিক ঐরকম তোমরা তোমাদের মা-জননী জন্মভূমিতে ক্ষেতখামার করে খাদ্যরস আহারাদি করো। তোমরা এখনো কি করে বুঝবে, নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বলতে কি বোঝায়? সেটা শুধু হয় যখন মানুষ কলকারখানার গোলায় হয়ে হয়। অর্থাৎ মাতৃদুগ্ধ থেকে বর্ণিত হওয়ার পর, বড় হয়ে সে তার মাতৃদুগ্ধের মূল্য বুঝতে শেখে—”

আমি বললাম, “মানছি, কিন্তু দেখুন গ্রীস, রোম এবং আমার দেশ ভারত-বর্ষেও তো কলকারখানা নির্মিত হওয়ার বহু পূর্বে উত্তমোত্তম কাব্য রচিত হয়েছিল এবং সেগুলোতেও বিস্তর প্রাকৃতিক নৈসর্গিক বর্ণনা আছে। তবে কেন—?”

এসব কথাবার্তা যেন ঐ চেয়ারে বসে কানে শুনতে পাচ্ছি। কত বৎসর হয়ে গেছে। এমন সময় লীজেল আমার মাথায় মারলো একটা গাট্টা। আমার স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল। বিশেষ করে তার ঠাকুরমার ছবিটি।

“কি খাবে বলছিলাম?”

আমি আশ্চর্য হয়ে উত্তর দিলাম, “আমি তো কিছুই বলি নি।”

“তুমি চাও, তুমি যে সুপ পছন্দ করতে সেই সুপই করেছি—অর্থাৎ পী সুপ (বলাইশাটের সুপ)—এবারে বলো তুমি কি খাবে? তুমি যা খেতে চাও

তার জন্য মাছ, মাংস, ক্রীম আছে।”

আমি বললুম, “বিধি, সদূপ ছাড়া আমার অন্য কোনো জিনিসের প্রয়োজন নেই। আর এই জিনিসতে আমার সর্বাঙ্গ অসাড়। তবে কিনা আমি বলসন্তান। হেথায় ডান পাশে রাইন নদী। সে নদীর উত্তম উত্তম মাছ খেয়েছি কত বৎসর ধরে। তারই বিধি একটা কিছ—”

বেচারী লীজেল!

শুদ্ধকনো মদুখে বললে, “রাইনে তো আজকাল আর সে মাছ নেই।”

আমি শুধোলুম, “কেন?”

বললে, “রাইন নদের জাহাজের সংখ্যা বহু বেশী বেড়ে গিয়েছে। তাদের পোড়ানো তেল তারা ঐ নদীতে ছাড়ে। ফলে নদীর জল এমনই বিষে মেশা হয়ে গিয়েছে যে, মাছগুলো প্রায় আর নেই। আমার কাছে যে সব মাছ আছে সেগুলো টিনের মাছ।”

আমি বললুম, “তা হলে থাক।”

১০

বিন্দু যখন সোয়ামীর সঙ্গে ট্রেনে করে যাচ্ছিল তখন বললে, “আহা ওরা কেমন সুখে আছে।” আমারও ভাবি ইংরেজ ফরাসী জার্মান জাত কি রকম সুখে আছে। কিন্তু ওদের দ্বংখও আছে। তবে আমাদের মতো ওদের দ্বংখ ঠিক একই প্রকারের নয়। ওরা খেতে পায়, আশ্রয় আছে। তৎসঙ্গেও ওদের দ্বংখ আছে।

লীজেলদের বাড়ি প্রায় দ্বংশো বছরের পুরনো। সে আমলে স্টীল সিমেন্টের ব্যাপার ছিল না। বাড়িটা মোটামুটি কাঠের তৈরী। দ্বংশো বছর পরে ছাদটা নেমে আসছে। এটাকে থাড়া রাখা যায় কি প্রকারে!

আমি জিজ্ঞেস করলুম, “লীজেল, এটাকে কি মেরামত করা যায় না?”

লীজেল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, “শুদ্ধ ছাড়া নয়, দেওয়ালগুলো কুরখুরে হয়ে এসেছে। এ বাড়ি মেরামত করতে হলে কুড়ি হাজার মার্ক (আমাদের হিসাবে চল্লিশ হাজার টাকারও বেশী) লাগবে। বাবা গেছেন, আমার কোনো ভাইও নেই। ক্ষেতখামার দেখবে কে? আপেলবাগানটা পর্যন্ত বেচে দিয়েছি। তাই স্থির করেছি বাড়িটা সরকারকে দিয়ে দেবো। ওরা সব পুরোনো বাড়ির কিছু কিছু বাঁচিয়ে রাখতে চায়। কারণ এ বাড়িটির স্টাইল একেবারে খাঁটি রাইনল্যান্ডের।”

আমি বললুম, “এটা মর্টগেজ করে টাকাটা তোলা না কেন?”

লীজেল বললে, “যে টাকাটা কখনো শোধ করতে পারবো না সে টাকা ধার করবো কি করে!”

আমার মনে গভীর দ্বংখ হলো। বাড়িটি সত্যিই ভারী সন্দেহের। শুদ্ধ বাড়িটি নয়, তার পেছনে রয়েছে ফল-ফুলের বাগান, তরু-তরকারির ব্যবস্থা,

কুমো, হ্যান্ডপাম্প দিয়ে জল তোলার ব্যবস্থা—গ্রামাঞ্জে উত্তম ব্যবস্থা। ক্ষেত-খামার গেছে থাক। ওদের আপেলবাগান এই অঞ্চলে বৃহত্তম এবং শ্রেষ্ঠতমও ছিল। সেও গেছে থাক। কিন্তু এই সুন্দর বাড়িটা সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে, এটা আমার মন কিছুতেই মেনে নিতে চাইল না।

ইতিমধ্যে লীজেলের ছোট বোন মারিয়ানা এল। তিন বোনের ঐ একমাত্র স্নায়ু বিয়ে হয়েছিল। ঘে-ডার্টারিস আমাকে নিয়ে যাবার জন্য বন-এ এসেছিল তার মা। ছেলের বাড়ি দু'মিনিটের রাস্তা। সেখানে বউ নিয়ে থাকে।

মারিয়ানা বিধবা। প্রায় সাতাশ বছর পূর্বে তার বিয়ে হয়। বরাট ছিল খাসা ছোকরা—কিন্তু...

এ বাড়ির তিন বোনের কেউই নাৎসী ছিল না। এরা সবাই ধর্মভীরু ক্যাথলিক। ইহুদীরা প্রভু খৃষ্টকে হয়তো ভ্রুশাবিশ্ব করেছিল, হয়তো করে নি। যাই হোক, যাই থাক—তাই বলে ধর্ম, সুদর্শন সেই ঘটনার দু'হাজার বছর পর ওদের দোকানপাট, ডজনালয়, ওদের লেখা বইপত্র পুড়িয়ে দেবে (মহাকাব্য হাইনারিস হাইনের কবিতাও বাদ যায় নি), ইহুদী ডাক্তার, উকীল প্রায়কটিস করতে পারবে না—এটা ওরা গ্রহণ করতে পারে নি। এটা ১৯৩৪ সালের কথা। তখনো কনসানট্রেশন ক্যাম্প আরম্ভ হয় নি। যখন আরম্ভ হল তখন আমি দেশে। বন্ধু পুরোদমে শত্রু হয়ে গিয়েছে। চিটি-চাপাটির গমনাগমন সম্পূর্ণ রুদ্ধ। কিন্তু আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ ছিল না যে লীজেলের পরিবার এ-প্রকারের নিষ্ঠুর নরহত্যা শব্দে যে ঘণার চোখে দেখবে তাই নয়, এরা যে এর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারছে না সেটা তাদের মনকে বিকল করে দেবে।...এ সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমি যখন জার্মানি যাই তখন লীজেল আমাকে বলেছিল, ‘ডু হালদেক, তুই তো ভালো করেই চিনিস, আমাদের এই ম্যুফেনডারফ গ্রাম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের না হোক, জার্মানির ক্ষুদ্রতম গ্রাম। সেই হিসেবে আমরা প্রখ্যাততম গ্রাম। এখানে মাত্র একটা দুটো ইহুদী পরিবার ছিল। দীর্ঘ সময়মত ওদেরকে সুইটজারল্যান্ডে পাচার করে দিয়েছিল।

এবারে আরম্ভ হবে ট্রাজেডি।

মারিয়ানা বড় সরলা। এ-সব ব্যাপার নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাতো না। অবশ্য সেও ছিল আর দুই দ্বিদির মত পরদুঃখকাতর।

বিয়ে করে বসলো এক প্রচণ্ড পাড়ি নাৎসীকে। কেন করলো, এ মূর্খকে শোধোবেন না। মেয়েরা কেন কার প্রেমে পড়ে, কেন কাকে বিয়ে করে এ-নিগড়

১ আমার এক গুণী সখা আমাকে একদা বলেন, ‘সিপাহী বিদ্রোহ’র সময় চাপাটিরুটির মারফৎ ‘বিদ্রোহী’রা একে অন্যকে খবর পাঠাতো বলে ‘চিঠিচাপাটি’ সমাসটি নির্মিত হয়। কোনো এবং কিংবা একাধিক বিষয়জন্য যদি এ-বিষয়ে ‘দেশ’ পত্রিকায় সর্বস্তর আলোচনা করেন তবে এ-অজ্ঞজন উপকৃত হবে। কিন্তু দয়া করে আমাকে সরাসরি লিখবেন না। এটা পাণ্ডজ্ঞান। আমি ছাড়ুও পাঁচজনের উপকারার্থে।

তঁহ দেবতারও আৰিষ্কার করতে পারেন নি।

তারপর যুদ্ধ লাগল। সেটা শেষ হল।

এইবারে মার্কিন ইংরেজদের কুপায় দেশের শাসনভার পেলেন নাৎসীবৈরীরা। এঁরা খুঁজে খুঁজে বের করলেন নাৎসীদের। তখন আরম্ভ হল তাদের উপর নির্বাতন। আজ ধরে নিয়ে যায়। তিন দিন তিন রাত্তির গারবে নিজের কারাবাসের পর আপনাকে ছেড়ে দিল। আপনি ভাবলেন, যাক বাঁচা গেল। দশ দিন যেতে না যেতে আবার ভোর চারটেই আপনাকে গ্রেফতার করে ঠাসলো গারবে। (এই যে আপনাকে ছেড়ে দিয়েছিল সেটা শুধু আপনার পিছনে গোয়েন্দা রেখে ধরবার জন্য কারা কারা আপনার সহকর্মী ছিল; কারণ স্বভাবতই আপনি তাদেরই সম্মুখে বেরিয়েছেন। দ্বিতীয়ত এরা আপনার ধরবার বন্দু। আপনার দৈন্য-দুর্দিনে—একমাত্র তারাই আপনাকে সাহায্য করবে—অবশ্য যদি তাদের দুঃপরিস্থিতি থাকে।...এটা কিছুর নবীন ইতিহাস নয়। আমাদের এই স্বদেশী আন্দোলনের সময়, পরবর্তী যুগে ‘মহামান্য’ টেগার্ট সাহেবের আমলে—

বারে বারে সহস্র বার হয়েছে এই খেলা।

দারুণ রাহু ভাবে তবু হবে না মোর বেলা ॥)

সর্বশেষে মারিয়ানার স্বামীর তিন বছরের জেল হল। সেখানে যক্ষ্মা ৮ বেরিয়ে এসে ছ মাসের পরই ওপারে চলে গেল।

পাঠক ভাববেন না,

আমি নাৎসীবৈরীদের ঘোষ দিচ্ছি।

বার বার শুধু আমার মনে আসছে :—

এদেশের লোক সবাই কুশান।

এদেশের প্রভু, প্রভু খুঁটে আদেশ দিয়েছেন, ক্ষমা, ক্ষমা, ক্ষমা।

জানি মানুষ এত উঁচুতে উঠতে পারে না।

কিন্তু সেই চেষ্টাতেই তো তার খুঁটখুঁ, তার মানদ্রব্য।

হৃদয়ে হৃদয়ে, হৃদয়ে।

কৈশোরে অকস্মাৎ আমরা বলতাম, হিপ্পো হিপ্পো হৃদয়ে।

পদ্যোপাঙ্গা ব্লোজিট নিশ্চয়ই এ্যার ইন্ডিয়া কোম্পানির।...দীর্ঘ হাওয়াই মুসাবিরির পর অঘোরে ধূমিরোহিলাম সকাল আটটা অবধি। নীচে নাবতেই লীজেল চৌচক্রে বললে, “ভু হালদুকে! তোর হারানো স্কাটকেন্স ফিরে পাওয়া গিয়েছে।”

“কি করে জানলি?”

“আমাদের তো টেলিফোন নেই। চল্লিশ বছর আগে এই গোডেসবেগের ফে

বাড়িতে তুই বাস করতিস তার টেলিফোন নম্বরটি তুই কলোনের 'হারানো প্রাপ্তির দফতরে সন্ধানিমানের মত দিয়ে এসেছিলি। আশ্চর্য! সে নম্বর তুই পদুপদু করে এত বৎসর ধরে পদুধে রেখেছিলি কি করে আর সেটা যে কলোনের সেই 'হারানো প্রাপ্তির দফতরে আপন স্মরণে এনে ওদের দিয়েছিলি সেটা আরো বিস্ময়জনক। তোর পেটে যে এত এলুম তা তো জানতুম না। আমি তো জানতুম তোর পশ্চাৎদেশে টাইম বম রাখতে হয়। আমরা বাঙলার বলি, 'পেটে বোমা না মারলে কথা বেরোয় না', ফিউজের হিস্‌হিস্‌ শব্দে তব তোর বদ্বিধ খোলে! সে-কথা থাক। কালোনের দফতর সেই নম্বরে ফোন করে, আর তোর সেই প্রাচীন দিনের ল্যান্ডলেডির মেয়ে 'আনা' সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু গেল তুই আমাদের বাড়িতে উঠেছিলি। তা ছাড়া যাবি আর কোন চুলোয়। আনা'র বিষে হরেছে এক বৃদ্ধ আগু। ভারত আর বাচ্চা দুটো রয়েছে। তাই সেখানে না উঠে আমাকে আপ্যায়িত করতে এসেছিলি। ফের বলাই সে-কথা থাক। আনা কিন্তু বদ্বিধমতী মেয়ে—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "হবে না কেন? আমি ওদের বাড়িতে ঝাড়া একটি বছর ছিলুম। আমার সঙ্গ পেয়েছে বিস্তর।"

লীজেল আমার দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে কোনো মন্তব্য না করে বললে, "সে জানে আমাদের টেলিফোন নেই। কিন্তু আমাদের পাশের বাড়ির মহিলার আছে। তাকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে যে তার সন্টেকেসটি পাওয়া গিয়েছে এবং কলোন দফতরে জমা পড়েছে।"

আমি বললুম, "সর্বনাশ! আমাকে এখন ঠ্যাঙস ঠ্যাঙস করে যেতে হবে সেই খেড়খেড়ে-গাবিশ্বপূর কলোনে? আধখানা দিন তাতেই কেটে যাবে। হেথায় এসেছি কদিনের তরে? তারও নিরেট চারটি ঘণ্টা মেয়ে দিয়েছে জুড়িক। কনেকশন ছিল না বলে। আমি—"

লীজেল বাধা দিয়ে বললে, "চল্লিশ বৎসর পূর্বে প্রাথমিক পরিচয়ে তোকে যে একটা আকাট মুখ ঠাউরেছিলুম সেটা কিছু ভুল নয়; কলোনের দফতরে তোর প্র্যাকটিকাল বদ্বিধ ব্যতায়। অবশ্য আমি কখনো বলি নে এক্সেসপ্‌শন্‌ প্রভুজ দি রুল, আমি বলি রুল প্রভুজ দি এক্সেসপ্‌শন্‌। তো সন্টেকেস তারাই এখানে পে'ছে দেবে।"

*

*

*

ওঃ! কী আনন্দ, কী আনন্দ! কাল রাতে ভয়ে ভয়ে আমি আমার হারিয়ে না যাওয়া বড় সন্টেকেসটি খুঁজি নি। যদি দেখি, এদের এবং আমার অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবের জন্য ছোটখাটো যে-সব সওয়াণ এনেছি সেগুলো এই বড় সন্টেকেসটিতে নেই। এটাকেই নাকি বিদেশী ভাষায় বলে অসিট্রিচ মনোবাস্তি।

ইতিমধ্যে বাড়ির সদর দরজাতে ঘা পড়লো। লীজেল সেথায় গিয়ে কি যেন কথাবার্তা কইলে। মিনিট দুই পরে সেই হারিয়ে-যাওয়া-ফিরে-পাওয়া সন্টেকেসটি নিয়ে এসে আমার সামনে রেখে বললে, "তোদের এয়ার-কোমপানি তো বেশ স্মার্ট: কম্পিউটেন্ট। এত তড়িঘড়ি হুঁলিয়া ছেড়ে বাস্টাকে ঠিক ঠিক পকড়

কর তোর কাছে পেঁছে দিলে।” আমার ছাতি সূদীল পাঠক, ইণ্ডিয়ান—মাফ করবেন, আজকাল নাকি তাবৎ মাপ সেন্টিমীটার মিলিমীটারে বলতে হয়—অর্থাৎ ১৫ মিলিমীটার কিংবা সেন্টিমীটারও হতে পারে—আমার প্রিন্স অব ওয়েলস্ অর্থাৎ বড় বাবাজী যে ইস্কেলখানা রেখে দিয়ে ঢাকা চলে গিয়েছেন সেটাতে তার হাঁকস মেলে না। ফুলে উঠলো।

বাকসোটা খুলে দেখি, আমার মিত্র মিত্র যে-সব বস্তু খাদি প্রতিষ্ঠান থেকে কিনে দিয়েছিল তার সবই রয়েছে (১) বারোখানা মর্শিদাবাদী রেশমের স্কার্ফ, (২) উড়িষ্যার মোঘের শিঙে তৈরী ছ’টি হাতি, (৩) পূর্ববং ঐ দেশেরই তৈরী পিঠি চুলকানোর জন্য ইয়া লম্বা হাতল, (৪) দশ বাঁশডল বিড়ি (এগুলো অবশ্য লীজেল পরিবারের জন্য নয়; এগুলো আমার বন্ধুর জন্য), (৫) ভিন্ন ভিন্ন গরমশলা এবং আচার, (৬) বর্ধমানের রাজপরিবারের আমার একটি প্রিয় বান্ধবীর দেওয়া একখানি মাকড়সার জালের মত সূক্ষ্ম স্কার্ফ (তার শর্ত ছিল সেটি যেন আমি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ বান্ধবীকে দিই), (৭) তিনটি ফাস্ট ক্লাস বেনারসী রেশমের টাই, কাশ্মীরের ম্যাংগো ডিজাইনের শালের মত ওগুলো বর্ধমানেরই দেওয়া, (৮) দুই পৌন্ড দক্ষিণ ভারতের কফি ও পূর্ববং ওজনে দারজিলিংয়ের চা।...এবং একখানা বই ঠাকুর রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে—তার এক বিশেষ পুজারিণীর জন্য, তিনি বাস করেন সুইটজারল্যান্ডে। আর কি কি ছিল ঠিক ঠিক মনে পড়ছে না। বেশ কিছু কাসুশ্বেদাও ছিল। এই ইয়োরোপীয়ানদের বস্ত্রই দেখাক, তাদের মাস্‌টার্ড নিয়ে। দম্ভজনিত আমার উদ্দেশ্য ছিল এদেরকে দেখানো যে আমাদের বাঙলাদেশের কাসুশ্বেদা এ-লাইনে অনিবচনীয়, অতুলনীয়। পাউডার দিয়ে তৈরী ওদের মাস্‌টার্ড দু’দিন যেতে না যেতেই মসনে ধরে সবুজ হয়ে অখাদ্যে পরিবর্তিত হয়। আর আমাদের কাসুশ্বেদা? মাসের পর মাস নির্বিকার ব্রহ্মের মত অপরিবর্তনশীল।

লীজেলকে বললুম, “দাঁদি, এসব জিনিস ঐ বড় টেবিলটার উপর সাজিয়ে রাখ। আর খবর দে ডায়েরি ও তার বউকে। মারিয়ানা আর তুই তো আছিসই। যার যা পছন্দ তুলে নেবে।”

লীজেল বললে, “এটা কি ঠিক হচ্ছে? এখান থেকে তুই যাবি ড্যালসডফে—সেখানে তোর বন্ধু পাউল আর তার বউ রয়েছে। তারপর যাবি হামদুর্গে; সেখানে তোর বান্ধবীর (তিনি গত হয়েছেন) তিনটি মেয়ে রয়েছেন। তারপর যাবি স্টুটগার্ট-এ। সেখানে রয়েছেন তোর ফাস্ট লভ। এখানেই যদি ভালো ভালো সওগাৎ বিলিয়ে দিস তবে ওরা পাবে কি?”

একেই বঙ্গভাষায় বলে পাকা গৃহিণী। কোন্‌ গয়না কে পাবে কে জানে।

গডেসবেগ সতাই বড় সুন্দর। এ শহরের সৌন্দর্য আমাকে বার বার আনন্দিত করেছে। রাস্তাগুলো খুবই নির্জন। এতই নির্জন যে পথে কারো সঙ্গে দেখা হলে সে সম্পূর্ণ অচেনা হলেও আপনাকে অভিবাদন জানিয়ে বলবে, ‘গুটেন টাই’। আপনিও তাই বলবেন। রাস্তার দু’পাশে ছোট-ছোট গেরস্তবাড়ি। সবাই বাড়ির সামনে যেটুকু ফাঁকা জায়গা আছে তাতে ফুল ফুটিয়েছে। যদি কোন বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আপনি ফুলগুলোর দিকে মৃদুস্বপ্নে তাকিয়ে থাকেন তবে প্রায়ই বাড়ির কর্তা, কিংবা গিন্নী, কিংবা তাদের ছেলেমেয়ের একজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আপনার সঙ্গে কথা জুড়ে বসবে। শেষটায় বলবে, ‘আপনিও আমাদেরই একজন; কিছু ফুলটুল চাই? বলুন না, কোন গুলো পছন্দ হয়েছে।’ তারপর একগাল হেসে হসত বলবে, ‘প্রেমে পড়েছেন নাকি? তাহলে লাল ফুল। হাসপাতালে রুগী দেখতে যাচ্ছেন নাকি? তাহলে সাদা ফুল।’ আমি একবার শূধিয়েছিলুম, ‘আর যদি আমার প্রিয়র সঙ্গে ঝগড়া হয়ে থাকে, তাহলে কি ফুল পাঠাব?’ যাকে শূধিয়েছিলুম তিনি তখন দু’গাল হেসে বলেছিলেন, ‘সবুজ ফুল। সবুজ ঈর্ষার রঙ।’ আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, ‘সবুজ ফুল এদেশে দেখি নি কখনো। আমাদের দেশেও সবুজ ফুল একেবারেই বিরল।’ ভদ্রলোক বললেন, ‘আমাদের দেশেও। কিন্তু আমাদের এক প্রতিবেশীর বাড়িতে সবুজ ফুল আছে। আমি এখনি এনে দিচ্ছি।’

‘ও মশাই, দাঁড়ান দাঁড়ান, আমার সবুজ ফুলের তেমন কোনো প্রয়োজন নেই—ও মশাই—’

কিন্তু কে বা শোনে কার কথা!

মিনিট দুই যেতে না যেতেই সেই মহাআর পুনরাবির্ভাব। হাতে একটি সবুজ গোলাপ। চোখেমুখে যে আনন্দ তার থেকে মনে হলো তিনি যেন বাকিংহাম প্রাসাদ কিংবা কুতুবমিনার কিংবা উজ্জই কুড়িয়ে এনেছেন। আমি বিস্তর ‘ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ডাকৈ শ্যোন, ডাকৈ রেবট শ্যোন’ বলে অজস্র ধন্যবাদ জানালুম।

ইতিমধ্যে বাড়ির দরজা খুলে গেল। চাঁপ্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের একটি মহিলা ডেকে বললেন, ‘ওগো, তোমার কফি—’

ইঠাং আমাকে দেখে কেমন যেন চুপসে গেলেন।

ভদ্রলোক বললেন, ‘চলুন না। এক পান্ন কফি—হ’ হে’—’

আমি বললুম, ‘কিন্তু আপনার গৃহিণী—?’

‘না, না, না—আপনি চিন্তা করবেন না। আমার গৃহিণী খান্ডারিণী নয়। অবশ্য সে আপনাকে কখনো দেখে নি। চলুন চলুন।’

বসার ঘরে ঢুকে ভদ্রলোক আমাকে কফি টেবিলের পাশে সযত্নে বসিয়ে বললেন, ‘আপনাকে চাঁপ্লিশ বৎসর পূর্বে কত না দেখেছি। আমার বয়েস তখন চোদ্দ-পনেরো। কিন্তু ভয়ে আপনার সঙ্গে পরিচয় করতে পারি নি—’

আমি বাধা দিবে বললুম, “সে কি?”

“এসে, আমি জানতুম, আপনি ইন্ডিয়ান। আর ইন্ডিয়ানরা সব ফিলসফার! তারা ষষ্ঠতর ধার তার সঙ্গে কথা কয় না। তাই। আপনি ধীরে ধীরে পা ফেলে যেতেন রাইস নদের পারে। আমি কত না দিন আপনার পিছন পিছন গিয়েছি। আপনি একটি বেঞ্চিতে বসে রাইনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি বেন ভাবতেন। তখন কি আর বিরক্ত করা যায়?”

আমি বললুম, “রাধার, এটা বড় ভুল করেছ। তখন আমার সঙ্গে কথা কইলে বড়ই খুশী হতুম।”

ইতিমধ্যে বাড়ির গৃহিণী কেক ইত্যাদি নিয়ে এসে আমাদের টেবিলে রাখলেন। তাঁর গাল দুটো আরো লাল হয়ে গিয়েছে, ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরছে এবং তিনি হাঁপাচ্ছেন। অর্থাৎ এ পাড়ায় কোনো কেকের দোকান নেই বলে তিনি কুড়ি মিনিটের রাস্তা ঠেঙিয়ে কেক টাট নিয়ে এসেছেন।

এ স্থলে যে কোনো ভদ্রসন্তান ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মাফ চাইতো। বলতো, ‘এ সবে রকি প্রয়োজন ছিল?’ কিন্তু আমি চাই নি। আমাকে বেয়াধব মূর্খ বা খুশী বলতে পারেন।

আমি শুধু আমার পকেট থেকে একটি রুমাল বের করে তাঁর কপালটি মুছে দিলুম।

১৩

ভ্রমগকাহিনী লিখতে লিখতে মানুস আশকথা পাশকথার উত্থাপন করে। গুণীরা বলেন এটা কিছু দৃষ্কর্ম নয়। সদর রাস্তা ছেড়ে পথিক যদি পথের ভুলে আশপথ পাশপথ না যায় তবে অচেনা ফুলের নয়া নয়া পাখির সঙ্গে তার পরিচয় হবে কি প্রকারে? কবিগুরুও বলেছেন,

“যে পথিক পথের ভুলে,

এল মোর প্রাণের কুলে—”

অর্থাৎ প্রণয় পথ হতে পারে। তাই আমি যদি মাঝে মধ্যে এদিক ওদিক ছিটকে পড়ি তবে সঙ্গর পঠক অপরাধ নেবেন না।

আলেকজান্ডার ফন হুম্বল্টের নাম কে না শুনেছে? নেপোলিয়ন, গ্যোট্টে, শিলারের সমসাময়িক। দুই কবির সঙ্গে তাঁর ভাবের আদান প্রদান হত। এবং অনেকেই বলেন, ঐ সময়ে পাশ্চাত্য মহাদেশগুলোতে নেপোলিয়নের পরেই ছিল হুম্বল্টের সূচ্যাত। আসলে তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক এবং পথটক—ওদিকে কাব্য দর্শন অলংকার শাস্ত্রের সঙ্গেও সুপরিচিত।

কিন্তু তাঁর পরিপূর্ণ পরিচয় দেওয়া আমার শক্তির বাইরে এবং সে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এ-লেখাটি আরম্ভও করি নি।

হুন্সলট্ গত হন ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে। বেহেতু তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক যোগাযোগের জন্য (দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ককেশাস সাইবীরিয়া পর্যন্ত) অতিশয় সফলমান ছিলেন তাই ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বার্লিনের জার্মান পররাষ্ট্র দফতরের উৎসাহে ঐ দেশে জনসাধারণ একটি প্রতিষ্ঠান—এন্ডাওমেন্ট বেসেস্তার রকোস্তর, ওলাকফ, বা হুন্সলট্ বলতে পারেন—নির্মাণ করলো, নাম : আলেকজান্ডার ফন হুন্সলট্ স্টিকটুট্। তাদের একমাত্র কর্ম তখন ছিল বিদেশী ছাত্রদের বৃত্তি দিয়ে জার্মানিতে পড়াশুনো করার ব্যবস্থা করে দেওয়া। আমার বড়ই বিস্ময় বোধ হয়, জার্মানির ঐ বৃত্তিনে (ইনস্ট্রেশন সবে শেষ হয়েছে; তার খোঁজার তখনও কাটে নি) সে কি করে ঐ প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করলো? আমরা বলি ‘আপনি পায় না খেতে—’ অনেক চিন্তা করে বুঝেছিলুম, দয়াব্যক্তিগ্য আর্থিক সচ্ছলতার উপর নির্ভর করে না। লক্ষপতি একটা কানাকাড়ি ভিখিরিকে দেয় না, অথচ আমি আপন চোখে দেখেছি এক চক্ষুমান ভিখারি এক অশ্ব ভিখিরিকে আপন ভিক্ষালব্ধ দু’চার আনা থেকে দু’পয়সা দিচ্ছে। আমার এক চেলা ইদানিং আমাকে জানালে গঙ্গাম্বরুপা ইন্দ্ররাজীও নাকি বলেছেন, গরীবই গরীবকে মদ্য দেয়।

সে আমলে ইন্ডিয়া পেত মাত্র একটি স্কলারশিপ—আজ অনেক বেশী পায়।^১ সেটি পেলেন আমার বন্ধু সতীর্থ বাসুদেব বিশ্বনাথ গোখলে।^২ ইনি সবজনপূজ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বর গোখলের ভ্রাতৃপুত্র। তার চার বৎসর পর পেলুম আমি। সে-কথা থাক। মাঝে মাঝে গাধাও রাজমুকুট পেয়ে যায়।...

গোডেস-বেগ শহরের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দেখি, একটি বাড়ির সম্মুখে মোটা মোটা হরফে লেখা।

আলেকজান্ডার ফন হুন্সলট্ স্টিকটুট্

আমারে তখন আর পায় কে? লম্বা লম্বা পা ফেলে তল্লাশেই সে বাড়িতে উঠলুম।

আমি অবশ্যই আশা করি নি যে সেই চল্লিশ বৎসর পূর্বোক্ত লোক ঐ আপিস চালাবেন।

কিন্তু এনারাও ভুললোক। অতিশয় ভুলভাবে শ্রমোলেন,

“আপনি কোন্ সালে হুন্সলট্ বৃত্তি পেয়েছিলেন?”

“১৯২৯।”

১ দয়া করে আমাকে প্রসন্ন শ্রদ্ধায় চিঠি লিখবেন না, কি কৌশলে ঐ স্কলারশিপ পাওয়া যায়।

২ দয়া করে “গোখলে” উচ্চারণ করবেন না।

ভুল্লোলক যেন সাপের ছোবল খেয়ে লক্ষ বিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ানেন।

আমিও তাক্সব বনে গিয়ে বললুম,

“কি হল?”

“কী! চল্লিশ বছর পূর্বে।”

“এজ্ঞে হাঁ।”

“মাইন গট্ (মাই গড্) এত প্রাচীন দিনের কোনো স্কলারশিপ হোল্ডারকে আমি তো কখনো দেখি নি।”

আমি একটুখানি সাহস পেয়ে বললুম, “স্বাদার, ইহসংসারে তুমিও অনেককিছু দেখেছো নি, আশ্মো দেখি নি। তুমি কি আপন পিঠ কখনো দেখেছ? তাই কি সেটা নেই?”

* * * *

যেহেতু আমি এ-বাড়িতে ঢোকার সময় আমার ভিজিটিং কার্ড পাঠিয়ে দিয়েছিলুম, তাই তারা ইতিমধ্যে চেক-অপ ক’রে নিয়েছে, আমি সত্য সত্যই ১৯২৯-এ স্কলারশিপ পেয়ে এ-দেশে এসেছিলাম।

ইঠাৎ ভুল্লোলকের মূখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

“অ—অ—অ। জ্ঞানেন, আপনি আমাদের প্রাচীনতম স্কলারশিপ হোল্ডার?”

আমি সবিনয়ে বললুম,

“তা হলে আমাকে আপনাদের প্রাচ্যদেশীয় ষাধুঘরে পাঠিয়ে দিন। টুটেন-খামেনের মিমির পাশে কিংবা রানী নক্কেটাটির পাশে আমাকে শাইয়ে দাও।”

১৪

সুইটজারল্যান্ড, জর্মনি, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেনে টাকাকড়ির এমনই ছড়াছড়ি, সে কড়ি কি করে খরচ করবে যেন সেটা ভেবেই পায় না। বিশ্বময় (সঠিক বলতে পারবো না, তবে বোধ হয় চীন এবং লোহ-যবনিকার অন্তরালের দেশগুলো এখনো অপারস্কেয়) গন্ডায় গন্ডায় স্কলারশিপ ছড়ানোর পরও হুম্বল্ট ওয়াক্সের হাতে বেশ-কিছু টাকা বেঁচে যায়।

তাই তারা প্রতি বৎসর একটা জম্বর পরব করে। তিন দিন ধরে জর্মনিতে যে শত শত হুম্বল্ট স্কলার ছাড়িয়ে আছে এবং যারা একদা স্কলার ছিল, উপস্থিত জর্মনিতেই কাজকর্ম করে পয়সা কামাচ্ছে, তাদের সবাইকে তিন দিনের তরে বাড়-গডেসবের্গে নৈমন্তিক জানায়। যারা বিবাহিত, তাদের বউ কাচ্চা বাচ্চা সহ;—বলা বাহুল্য ঐ উপরোক্ত সম্প্রদায়, যারা কাজকর্ম করে পয়সা কামায়। আসা-যাওয়ার ট্রেন ভাড়া, হোটেলের খাইখর্চা, তিনদিন ধরে নানা-বিধ মীটিং পরব নৃত্যগীত, অনুষ্ঠানে যাবার জন্য মোটরগাড়ি—এক কথায় সব—সব। প্রাচীন দিনে আমাদের দেশে যে-রকম জম্বিয়ারবাড়িতে বিয়ের সময়

অশখানা গাঁয়ের বাড়িতে তিন দিন ধরে উনুন জ্বালানো হত না।

হ্যার পাপেনহুস্‌ স্টিফটুঙের অন্যতম কর্তাব্যক্তি। আমাকে সান্নিধ্য অনুরোধ জানিয়ে বললেন, “আপনার তুলনায় জার্মানিতে উপস্থিত যে-সব প্রাক্তন স্কলার আছেন তাঁরা নিতান্তই শিশু—”

আমি বললুম, “আমার হেঁটোর বয়স।”

পাপেনহুস্‌ ভুরু কঁচকে আমার দিকে তাকালেন। অর্থাৎ বুঝতে পারেন নি। সব দেশের ইন্ডিয়ম, প্রবাদ তো একই ছাঁচে তৈরী হয় না। আমি বুঝিয়ে দেওয়ার পর বললুম, “আমাকে যে আপনাদের পরবে নিমন্ত্রণ করেছেন তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আপনাদের পরব আসছে সপ্তাহ তিনেক পরে। ওঁদিকে আমাকে যেতে হবে কলোন, ড্রাস্‌লডর্ফ, হামবুর্গ, স্টুটগার্ট—এবং সর্বশেষ স্টুটগার্ট থেকে প্রায় ত্রিশ চাঁল্লিশ মাইল দূরে পাড়াগায়ে আমার প্রাচীন দিনের এক বিধবা বাস্‌ধবীর সঙ্গে দেখা করতে। আমরা একসঙ্গে পড়াশুনো করেছি। তার অর্থ আমার স্কলারশিপের মত তিনিও চাঁল্লিশ বছরের পুরনো—প্লাস তাঁর বয়স।”

লক্ষ্য করলুম, যে তৃতীয় ব্যক্তি ‘সভাস্থলে’ উপস্থিত ছিলেন তাঁর চোখে ঠোঁটে কেমন যেন একটুখানি মৃদু হাসি খেলে গেল। এর অর্থ হতে পারে :—

(১) এ তো বড় আশ্চর্য! ষাট বছর বয়সের প্রাচীন প্রিয়র অভিসারে যাচ্ছে এই নাগর!

কিংবা

(২) এর এক-প্রিয়া-নিষ্ঠতাকে তো ধান্য মানতে হয়!

(রামচন্দ্রকে বলা হয় একদারনিষ্ঠ।)

ইতিমধ্যে কর্তা বললেন, “সে কি কথা! আপনি আসবেন না, সে তো হতেই পারে না। আপনার ভাষায়ই বলি আপনার মত ‘মিউজিয়ম পীস’ আমাদের কর্তাব্যক্তিদের গুণীজ্ঞানীদের দেখাতে পারবো না, সে কি একটা কাজের কথা হল? ওনারের অনেকেই ভাবেন, আমাদের আলেকজান্ডার ফন হুম্বল্ট স্টিফটুঙ বুঝি পরশু দিনের বাচ্চা। অথচ আমাদের প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন হবে সেই ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে—অবশ্য যুদ্ধের ফলস্বরূপ জার্মানি যখন তখনই হয়ে গেল তখন কয়েক বৎসর প্রতিষ্ঠান বেউলে হয়ে রইল। এঁদের আমি ঘোষ দিই নে—সব জার্মানই তো ঐতিহাসিক মমজেন হয় না। অতএব চাঁল্লিশ বছরের পূর্বেকার জলজ্যান্ত একজন ব্যক্তিদারীকে যদি ওদের সামনে তুলে ধরতে পারি, তখন হৃদয়দের পেতায় যাবে—”

আমি মনে মনে বললুম, ঈশ্বর রক্ষতু। যাদুঘরে যে-রকম পেডেস্টালের উপর গ্রীক মূর্তি খাড়া করে রাখে, সে রকম নয় তো! তা করুক, কিন্তু জামাকাপড় কেড়ে নিয়ে লজ্জা নিবারণার্থে কুলে একখানা ছুদ্রপাতা পরিয়ে দিলেই হতো চিন্তার—

কর্তা বলে যেতে লাগলেন, “আপনি পরবের সময় কন্‌টিনেন্টে যেখানেই থাকুন না কেন, আমরা সানন্দে আপনাকে একখানা রিটার্ন টিকিট পাঠিয়ে দেব।

সৈয়দ মজ্জতবা আলী রচনাবলী (৭ম)—২৬

এখানে হোটেলের ব্যবস্থা যানবাহন সবই তো আমরা কসে থাকি। তারপর আপনি ফিরে যাবেন আপন মোকামে।” বিষন্ন কণ্ঠে বললেন, “আপনি কি মাত্র তিনটি দিনও স্পেন্সার করতে পারবেন না?...আচ্ছা, তবে এখন চলুন আমাদের সঙ্গে লাগ খেতে।”

বস্ত্রই নৈমকহারামী হয়। তবুপরি এরা আমাকে আবার দুই মৃগ পরে আবার নৈমক দিতে চায়। একদা যে প্রতিষ্ঠান যে জম'ন জাত এই তরুণকে স্কলারশিপ-নৈমক দিয়েছিল, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে, তাদেরকে নিরাশ করি কি প্রকারে?

আমি স্কৃতস্তম্ভ পরিপূর্ণ সন্মতি জানালুম।

রেস্তোরাঁটি সাদামাটা, নিরিবিবি, ছোটখাটো, ঘরোয়া। ব্যান্ড-বাদ্য, জ্যাজ-ম্যাজিক, খাপসদরং তরুণীদের ঝামেলা, কোনো উৎপাতই নেই। বদ্বতে কোনো অসুবিধা হল না যে এ রেস্তোরাঁতে আসেন নিকটস্থ আপিস-দফতরের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা! তার অন্যতম প্রধান কারণ ‘মেনু’ (খাদ্যনির্ঘণ্ট) দেখেই আমার চক্ষুস্থির। তড়িতেই হিসেব করে দেখলুম এখানে অতি সাধারণ লাগ খেতে হলেও নিদেন পনেরো মার্ক লাগায় কথা। আমাদের হিসেবে তিনখানা করকরে দশ টাকার নোট। অবশ্য গচ্ছাটা আমাকে দিতে হবে না। কারণ ওঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন। এবং এ-দেশের রেস্তোরাঁতে যে ব্যাস্তি অভ্যর্থন দিল সে-ই পেমেন্ট করবে—যে খেলো তার কোনো দায় নেই।

কিন্তু এ-স্থলে সেটা তো কোনো কাজের কথা নয়।

যাঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন তাঁরা আমাকে মেনু এগিয়ে দিয়ে বলেছেন, “কি খাবেন, বলুন।” আমি কি তখন তাঁদের ঘাড় মটকাবো?

আমি শূদখোলুম, “আপনারা কি এই রেস্তোরাঁতেই প্রতিদিন লাগ খেতে আসেন?”

“এজ্ঞে হ্যাঁ।”

“কি খান, মানে, কোন কোন পদ।”

“সুপ, মাংস আর পুড়িঙ। কখনও বা আইসক্রীম—তবে সেটা বেশীর ভাগ গ্রীষ্মকালে। মাঝে মাঝে শীতকালেও।”

আমি অবাক হয়ে শূদখোলুম, “শীতকালে আইসক্রীম!”

তখন আমার মনে পড়লো আমরাও তো দ্বারদূর গরমের দিনে গরমের চা খাই। তবে এরাই বা শীতকালে আইসক্রীম খাবে না কেন?

আমি অতিশয় সাদামাঠা লাগ অভ্যর্থন দিলুম। যে হাঁস সোনার ডিম পাড়ে, তার গলা মটকতে নেই।

আহারাদির কেছা শূন্য হলেই আমি যে বে-এক্কেয়ার হয়ে যাই আমি সম্প্রদে-
সে বদনাম এতই দীর্ঘকালের যে তার সাফাই এখন যেবাক তামাদি—ইংরাজী
আইনের ভাষায় ‘টাইম-বার’ না কি যেন বলে—হয়ে গিয়েছে। তাই পাঠক
‘ধর্মবিতারের’ সমুদখে করজোড়ে স্বীকার করে নিচ্ছি “আমি দোষী, অপরাধ
করেছি।”

কিন্তু আমি জাত-ক্রিমিনাল। আমার মিত্র এবং পৃষ্ঠপোষক জেল সুপারিন-
টেনডেন্ট তাঁর একাধিক প্রামাণিক পুস্তকে লিখেছেন, এই বঙ্গদেশে ‘জাত-
ক্রিমিনাল’ হয় না! হঁ! আমি জাত-ক্রিমিনাল সেটা জানার পূর্বেই তিনি
এসব দায়িত্বহীন ‘ব্যাকাবিন্যাস’ করেছেন। তাই আমি আবার সেই লাঞ্চার বর্ণনা
পুনরায় দেব।

সুদূর আমি বহু বেশী একটা ভালোবাসি নে।

এ বাবদে কিন্তু আমি সমুদ্রের বেলাভূমিতে সম্পূর্ণ একাকী নড়ি নই। ডাচেস
অব উইন্ডসর (উচ্চারণ নাকি ‘উইনজার’) অতি উত্তম রান্নাবান্না করতে পারেন।
তা সে অনেকেই পারেন। কিন্তু তিনি আরেকটি ব্যাপারে অসাধারণ হুন্দুরি।
ভোজনটি কি প্রকারে ‘কম্পোজ’ করতে হবে—এ-তথ্যটি তিনি খুব ভালো করে
জানেন।

অপরাধ নেবেন না। আমরা বাঙালী মাত্রই ভাবি ভোজনে যত বেশী পদ
দেওয়া হয় ততই তার খানদানিও বেড়ে যায়। তিন রকমের ডাল, পাঁচ রকমের
চচ্চড়ি, তিন রকমের মাছ, দু-তিন রকমের মাংস, চিনিপাতা দই আর কত হরেক
রকমের মিষ্টি—তার হিসেব নাই বা দিলুম।

আর প্রায় সব-কটাই অখাদ্য! কারণ, এতগুলো পদের জন্য তো এতগুলো
উনুন করা যায় না, গোটা দশেক পাচক ডাকা যায় না। অতএব বেগুনভাজা
মেগনোলিয়ার আইসক্রীমের মত হিম, চিনি-পাতা দই পাঞ্জাব মেলের এনজিনের
মত গরম, লুচি কুকুরের জিভের মত চ্যাপ্টা, লম্বা,—খেতে গেলে রবারের মত।
আজকাল আবার ফ্যাশন হয়েছে ঘি-ভাত বা পোলাউয়ের বদলে চীনা ফ্রাইড
রাইস। চীনারা ‘র’ উচ্চারণ করতে পারে না। অতএব বলে ‘ফ্রাইড লাইস’
—অর্থাৎ ‘ভাজা উকুন’! তা সে যে উচ্চারণই করুক আমার তাতে কানাকাড়ি
মাত্র আপত্তি নেই। শূন্যেই মহাকবি শেকসপীয়র বলেছেন, ‘গোলাপ যে-নামে
ডাকো গন্ধ বিতরে’। তাই ‘ফ্রাইড রাইস’ বলুন বা ‘ফ্রাইড লাইস’ই বলুন—
সোওয়ার্দি উক্ত হলেই হল। কিন্তু আজকালকার কেটারাররা (হে ভগবান, এই
সম্প্রদায়কে বিনষ্ট করার জন্য আমি চোঙ্গস খান হতে রাজী আছি) নেটিভ পাচক
দিয়ে ‘ফ্রাইড লাইস’ নির্মাণ করেন। সত্য সত্য তিন সত্য বলছি, সে মহামূল্য
সম্পদ জিহ্বায় স্পর্শ করার পূর্বেই আপনি বুঝে যাবেন এই অভূতপূর্ব বস্তু
‘উকুন ভাজা’। আলবৎ, আমি নতমস্তকে স্বীকার করছি, ‘উকুন ভাজা’ আমি
কেটারার-সম্প্রদায়ের অবদান—মেহেরবাণীর পূর্বে কখনো খাই নি। তাই

গোড়াতেই বেলোছি, আমরা মেন্দু কম্পাঙ্ক করতে জানি নে।

তা সে থাক, তা সে থাক। পরনিশ্চয় মহাপাপ। এখানেই ক্ষান্ত দিই।
যরস যত বাড়ে মানব ততই খিটখিটে হয়ে যায়।

পূরনো কথায় ফিরে যাই। ডাচেস অব উইনজার নাকি তাঁর লাগু ডিনারে নিমন্ত্রিতজনকে কখনো সদুপ পরিবেশন করেন না। অতিশয় অভিজ্ঞতালব্ধ তাঁর বক্তব্য : এই যে বাবুদা এখন ডিনার খেতে যাবেন তার আগে তেনারা গিলেছেন গ্যালন গ্যালন ককটেল হুইস্কি। জালা জালা শেরি, পোর্ট। স্কলেরই পেট তরল বস্তুতে টাইটস্‌দর—ছয়লাপও বলতে পারেন। ডাচেসের দ্বীষ' অভিজ্ঞতা-প্রসূত সূচিস্থিত অভিমত : এর পরও যদি হুজুররা তরল দ্রব্য সদুপ পেটে ঢোকান, তবে, তার পর আর রোস্ট ইত্যাদি নিরেট সলিড দ্রব্য খাবেন কি প্রকারে ? তাই তাঁর ডিনারে 'নো সদুপ !' অবশ্য ডাচেস সহস্রা মহিলা। কাজেই যারা নিতান্তই সদুপাসক্ত তাঁদের জন্য সদুপ আসে। ওদেরকে সঙ্গে দেওয়ার জন্য তিনিও মাঝে মাঝে দু-চার চামচ সদুপ গলাতে ঢালেন।

অতএব আমাদেরও নিতান্ত সঙ্গ দেওয়ার জন্য হুজুরলুট স্টিফ্টুও প্রদত্ত লাঞ্চে কিঞ্চিত সদুপ সেবন করতে হল।

বাঃ ! উত্তম সদুপ। ব্যাপারটা তাহলে ভালো করে বুঝিয়ে বলি।

যে সব দেশের কলোনি নেই—বিশেষ ভারত, সিংহল কিংবা ইণ্ডোনেশিয়ান—তারা গরম মশলা পাখে কোথেকে ? কেনার জন্য অত রেষ্ট কোথায় ? শত-শত বৎসর ধরে তাদের ছেঁকছেঁকানি শব্দ গোলমরিচের জন্য ! শুনোছি, ভাস্কো-দা-গামা ঐ গোলমরিচের জন্য অশেষ ক্রেশ করে দক্ষিণ ভারতে এসেছিলেন। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন, কলম্বসও নাকি ঐ একই মতলব নিয়ে সাপ খুঁজতে গিয়ে কেঁচো পেয়ে গেলেন—অর্থাৎ ভারতবর্ষ আবিষ্কার করতে গিয়ে আমেরিকায় পেঁছে গেলেন। এর পর ইয়োয়োপীয়রা দক্ষিণ আমেরিকায় ঝাল লাল লংকা আবিষ্কার করলো, কিন্তু ওটা ওদের ঠিক পছন্দ হল না ! যদ্যপি আমরা ভারতীয়রা সেটি পরমানন্দে আলিঙ্গন করে গ্রহণ করলুম।

ইতিহাস দ্বীষ'তর করবো না।

ইতিমধ্যে জর্ম'নির এতই ধনদৌলত বেড়ে গিয়েছে যে, এখন সে শব্দ কাল্যারিচ কিনেই পরিতৃপ্ত নয়—এখন সে কেনে দুনিয়ার যত মশলা। বিশেষ করে 'কারি পাউডার' আর লবঙ্গ, এলাচ, ধনে ইত্যাদির তো কথাই নেই। তবে কি না আমি কণ্টিনেন্টের কুয়্যাপি কাঁচা সবুজ ধনেপাতা দেখি নি। কিন্তু ভয় নেই, কিংবা ভয় হয়তো সেখানেই। যেদিন কণ্টিনেন্টের কুবের-সন্তানরা ধনেপাতা-লংকা-তে তুল-তেলের চার্টার্ড সোয়াদাটি বদলে যাবেন সেদিন হবে আমাদের সর্বনাশ। হাওয়াই-জাহাজের কল্যাণে কুলে ধনেপাতা হিজি-বিজি হয়ে চলে যাবেন কাঁহা কাঁহা মদ্রুকে। এটা তো এমন-কিছুর নয়া অভিজ্ঞতা নয়। ভারত-বাঙলাদেশের বহু জায়গাতেই আজ আপনি আর চিংড়ি মাছ পাবেন না। টিনে ভর্তি হয়ে তাঁরা আপনার উবরে না এসে সাধনোচিতধামে (অর্থাৎ কণ্টিনেন্টে—বেখানে চিংড়ি মাছ কেন সর্বভারতীয় শব্দকই যেতে চান) প্রস্থান করেন। একমাত্র

কোলা ব্যাঙ সম্বন্ধেই আমাদের কোন দৃঃখ নেই। যাক্ যত খুশী যাক্। ওটা ফরাসীদের বড়ই প্রিয় খাদ্য। তবে কিনা বাঙালোর থেকে তারম্বরে এক ভদ্রলোক প্রতিবাদ করেছেন : পাইকির হিসেবে এ-ভাবে কোলা ব্যাঙ বিবেশে রফতানী করায় ঐ-অঞ্চলে মশার উৎপাত দৃঃখান্তরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে ; কারণ ঐ কোলা ব্যাঙরাই মশার ডিম খেয়ে তাদের বংশবৃদ্ধিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করতো।

এটা অবশ্যই একটা সমস্যা—দৃষ্টিস্তার বিষয়। কিন্তু আমার ভাবনা কি ? আমার তো একটা মশারি আছে।

“গদরুমে” ভোজনরসিকরা বলেন সুইটজারল্যান্ডের জার্মানভাষী অঞ্চলের খাদ্যই সবচেয়ে ভোঁতা। অথচ নেপলিয়ন না কে যেন বলেছেন, “ইংরেজ এ-নেশন অব্ শপকীপারজ্” (অবশ্য ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ‘সাকী’ নামক ছদ্মনামের এক অতিশয় সূরাসিক ইংরেজ লেখক বলেন “আমরা এখন এ নেশন অব্ শপলিফ্-টারজ্” অর্থাৎ আমরা এখন দোকানের ভিড়ে চটসে এটা-ওটা-সেটা চুরি করতে ওস্তাদ) এবং “সুইসরা এ নেশন অব্ হোটেলকীপারজ্”। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে তাবৎ ইয়োরোপে সুইসরাই পরিচ্ছন্নতম হোটেল রাখে। কিন্তু প্রশ্ন : তোমার হোটেল-রেস্তোরাঁ যতই সাফসুৎরো রাখো না কেন, তোমার রেস্তোরাঁর সুপে রুড, ব্রুনেট, কালো চুল না পাওয়া গেলেও (দিনের পর দিন তিন রঙের চুল আবিষ্কার করতে করতে আমার এক মিত্র—সুইটজারল্যান্ডে নয়, অন্য এক নোংরা দেশের হোটেলে—একদিন মেনেজারকে শূদ্রধোলে “আপনার রান্নাঘরে তিনটি পাচিকা আছেন ; না ? একজনের চুল রুড, অন্যজনের ব্রুনেট এবং তেসরা জনের কালো। নয় কি ?” মেনেজার তো থ ! এই ভদ্রলোকই কি তবে শালক হোমসের বড় ভাই মাইক্রফট্ হোমস্ ? সর্দিনয়ে তথ্যটা স্বীকার করে শূদ্রধোলে, “স্যার, আপনি জানানালেন কি করে ? আপনি তো আমাদের রসুই-খানায় কখনো পদাধিগ করেন নি !” বৃদ্ধ বললেন, “সুপে কোনো দিন রুড, কখনো বা ব্রুনেট এবং প্রায়ই কালো চুল পাই—কালোটাই পাতলা সুপে চোখে পড়ে বেশী। এ তথ্যে পৌঁছবার জন্য তো দেকাত্ কান্ট-এর দর্শন প্রয়োজন হয় না। আমি বলাছি ঐ কালো চুলউলীকে যদি দয়া করে বলে দেন, সে যেন আর পাঁচটা হোটেলের পাঁচজন পাচকের মাথায় যে রকম টাইট সাবা টুপি পরা থাকে ঐরকম কোনো একটা ব্যবহার করে। আমার মনে হয় ওর মাথায় দৃঃখান্ত খুদ্রসিক্”—পাঠক অপরাধ নেবেন না, এ-কেছাটা বলার প্রলোভন কিছুতেই সম্বরণ করতে পারলুম না।) সুখ্ধুমাত্র সুইস হোটেলের সুপমধ্যে হরেকরকম্বা চুল নেই বলেই যে দূনিয়ার লোক হৃদয়মুগ্ধ হয়ে সে-দেশে আসবে এও কি কখনো সম্ভব ? আমার সোনার দেশ পূর্ব্ পশ্চিমওতর বাঙলায় সুপ তৈরী হয় না। অতএব প্লাটিনাম রুড, সাধামাটা রুড, চেশনাট ব্রাউন, মোলায়েম ব্রাউন, কালো, মিশ-কালো কোনো রঙের কোনো চুলের কথাই ওঠে না। ‘মোটাই মা রাঁধে না, তার শুপ আর পান্ডা।’ কিংবা বলতে পারেন, ‘হাওয়ার গোড়ায় রশি বাঁধার মত।’ তাই বলে কি মার্কিন সুইস টুরিস্ট এ-দেশে আসে না !

‘বিজনেস ইজ বিজনেস’—তাই সুইসরা পর্যন্ত তাদের রাস্মাতে প্রাচ্যদেশীয় মশলা ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে।

আমার কাছে একখানা সুইস সাংতাহিক আসে। তার কলেবর প্রায় ষাট পৃষ্ঠা। একদা কেউ ল্যাটে এলে আমরা ঠাট্টা করে বলতুম ‘কি বেরাদর, কেপ অব গড হোপ হয়ে এলে নাকি?’—সুয়েজ কানােল যখন রয়েছে। এখন কিন্তু এটা আর মস্করা নয়। এ্যার মেলের কথা অবশ্য ভিন্ন। কিন্তু ষাটপৃষ্ঠা বপদ-ধারী পত্রিকা তো আর এ্যার মেলে পাঠানো যায় না। খচা যা পড়বে সেটা সাংতাহিকের দাম ছাড়িয়ে যাবে। হিন্দীতে বলে ‘লড়কে সে লড়কার গদু ভারি’—বাচ্চাটার ওজনের চাইতে তার মলের ওজন বেশী।

সেই পত্রিকার একটি প্রমোক্তর বিভাগ-আছে। কেউ শূদখোল “মাংস আলু তরকারি সহ নির্মিত ভোজনের মেন ডিশ (পিয়েস দ্য রেজিস্তার্স) খাওয়ার পর যেটুকু তলানি সস (শুকনো শুকনো ঝোল, কলকাতাইয়ারা কাইও বলে থাকে) পড়ে থাকে তার উপর পাইউরটি টুকরো টুকরো করে ফেলে দিয়ে কাটা দিয়ে সেগদুলো নাড়িয়ে চাড়িয়ে চেটেপদুটে খাওয়াটা কি প্রত্যোকোলসম্মত—এটিকেট মার্ফিক, বেয়াদবী ‘অভদ্রস্থতা’ নয় তো?”

উত্তর : “পৃথিবীতে এখন এমনই নিদারুণ খাদ্যাভাব যে ঐ সসটুকু ফেলে দেওয়ার কোন যুক্তি নেই।” (অবশ্য তার সঙ্গে রুটির টুকরোগদুলোও যে গেল সে বাবদে বিচক্ষণ উত্তরদাতা কোনো উচ্চবাচ্য করেন নি। কারণ রুটিটি পরের ভোজনেও কাজে লাগতো কিংবা গরীব-দুঃখীকেও বিলিয়ে দেওয়া যেত—এটো প্লেটের তলানি সস তো পরবর্তী ভোজনের জন্য বাঁচিয়ে রাখা যায় না, কিংবা গরীব-দুঃখীকেও বিলোনো যায় না—লেখক) তারপর তিনি বলছেন, “কিন্তু আপনি যদি নির্মাণিত হয়ে কোথাও যান তবে এই কার্পণ্যটি করবেন না।” তার মানে আপনার বাড়ির বাইরের এটিকেট যেন বাড়ির ভিতরের চেয়ে ভালো হয়। আমি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন মত ধরি। আমার মতে বাড়ির এটিকেট, আদবকায়া যেন বাইরের চাইতে ঢের ঢের ভালো হয়।

প্রশ্ন : “কোহিনুর পস্তুর কোন ভাষার শব্দ?”

উত্তর : “ফাসী।”

সম্পূর্ণ ভুল নয়। ‘কোহ’=পাহাড়—ফাসতে। যেমন কাবুলের উত্তর দিকে কোহীস্তান রয়েছে [আমার সখা আশ্চর্য রহমান ঐ কোহীস্তানের লোক]। কিন্তু কোহ-ই-নুরের ‘নুর’ শব্দটি ‘ন’ সিকি আরবী। খাঁটি ফাসীতে যদি বলতেই হয় তবে ‘নুর’-এর বদলে ‘রওশন’ বা ‘রোশনী’ [বাঙলায় ‘রোশনাই’] ব্যবহার করে বলতে হয় কোহ-ই-রওশন। শূদখ আরবীতে বলতে হলে জবলদন (পাহাড়) নুর। ‘কিন্তু এ রকম বর্ণসংকর সমাস সর্বত্রই হয়ে থাকে। ‘দ্বিল্লীশ্বর’ ইত্যাদি।

প্রশ্ন : “আমার বয়স বত্রিশ; আমি বিধবা। আমার ষোলো বছরের ছেলের একটি সতেরো বছরের ভেরি ডিম্বার ক্লাস ক্রেড প্রায়ই আমাদের এখানে আসে। কিন্তু কিছুদিন ধরে সে আমার সঙ্গে ভাবভালোবাসা জমাবার চেষ্টা করছে। আমি করি কি?”

উত্তর : “আপনি ওকে সঙ্গেপনে নিয়ে গিয়ে বলুন, ‘তুমি তোমার অঙ্গবয়সী মেয়েদের সঙ্গে প্রেমপ্রেম করো। আমি তোমার মায়ের বয়সী। তোমার বয়সী মেয়ের তো কোনো অভাব নেই’। কিন্তু, আমার মনে হয়, ছেলোটার বোধ হয় মাদার কমপ্লেক্স আছে—অতি অঙ্গ বয়সেই তার মা গত হন। কাজেই সে একটি মায়ের সম্বন্ধে আছে”—তার পর আরো নানাপ্রকার হাবিজাবি ছিল।

এ-উত্তর যে-কোনো গোগদ’ভ দিতে পারতো।

কিন্তু এই প্রশ্নোত্তরমালা নিতান্তই অবতরণিকা মাত্র।

*

*

*

কয়েক মাস পূর্বে—মনে হল—একটি প্রাচীনপন্থী মহিলা—প্রশ্ন শূন্যধোলে : “আজকালকার ছেলে-ছোকরারা এমন কি মেয়েরাও বস্ত্র বেশী মশলাদার খানা খাচ্ছে। আমি গ্রামাঞ্চলে থাকি। সেদিন বাধ্য হয়ে আমাকে শহরে যেতে হয়। যদি জানতুম, শহরের ‘মাই লভ’ রেস্টোরাঁগুলো কি জঘন্য ঝাল, মাষ্টার্ড (আমাদের কাসুন্দো—লেখক) আর মা মেরিই জানেন কি সব বিদকুটে বিধকুটে বিজাতীয় মশলা দিয়ে যাবতীয় রান্না করেন, তবে কি আমি সে রেস্টোরাঁয় যেতুম ! এক চামচে সদুপ মূখে ঢালা মাত্রই আমার সর্বাঙ্গ শিহরিত হতে লাগলো। আমার কপালে সেই শীতকালে, ঘাম জমতে লাগলো। মনে হলো, আমার জিভে যেন কেউ আগুন ঠেলে দিয়েছে। আমার চোখ থেকে যা জল বেরুতে আরম্ভ করলো সেটা দেখে আমার কাছেই একটি সহৃদয় প্রাইভিট শূন্যধো—‘মাদাম, আমি বহু দেশ-বিদেশ দেখেছি—যেখানে টিয়ার গ্যাস ছাড়া হয়; কিন্তু আমাদের এই সুইটজারল্যান্ডে তো কখনো দেখি নি। শোকাতুরা হয়ে কান্না করলে রমণীর চোখে যে অশ্রুজল বেরোয় এটা তো তা নয়।

একদা সুইস কাগজে প্রশ্ন বেরলো : “এই যে আমরা প্রতিদিন আমাদের রান্নাতে মশলার পর মশলা বাড়িয়েই চলেছি এটা কি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো ?”

সেই ‘সবজাস্তা’ উত্তরিলো :

‘মাত্রা মেনে খেলে কোনো আপত্তি নেই। কোনো বস্তুরই বাড়াবাড়ি করতে নেই।’ (মরে যাই ! এই ধরনের মহামূল্যবান উপদেশ পাড়ার পদার্থীপিসি, ইন্সকুল বয় সবাই দিতে পারে !—লেখক)। তার পর সবজাস্তা বলছেন “ডাক্তারদেরও আধুনিক অভিমত, ‘মেকদার-মাফিক মশলাদার খাদ্য ভোজনস্পৃহা আহ্বারকর্ষক বৃদ্ধি করে।’ তদুপরি আরেকটা গুরুত্ববাক্যক তত্ত্ব আছে। আপনি যদি আপনার ভোজন ব্যাপারে সর্বক্ষণ ‘এটা খাবো না ওটা ছোঁব না’ এরকম পদতপদ করে আপনার ভোজন-যন্ত্রটিতে ন’সিক মোলায়েম করে তোলেন (ইংরিজীতে একেই বলে ‘মলিকডল্’ করেন) তবে কি হবে ? আপনি যতই চেষ্টা দেন না কেন, আপন বাড়িতে তৈরী মশলা বিবর্জিত রান্না-মাছই খাবো তথাপি ইহসংসারে বহুবিধ ফাঁড়া-গদি’শ আছে যার কারণে আপনাকে হয়তো কোনো রেস্টোরাঁতে এক বেলা খেতে হল। কিংবা মনে করুন, আপনি নির্মশ্রিত হলেন। শক্তসমস্ত জ্ঞেয়ান আপনি। কি করে বলবেন আপনি ডায়েটে আছেন ? ওরিকে রেস্টোরাঁ বলুন, ইয়ার বখশীর বাড়িই বলুন সব’টাই সর্বজন শনৈঃ শনৈঃ গরম মশলার মাত্রা

বাড়িয়ে যাচ্ছেন তো যাচ্ছেনই। পরের দিন আপনি কাং। অতএব”—আমাদের সবজাস্তা বলছেন, “কিছু কিছু মশলা খেয়ে নেওয়ার অভ্যাসটা করে ফেলাই ভালো।”

কিন্তু মশলাপদ্রাণ এখানেই সমাপ্ত নয়। সেটা পরে হবে।

ইতিমধ্যে আমি বদম্ করে প্রেমে পড়ে গেলুম।

কবিগদরু গিয়েছেন :

যদি পদ্রাতন প্রেম

ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেম জালে

তবু মনে রেখো।

কিন্তু এ-আশা রাখেন নি, সেই প্রথম প্রিয়াই পদ্রায় তাঁর কাছে ফিরে আসবে। আমার কপাল ভালো।

লাগু সেরে মদুম্মথরে যখন বাড়ি ফিরছি তখন বাস্‌স্‌ট্যান্ডের বেঞ্চিতে বসেই দেখি বেঞ্চির অন্য প্রান্তে যে-মেয়েটি বসেছিল সে জলজল করে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমার দৃশমনরা তো জানেনই, এস্তেক বোস্তরাও জানেন, আমি কন্সপর্কিউপিডের সৌন্দর্য নিয়ে জন্মাই নি। তবুপরি বয়স যা হয়েছে তার হিসেব নিতে গেলে কাঠাকালি বিবেকালি বিস্তর আঁক কষাকষি করতে হয়। সর্বশেষে সেটা ভ্রাংশে না গৈরাশিকে দিতে হবে তার জন্য প্লাশেং মারফৎ ঈশ্বর স্দুকুমার রায়কে নন্দনকানন থেকে এই য ব ন ভূমিতে নামতে হবে!

অবশ্য লক্ষ্য করেছিলাম, আমি ওর দিকে তাকালেই সে ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে নেয়।

রোমান্টিক হবার চেষ্টাতে বলিছিলাম, “মেয়েটি।” কিন্তু তাম বয়স হবে নিবেন চাঙ্গিশ, পয়তাল্লিশ এমন কি পঞ্চাশও হতে পারে। কিন্তু তাতে কি যায় আসে। বিদগ্ধ পাঠকের অতি অবশ্যই স্মরণে আসবে, বৃদ্ধ চাটুষ্যে মশাই যখন প্রেমের গল্প অবতারণা করতে যাচ্ছেন তখন এক চ্যাংড়া বক্তোতি করে বলিছিল ‘চাটুষ্যে মশাই প্রেমের কী-ই বা জানেন। মদুখে আর যে-কটা দাঁত ধাবোষাছি ধাবোষাছি করছে তাই নিয়ে প্রেম।

চাটুষ্যে মশাই দারুণ চটিতং হয়ে যা বলিছিলেন তার মোদ্দা : ওরে মদুখ! প্রেম কি চিবিয়ে খাবার বস্তু যে দাঁতের খবর নিচ্ছিস! প্রেম হয় হুয়ে।... একদম খাঁটি কথা। ভলতের, গ্যাটে, আনাতোল ক্লাস, হাইনে আমত্য়া বিস্তরে বিস্তর বার ফট ফট করে নয়া নয়া হুরী পরীর সঙ্গে প্রেমে পড়েছেন। এই সোনার বাঙলাতেও ব্দ একটি উত্তম দৃষ্টান্ত আছে। তা হলে আমিই বা এমন কি রক্ষহত্যা করছি যে ফুট করে প্রেমে পড়বো না।

বললে পেতায় যাবেন না, অক্সমাং একই মদুহুতে একে অন্যকে চিনে গেলুম। যেন ‘আকাশে বিদ্যাৎ-বাহি পরিচয় গেল লোখ।’

১ বইখানা আমার চুরি গেছে। কাজেই উত্তোস্দুন্টো হয়ে গেলে পাঠক অপরাধ নেবেন না।

একসঙ্গে আমি চেঁচালুম “লটে।”

সে চেঁচালে “হ্যার সায়েড।”

তারপর চরম নিলশঙ্কার মত সেই প্রশস্ত দিবালোকে সর্বজন সমক্ষে আমাকে জাবড়ে ধরে দুই গালে ঝপাঝপ এক হৃদয় বা দুই টন চুমো খেল।

সদৃশীল পাঠক, সচ্চরিত্রা পাঠিকা, মায় বেষের মরালিটি-রক্ষণী বিধবা পর্দীপিসি এতক্ষণে একবাক্যে নিশ্চয়ই নাসিকা কুণ্ঠিত করে “হ্যা হ্যা” বলতে আরম্ভ করেছেন। আমি দোষ দিচ্ছি নে। এঙ্কলে আশ্মো তাই করতুম—যদি না নাটকের হেরোইন আমার প্রিয়া লটে (তোলা নাম ‘শাল ট’) হত। বাকিটা খুলে কই।

ওর বয়স যখন নয়-দশ আমার বয়স ছাশ্বিশ। আমি বাস করতুম ছোট গোডেসবেগ টাউনের উত্তরস্তুম প্রান্তে লটেবের বাড়ির ঠিক মদুখোমদুখি। ওদের পাশে থাকতো দুই বোন গ্রেটে ক্যাটে। আমরা গোটা পাঁচেক মেয়ে—তাদের বাড়ির পরে। কারোয়ই বারো-তেরোর বেশী নয়।

লটে ছিল সবচেয়ে ছোট।

আমার জীবনের প্রথমা প্রিয়া।

আর সব কটা মেয়ে এ তথ্যটা জানতো এবং হয়তো অতি সামান্য কিছুটা হিংসে হিংসে ভাব পোষণ করতো। ওদের আশ্চর্য বোধ হত হয়তো, যে লটে তো ওদের তুলনায় এমন-কিছু গুলেবাকাগুলী নয় যে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে এসে আমি এরই ‘প্রেমে মজে যাবো’। এটা অবশ্য আমি বাড়িয়ে বলছি। ‘প্রেমে মজার’ কোনো প্রস্নই ওঠে না। আমার বয়স ছাশ্বিশ, ওর নয় কি দশ।

আসলে ব্যাপারটি কি জানেন? জার্মানদের ভিতর যে-চুল অতিশয় বিরল, লটের ছিল সেই চুল। দাঁড়চাকের মত মিশমিশে কালো একমাথা চুল। ঠিক আমার মা-বোনদের চুলের মত। ওর চুলের দিকে তাকালেই আমার মা-বোনদের কথা, দেশের কথা মনে পড়তো। আর লটে ছিল আমার বোনের মত সত্যি বড় লাজুক। সকলের সামনে, নিজের থেকে, আমার সঙ্গে ককখনো কথা বলতো না।

আমাদের বাড়ির সামনে ছিল একচিগতে গলি। সেখানে রোজ দুপুরে একটা দুটোয় আমরা ফুটবল খেলতুম। আমার বিশ্বাস তুমি পাঠক, আমাদের সে টিমের নাম জানো না। আমিও অপরাধ নেবো না। আমরা যে আই এক এ শীল্ডে লড়াই দেবার জন্য সে আমলে ভারতবর্ষে আসি নি তার মাত্র দুটি কারণ ছিল। পয়লা : অতখানি জাহাজ ভাড়ার রেশ্ত আমাদের ছিল না, এবং দোসরা : আমাদের ‘কাইজার টীমে’ পুরো এগারো জন মেম্বার ছিলেন না। আমরা ছিলুম মাত্র আশোটা জন। তৃতীয়ত, যেটা অবশ্য আমাদের ফেভারেই-যায়, আমাদের ফুটবলটি ছিল অনেকটা বাতাবী নেবুর মত। ওরকম ফুটবল দিয়ে কি সম্ভব, কি জুদ্দা খান ককখনো প্যাটান-উইভিং ড্রিবাং ডজিং ডার্কিঙের সদুযোগ পান নি।

হায়, হায় ! এ-জীবনটা শুধু সদ্ব্যোগের অবহেলা করে কয়েই কেটে যায় ।

এসব আত্মচিন্তা যে তখন করেছিলুম তা নয় ।

চল্লিশ বছর পর পুনরায় এই প্রথম আমাদের পুনর্মিলন । লটে হঠাৎ শুধলো, “হায় সায়েড ! তুমি বিয়ে করেছো ?”

শুনোছি ইহুদীরা নিতান্ত গঙ্গাঘাটার জ্যাস্ত মড়া না হলে কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন শুধিয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা দেয় । আমি শুধলুম, “তুই ?”

খল খল করে হেসে উঠলো ।

“কেন ? আমার আঙ্গুলে এনগেজমেন্ট রিং বিয়ের আংটি ব্দটোই এখনো তোমার চোখে পড়ে নি । আমি তো বিদ্বিমা হয়ে গিয়েছি । চলো আমাদের বাড়ি ।”

আমি সান্ধাৎ যমদর্শনের নায় ভীত চকিত সন্ত্রাসগত হয়ে প্রায় চিংকার করে উঠলুম, “সে যদি আমায় ঠ্যাণ্ডায় ।”

দুটি মিনিট মধুর ঠোঁটের উপর অতিশয় নিম্নল মৃদু হাসি এঁকে নিয়ে বললে, “বটে ! আমার জীবনের প্রথম প্রিয়কে সে প্যাঁদাবে ? তা হলে সেই হালদুকেটাকে আমি ডিভোর্স করবো না !”

তওবা, তওবা !